CUL- H04368-23-P30634

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচনী

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

দ্বাবিংশ বর্ষ

১৩১৮

P 30634

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৩৬নং বলরাম দের ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—০:০—

অ

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
অদৃষ্ট (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	২০১
অনুভূতি (কবিতা)	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	৮৮১
অনুশোচনা (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ গুহ	১৬৩
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩০৪, ১২৫, ৮৪৯

আ

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটী নলিনী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল	১২৩
আত্মত্যাগ (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৭৫
আনন্দ-পর্য্যটন (নক্সা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	২৫১
আমাদিগের চাষ (নক্সা)	ঐ	৫৭৩
আবগারী বিভাগের সংস্কার		১০৫

ই

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.	৬২

উ

উৎসর্গ-পত্র (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	৩৩২
উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	৬৭৬, ৮৩২, ৯১৪

ক

কথাপ্রসঙ্গ	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৯, ৫৩২
কর্ম্মযোগের টীকা (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	২৭
কি বনাম কী	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৯৩০
কর্ণাট	শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি	১৩০, ৬৮৭
কাবুলী বিড়াল (গল্প)	শ্রীবঙ্গবিহারী চট্টোপাধ্যায়	১০৩
কিসের অভাব ? (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৭৮১
কুকুরের মূল্য (গল্প)	শ্রীসুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এল.	৪৬১
কুৎসা-কুমারী (গল্প)	৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৩৪৮
কেরল	শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি	৯২১

ঘ

ঘণ্টা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৮৭
ঘুম-রাণী (কবিতা)	শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৭৩

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
চন্দ্রালোকে (গল্প)	শ্রীমতী [illegible] ঠাকুর	৪২৯
চীন-প্রবাস-চিত্র	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭৪৮, ৮৩৮, ৯২৫
চুট্‌কী	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ.	৪৮৩
	জ	
জগৎ-কথা	শ্রীরাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ	১৫
জয়মাল্য (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৩৭
জীব-বন্ধন	শ্রীশশধর রায় এম্. এ., বি. এল.	৯৭১
জীবন-সোপান	শ্রী[illegible]কুমার বড়াল	১২৯
জ্ঞানালোকে শ্রীচরিত্র	শ্রী সত্যধনাথ ঘোষ	৮৯১
[illegible]	শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত	৭১২, ৯১৮
	ট	
[illegible] (গল্প)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫৫
	ত	
তীর্থযাত্রী (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৪৪
	দ	
দিদি (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	২৮৩
দুর্গীরাম (গল্প)	ঐ	৭৮৫, ৯৩৭
দুইটি গান	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৫
দেশের কথা	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল্	৭৭
দক্ষিণ-ভারত	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৪৩৮
	ন	
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	সম্পাদক	৩৯৬
নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্	৫১৯
ঐ ঐ	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	৫৭৫
"নিনা'য়ের শতেক নাও"	শ্রীচন্দ্রশেখর কর বি. এ,	৭৩০
	প	
পশুব্রহ্ম (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৫০
পরলোকবাদ কি বিজ্ঞানসম্মত ?	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্. এ,	৮০৩
পান্থ (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	১
পিশাচ পুরোহিত (সমালোচনা)	সম্পাদক	৯২৪
পুরোহিত (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৬৫
পৃথ্বীরাজ রাসো	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	১০৭
পেঁপে সুন্দরী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্. এ. বি. এল্	১০৬
[illegible] (গল্প)	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার [illegible]	[illegible]

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন ভারতে মনুষ্যগণনা	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭৩
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ	৭৮১
	ব	
ব্যাকরণ-বিভীষিকা	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ,	১১২, ১৯৫
বাতাসী (গল্প)	শ্রীজলধর সেন	৭১৩
বানান-প্রসঙ্গ	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.	২১৬, ৩৮৪
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮১, ৩১৩, ৩৪৪
বিদেশী গল্প	৫০, ১০৩, ১৬৭, ১৭৫, ২১৫, ৩৭০, ৩৭৪, ৪২৯, ৪৫১, ৫৭১, ৪৮৭, ৫৬৫, ৬১৭, ৬২২, ৭৬৩, ৮৫৫, ৮৩৯	
ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯৩
বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বি. এল.	৪৯
	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ,	৪৬৬
ব্যাকরণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে আলোচনা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন	৩৮১
বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৬
বরষায় (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৩২
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৫৪২
বর্ষা-মঙ্গল (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল্	৩১৫
বাঙ্গালী জীবন (সমালোচনা)	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ,	৭০১, ৯৮৫
বাঙ্গালাভাষার মামলা	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল্	৬৫৯
বাড়ী-বিক্রয় (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪৭৫
বিজয়ী (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৭৩৩
বুদ্ধিহীনা	ঐ	৯৩৮
	ভ	
ভবভূতি ও কালিদাস	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্. এ,	৫,২৯২,৫৫০,৭৫৩,৯৫২
ভারতের স্বর্ণযুগ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৪০
ভারতে শক-শোণিত	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	১৫৫
ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ,	৫৮৫
ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	৩৪৭, ৮৭৫
ভারতীয় শিল্পাদর্শ	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল,	৮৮৩
	ম	
মারাঠে শক-শোণিত	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	৭৩৮
মগ-সাম্রাজ্য	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	১৮৫
মহাষ্টমী (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৫৯৮

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
মায়াবিনী (কবিতা)	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	৩১২
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	সম্পাদক	
মানব-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৯৫০
মুস্কিল-আসান (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ,	৪১৫
মূর্ত্তি-আবিষ্কার	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬২৫
মেঘদূত (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্. এ., বি. এল্	৪৭৩
মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্	৬৫৪
		৩১৭, ৪০২, ৫৭০, ৬৪৩, ৮০৯

য

রাজা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৫১

শ

শঙ্করস্বামী ও তাঁহার যুগ	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৯৬
শশাঙ্ক	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৪, ৫২৭
শারদ-লক্ষ্মী (কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা	৪০৯
শিশুর জয় (গল্প)	৺নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৮৩
শিক্ষয়িত্রী (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৬১৭
শ্রাবণে (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	৮১৫

স

সভ্যতা	শ্রীশশধর রায় এম. এ., বি. এল্	৫৩৪
সহযোগী সাহিত্য		৭০, ১৪৪, ২২৫, ৩০৭, ৩৫৯,
সংগ্রহ		৪০০
সাঞ্চীর স্তূপ	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬৬৩, ৮৪৩,
সে (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৪৮০
স্মৃতি (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬২২
স্পর্শমণি (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	২৫
স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি ?	শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী	২৬১
		৩৬৫, ৫৬৭, ৬৩৯, ৬৯৮, ৭৯৮, ৮৬১

হ

হিমারণ্য	স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী	২৩৫, ৩০৭
হুগোর কবিতা	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	৬৭৬

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অ

অক্ষয়কুমার বড়াল

কিসের অভাব ? ,, ৭৮১
মানব-বন্দনা ১৫০
জীবনযোগান (কবিতা) ১২৯
পান্থ (কবিতা) ১
মহাষ্টমী ,, ৫১৮
,, ,, ৪৮০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল

দেশের কথা ৭৯
নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ৫১৯
ভারতীয় শিল্পাদর্শ ৮৮৩

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বঙ্কিমচন্দ্র ৪৯৫

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা ৬৩৭,৮৭৫

আ

আশুতোষ রায়

চীন-প্রবাস-চিত্র ৭৫৮, ৮৩৮, ৯২৫

উ

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

জৈন কথা-সাহিত্য ৭৭২, ৯১৮
কী ৮১০

ঋ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুইটি গান
ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শান্তিনি ...

ক

কৈলাসচন্দ্র সিংহ

[illegible] ৭৮১

চ

চন্দ্রশেখর কর বি, এ,

"নিনা"য়ের পত্রের নাও" ৭৩০

জ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রালোকে (গল্প) ৪২৯
বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্র...
...
বাতাসী (গল্প)

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কুৎসা-কুমারী ৩৪৮

দুর্গাচরণ ভট্টি

...টি ১৩০,২৮৭
...কেরল ৯২১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

...লাপ ২১৯,৫৩২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ,

ভবভূতি ও কালিদাস ৫,২৯২,৫৫০,৯৫২

দেবকুমার রায় চৌধুরী

আকৃতি (কবিতা) ৮৮১

দেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ. বি. এল

আমার কবিবন্ধুর নাতনি নন্দিনী ১২৬

মেঘদূত ” ৪৭৩
বর্ষামঙ্গল ” ৬১৫

দীনেন্দ্রকুমার রায়
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ ৬০৬,৭২৩,৮৪৯
দিদি (গল্প) ২৮৩
দুখীরাম ঐ ৭৮৫, ৯৩৩
প্রত্যাখ্যান ঐ ৪৩৫

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
ভারতের স্বর্ণযুগ ৪০

নিখিলনাথ রায় বি, এল্,
মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ৬৫৪

নলিনীভূষণ গুহ
অনুশোচনা (গল্প) ১৬৩

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
শিশুর জয় (গল্প) ৭৯

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ,
পরলোকবাদ কি বিজ্ঞানসম্মত ? ৮৩

প

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ৪৬৬
বাঙ্গালী-জীবন (সমালোচনা) ৭০৭,৯৬৫
সহযোগী সাহিত্য ৭০,১৪৪,২২৫,৩০৭,
৩৫৯,৪৬৭,৬৩৯,৬৯৮,৭৯৮,৮৬১

প্রিয়নাথ সেন
ছগোলর কবিতা ৬৭৬
শ্রাবণে (কবিতা) ৮১৫

ব

বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্,,
বাঙ্গালা ভাষার মামলা ৩৬৯
দিল্লী ৮৭০
কি বনাম কী ৯৩০

বনওয়ারীলাল চৌধুরী
স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি ? ২৩১

বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কাবুলী বিড়াল (গল্প) ১০৩
জয়মাল্য ” ৫৩৭
স্বপ্ন ও বুদ্ধিমান ” ৫৬৫, ৫৬৬
পুরোহিত ” ৭৬৮
বাড়ী-বিক্রয় ” ৪৭৫
রাজ-কুকুর ” ৩৭০
স্মৃতি ” ৬২২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
টেঞ্জি (গল্প) ৮৫৫

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রাচীন ভারতে মনুষ্যগণনা ৭০৩
বেস নগরের শিলালিপি (সহযোগী) ৩৬৫
মূর্ত্তি-আবিষ্কার ৬২৫

ম

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
ঘুম-রাণী ” ৬৩৩
তীর্থযাত্রী ” ৩৪৪
স্পর্শমণি (কবিতা) ২২

মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
চিত্রশালা ৬৯,১২৭,৩২৫

মন্মথনাথ ঘোষ
জাপানে স্ত্রী-চরিত্র ৮৯১

য

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহামহোপাধ্যায়,
ব্যাকরণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে আলোচনা ৬৮৫

র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ,
জগৎ-কথা ১৫

রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ,
শঙ্করস্বামী ও তাঁহার যুগ ৯৬
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান ৫৪২

রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ,
নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ৭৫

রামপ্রাণ গুপ্ত

মগধ সাম্রাজ্য ১৮৫
দক্ষিণ ভারত ৮৯৮

রামানন্দ ভারতী

হিমারণ্য ২৩৫, ৩২৭

রসময় লাহা

শারদ লক্ষ্মী (কবিতা) ৪০৯

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, শশাঙ্ক ৩৫৪, ৫২৭

ল

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ,

ব্যাকরণ বিভীষিকা ১১২, ১৯৫
বানান-সমস্যা ২৬৬, ৩৮০
চুটকী ৪৮৩

শ

শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্,

জীব-বন্ধন ১৭১
সভ্যতা ৬৩৪
চরিত্র ৮৬৪

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ১৮১,৩১৩,৩৪৪
বঙ্কিমচন্দ্র ৬৯৩

স

সখারাম গণেশ দেউস্কর

পৃথ্বীরাজ-রাসো (হিন্দী সাহিত্য) ১৩৭
ভারতে শক-শোণিত ১৫৫
মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত ৭৩৮

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্,

কুকুরের মূল্য (গল্প) ৪২৩

সুরেশ সমাজপতি

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ৩৯৬

সরোজনাথ ঘোষ

অদৃষ্ট (গল্প) ৩০১
আত্মত্যাগ ” ১৭৫
পণরক্ষা ” ৫০
বুদ্ধিহীনা ” ৯৩৯
পিতৃদ্রোহী ” ২১৫
রাজা ” ৪৫৮
বিজয়ী ” ৭৬৩
শিক্ষয়িত্রী ” ৬১৭
ক্ষমা ” ৩৭৪
ঘণ্টা ” ৪৮৭

সুরেশ্বর শর্ম্মা

মায়াবিনী (কবিতা) ৩১২

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ

আনন্দ-পর্য্যটন (নক্সা) ২৫১
আমাদিগের চাষ (নক্সা) ৫০৬
উৎসর্গ-পত্র ” ৩৩২
কর্ম্মযোগের টীকা (গল্প) ২৭
ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি ৫৮৬
মুস্কিল-আসান ” ৪১৫

হ

হরগোপাল দাসকুণ্ডু

উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার ৬৭৬, ৮৩২

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সাঞ্চীর স্তূপ ৬৬৩, ৮৪০

চিত্র সূচী।

—;*:—

১। জলতোলা ১
২। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
৩। " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯
৪। ভগ্নকুটীর ৭৯
৫। অধ্যাপক ললিতকুমার ১১৪
৬। বর্ণ-পরিচয় ১৫২
৭। প্রভাত ও শুকতারা ১৫৫
৮। ওজন ২৩০
৯। প্রসাধন ২৩৫
১০। ছদ্মবেশে রাবণের সীতা-সমীপ আগমন ২৫১
১১। রাজ-পরিবার ২৬৭
১২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২৭৮
১৩। চিরন্তন কাহিনী ৩২৭
১৪। হোরা ৩৫০
১৫। স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ৩৯৬
১৬। উপাসিকা ৪১৫
১৭। নদীতীর ৪২৩
১৮। তন্ময় ৪৩১
১৯। নিশীথ-চিত্র ৪৩৯
২০। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬৩
২১। ইলেইন ৪৯৫
২২। পবিত্র পরিবার ৫১৪
২৩। দিনাজপুরের প্রস্তর চৈত্য ও প্রস্তরস্তম্ভলিপি ৫৪২
২৪। দাস্তের স্বপ্ন ৫৭৬
২৬। গ্যালিলী ৫৮৬
২৭। নূতন আবিষ্কার ৬৩০
২৮। দাস্তের স্বপ্ন ৬৪৭
২৯। মুকুল ও পুষ্প ৬৬২
৩০। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৬৮
৩১। রুষ কৃষাণের গৃহাশ্রম ৭২৩
৩২। সমালোচক ৭৩৮
৩৩। কন্‌কিউসিয়াস্ মন্দিরের সিংহদ্বার ৭৪৬
৩৪। আন্‌টিংমন্-পিকিং ৭৫৪
৩৫। সন্দিগ্ধা ৮০৩
৩৬। খেলার সাথী ৮১৪
৩৭। মুগ্ধা ৮৩৮
৩৮। ধরা-স্বর্গ ৮৭৮
৩৯। জাগো ৮৮৩
৪০। জাপ-ছাত্রী ও জাপ-রমণী গৃহ মার্জ্জনে নিরত ৮৯১
৪১। সামিসেন ও কোতো এবং জাপ-রমণী কিমোনো-ধৌত করিতেছে ৮৯৮
৪২। শ্রীযুত শশধর রায় ৯৩০

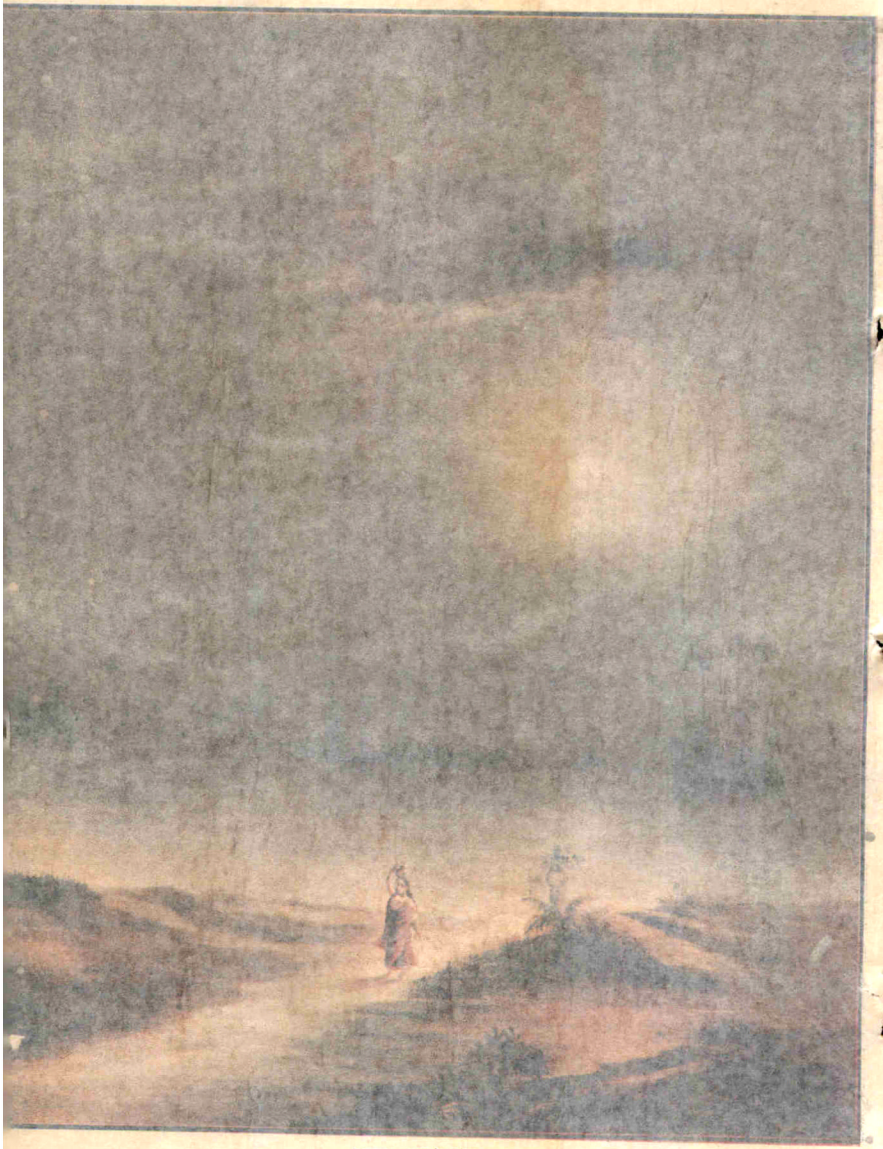

জল তোলা

by G. N. Mukerji, Prop. Mohila Press.

Mohila Press, Calcutta.

পান্থ।

[ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ।]

১

ঢাল'—তবে ঢাল' সুরা, ঢাল' পূর্ণ করি';
চরণ-মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরি'।
প্রেয়সী, নিটোল কসি', হাসি' হাসি' যাও—
প্রেম হোক্ বিশ্বব্যাপী—আপনা বিসরি'।

২

কহিও না কোন কথা,—অদৃষ্ট হাসিবে,
কি কথা বলিতে গিয়ে কি কথা আসিবে।
হয় তো কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ,
আবরণ আঁধিজলে হৃদয় ভাসিবে।

৩

কাঁপুক অধরে তবে অব্যক্ত কামনা—
পলে পলে নব লীলা, নবীন ছলনা!
কত স্তব-স্তুতি-পূজা,—বেশ নাহি সরে,
দেবান্তরে করে নর স্বপন-কল্পনা।

৪

অহো, যুগ-যুগ-শ্রম, জন্ম-জন্ম-আশ,
বিফল উদ্যম কত, প্রাণান্ত পিয়াস,
আকাশে বাতাসে ওই গভীর নিশ্বাসে—
খুঁজিছে কাতরে গত জীবন-আবাস!

৫

উদ্যোগে প্রভাত গেল, কর্ম্মত সজাগ,
গোলাপ-কপোলে নাই সুষমা-সোহাগ!
শিশির শুকায়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু করি'
উঠে নাই উষিয়া, সুপক্ক দ্রাক্ষা!

৬

সে নবযৌবন কোথা—কি উৎসাহে মাতি'
কত মানী জ্ঞানী পিছে গেছে দিবা-রাতি !
ভূদেব কোথায় আজ, কেশব নীরব ;
বিশ্বযোড়া মরণের বিশ্বযোড়া খ্যাতি।

৭

কোথা দ্রৌণী, কোথা কৃপ, কোথা বিভীষণ !—
কাহার চরণে আমি লইব শরণ ?
প্রতিদিন নব ধর্ম্ম, নব প্রচারক ;
সত্য-মিথ্যা-পরীক্ষায় ফুরায় জীবন।

৮

পারিত গড়িতে যেই স্বর্গের সোপান,
গড়ি গড়ি করি' কোথা করিল প্রস্থান !
যতটুকু আছে—তবে ততটুকু দাও,
প্রেম কভু নহে বিন্দু, সিন্ধু পরিমাণ !

৯

আজ যদি যায় দিন নয়নে নয়নে,
গতকল্য মধুময় হবে না কি মনে ?
কে জানে—আগামী কল্য এই মত্ততায়
ঘুমাব না চিরস্বপ্নে—অনন্ত-শয়নে ?

১০

যুড়ি' করপদ্ম দুটি কাতরে, ললনা,
আকাশের পানে চেয়ে কি কর প্রার্থনা ?
জান না কি ওই শূন্য—আমাদেরি মত
সহিতেছে অবিরত অদৃষ্ট-তাড়না !

১১

অস্থির গোলকে এই কেহ নহে স্থির,
সৃজনের শিরে শিরে বেদনা গভীর !
সমুদ্র আকুলি' উঠে, ভয়ে বায়ু ছুটে,
ফুটে পড়ে মর্ম্মজ্বালা ক্রোড়ে ধরণীর !

১২

সুজন-মদিরা-পানে পূর্ণ মনোরথ,
উলটি' দেছেন শূন্য—পাত্র মহত্তম ;
কেবা কার তত্ত্ব লয়, কে জানে নিশ্চয়
নিদ্রিত না জাগরিত স্বয়ম্ভু শাশ্বত !

১৩

বিজ্ঞানের পঞ্চভূতে করিয়া ভ্রমণ,
দর্শনের ষড় অঙ্গ করিয়া দর্শন,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত—মুহ্যি মর্ম্ম আজ
জীবন-রহস্য-দ্বারে মূঢ় অকিঞ্চন।

১৪

এত শোভা, এত আলো কি করে হেথায় ?
এত আশা ভালবাসা সবি কি বৃথায় ?
শোকে দুখে নিরাশ্বাসে—মনে প্রাণে আমি
গড়ি যে মঙ্গল-মূর্ত্তি, বরি কি মিথ্যায় ?

১৫

হের ওই সূর্য্যমুখী চাহে ফিরে ফিরে,
চাতকী কাতরে ডাকে জলদ নিবিড়ে।
মৃতমুখী স্বর্ণলতা, শুষ্ক নীর্ণ শাখা,
জননী বিদীর্ণবক্ষঃ লুটায় মন্দিরে !

১৬

কে খুলিবে অদৃষ্টের চিররুদ্ধ দ্বার ?
কে করিবে নচিকেতা সমাধি-উদ্ধার ?
জীবনের চিরতর্ক কবে হবে শেষ—
ঘুচিবে সৃজিত স্রষ্টা, সাধের আধার !

১৭

চিরদিন আপনার আনন্দ-কিরণে
যে আত্মা ভাসিতে পারে গগনে গগনে,—
সে আত্মা—সে মুক্ত আত্মা অন্ধ পঙ্গু আজ,
পড়ি' জড়পিণ্ড সম জড়ের বন্ধনে।

১৮

কি দুখ—ত্যজিতে দূরে জীর্ণ ছিন্ন বাসে?—
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র উড়িছে বাতাসে।
মুঞ্জরিছে শাখা-অগ্রে শুভ্র কিশলয়,
বিহগের ভগ্নস্বরে বসন্ত উচ্ছ্বাসে!

১৯

আমি যাব, কিবা তায়? রবে তো ধরণী,
ল'য়ে রবি, শশী, তারা, দিবস, রজনী!
গোলাপে সুবাস দিয়া, বিহগে উল্লাস,
শিশুকণ্ঠে পতি-পার্শ্বে দাঁড়াবে রমণী!

২০

কার বিচারের কথা?—কেন ভয় পাই?
আসিবার কালে, প্রিয়, কিছু আনি নাই!
কাঁদিয়া এসেছি ভবে, কেঁদে যাব চলে'—
মুহূর্ত্তের জলবিম্ব—মুহূর্ত্তে মিলাই!

২১

এ কি সত্য?—পূর্ণজ্ঞান উঠিবেন রাগি'
অজ্ঞানের অক্ষমতা-অপরাধ লাগি'?
ইহলোকে ভালবেসে পারি না কুলাতে,
পরলোক তরে হব কেমনে বিবাগী?

২২

লইলাই যেই ঋণ, জানি না যে ঋণ,
হইবে শুধিতে তাহা, কি আজ্ঞা কঠিন!
দাও নাই ভক্তি জ্ঞান,—এ কি অসম্ভব,
তাহারি পরীক্ষা তুমি ল'বে একদিন?

২৩

আলোকে আঁধারে তুমি গড়িলে ভুবন,
জীবনে জড়ায়ে দিলে নানা প্রলোভন;
আমি যদি ভুলি পথ, সে কি মোর পাপ—
তোমার বিচিত্র স্বাদ করি' আস্বাদন?

২৪

কেন গড়েছিলে পাপে পুণ্যের বরণে ?
কেন এত দিলে মোহ জড়ায়ে জীবনে ?
বিভ্রান্ত তোমারি ছলে,—কৃপাপাত্র তুমি,
কর ক্ষমা,—ক্ষমি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে !*

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ভবভূতি ও কালিদাস।

৩

নাটকত্ব।

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস, তিনটিই মনুষ্যচরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব দেখানো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষমাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা। অজবিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষমাত্র। এ বিলাপ অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্রনির্ব্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো।

উপন্যাসে, চরিত্রাবলি লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। [illegible] উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

---

* প্রদীপ, ১—২য় সংখ্যা) সাহিত্যের ১৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যায় (১৩১১ সাল, বৈশাখ) প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখণ্ডগুলির মত; তাহাদের গতি এক দিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত;—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত;—চারি দিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত, এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট্। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাক্‌বেথ। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স্ সিজার্। নাটক প্রতিহিংসায় আরব্ধ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হাম্‌লেট্।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। নাটকে, মহাকাব্যে, বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এখন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে; আখ্যানবস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোনও নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই। কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্যচরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এক দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য দিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু না কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্যজীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। এক জন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দাস্য স্বীকার করিল। এরূপ ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল রকমের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, নাটক তত যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখানো চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ঘটনার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ না তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না পায়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত না হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরি উক্ত উদাহরণে ধরুন, যদি নায়ক বা নায়িকার, বা উভয়েরই মৃত্যু হয়, কিংবা এক জন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে

নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক; যেমন—হাম্‌লেট্ বা কিং লিয়র্। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে, তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল এক স্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার পূর্ব্বে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডংকানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আতিথ্যে ও লোভে। কিং লিয়রের যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতায় ও প্রবৃত্তিতে। হাম্‌লেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে না। তাহা যে সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটক বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুলপরিমাণে থাকে; যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে।

তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে, কিংবা গুণগুলি বাদ দিয়া দোষগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখানো হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শচরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্যচরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র—মনুষ্যচরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি নাটকাকারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না—ধর্ম্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি যে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহাদার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই, যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার [illegible], (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) [illegible]।

কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম—(তাহার অঙ্কুর—তাহার বৃদ্ধি ও তাহার পরিণাম) দেখানোই এ নাটকের

উদ্দেশ্য; এ নাটক যাহা লইয়া আরম্ভ, তাহা লইয়াই শেষ। মূল ব্যাপার প্রেম, যুদ্ধ নয়। সেই প্রেমের সফলতা বা বিফলতা লইয়াই প্রেমমূলক নাটক রচিত হয়। এ নাটকে প্রেমের সফলতা দেখানো হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা নাটকে ঘটনার ঐক্য আছে।

তাহার পরে এ নাটকে অন্য সব চরিত্র ঐ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-কাহিনীকে ফুটাইবার জন্য কল্পিত। নাটকে বর্ণিত সকল ঘটনাগুলিই সেই প্রেমের স্রোতে, হয় বাধাস্বরূপ আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহাকে দ্রুততর আগাইয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইতেছে। বিদূষকের কাছে রাজার মিথ্যাবাদ, গোপনে বিবাহ, দুষ্মন্তের অভিশাপ, অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, এগুলি মিলনের পক্ষে প্রতিকূল; বিবাহ, ধীবর কর্তৃক অঙ্গুরীয়-উদ্ধার, রাজার স্বর্গে নিমন্ত্রণ—এগুলি মিলনের অনুকূল। এমন একটি দৃশ্য এ নাটকে নাই যাহা বাদ দিলে পরিণাম ঠিক বর্ণিতরূপ হইত। অতএব এ নাটকে ঘটনার সার্থকতাও আছে।

উপরন্তু দৃষ্ট হইবে যে, ঘাত প্রতিঘাতেই এ নাটক চলিয়াছে। প্রথম অঙ্কেই, শকুন্তলার ও দুষ্মন্তের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; এমন সময়ে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা, ও দিকে গৌতমীর সতর্ক দৃষ্টি, গোপনে বিবাহ, কণ্বের ভয়ে রাজার পলায়ন, দুর্বাসার অভিশাপ ইত্যাদি গল্পটিকে ক্রমাগত বক্রভাবে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছে; সরলভাবে চলিতে দিতেছে না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অন্তর্বিরোধ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধ প্রায় কোনও স্থানেই পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম সম্বন্ধে রাজার কৌতূহল ব্যঞ্জনাপ্রসূত। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দুষ্মন্তের ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু অসবর্ণে ত বিবাহ সম্ভবে না; তাই তিনি ভাবিতেছেন যে, শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কি না। সে বিষয় দুষ্মন্তকে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল।—তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা। বস্তুতঃ সন্দেহ হইবা-মাত্রই ভঞ্জন হইয়াছিল। কারণ দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে, তাঁহার যখন শকুন্তলার আসক্তি হইয়াছে, তখন শকুন্তলার ক্ষত্রিয়কন্যা হইতেই হইবে। এখানে কোনও অন্তর্বিরোধ নাই।

মাতৃ-আজ্ঞা ও ঋষি-আজ্ঞায় কোনও সংঘর্ষ হইল না। মাতৃ-আজ্ঞা

আসিবামাত্র তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাধব্য যাইবেন মাতৃ-আজ্ঞা-রক্ষায়, রাজা যাইবেন ঋষি-আজ্ঞা-রক্ষায়—অর্থাৎ শকুন্তলার উদ্দেশে। তৃতীয় অঙ্কে যখন রাজা একাকী, তখন তিনি ভাবিতেছেন, জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।

কিন্তু তৎপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্।

Ceasarএর দিগ্বিজয়ের ন্যায় লালসার Vini Vidi Vici—যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই পরাজয়। তাহার পরে এই অঙ্কে রাজা একেবারে প্রকৃত কামুক। প্রকৃত অন্তর্বিরোধ যাহা হইয়াছে, তাহা পঞ্চম অঙ্কে।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিভ্রম হইয়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার কামুক মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্।

শকুন্তলার নাতিপরিস্ফুট শরীরটির উপরে একবারে তাঁহার লক্ষ্য গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমী এই নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে দুষ্মন্তকে বলিলেন, তখন দুষ্মন্ত কহিলেন, কিমিদমুপন্যস্তম্।

গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখাইলেন। তখন রাজা আবার

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্॥

ইহা প্রকৃত অন্তর্বিরোধ। এক দিকে লালসা, আর এক দিকে ধর্ম্মজ্ঞান। মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। রাজা তখাপি স্মরণ করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন কি না। তিনি গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

কথমিদমভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণমাশ্রমমৃগীয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

এবার শকুন্তলা স্বয়ং মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন। "ইহা কি আপনার উচিত

হইতেছে?" "ইদমেহিং অক্খরেহিং পচ্চাকৃখাদুং"। রাজা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, শান্তং পাপম্, "সদীহশে ময়ি পাতয়িতুম্।"

শকুন্তলা অঙ্গুরীয় দেখাইতে গিয়া পারিলেন না। অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হইয়াছে। গৌতমী বলিলেন যে, অঙ্গুরীয়টি নিশ্চয় নদীস্রোতে পতিত হইয়াছে। তখন রাজা এমন কি গৌতমীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।" এমন কি, রাজা এমন কঠোর হইলেন যে, গৌতমী যখন বলিলেন যে, "এই শকুন্তলা তপোবনে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, শঠতা কাহাকে বলে, জানেন না।" তখন রাজা কহিলেন,—

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীনাং সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যদ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি॥

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা রোষের সহিত কহিলেন,—হে অনার্য্য আপনার ন্যায় সকলকে ভাবেন * * তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় শঠ আপনি। সকলেরই সে প্রবৃত্তি নয়—জানিবেন। ক্রোধে তখন শকুন্তলা ফুলিতেছেন। রাজার তখন আবার সন্দেহ হইল।

ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলা তখন ঊর্দ্ধ হস্ত উঠাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপ ভাবে মহিলাকুল কি কখন পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে? আমি কি স্বেচ্ছাচারিণী কুলটার ন্যায় আপনার কাছে আসিয়াছি?"

শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুষ্মন্ত নীরব। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তাঁহারা মনে কি ঝড় বহিতেছিল। সম্মুখে রোরুদ্যমানা অপরূপ সুন্দরী তাঁহার পত্নীর ভিক্ষা করিতেছে; তাহার সহায় ঋষি ও ঋষিকন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার ধর্ম্মভয় তাঁহাকে টানিতেছে। একটা মহাসমর চলিয়াছে। শেষে ধর্ম্মভয়ই জয়ী হইল। একটি দৃশ্যে এতখানি অন্তর্বিরোধ অন্য কোনও নাটকে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা প্রতীহারীকে কহিলেন, আজ তিনি ধর্ম্মাসনের কার্য্য সকল সম্যক প্রকারে পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন না। গৌরকার্য্য

পরিদর্শন করিয়া তাহার একটা বিবরণ তিনি যেন রাজার নিকটে প্রেরণ করেন। কঞ্চুকীকেও যথাযথ আজ্ঞা দিলেন। সকলে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার বয়স্যের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর চেটী দুষ্মন্ত-চিত্রিত শকুন্তলার আলেখ্য আনিলে রাজা তাহা তন্ময়-চিত্তে দেখিতেছেন।

বিদূষক আলেখ্য লইয়া প্রস্থান করিলে প্রতীহারী আসিয়া রাজকার্য্য রাজার কাছে 'পেশ' করিল। রাজা শুনিলেন যে, এক নিঃসন্তান বণিক জলমগ্ন হইয়াছে। রাজা আজ্ঞা দিলেন, "দেখ, ইনি সম্ভবতঃ বহুপত্নীক; যদি তাঁহার কোনও অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যা থাকে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হইবে।" তাহার পরে প্রতীহারী গমনোদ্যত হইলে রাজা পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, সন্তান থাকে না থাকে, কি যায় আসে—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

তাহার পরে তাঁহার নিজের নিঃসন্তান অবস্থা স্মরণ হইল। পূর্ব্ব-পুরুষগণের পিণ্ডদান কে করিবে, তাহা ভাবিলেন। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মাধব্যের আর্ত্তনাদ তিনি শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন যে, পিশাচ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন; ধনুর্ব্বাণ লইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মাতলি মাধব্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন যে, ইন্দ্রদেব দৈত্যদমনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এই অঙ্কে আর অন্তর্বিরোধ নাই বটে, কিন্তু রাজার রাজকর্ত্তব্যজ্ঞান, বিরহ ও অনুতাপ মিশিয়া যে এক অপূর্ব্ব করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

ভবভূতির নাটকে কিন্তু এ গুণগুলির একান্ত অভাব। ঘটনায় একাগ্রতা উত্তরচরিতে আছে বটে। সীতার পরিত্যাগ ও পুনর্ম্মিলন এই নাটকের প্রধান ব্যাপার। প্রথম অঙ্কে বিবাহ, সপ্তম অঙ্কে মিলন। কিন্তু ঘটনার সার্থকতা এ নাটকে নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কয় অঙ্কে একটি ব্যাপার আছে। তাহা রামের জনস্থানে প্রবেশ। দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের সহিত পঞ্চবটী দর্শন,

তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সমক্ষে রামের আক্ষেপ,চতুর্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা, ও অরুন্ধতীর সহিত লবের পরিচয়, পঞ্চম অঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশ মুখে রামের রামায়ণ-গীতি-শ্রবণ—এগুলি না থাকিলেও সীতার সহিত রামের মিলন হইত। এ নাটকে যাহা কিছু নাটকত্ব, তাহা প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে রাম অষ্টাবক্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

এইখানে নাটকের আরম্ভ। তাহার পরে আলেখ্যদর্শনে সীতার পুনর্ব্বার বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। ইহার সহিত পরিণামের কোনও সংস্রব নাই। এখানে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈষৎ সঙ্কেত আছে। পরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহার চরম সার্থকতা আছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এত দূর পর্য্যন্ত নাটক চলিতেছে পরবর্ত্তী পঞ্চ অঙ্কে নাটক স্থগিত রহিল। আরব্যোপন্যাসের গল্পের শাখা-গল্পের মত একটা প্রকাণ্ড 'ফ্যাকড়া' চলিল। প্রভেদ এই, আরব্যোপন্যাসে গল্পের মনোহারিত্ব আছে, এখানে তাহা নাই।

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত 'সীতা-নির্ব্বাসনে'র অভিনয় দেখিতেছেন। এইটি বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত সীতার পাতালে প্রবেশ লইয়া রচিত, কিন্তু নাটকে এ অভিনয়ের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম অভিভূত হইলেন। সীতা আসিয়া রামকে বাঁচাইলেন। তাহার পরে উভয়ের মিলন হইল, এইমাত্র।

সত্য কথা বলিতে গেলে এ নাটকে সীতা-নির্ব্বাসন ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, এই দুইটি ঘটনা আছে। তাহার মধ্যে একটি অবান্তর। যুদ্ধটি না থাকিলেও নাটকের কোনও ক্ষতি ছিল না।

এ নাটকে অন্তর্বিরোধ নাই। যেই সীতাপবাদ, সেই নির্ব্বাসন। রামের বিলাপ যথেষ্ট আছে। কিন্তু "করিব, কি করিব না"—এ ভাব নাই। সংকল্পের সহিত কর্ত্তব্যের কোনও যুদ্ধই হয় নাই।

নাটকের নাটকত্বের আর একটি লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণ। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, উত্তরচরিতে কোনও চরিত্র পরিস্ফুট হয় নাই;

কিন্তু 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' চিত্রণ-কৌশল প্রচুরপরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব শকুন্তলায় আছে। কিন্তু তদধিক কবিত্ব আমরা উত্তরচরিতে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

জগৎ-কথা।

২০

কঠিন, তরল, অনিল, ত্রিবিধ পদার্থে কোনও কোনও বিষয়ে পার্থক্য দেখা গেল। আবার একটা বিষয়ে তিনে মিল আছে, তাহাও দেখা গেল। তিনেরই ওজন আছে; এই ওজনের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক; অন্য কোনও ধর্ম্মের সম্পর্কমাত্র নাই; এই বিষয়ে ত্রিবিধ পদার্থের সমানতা।

জিজ্ঞাসা চলিতে পারে, কঠিনে কঠিনে, কঠিনে তরলে, তরলে অনিলে একত্র মিশিয়া কিরূপ জিনিস হয়? উহারা পরস্পর মিলিত কি না?

কঠিনে কঠিনে মিলিত হয়; তাহার বিস্তর উদাহরণ। সোনায় রূপায় তামা মিশাইয়া গহনা তৈয়ার হয়; তামায় দস্তার পিতল হয়। এইরূপে দুই উপধাতু তৈয়ার হয়। লোহাতে কয়লা মিশাইলে ঢালাই লোহা হয়, উহা লোহা অপেক্ষা ভঙ্গুর। আবার তরলে তরলে মেশার উদাহরণ গোয়ালার দুধ। গাই-দুধে যত ইচ্ছা জল মিশাইলেই তাহার আনন্দা অনিলে অনিলে মেশার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—বায়ু; ইহা দুইটা অনিলের মিশ্রণে উৎপন্ন; একটা এক ভাগ, অন্যটা চারি ভাগ। উহার সঙ্গে আরও কয়েকটা অনিল অল্পবিস্তর মিশিয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান ঐ দুইটি অনিলের বাঙ্গলায় নামকরণ হইয়াছে, অম্লজান ও যবক্ষারজান। নাম দুইটা এমনই কর্কশ যে, উহার ব্যবহারে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। সহস্র আপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া উহাদের নাম খাট করিয়া একটু মোলায়েম করিয়া লইব। অম্লজানকে বলিব অম্ল; আর যবক্ষারজানকে বলিব যবান। দূরবীক্ষণকে খাট করিয়া যদি দূরবীণে পরিণত হইয়া থাকে, তখন অম্লান ও যবান চলিবে না কেন?

তরলে অনিলে মিশ্রণের উদাহরণ সোডা ওয়াটার, উহাতে জলের সঙ্গে একটা অনিল—যাহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়, সেই অনিল মিশ্রিত থাকে। কঠিন পদার্থেও অনিল মিশিতে দেখা যায়; রূপার বায়ুতে মিশাইয়া থাকিবার ক্ষমতা আছে। রূপা গলিলে উহা বাহির হইয়া যায়।

সকল জিনিসেই যে সকল জিনিস মেশে, এমন নহে। জলের সহিত আরক মেশে; কিন্তু তেল মেশে না। ঈথার নামে তরল পদার্থ আছে, তাহা জলের সঙ্গে কতকটা মেশে, আর মেশে না। বেশী মেশাইবার চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত অংশটা জলের উপর ভাসিতে থাকে, যেমন জলের উপর তেল ভাসে। কেন না, উহা জলের চেয়ে হাল্‌কা। কেবল অনিলে অনিলে মেশার এরূপ কোনও বাধা হয় না। যে কোনও অনিল, অপর একটা অনিলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, তা যতটাই লও না কেন। একটা বাক্সের ভিতর একটা অনিলে পূর্ণ কর; তার পর অন্য একটা অনিল যতটুকু ইচ্ছা, সেই বাক্সে প্রবেশ করাও; একটু পরেই সেই দ্বিতীয় অনিলও বাক্সের সমস্ত ভিতরটায় ব্যাপ্ত হইবে। উভয়ে মিশিয়া একের সমুদয় অভ্যন্তর দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে। বাক্সের একটা ধার এর ভাগে পড়িল, অন্য ধার ওর ভাগে পড়িল, এরূপ হয় না।

তরলে কঠিনে মিশ্রণের রীতিটা একটু বিচিত্র। জল তরল পদার্থ—উহাতে অনেক কঠিন জিনিস মেশে, যেমন নুন, চিনি, ভুঁতে, হীরাকষ; আবার অনেক জিনিস মেশে না, যেমন বালি, কয়লা, সোনা, রূপা। যাহা মেশে মেশে, তাহা দ্রাব্য; যাহা মেশে না, তাহা অদ্রাব্য। ক্রিয়াটির নাম দ্রবীভবন। সের খানেক জলে একটু একটু চিনি মেশাও, দেখিবে, চিনি মিশিতেছে, জলটা মিষ্ট হইতেছে। এমন সময় আসিবে, তখন আর একটু চিনি দিলে সেটুকু আর মিশিবে না। মানুষের ক্ষুধার যেমন একটা সীমা আছে, জলেরও ক্ষুধার তেমনই একটা সীমা আছে; উহার পেট ভরিলে আর চিনি খাইতে বা লইতে চায় না। তাহার যের যেটুকু দেওয়া যাইবে, সেটুকু দ্রবীভূত না হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

কঠিন অবস্থায় ঐ জলটাকে আগে আগে বাষ্প করিতে দাও; জলের খানিকটা বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশিয়া যাইবে, জলের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইবে। মনে কর, এক সের জল ক্রমে ঐ বাষ্পেতে দাঁড়াইল। এক সের জলে যতটা চিনি ধরিয়া রাখিতে পারে, তিন পো জলে তাহা পারে না।

অতিরিক্ত চিনিটা, যাহা জলে মিশ্রিত ছিল, এখন আবার কঠিন অবস্থা পাইয়া জলের নীচে জমিতে থাকিবে। এই সময়ে যদি অন্য কোনও কঠিন পদার্থের আশ্রয় পায়, একগাছি সুতা বা এক টুকুরা মিছরীর আশ্রয় পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহার গায়ে জমিতে থাকে।

জল যত কমে, চিনিও তত জলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জমে। জমিবার সময় চিনিতে দানা বাঁধে। বড় বড় দানার নামই মিছরী। এই দানা-গুলির আকার বেশ সুন্দর। উহার পিঠগুলি সমতল, মসৃণ। মিছরী ভাঙ্গিলে যে নূতন পিঠ বাহির হয়, তাহাও সমতল মসৃণ। দানার কিনারায় কোণগুলি মাপিলে দেখা যায়, বেশ একটা হিসাব আছে। অনেক জিনিসের এইরূপ দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; অনেক জিনিসের নাই। নুন, ফট্‌কিরি, তুঁতে, হীরাকষ প্রভৃতির দানা সর্ব্বজনপরিচিত। আর মাটী কাঠ, ইহাদের দানা হয় না।

জল হইতে বাহির হইয়া জমিবার সময়ই যে দানা বাঁধে, এমন নহে। অনেক জিনিস, যাহা উত্তাপে তরল হয়, শীতে কঠিন হয়, তাহাও তরল হইতে শৈত্যযোগে কাঠিন্যপ্রাপ্তির সময় দানা বাঁধিয়া ফেলে। গন্ধক উত্তাপ দিয়া গলান যায়; আবার ঠাণ্ডা করিলে উহার দানা বাঁধে।

কয়লারও দানা বাঁধে; দুই রকমের দানা আছে; এক রকম দানাতে পেন্‌সিল তৈয়ার হয়; আর এক রকম দানার নাম হীরা।

এই সকল দানার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। দানার আকৃতি দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কোনও জিনিসের দানা ছোটই হউক, বড়ই হউক, তাহার আকৃতি এক রকম থাকে। অনেক সময় দানার আকার দেখিয়া জিনিসটা কি, তাহা বুঝিবার সাহায্য পাওয়া যায়।

রাস্তায় ইটের স্তূপ পড়িয়া থাকিলে লোকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না; কিন্তু সেই স্তূপের ইটগুলি সাজাইয়া একখানির উপর একখানি করিয়া রাখিয়া যখন অট্টালিকা তৈয়ার হয়, তখন তাহাতে লোকের নজর পড়ে। ইটগুলি আপনা হইতে সজ্জীকৃত হইয়া অট্টালিকায় পরিণত হয় না। মিস্ত্রী কিংবা কারিকর উহাকে [illegible] পারায়। কাঠের জিনিসের দানা নাই, কিন্তু চিনি বা তুঁতের [illegible] দানা আছে; ঐ দানাগুলির সুন্দর আকৃতি দেখিলেই উহাতে [illegible] এবং স্বতঃই মনে প্রশ্ন আসে, এখানে কি কোনও কারিকর উহার [illegible] থাকে থাকে বিন্যাস করিয়া

ঐরূপ সৌন্দর্য্য দিয়াছে? আমাদের দেশে তুষার পড়ে না; হিমালয় অঞ্চলে বা হিমপ্রধান দেশে তুষার পড়ে। ঐ সকল তুষারকণায় কত বিচিত্র, কত সুন্দর দানা দেখা যায়; কত বৈচিত্র্য, অথচ এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা কারিকরি; একটি বড়ভুজ, বট্‌কোণ ক্ষেত্র, যাহার ভুজগুলি ও কোণগুলি সব সমান, যেন সেই ক্ষেত্রের প্ল্যানটি বজায় রাখিয়া তাহার উপর নানারূপ নক্সা টানা হইয়াছে। এক জন কারিকরের কারিকরী নহিলে জড় পদার্থের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, ঠিক্ এইরূপ প্ল্যানের মত নক্সা আঁকে?

এই রকমের প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়, এবং মনে নানারূপ চিন্তা আনয়ন করে। এখানে কেবল কথাটা ছুঁইয়া রাখিলাম। জগত্তত্ত্বের আলোচনায় এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। এ বিষয়টা এত গুরুতর যে, বড় বড় পণ্ডিতের মনে এখনও ঐকমত্য নাই; এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের কোন্ আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

২১

শ্রেণী-বিভাগ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ বিচিত্র জগৎ; কোনও দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিলে, উহারা এক জিনিসই হইত। ইন্দ্রিয় তাহাদিগকে দুই বলিয়া গ্রহণই করিত না। আবার দুই জিনিসে সম্পূর্ণ অনৈক্যও নাই। সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকিলে, সেই জ্ঞান নিষ্ফল হইত। উহা দ্বারা জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চলিবে কি, জীবন বলিয়া কোনও পদার্থই থাকিত না; কেন না, জীবনের অস্তিত্বও বহুর মধ্যে ঐক্যমূলক।

এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ। প্রথমে যে ঐক্যের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে যে ঐক্য মনের নিকট উপস্থিত করে না, মন বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ক্রমশঃ বহুর মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার করে ও ঐক্যের মাত্রা [illegible] একগুলি কোঠার মধ্যে সাজায়। এইরূপ পদার্থসমূহকে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই শ্রেণীবিভাগকার্য্য বিজ্ঞানের সৌধে আরোহণের প্রথম সোপান; অথবা প্রত্যেক সোপানে উঠিতেই এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন।

আমরা যাবতীয় জড়পদার্থকে কঠিন, তরল ও অনিল, এই তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি বহু দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য বা সামান্য খুঁজিয়া। কিন্তু অন্যরূপ সাদৃশ্য বা সামান্য খুঁজিয়া অন্যরূপ শ্রেণী-বিভাগও চলিতে পারে। এখন তাহাই দেখিব।

২২

মূল ও যৌগিক পদার্থ।

এখন জড়ের নূতন রকমের শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইব। কতকগুলি জিনিস ভাঙ্গিয়া, আমরা দুই তিন রকমের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাহির করিতে পারি। পিতল হইতে তামা ও দস্তা পৃথক্ করা চলে; সরবতের জল হইতে চিনি পৃথক্ করা চলে; জল হইতে দুইটা অনিল বাহির করা চলে। এই-গুলিকে যৌগিক পদার্থ বলিব; কতিপয় দ্রব্যের সংযোগে ইহারা উৎপন্ন; আবার তামা হইতে তামাই পাওয়া যায়; দস্তা হইতে দস্তাই পাওয়া যায়; কয়লা হইতে কয়লাই পাওয়া যায়; গন্ধক হইতে গন্ধক ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। বহু চেষ্টাতেও এই সকল জিনিস ভাঙ্গিয়া অন্য জিনিস বাহির হয় নাই।

একটা জিনিস ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহির করিবার নানা উপায় আছে। জলে তুঁতে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহার ছুরি ধরিলে, ছুরির গায়ে তামা জমিতে থাকে। ঐ তামা তুঁতের মধ্যে ছিল।

সরবতে উত্তাপ দিলে, জলটা বাষ্প হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়; চিনিটা পড়িয়া থাকে। জলকে ঈষৎ অম্লাক্ত করিয়া তাহার ভিতর তাড়িৎ-স্রোত বহাইলে উহা হইতে দুইটা অনিল বাহির হয়। [illegible] সিন্দুরে কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া বাঁকনলে ফুঁ দিয়া দীপশিখা দ্বারা [illegible] তাহা হইতে সীসা বাহির হয়। অত্যধিক উত্তাপসংযোগে বহু [illegible] ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক দ্রব্য বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে [illegible] যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, কঠিন, তরল, অনিল, সমস্তই [illegible] যৌগিক; কেবল গোটাকতক জিনিস মূল পদার্থ; এই গুলিকে ভাঙ্গি [illegible] পদার্থ অদ্যাপি বাহির করিতে পারা যায় নাই।

মূল পদার্থগুলির [illegible] যেগুলি পরিচিত, তাহার কতিপয়ের নাম—কয়লা, গন্ধক, দস্তা, [illegible], সীস, রাঙ, লোহা, সোনা, রূপা।

যে সকল জিনিস [illegible] আমরা আজিকালি মূল পদার্থ বলিয়া জানি, তাহারা

যে চিরকাল মূল পদার্থ বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহা মনে করা অনুচিত। এখন আমরা সোনা হইতে অন্য কোনও জিনিস বাহির করিতে পারি না, বা অন্যান্য জিনিসের একত্র সংযোগে সোনা তৈয়ার করিতে পারি না, তাহা বলিয়া কোন কালেও যে কেহ পারিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। শতখানেক বৎসর পূর্ব্বে চুণের মত জিনিস মূল পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইত; বিশেষ চেষ্টায় চুণ ভাঙ্গিয়া একটা ধাতু বাহির হইয়াছে, সেই ধাতু পোড়াইয়া আবার চুণ তৈয়ার হয়।

গ্রীক্‌পণ্ডিতেরা মাটী, জল, বায়ুমণ্ডল, এই কয়টাকে মূল পদার্থ মনে করিতেন। এখন সে মত আর নাই।

হিন্দু দার্শনিকেরা 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কালের মহাভূত, আর এ কালের বিজ্ঞানের মূল পদার্থ, এ দু'য়ের এক অর্থ নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অজ্ঞতার জন্য পরিহাস না করাই ভাল। যাক্, সে কথা পরে।

এই মূল পদার্থগুলির অধিকাংশ অল্পদিন মাত্র ইউরোপের রাসায়নিক পণ্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে; বাঙ্গলা নাম নাই। বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে লিখিয়া চালান যাইবে, কি প্রত্যেকের জন্য নূতন নামের সৃষ্টি করা হইবে, ইহা একটা বাঙ্গলা ভাষায় বিষম সমস্যা হইয়া আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অধিকাংশই ইংরেজিতে কৃতবিদ্য; আবার দুই সেট নাম ব্যবহার করায় নানা অসুবিধা। কাজেই বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে চালানই মোটের উপর সুবিধা। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয়ের খাতিরে এক আধটু উচ্চারণ বদাইলে শ্রুতিকটুতা দোষও দূর হইতে পারে, অথচ চিনিবার গোল হয় না।

এইরূপে সীলীরম, তেলুরম, চোরক, অচ্ছন্দে বাঙ্গলায় চলিতে পারে। ক্লোরিন, ব্রোমিন, ফ্লুরিণও বেশ চলিতে পারে। কিন্তু নিত্য-ব্যবহার্য্য অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ইহাকে বাঙ্গলায় চালান কঠিন; বাঙ্গলা ভাষার একটা ধাত আছে; সেই ধাতের সঙ্গে না মিলিলে ভাষাটাই কদর্য্য হইয়া পড়িবে ও লোকে বরং ইংরেজি পড়িবে, কিন্তু সে বাঙ্গলা পড়িবে না। উহাদের বাঙ্গলায় অম্লজান, যবক্ষারজান ও ভূতি যে নামগুলি প্রায় চলিত হইয়াছে, তাহারও নানা দোষ; প্রধান দোষ উহাদের দীর্ঘতা। লেখা পুঁথিতে চলিতে পারে, কিন্তু কথা কহাতে চালান দুষ্কর। এখনও উহাদের বদলান

চলে কি না, তাহা আবশ্যক। নামগুলি এত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে না ঠেকে, এইরূপই নাম হওয়া উচিত। আমি অম্লজানের জন্য অয়ান ও নাইট্রোজেনের জন্য যবান ব্যবহার করিব। অনেকে আপত্তি তুলিবেন; কিন্তু এ আপত্তির অন্ত নাই। হাইড্রোজেনের উদজানকে সংক্ষিপ্ত করিয়া উজান বলিব; উজানের কোনও মানে হয় না; উদজানই ব্যাকরণসঙ্গত কি না, জানি না। দূরবীক্ষণ যখন চলিত কথায় দূরবীণে দাঁড়াইয়াছে, তখন উদ্‌জানকে উজান বলিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে না।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে গোটাকতক মাত্র অনিলাবহ:—অয়ান, যবান, উজান, ফ্লুরিণ ও ক্লোরিণ। আমাদের বাঙ্‌সাগরের মধ্যে সম্প্রতি গোটাকতক অনিলের আবির্ভাব হইয়াছে; উহাদের পরিমাণ কিছু যৎসামান্য ও ব্যবহার অনেকটা খাপছাড়া—উহাদের নাম আর্গণ, লিয়ন, ক্রুষ্টল, জেলন।

মৌলিক তরল পদার্থ কেবল দুইটি, ব্রোমিণ—আর পারা। বাকি সমস্তই কঠিন।

বলা বাহুল্য, কঠিন পদার্থ তাপযোগে তরল ও তরল কঠিনাবস্থা পায়; শৈত্যপ্রয়োগে অনিলমাত্রই তরল হয়; এক আধটা ছাড়া সকলগুলি কঠিনাবস্থায় আনীত হইয়াছে।

কতিপয় মূল পদার্থের একাধিক রূপ। অম্লান অনিলের রূপান্তর—ওজোন অনিল। কয়লার রূপান্তর গ্রাফাইট্ (কাল সীসা, যাহাতে পেন্সিল হয়) ও হীরা। গন্ধকের কয়েকটা রূপ। গন্ধককে গলাইয়া ঠাণ্ডা করিলে দানা বাঁধে; আবার তরল ফুটন্ত গন্ধককে জলে ফেলিলে আমড়ার আটার মত চিটেল গন্ধক হয়। ফস্ফরস্ (প্রস্ফুরক?) দুই রকমের; এক রকম দিয়াশলাইয়ের লাসকাঠীর মুখে দেওয়া যায়; আর এক রকম কাল কাঠী দিয়াশলাইয়ের বাক্সের গায়ে লাগান থাকে।

গুপ্ত-কবি বিস্মিত হইয়া গাহিয়াছিলেন,—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান;
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।
জীবনধারণ কিংবা আরাম কারণ;
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন,
সকলই সুলভ এতে, অভাব ত নাই।

কোন, অপার্থিব জিনিস, যাহা কেহ পৃথিবীতে দেখে নাই, অতএব যাহা

P30634

কল্পনায় আসে না, তাহা কি আমাদের জীবনধারণের বা আরামকারণের জন্য দরকার হইতে পারে; ইহাই আমাদের পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের হেতু হইত। আর আবশ্যক জিনিস সকলই যে সুলভ, তাহাও বলা যায় না। আমাদের ম্যালেরিয়ার দেশে কুইনাইন আর একটু সুলভ হইলে হয় ত মন্দ হইত না। অন্ততঃ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের জিনিস সর্ব্বদা সুলভ হইলে ভারতবর্ষে এক একটা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনধ্বংস হইত না।

সে যাহা হউক, কয়েকটা মূল পদার্থের বাক্যগুলি সমান নহে; এবং আমাদের জীবনধারণে বা আরামকারণে আবশ্যকতার অনুপাতে প্রকৃতি কর্ত্তৃক সকলগুলির সুলভতা বিহিত হয় নাই। তবে গোটাকতক জিনিস, যাহা না হইলে জীবনযাত্রা একেবারে অসম্ভব হইত, তাহা রাজ্যে সুলভ; অথবা উল্টাইয়া বলিলেই ঠিক হয়,—তাহারা সুলভ বলিয়াই জীবনযাত্রা সুলভ বা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

স্পর্শমণি।

১

অস্ত যায় সন্ধ্যাসূর্য্য,—ম্লান শান্ত সোনার কিরণ,
পদ্মরেণুপীত প্রভা ধরিতেছে অশোক-বরণ;
স্বর্ণস্বপ্নময় সেই অবারিত আলোকপ্রবাহে,
চিত্রকণ্ঠ কপোতেরা স্নান করি' নবপ্রেমোৎসাহে
নামিতেছে নগরীর রৌদ্রদীপ্ত শিখরে শিখরে;
উল্লাসে ভবনশিখী চারুগ্রীবা তুলি' লীলাভরে,
চাহিতেছে দিনান্তের শান্তচ্ছবি দিনকর পানে;
মাধবী মেলিছে আঁখি অলিন্দের বিলোল বিতানে।
তরলিত কলধ্বনি,—মূর্ত্তিমান গীতিচ্ছন্দ সম,
উপবনে উৎসরাজি বিকাশিছে কি লীলাবিভ্রম!
ঝরিতেছে বারিবিন্দু বিম্বে বিম্বে রত্নদীপ্তি ধরি',
ছিঁড়িছে মাণিকমালা রোষমত্তা মানিনী অপ্সরী!

বকুল মুকুলাকুল—কুসুমিত রক্তাশোকবীথি,
চুম্বন-চকিত চম্পা—ভৃঙ্গ গায় মঞ্জু গুঞ্জগীতি।
দীর্ঘদেবদারু-শ্রেণী রচিয়াছে চিত্র-যবনিকা,
মরকত-পটে আঁকা রবিকর-স্বর্ণ-মরীচিকা!
উপবন-প্রান্তভাগে সরিতের স্বচ্ছ আলিপনা,
প্রতিচ্ছবি দেখাইয়া হরিণীরে করিছে ছলনা।
নব-অলক্তক-ছটা বিকশিত রক্ত-কোকনদ,
মুগ্ধমুখে নিরুদিষ্টে—হেরে দূরে সুবর্ণ-জলদ।
পুরপ্রান্তে উপবনে রমণীয় 'মুকুট' প্রাসাদ,
বহিতেছে শতস্তম্ভ সগৌরবে পরচূড় ছাদ।
নবদূর্ব্বাদলদলে রোমাঞ্চিত শ্যামল প্রাঙ্গণ,
চারি ভিতে ফুলবীথি সৌন্দর্য্যের সহস্র স্বপন।
তার মাঝে শুচিশোভা হিমশুভ্র মর্ম্মর-বেদিকা,
শষ্পে পুষ্পে লতাজালে রম্যস্নিগ্ধ সুন্দর-হারিকা।
চারুনেত্রা কিঙ্করীরা স্বামিনীর সমাগম তরে,
সাজাইছে সুখাসন বহুযত্নে সে বেদীর 'পরে।
হেন কালে পুষ্পবীথি আলোকিত পুলকিত করি',
সখীজন সঙ্গে রঙ্গে দেখা দিল অপূর্ব্বসুন্দরী!
লালসা-অলস নেত্র—অঙ্গে অঙ্গে রূপের জ্যোৎস্না,
সহাস অরুণাধরে বিকশিত যৌবনের কল্পনা!
কি বন্দনা গায়িতেছে নূপুরের ছন্দোময়ী বাণী!
বেড়িয়াছে নীলাম্বর কি অঙ্গে পুষ্পভঙ্গুখানি!
অলকে ঝলকে মণি, কম্বুকণ্ঠে তরলিত হার,
শুভ্র ভালে রত্নশোভা,—যেন তারা বসন্ত উষার!
লম্বিত মৃণালভুজ—মণিবন্ধে হীরক-কঙ্কণ।
মলয়জ-পঙ্কে আঁকা ললাটিকা অতি সুশোভন,
রঞ্জিত রতন-রাগে তরঙ্গিত নীল কেশপাশ,
মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছপ্রভা করিছে প্রকাশ।
গ্রীবাভঙ্গে কি গরিমা, কি সুন্দর লীলায়িত গতি!
কুসুম-স্তবক-নম্রা লতা সম আনতা যুবতী।

আসি বেদী 'পরে বালা সুখাসনে বসি' হেলাভরে,
এলাইয়া তনুলতা, দুটি কান্ত কুবলয়-করে
আবরিলা উত্তরীয়ে পরিপূর্ণ যৌবনবিভব ;
নামিল আঁখির পরে স্বপ্নালস কোমল পল্লব !
মঞ্জীর-রঞ্জিত পদ পাদপীঠে রাখি' সুখাবেশে,
রহিলা নিস্তব্ধ হয়ে গর্ব্বময়ী উর্ব্বশীর বেশে।
শিখি-পুচ্ছ-বিরচিত মৃগমদ-সুরভি ব্যজন,
দুলাইল মৃদু মৃদু অনুগত সহচরীগণ।
তরুণ-তমালতলে দূরে হোথা বন-অন্তরালে,
উৎসবের উপচার সু-সজ্জিত স্বর্ণময় থালে।
শিলাতলে বসি' কত মধুমতী মোহিনী নবীনা,
গায়িতেছে প্রেম-গান—বাজাইয়া বিনোদিনী বীণা!
মন্ত্রমুগ্ধা পুষ্পসেনী দেখিতেছে প্রেমের স্বপন,
হৃদি-তন্ত্রে উঠিতেছে কি মধুর কোমল কম্পন!
কহিলা আদরে সখী, স্নেহরসে কণ্ঠ মধুময়,
"বাজে বীণা—উঠ দেবি, উৎসবের হয়েছে সময়!"
মনোজ-মদির দৃষ্টি ফিরাইয়া কুঞ্জবন পানে,
কহিলা সুন্দরী হাসি' স্বপ্নমুগ্ধ মোহাতুরপ্রাণে,—
"কেন ত্বরা তমালিকা, আশাতরে থাক্, ওরা থাক্,
প্রিয়জন-মনে সখি, প্রতীক্ষায় বাড়ে অনুরাগ।"
পুষ্পগন্ধ মদিরায় মৃদুমন্দ মলয় পবন,
বহিতেছে বীণাধ্বনি—কলকণ্ঠ-কোমল-কূজন।
হেন কালে রাজপথে—অতি দূর কলধ্বনি শুনি'
হংসী সম অকস্মাৎ চমকিলা বিমুগ্ধ তরুণী।
"ও কি শব্দ তমালিকা?" সবিস্ময়ে কহে পুষ্পসেনী
পথপ্রান্তে গেল সখী দুলাইয়া রত্নময়ী বেণী।
"আসিছেন এই পথে দণ্ডধারী নবীন সন্ন্যাসী,
নগর ভাঙ্গিয়া আসে সঙ্গে সঙ্গে যত পুরবাসী।
কয় দিন ধরি' মোরা লোকমুখে কত কথা শুনি,
আসিছেন সাধু এক শান্তমূর্ত্তি, নাম শাক্যমুনি।"

"শাক্যমুনি?—শুনিয়াছি, তিনি নাকি পুরুষরতন,
মহেন্দ্র-নিন্দিত রূপ—কামিনীর কামমারধন!
ঐশ্বর্য্য, সম্ভোগ, সুখ, যৌবরাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া,
ফিরিছেন পথে পথে আর্ত্ত দীন জীবের লাগিয়া!
দেখিব এ সন্ন্যাসীরে।"—বলি' বামা ত্যজিল আসন,
নিচোল লুটায়ে ভূমে পদপদ্ম করিল চুম্বন।
ঝঙ্কারিল অলি সম অঙ্গে অঙ্গে রতন-ভূষণ,
ঝলকি' উঠিল বিভা—বরবেহে মাণিককিরণ।
মদালস মন্দগতি সখী সহ পশিলা মন্দিরে,
শ্রীঘর্ম্মের সুধাগন্ধ বিলাইয়া বসন্ত-সমীরে।

২

প্রাসাদ-শিখরে বামা দাঁড়াইল বাঁকাইয়া গ্রীবা,
বৈশাখের মেঘমুক্ত অতিদীপ্ত দামিনী সন্নিভা;
চাহি' রাজপথ পানে—নিরখিল জনদল মাঝে,
নবগৌর বরতনু—দেবমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর সাজে!
"দেখ দেখ তমালিকা, কি করুণ শান্ত কান্তরূপ!
পুরুষ-রতন-কুলে কি উজ্জ্বল দুর্লভ কৌস্তুভ!
এ রত্ন ধরিব কণ্ঠে, পুষ্পসেনী চিরবিজয়িনী।
লভি প্রেম রাজকর রূপ-রণে এ রতনে জিনি'।"
বাহু তুলি' গবাক্ষের দাঁড়াইল প্রদীপ্তা সুন্দরী,
দুলিতেছে রূপদর্পে সঞ্চারিণী লাবণ্যলহরী!
বাহুমূলে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, মুখকান্তি কোমল কপোলে,
বিকশিল রক্তরাগ কি উল্লাসে হিল্লোলে হিল্লোলে!
স্ফুরিছে অশোকাধর, শুক্তিশোভা চারু শ্রুতিমূল,
হৃদয়স্পন্দনে কাঁপে বরবক্ষে কমল-মুকুল!
জ্বলিতেছে নীলনেত্র—মদন ধরেছে ফুলধনু,
কামিনী-কটাক্ষ-শরে সর্ব্বজয়ী গর্ব্বিত অভনু!
"আয় সখি, আয়!" বলি' লীলামত্ত হরিণী সমান,
চঞ্চল-চরণে বহি' শত শুভ্র মর্ম্মরসোপান,
ছুটি' গেল দ্রুতবেগে—উচ্ছ্বসিতা রূপ-তরঙ্গিণী,
বাজিল মঞ্জীর পদে, বরারোহে কনক-কিঙ্কিণী!

৩

লঘুগতি ইন্দুমুখী রাজপথে উত্তরিলা যবে,
"পণাঙ্গনা পুষ্পসেনী"—জনসঙ্ঘ গর্জ্জিল ভৈরবে।
কৌতূহলে মুখ তুলি' চাহিলেন নবীন সন্ন্যাসী ;
মোহিনী রোহিণী সম সম্মুখেতে দীপ্ত রূপরাশি !
পুন নত স্নিগ্ধদৃষ্টি—শুচিস্মিত করুণ উজ্জ্বল,
লালসা ভুজঙ্গে বেড়া সৌন্দর্য্যের সোনার কমল !
"ওগো সখি, সে আমার রূপ-রণে জয়লব্ধ ধন !
লেগেছে নয়নে তাঁর এ নবীন রূপের অঞ্জন।"
সখীরে সম্ভাষি' হর্ষে মৃদুস্বরে কহে পুষ্পসেনী ;
প্রগল্‌ভার স্পর্দ্ধা হেরি' রোষে মত্ত ক্ষুব্ধ জনশ্রেণী।
"চূর্ণ কর ডাকিনীরে !"—হুঙ্কারিল ক্রোধে কোন জন ;
তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি—সাধু পুন তুলিলা নয়ন,
মন্ত্রবলে শান্ত হ'ল সে বিক্ষুব্ধ জনতা-সাগর ;
পড়িল প্রসন্ন দৃষ্টি সুন্দরীর মুখের উপর।
কাঁপিছে চরণযুগ, ম্লান মুখ, দুরুদুরু হিয়া,
বেদনাব্যাকুল বুক—অশ্রু যেন আসে বাহিরিয়া !
সন্ন্যাসীর এ কি দৃষ্টি ? এ কি এ কি আলোক-উচ্ছ্বাস !
আঁখির অতল গর্ভে অনন্তের কি মহা আভাস।
এ কি দৃষ্টি মর্ম্মভেদী ! কোমল করুণ অভিনব !
হে সন্ন্যাসি, দয়া কর, ফিরাইয়া লহ আঁখি তব।
লজ্জায় পড়িল ভাঙ্গি' ;—জীবনের যত দৈন্য গ্লানি
নিমেষে উঠিল জাগি',—নতশিরে যোড় করি' পাণি
তীব্র-অনুতাপবিদ্ধা, দীনা মৌনা কুণ্ঠিতা কাতরা,
সন্ন্যাসীর পদ-প্রান্তে ধূলি মাঝে আলিঙ্গিল ধরা।
নাহি ঝরে রুদ্ধ অশ্রু, উঠে বামা গুমরি' গুমরি,'
আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালাময়ী লজ্জায় শিহরি'।
সন্ন্যাসী নিশ্চলমূর্ত্তি—কি গম্ভীর শান্ত মুখচ্ছবি !
নামিছে হিমাদ্রি হ'তে করুণার উচ্ছল জাহ্নবী !
পরশি' কন্যার শির দয়াময় কহিলেন ধীরে,—
"ফুটুক আত্মার রূপ আজি হ'তে অন্তরে বাহিরে ;

উঠ শুভে, উঠ শুভ্রে!" কি গম্ভীর, কি উদাত্ত বাণী!
বরষিল কি অমৃত দগ্ধপ্রাণে কি সান্ত্বনা আনি'।
মৌন মুগ্ধ পুরজন, ধীরে ধীরে দাঁড়াইল নারী,
শান্ত স্নিগ্ধ পদ্মনেত্রে ছল ছল করে অশ্রুবারি।
কি আলোক বিকশিত সুন্দরীর নয়নে বদনে,
কি মন্দার ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যের নবীন নন্দনে!

৪

বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ নগরীর মন্দিরে মন্দিরে,
মধু-পূর্ণিমার চন্দ্র দিগ্বলয়ে উঠিতেছে ধীরে।
ছিন্নবেণী, রক্তবাসা, ধীরপদে চলে একাকিনী
আলস্য-বিহার-মুখে নতনেত্রে নব-তপস্বিনী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কর্ম্মযোগের টীকা।

১

গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, গ্রন্থখানি সারবান। প্রথমে তত্তটা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ক্রমে পাঠ করিতে করিতে অর্জ্জুনের মত একটা দিব্য চক্ষু ফুটিতে লাগিল। তদবধি প্রত্যহ গীতা পাঠ করি, এবং পাঠ করিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠি।

অবশ্য আমি কিছু দর্শন শাস্ত্র জানি না। সামান্য গৃহস্থমাত্র। দেশে একটা জমীদারী ছিল; তাহার বাইশ জন সরীকদার। পিতৃদেব মহারথী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রের মত একটা গোল বাধিয়া গেল। ভীষ্মদেবের মত এক জন পিতামহ, দুর্য্যোধনের ন্যায় খুল্লতাত-পুত্র, শকুনির ন্যায় মাতুল ও মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের অন্যান্য বীর-পুরুষগণের ন্যায় আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সস্ত্রীক ও সসৈন্য, ভীষণ সমরের সূত্রপাত করিয়া তুলিল।

কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে, আপোষে বাটওয়ারা করিয়া শান্তিপর্ব্বের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা জৈবিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঘোর

অজ্ঞ। ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু না হইলে যে শান্তিপর্ব্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। নচেৎ এ কথা বলিতেন না।

ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমি একাকী গাণ্ডীবহস্তে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। জীবন-রথের সারথি ভগবান!

এক জন ক্ষীণস্বরে অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওহে সখা! আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত যুদ্ধ করাই গীতার সার উপদেশ। বিনা যুদ্ধে তাহারা সূচ্যগ্রভূমি ছাড়িয়া দিবে না।" মামলা মোকদ্দমা, জাল দলীল দস্তাবেজ, এবং সুবিধা পাইলে চুরি চামারি ও লাঠালাঠি, ধর্ম্মের খাতিরে এই সব সদাচার কত দূর অসঙ্গত, এবং কত দূর অকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইল।

এক জন বলিলেন, "কলিকালের ইহাই ধর্ম্ম।" ইহাতে ক্ষত্রিয়োচিত রক্তপাত নাই, অথচ কর্ম্ম সাফ্। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। জীবহিংসাশূন্য নিষ্কাম উপায় অবলম্বন করিয়া যদি ধর্ম্মরক্ষা হয়, তবে কেবল শঙ্করাচার্য্য কেন, রামানুজ প্রভৃতির টীকারও সামঞ্জস্য হইয়া যায়।

কিন্তু এমন অবস্থায় মোহ না হইয়া যায় না। এত যে স্নেহ মমতা, এত যে আশৈশব পরিচর্য্যা ও সহানুভূতি, তাহার কি এই ফল?

"যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি,
তারা ত চাহে না আমারে,
তারা আসে, তারা চ'লে যায়—"

পাগলের মত গাহিলাম। ভগবান ঈষৎ হাসিলেন। তাহার পরেই দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ।

২

অর্থাৎ, ভগবানের সহিত আমার ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। কারণ, অর্জ্জুনের মত সব কথা মানিয়া লওয়া আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে। কলিকালের শিষ্য যে ধাঁ করিয়া ইষ্টদেব কিংবা গুরুদেবের কথা শিরোধার্য্য করিবে, তাহা অসঙ্গত (যদিও অশ্লীল নয়)। সুতরাং বর্ণসঙ্করত্ব অনিবার্য্য। যখন জাতি-বিচার, ব্রহ্মচর্য্য ও ক্ষত্রিয়বর্ণের ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে, তখন সহসা গাণ্ডীব লইয়া অগ্নি ও বরুণ বাণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ন্যায়বিচার করিবার একটা দুর্দ্দমনীয় বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রথমে ছিলাম শাক্ত, মধ্যে বৈষ্ণব, এবং পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া গৃহস্থালী

চলাইতেছি। এহেন যুগে গীতার উপদেশ কিরূপে প্রচার হইবে, তাহার একটা মীমাংসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কহিলাম, "হে, হৃষীকেশ! যদি মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া যায়, তবে কতকগুলা অ্যাটর্ণী, ব্যারিষ্টার ও উকীল মোক্তার আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত ধন লুটিয়া খাইবে। কেবল আত্মীয় স্বজন কেন, আমিও মরিব। আমি যুদ্ধ করিব না।"

হৃষীকেশের উপদেশ,—"হে দেহাভিমানী জীব! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পঞ্চপাণ্ডবাদি যে বিশেষ কিছু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এ দেহ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আত্মা চিরস্থায়ী। তাহার মৃত্যু নাই।"

এই উপদেশটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি, এমন সময় "খুকীর মাকে ছোটখুড়ী মেরে ফেলে রে!" এবংবিধ বিকট চীৎকারধ্বনি অন্দর-মহলে উত্থিত হইল। আমি হৃষীকেশকে ফেলিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। ছোট খুড়ী প্রকাণ্ড জাঁহাবাজ জগদম্বা নামিকা স্ত্রীলোক। খুকীর মা অর্থাৎ আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত তাঁহার প্রত্যহ বাক্‌যুদ্ধ হয়; অদ্য অবলীলাক্রমে তাহা হাতাহাতি মারামারিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! গৃহকর্ত্তা ভগবদ্গীতা-পাঠে নিযুক্ত থাকিলে স্ত্রীলোকেরা মারামারি খুনোখুনি করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পায় [ইহা তাহাদিগের ধর্ম্ম। শঙ্করের টীকা।]

আমি অত্যন্ত চটিয়া উঠিলাম, এবং কর্ত্তার আমোলের একখণ্ড পুরাতন বংশখণ্ড লইয়া ছোট খুড়ীকে খুন করিতে উদ্যত হইলাম। আমার রণমূর্ত্তি দেখিয়া প্রিয়া ঈষৎলজ্জিতভাবে বলিলেন, "মরণ আর কি! স্ত্রীলোকের ঝগড়ায় তোমার বাহাদুরী কেন?"

আমি বলিলাম, "আমার ভয় হইয়াছিল, তোমাকে খুন করিবে।" তা' ত হইবারই কথা। প্রিয়তমা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার কি মরণ আছে?" ক্রমশঃ ক্রন্দন বর্দ্ধনশীল দেখিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

হৃষীকেশ পুনর্ব্বার বলিলেন, "বৎস! আত্মার মরণ নাই। তুমি হঠাৎ যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। তোমার স্ত্রীর পক্ষ হইয়া যাহা অবলম্বন করিতে গিয়াছিলে, আর্ত্তনাদমাত্রেই তাহা প্রযোজ্য। কোনও স্থলে আর্ত্তনাদ গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসে, কোনও কোনও স্থলে সমাজ ও দেশ হইতে প্রচ্ছন্নভাবে আসে। হে অর্জ্জুন! স্থিতপ্রজ্ঞ হও।"

ভাবিলাম, কথাটা এই,—যখন সুযোগ দেখিবে, চতুর্দ্দিকে লাঠী চালাইবে। ইহাতে বাদ বিচার নাই। ইহাই স্থিরপ্রজ্ঞের লক্ষণ। "ব্রজেৎ কিম্?"

ঐ প্রকারে। যখন যেখানে দরকার, ঠেলাইয়া লাস করিয়া দাও। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না। ইহাতে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। কামনা বর্জ্জন করিয়া নির্ম্মম হও। নচেৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ নাস্তি।

এইরূপে সাংখ্যযোগের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মযোগে আসিয়া পড়িলাম।

৩

সংসারের কর্ম্ম সকল স্ত্রীলোক (প্রকৃতি) দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে। এই বচনানুসারে সমস্ত কর্ম্মের ভার ভগবানের নামে স্ত্রীলোকের উপর সমর্পণ করা উচিত। কিন্তু এবম্প্রকার সংকল্পে যদি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে যুদ্ধের ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে স্ত্রীলোক উন্নতিলাভ করিয়া, যুদ্ধ না হউক, যুদ্ধের সূত্রপাত আরম্ভ করিল। তাহার ফলে, দ্বাপর যুগ হইতেই পুরুষের অবনতি লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের যুদ্ধসামর্থ্য যত বাড়িবে, পুরুষের সংখ্যা ততই কমিবে।

কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া দেখা গেল, ঠিক তাই। আমাদিগের দলে পুরুষ তিন জন; কিন্তু স্ত্রীলোক (ঝি লইয়া) আট জন। কুরুক্ষেত্রের যুগে পঞ্চ পাণ্ডবের এক মাত্র সহধর্ম্মিণী। এখন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-সংখ্যার অনুপাতে এক জন পাণ্ডবের ১½ স্ত্রী হওয়া উচিত, অর্থাৎ তুলনায় ৫ × ½ = ৭½ গুণ অধিক।

অথচ পূর্ব্বকালের প্রথানুসারে এক জন পুরুষকে এই ৭½ স্ত্রীলোকের জন্য সংসার-সংগ্রামে অন্ন-সংগ্রহ করিতে হয় (অবশিষ্ট পুরুষ দুই জন অশক্ত) সংগ্রাম তুমুল, এবং এই সংগ্রামের প্রবর্ত্তক স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে উত্তেজনাও তুমুল। আমাদিগের দেশে এই সমস্যার পূরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, অবরোধপ্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবিশেষে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সাহায্য না করিলে, মুদীর দোকান ছাড়া আমাদিগের এ দেশে অন্য কোনও উপায় থাকিবে না।

বসন্ত পুষ্পসৌরভসম্ভার বিকীর্ণ করিয়া দক্ষিণ মলয় সমভিব্যাহারে ছাদের উপর প্রিয়ার কেশদাম ঈষৎ কম্পিত করিতেছিল। আমি সমস্ত দিন খাটিয়া প্রায় মানবলীলা সংবরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম। হাইকোর্ট হইতে বাগ্‌বাজার ও তথা হইতে ট্যামার্লেন ইত্যাদি চৈত্র মাসের রৌদ্রে হাঁটাহাটি ও ছুটাছুটি করিয়া, তিব্বতী মুদ্রা অবলম্বন

করিতে চাহিতেছিল। এমন সময়ে খুকী নিকটে আসিয়া ডাকিল "বাবা, তোমার মুখ শুক্‌নো কেন?" কি মধুর সম্ভাষণ! এই প্রজ্বলিত সংসার-সংগ্রাম-বহ্নির মধ্যে ঐ যে একটু মধুরতা, তাহা কাহার?

ঐটুকু আছে বলিয়াই জগৎ। ঐটুকু আছে বলিয়াই ঈশ্বর। ঐটুকু আছে বলিয়াই গীতা। নচেৎ সমস্তই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ঐটুকু রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধ সংগ্রাম। ঐটুকু ফুটাইবার জন্যই সমাজ। মরুর মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠে। কোথা হইতে আসে, জানি না। সন্ন্যাসী! তুমি সমাধিগ্রস্ত হইয়া মুক্তিলাভ কর, কিন্তু আমি যেন সংসারী হইয়া উহাই আবার দেখি। কেবল আমার ঘরে নয়, সকল ঘরেই যেন দেখি। উহাই ধর্ম্ম। যেখানে উহার অবহেলা ও অপলাপ সেখানেই যুদ্ধ।

প্রিয়তমা বলিলেন, "আমার খুকীর বিবাহের বয়স হইয়াছে।" আমি একটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিতে করিতে বলিলাম, "অবশ্য, কিন্তু মাম্‌লাটা না চুকিলে আমাদের অবস্থা কি হইবে, তাহা জান?" পিসীঠাকুরাণী কল্ হইতে জল আনিয়া দিলেন। ঝি টীকা বিস্তার পূর্ব্বক কহিল, "অমন সুন্দরী মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা কি?" বৃদ্ধা মাতামহী বলিলেন, তাঁহার আড়প তণ্ডুল কমিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া জানাইল, রন্ধনশালা হইতে বিড়াল ভাজা মৎস্যগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে। বাজার-খরচের বীভৎস রকম প্রসারতা। এইরূপ সদালাপের মধ্যে ব্যারিষ্টার শিশির মুখোপাধ্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছিলেন। "আমাকে মাপ করুন, এখানে স্ত্রীলোকেরা আছেন, জানিতাম না। বড়ই লজ্জিত।"

আমি। লজ্জিত হইবার দরকার নাই। তুমি ঘরের ছেলে।

বাস্তবিক, শিশিরের চেহারা বড় সুন্দর। সে বড় ধীর ও বুদ্ধিমান। সমানে অ্যাটর্ণীদিগের সহিত আমার মামলায় খাটিতেছে। আপাততঃ পয়সার কোনও দাবী দাওয়া নাই। মোকদ্দমায় জিৎ হইলে তাহা বিচার্য্য।

৪

মাম্‌লাটা সবিরাম জ্বরের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ অবিরাম জ্বরে দাঁড়াইয়াছে। কুরুপক্ষীয় স্ত্রী পুরুষ চোরবাগানে একটা বাসা লইয়া ঘন ঘন শঙ্খনাদ করিতেছে। আমরা মাণিকতলায়। উভয়পক্ষীয় ঝি এ বাটী হইতে ও বাটীতে, মাধব বাবুর মৎস্যের বাজারে, যোগেশ ব্রহ্মচারীর পাঁঠার দোকানে এবং হেদোর মোড়ে তাহার তোলাপাড়া করিয়া সহর গুলজার করিতেছে।

কথাটা জান উইল লইয়া। কর্ত্তা গঙ্গালাভ কামনা করিয়া কলিকাতায় আসেন, এবং অপর পক্ষের উক্তি যে, সেই সময় উভয় পক্ষের একান্নবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া একটা প্রকাণ্ড উইলে আমাকে নিঃসহায় করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাঁটিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। কুরুপক্ষীয়গণ সেই অধর্ম্মার্জ্জিত বিষয় বিধু বাবু নামক হাইকোর্টের উকীলকে বেচিয়া ফেলিয়াছে। বিধুবাবু সম্প্রতি মরিয়াছেন, কি মরিবেন, তাহা বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, তিনি কাশীধামে। বিধুবাবুর পুত্র কিঞ্চিৎ নৃত্যগীতে, কিঞ্চিৎ কেমিক্যালের দোকানে, কিঞ্চিৎ লক্ষ্মী মিলে, এবং বিলক্ষণ রকমে কোনও সুন্দরীর অযাচিত প্রেমে বিতরণ পূর্ব্বক সেই সম্পত্তির বাৎসরিক প্রায় ষণ সহস্র টাকা আয়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

এ সকল প্রথাল কর্ত্তার মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত থাকিলে ঘটিত না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে টানিয়া, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলিকাতায় আসিয়া এই গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল। প্রধান সাক্ষী বেচুরাম ডাক্তার। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, কর্ত্তা সজ্ঞান অবস্থায় উইলে স্বাক্ষর করেন; কিন্তু তিনি দশ সহস্র মুদ্রা আমার পক্ষ হইতে পাইলে, ধর্ম্মের খাতিরে, কর্ত্তার তদানীন্তন অজ্ঞান অবস্থা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত!

কিন্তু আমি মোটেই প্রস্তুত নই। পক্ষান্তরে, বেচুরাম চালাকী করিয়া আমাদের ঝিকে হাত করিয়াছিল, এবং সে গিয়া ছোট খুড়ীকে বলিয়াছিল যে, বেচু ডাক্তার আমার পক্ষে হেলিয়াছে! সেই অলীক সংবাদের ফলে ডাক্তারের প্রাপ্য পঞ্চদশ সহস্র হইয়া গিয়াছে।

এখন বিশ সহস্রের কমে রক্ষা নাই। এ দিকে মামলা মোকদ্দমার খরচ তাহার বড় কম নয়। এখন প্রশ্ন,—কোন দিক অবলম্বন করিয়া টাকাটা খরচ করি?

ইহার উত্তর ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের তাড়কা রাক্ষসী বধের সময়ে হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মের পথটা গহন দুর্গম ও অনিশ্চিত। অধর্ম্মের পথটা আশু-ফলপ্রদ।

ফলপ্রদ? হৃষীকেশ হাসিয়া বলিলেন,—"ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম নাকি?"

আমি। তবে কর্ম্ম-সন্ন্যাসই থাক্। আমি হাত দিব না।

তিনির রাত্রে বীরেশ্বরাগজপত্র উল্টাইতেছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যে তাহার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদ্গত হইতেছিল। আমি তাহার সুন্দর মুখে পূর্ণ উদ্যম, পূর্ণ মহানুভূতি দেখিতেছিলাম।

আমি ডাকিলাম, "খুকী, এ দিকে আয়।"

শিশির চমকাইয়া বলিল, "কেন?"

আমি। একটু বাতাস করিবে।

শিশির রুমাল লইয়া মুখ মুছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নির্ম্মলা পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "যদি বেচুরামকে ঘুস দিলে চলে—" শিশিরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিতে হইবে। মার্জ্জনা করিবেন।"

আমি সভয়ে বলিলাম "কখনই না। কেবল ভয় হয়, যদি হারি! এ সংসার বড় মোহের স্থল। যদি আমি নিঃসম্বল হই।"

শিশির। আপনার ন্যায় জ্ঞানি—

কথা শেষ না করিয়া শিশির পাখা লইয়া আবার বসিল। আমি জ্ঞানযোগের কথা ভাবিতে লাগিলাম। মজ্জানোৎপন্ন হৃদয়স্থ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।"

কোথায় জ্ঞানযোগ এবং কোথায় কর্ম্মযোগ! তাহার কূল কিনারা নাই!

গৃহ নিঃস্তব্ধ। কেবল দীপ জ্বলিতে দেখিলাম, শিশিরের মুখ চিন্তাময়। সেই চিন্তাপূর্ণ মুখের উপর নির্ম্মলার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি। বালিকা বুঝিয়াছিল, শিশিরই আমাদিগের ভরসাস্থল।

যাইবার সময় শিশির গম্ভীরভাবে বলিয়া গেল যে, "মামলা হয় ত আমরা হারিতে পারি, কিন্তু আপীলে জয়ী হইব। আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না।"

৫

মকদ্দমা অবশ্য হারিলাম। হৃষীকেশ রথের উপর দাঁড়াইয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না।

আমাদিগের পক্ষের যে কতক যোগতিক দেখিয়া ও পক্ষে সরিয়া পড়িল। বিশেষতঃ মাতুলানী মহাশয়া ও মাতামহী ঠাকুরাণী। যি চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিতে লাগিল।

প্রিয়তমা ভক্তিযোগের সম্মান রক্ষা করিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

আমি বিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। সংসার ব্যাপিয়া বহু বাহু বহু উদর, এবং বহু বক্ত্র, অর্থাৎ মুখ। গোটাকতক উদর ও পক্ষে গিয়াছে, তথাপি

পাঁচটি লোকের অন্নসংগ্রহ, স্বীয় সম্মানরক্ষা, অবিবাহিতা বালিকা ও শিশিরের ঋণ। ইহা ছাড়া প্রায় সর্ব্বস্বই গিয়াছে, সম্বল স্ত্রীর গহনা।

নির্ম্মলা নিকটে আসিল। তাহার হৃদয়ে যে বলটুকু ছিল, তাহাও আমি হারাইয়াছিলাম।

"নির্ম্মলা! আমাদের দেশে যাইতে হইবে।"

নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গেল। "কেন যাবে?"

আমি। এখানে অনেক খরচ। আমরা এখন গরীব।

নির্ম্মলা। কলিকাতায় কি গরীবের স্থান নাই?

আমি। অতি কষ্টে। একটা ছোট বাড়ীভাড়া করিলে চলিতে পারে, কিন্তু খাওয়ার খরচ চলিবে না।

নির্ম্মলা। কেন? মা শেলাই জানে। আমি পাঠশালার মেয়েদের গান শিখাইব। আর আপীলটা দেখিয়া গেলে হয় না?

কি বিশ্বাস! কি আশা!

আমি। পাগলী, বড় বড় উকীল মত দিয়াছে যে, আপীলে কিছু হইবে না! এখন তাহার তদবির করিতে ও বিচারের ফল বাহির হইতে দুই বৎসর লাগিবে। ততদিন দেখে যে জমীটুকু আছে, তাহাতে চাষা করিলে দিনপাত হইতে পারে। আচ্ছা! তোর কলিকাতায় থাকিবার এত ইচ্ছা কেন?

নির্ম্মলা কিছু বলিল না। ভয় পাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি শিশিরকে একখানা পত্র লিখিলাম,—

"শিশির! তোমার নিকট আমি ঋণী! আমি জানি, তুমি এখন দাবী করিবে না, এবং আপীল না করিয়া ছাড়িবে না। আমার আপীল সম্বন্ধে কোনও আশা ভরসা নাই। উহার ফলের সম্বন্ধেও আমার কোনও প্রত্যাশা নাই। আমি না বলিয়া চলিয়া যাইতেছি। মার্জ্জনা করিবে।"

তৎপরদিন প্রভাতে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ীভাড়া চুকাইয়া সস্ত্রীক কন্যা সহ ষ্টীমারে রওনা হইয়া দেশে আসিলাম। পিসী মায়ামোহের জড়তা-গুণে সঙ্গে আসিলেন।

গ্রামে আসিয়া প্রথমতঃ মুখ দেখাইতে কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দাড়ি গোঁফ কামাইয়া আর ততটা কষ্ট হইল না। একান্নবর্ত্তী ভিটাকে নমস্কার করিয়া পিতৃস্বসার পুরাতন কুটীরে বাসস্থান স্থির করিলাম। সেখান হইতে

আমার জমীটুকু বেশী দূরে নহে। চাষ করিবারও বিশেষ ইচ্ছা জন্মিল।

দুরবস্থায় ভক্তিযোগটা না আসুক, অভ্যাসযোগটা আসিয়া পড়ে। পরিমিত আহারের ত কথাই নাই, নিদ্রা ও দুশ্চিন্তাও পরিমিত হইয়া পড়ে। কুটীর যে যোগীদিগের উপযুক্ত স্থান, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। এখন আমি নিঃসম্বল। বারণাবতের জতুগৃহদাহেরও কোনও সম্ভাবনাও নাই। জমীদারীর বিভীষিকা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রভৃতি হইতে আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

৬

সম্মুখে গাভী, সবৎসা, লাঙ্গুল দোলাইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় ব্যস্ত। প্রিয়তমার জীর্ণ মলিন বাস। নির্ম্মলা নদীতে জল আনিতে গিয়াছে। সংসারে সকলই জীর্ণ ও পুরাতন। আমি একটু রসিকতা করিয়া কহিলাম, "জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নূতন দেহ লইবার আর দেরী কত?"

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি ভগবদ্গীতার একখানা টীকা করিয়াছি; এবং প্রিয়তমা তাহা লিখিয়াছেন। অবস্থা-বৈগুণ্যেই হউক, কিংবা লিখিবার গুণেই হউক, কিংবা আমার ন্যায় নিষ্কাম পুরুষের সান্নিকট্যবশতঃই হউক, প্রিয়তমার চরিত্রের সুচারু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রমাণ,—

(১) নির্ব্বিবাদে প্রিয়ার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া কোনও ক্রমে দিন চালাইতেছি। জমীর খাজনা দিতেছি।

(২) ফসল না হইলেও হতাশাস নহি।

(৩) সকলেই মোটা চাউল ও নিরামিষ ধরিয়াছি।

(৪) প্রিয়তমা নিজে গোরক্ষা করিয়া থাকেন, এবং আমায় আমাকে সাজিয়া দেন।

আমি খাইলে যাহা থাকে, তাহাই মাতা ও কন্যা একত্র বসিয়া খান; অতএব খোরাকের বিষয়ে কোনও গোলমাল থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, কোনও তর্ক বাক্-বিতণ্ডা বিসংবাদ নাই। জ্ঞানী দরিদ্র ও মূর্খ দরিদ্রে তফাৎটা এই যে, মূর্খের [illegible] হইলেও মুখভঙ্গী, চীৎকার ও কলহ স্বভাবসিদ্ধ; জ্ঞানী [illegible] আস্ফালনাদির হ্রাস হইয়ে ভোফা চেহারা দাঁড়ায়।

এই সকল কারণে উভয়ে উভয়কে সুন্দর দেখিতাম। উভয়ের ধর্ম্ম একই দাঁড়াইয়াছিল।

তবে একটু তফাৎ তখনও ছিল। প্রিয়তমা স্বপ্ন ও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই। রাত্রিকালে বোধ হয় পুরাতন জমীদারীর কথা তাঁহার মনে হইত পুরাতন খাট, আলমারী, গহনার সিন্দুক, রবিবর্ম্মার ছবি, বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাস, রবি ঠাকুরের কবিতা, দ্বিজু রায়ের নাটক, সকলই এখন কুরুপক্ষীয়গণের দখলে। একখানা বহি চাহিলে তাহারা দেয় না। আমাদের গাড়ী তাহাদের জমীতে গেলে খোঁয়াড়ে দেয়। নির্ম্মলাকে দেখিলে হাসে।—"ও মা! এত বড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নি! একটা কলঙ্ক হবে যে!"

প্রিয়তমা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নির্ম্মলার একটা কিনারা করিতে হ'বে ত?"

নির্ম্মলা জল লইয়া আসিল। নির্ম্মলার মুখের শ্রী অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে। দুঃখে, দারিদ্র্যে, নির্ম্মলার সৌন্দর্য্য অনাদৃত বনফুলের মত বিজনে প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। দুই বৎসর দুঃখে গিয়াছে, তবুও নির্ম্মলা প্রফুল্লা। মুনিকন্যার মত, বনদেবীর মত, ইতস্ততঃ কৃষকবালিকাগণের সহিত খেলা করিত, তাহাদিগকে গান শিখাইত, পড়াইত। নির্ম্মলা দুঃখিনী হইলেও তাহাদের রাণী। যে দেশে ঐ রকম রাণী হইয়াছে, সেই দেশই রাজবংশের জন্মভূমি।

৭

নির্ম্মলা আসিয়া সভয়ে বলিল, "বাবা, ঘাটে একখানা নৌকা আসিয়াছে; মাঝী তোমার বাড়ী খুঁজিতেছিল।"

আমি। মা! আমাদের কে খুঁজিবে?

নির্ম্মলা বলিল, "আপীলের খবর নয় ত?"

আমি হাসিয়া এবং ভাবিয়া অবাক্! এই মেয়েটার এখনও আপীলের স্বপ্ন ভাঙ্গে নাই!

কিন্তু আপীল না হউক, আপীলের মত একটা খবর উপস্থিত। অর্থাৎ, আপীলের 'রেস্‌পণ্ডেণ্টে'র তালিকাভুক্ত কার্য্যকারী বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালক হারাধন চাটুর্য্যে গরীবের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত।

কথাটা আর কিছুই নয়। বিধুভূষণের পুত্র [illegible] আমার কন্যার করপ্রার্থী।

কুরুপক্ষীয়গণ আমার জমীদারীটা যাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বিধু বাবুর পুত্র কুমুদ।

আমি বলিলাম, "এত অনুগ্রহ যে?"

হারাধনবাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে বলিলেন, "বিবাদ বিসংবাদ আপোষে মিটাইয়া ফেলাই ভাল। আপীল জিতিবার আপনার কোনও আশা নাই। তবে উভয় পক্ষের মনের উদ্বেগ বাঞ্ছনীয় নহে। কুমুদ জমীদারের পুত্র। আপনি যদি হারিয়াও যান, তথাপি জমীদারী আপনার কন্যারই থাকিবে। জিতিলেও কাহারও হানি নাই। আপনার ন্যায় মহাশয় লোকের সহিত আত্মীয়তা সকলের পক্ষেই সৌভাগ্য বলিয়া গণনীয়। কি বল ভবদেব?"

পুরাতন ভবদেব সাক্ষী বলিল, "অবশ্য।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া প্রিয়তমা আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। কিন্তু আমার মনে খট্‌কা রহিয়া গেল। কুমুদের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। এ স্থলে নির্ম্মলার মত-গ্রহণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ে নির্ম্মলাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম, "নির্ম্মলা, আপীলের খবর এসেছে।"

বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল। "কি খবর এসেছে বাবা?

আমি। মা, তুমি আপীলের জন্য এত উদ্বিগ্ন কেন? সংসারে দুঃখই নিয়ম, সুখ অলীক।"

নির্ম্মলার মুখের জ্যোতি নিভিয়া গেল। "তবে বুঝি আমরা হারিয়াছি?"

কি বেদনার স্বর! আমি বলিলাম, "মা! ভাবিও না এখনও হারি নাই, কিন্তু জিতিবার মত একটা খবর আছে।" আমি সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম, এবং নির্ম্মলার নিশ্বাস দেখিয়া মনে করিলাম, সেটা সুখের নিশ্বাস। কিন্তু কি ভ্রম! নির্ম্মলার মুখ কঠিন হইয়া আসিল।

"না বাবা, কখনই না! আমি ওখানে বিবাহ করিব না।"

সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অপূর্ব্ব। কিন্তু আমার নিকট রহস্যময়।

"বাবা, আমি সুখ চাহি না, জমীদারী চাহি না। তুমি যদি বিষয় ফিরিয়া পাও, তখন তোমার কথা শুনিব। তুমি যদি আপীলে হারিয়াও যাও, তখনও শুনিব। কিন্তু এখন নয়। বাবা, আমি অবাধ্য, আমাকে মার্জ্জনা কর।"

নির্ম্মলার অধীর শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমি নিজে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

দুই বৎসর ধরিয়া নির্ম্মলার চরিত্র আমার প্রহেলিকাবৎ রহস্যপূর্ণ মনে হইতেছে। এখন নির্ম্মলা বালিকা নয়।

নির্ম্মলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। সেই নিবিড় সন্ধ্যা-গগনের একটি তারকার দিকে চাহিয়া ভাবিলাম। বোধ হয়, ধ্যানময় হইয়াছিলাম। বুঝিলাম, নির্ম্মলা শিশিরকে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসা রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা পিতা মাতা কেন, যমেরও নাই।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মা তুমি কাঁদিও না। আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। এখন তোমার মাকে বুঝাইয়া আসি।"

৮

পিতা অনেক সময় বুঝে, মাতা বুঝে না। যদি মাতা বুঝে, পিতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ স্থলে জ্ঞান বিজ্ঞানযোগের বিশেষ দরকার। আমার গীতার টীকাটা একবার পাঠ করিয়া হারাধন বাবুকে দুই কথায় বিদায় দিলাম।—"আমার কন্যার পক্ষে এখন দরিদ্র-সংসারই ভাল। ঐশ্বর্য্য অসামঞ্জস্যের উৎপত্তি করিবে। আপনার যদি এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত।"

হারাধন বাবু কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি রাগিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহাতে বড় ভয় পাই নাই। কিন্তু প্রিয়তমার শয়নাগারে নির্ব্বাক-নিঃস্পন্দ-ভাবে অবস্থিতি দেখিয়া অষ্টম অধ্যায়ের কথা মনে পড়িল, "হে অর্জ্জুন, আমার দুই প্রকৃতি আছে" ইত্যাদি।

প্রিয়তমার দৈবী প্রকৃতির হঠাৎ অন্তর্ধান, এবং পূর্ব্বকালের অপরা-প্রকৃতির আকস্মিক আবির্ভাব দেখিয়া আমি ভাবিলাম, "হৃষীকেশ, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তুমি যে অবতীর্ণ হইবে, সে কথাটা কি রকম?"

কিন্তু হৃষীকেশের কোনও সাড়া শব্দ নাই। সহধর্ম্মিণী নিঃস্পন্দ। প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া মূর্চ্ছা হয় নাই। এবার কিছু ঘোরতর। পিসী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত ত্রস্তা। বৃদ্ধে পেচক ডাকিতেছিল। নির্ম্মলা না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। নাড়ী পাওয়া গেল না।

আমি ক্রমাগত ভাবিতেছি, "ভয় কি! আত্মার মরণ নাই। যদি দেহটা ছাড়িবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কোনও হাত নাই, ডাক্তারেরও নাই।" কিন্তু ক্রমে যখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেল,

তখন আমার গীতার টীকা কোনও কাজে আসিল না। লম্ফ দিয়া উঠিলাম। কিন্তু যাই কোথা? গ্রামে ডাক্তার নাই। বৈদ্যপ্রবর মূর্চ্ছার কিছু জানেন কি না, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

অনন্যোপায় মায়া মমতা উপস্থিত হইল। নির্ম্মলাকে ডাকিয়া কহিলাম, "মা! তোমার মার কি হয়েছে দেখ, গায়ে হাত বুলাইয়া দাও, মুখে জল দাও।"

বাহিরে আসিলাম। ঘোর অন্ধকারে মুক্ত তারকাখচিত আকাশ দেখিয়া ডাকিলাম,—"হৃষীকেশ! ভক্তকে আর যন্ত্রণা দিও না। মাতৃহীনা নির্ম্মলাকে আমি দেখিতে পারিব না। আর যাহা খুসী হয়, কর।"

দূরে ঘাটের দিকে একটা শব্দ শুনিলাম। যেন একখানা বজরা আসিয়া লাগিল। ক্রমে অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি আলোক দেখা দিল। ক্রমে বক্র গ্রাম্য পথ ঘুরিয়া দুইটি লোক আমাদিগের কুটীরের সম্মুখে আসিল। এক জন বলিল, "এই চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাড়ী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ চাটুর্য্যে?"

কিন্তু আর অধিক বলিতে হইল না। সম্মুখেই শিশির। সে একটা প্রণাম করিয়াই অতি ব্যস্ত স্বরে কহিল, "আমরা আপীল জিতিয়াছি।" কি মধুর সংবাদ!

আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলাম, "এখানে বড় বিপদ। নির্ম্মলার মাতা মূর্চ্ছাগ্রস্তা।"

আমরা দ্রুতপদে কুটীরে ফিরিলাম। দৈবঘটনাক্রমেই হউক, কিংবা শিশিরের কথা কর্ণে গিয়াই হউক, মূর্চ্ছা তখন ভাঙ্গিয়াছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সুসংবাদেই তিরোহিত হইল।

আর নির্ম্মলা? তাহার সহিত বোধ হয় শিশিরের অনেক কথা হইয়াছিল। সে কথা আমি জানি না। সে সব ভবিষ্যতের কথা। নূতন জীবন ও নূতন সংসারের কথা।

বলা বাহুল্য যে, প্রাতঃকালে নিজের হর্ষের আধিক্য দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। কিন্তু সুখ ও দুঃখ 'সমং কৃত্বা' একবার গীতার টীকাটা পড়িয়া লইলাম। "হে হৃষীকেশ, হর্ষে বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল। তোমার ভক্তের পক্ষে যেন তাহা ঘটিয়া না যায়।"

হৃষীকেশ অনেক দিন পরে একবার দেখা দিয়াছেন। আমরা সেই কুটীরেই আছি। নির্ম্মলার সহিত শিশিরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অনাথ কৃষকগণের আবাস ও কৃষকবালিকাগণের একটা বিদ্যালয় হইয়াছে। নির্ম্মলা সেখানে মধ্যে মধ্যে আসে।

কিন্তু প্রিয়তমা এখনও সুখী নহেন। তিনি বলেন, "নির্ম্মলার খোকা হইল না।" আমি বলি, "সেটা হৃষীকেশের ইচ্ছা!"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভারতের স্বর্ণযুগ।

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের অধিকারকাল ভারতের স্বর্ণযুগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। চাণক্য-রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও গ্রীকদূত মেগাস্থেনিসের গ্রন্থে অশোকের রাজ্যসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি; মিউনিসিপালিটী।

যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, শাসন সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত একেবারে যথেচ্ছাচারী রাজার মত ছিলেন না। ইচ্ছা করিয়া তিনি অনেকগুলি বিষয়ে সমিতি সংগঠন করিয়া সেই সমিতির হস্তে কিয়ৎপরিমাণে রাজক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন ও উন্নতি-সাধনের ভার তিনি সমিতির হস্তে সমর্পণ করেন। এই সমিতি অনেক অংশে বর্ত্তমান মিউনিসপালিটীর অনুরূপ। পাটলিপুত্রের মিউনিসিপাল সমিতিতে ত্রিশ জন সভ্য থাকিতেন। এইরূপে গ্রাম্যপঞ্চায়ৎ প্রথার একটি উন্নততর সংস্করণের গঠন করিয়া তাহার উপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির ভার অর্পণ করেন;—

প্রথম বিভাগ;—শিল্পকলা।

শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রথম বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিকের হার-নির্দ্ধারণ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া যাহাতে ইহারা উপযুক্তভাবে কাজ করে, তাহার তত্ত্বাবধান, এবং যাহাতে কারিকরেরা খাঁটী জিনিস প্রস্তুত করে, তাহা দেখিবার ভার—এই সকল বিভাগে সমর্পিত ছিল। শিল্পী ও কারিকরগণ এক প্রকার রাজারই কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত। যদি কেহ হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করিয়া কোনও কারিকরের জীবিকার ব্যাঘাত জন্মাইত, তবে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় বিভাগ ;—বৈদেশিকদিগের তত্ত্বাবধান।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত অনেক বৈদেশিক রাজ্যের সংস্রব ছিল। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় আসিয়া পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত বিদেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াও বিভিন্ন দেশ হইতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দ্বিতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাদিগের তত্ত্ব লইতেন; তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান ও অনুচর সংগ্রহ করিয়া দিতেন, এবং আবশ্যক হইলে, যাহাতে তাঁহাদিগের সুচিকিৎসা হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতেন। কোনও বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, যথারীতি তাঁহার সমাধি হইত, এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তৃতীয় বিভাগ ;—জন্মমৃত্যুর হিসাব।

সরকারের অবগতির জন্য এবং করস্থিরীকরণের সুবিধার জন্য বিশেষ সতর্কতা ও শৃঙ্খলার সহিত এই বিভাগ হইতে জন্মমৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করা হইত।

চতুর্থ বিভাগ ;—বাণিজ্য।

বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলাস্থাপনের ভার চতুর্থ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যাহাতে উপযুক্ত স্থানে বাণিজ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, এবং যাহাতে ব্যবসায়ীরা রাজ প্রবর্ত্তিত বাট্‌খারা ও পরিমাণ ব্যবহার করে, সে বিষয়ে এই বিভাগের রাজপুরুষগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ব্যবসায়ীদিগকে সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দিয়া ব্যবসায় করিবার অনুমতি লইতে হইত। যাহারা একাধিক দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শুল্কের দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইত।

পঞ্চম বিভাগ ;—শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

উল্লিখিত প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্যাদিরও তত্ত্বাবধান চলিত। যাহাতে নূতন ও পুরাতন মাল পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, সে জন্য একটা আইনও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যে সকল ব্যবসায়ী ইহার উল্লঙ্ঘন করিত, তাহাদিগের অর্থদণ্ড হইত। নূতন ও পুরাতন জিনিসের শুল্কের হারে প্রভেদ ছিল।

ষষ্ঠ বিভাগ ;—বাণিজ্যদ্রব্যের উপর বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশমাংশ আদায়।

বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইত, তাহার দশমাংশ

রাজকর-স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই কর আদায়ের ভার ষষ্ঠ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যদি কোনও ব্যবসায়ী এই কর হইতে সরকারকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া ধরা পড়িত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

কেবল পাটলিপুত্র বলিয়া নহে, "অর্থশাস্ত্র" আলোচনা করিলে মনে হয়, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বড় বড় সহরেও এইরূপ মিউনিসিপাল শাসনের প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রত্যেক বিভাগের জন্য বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া, সমগ্র সমিতিটির হস্তে রাজধানীর সাধারণ শাসন ও বন্দোবস্তের ভারও অর্পণ করা হইয়াছিল। বাজার, বন্দর ও মন্দির,—সাধারণসংক্রান্ত সকল বিষয়ই রাজ-পুরুষদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল।

রাজপ্রতিনিধি।

দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনভার রাজপ্রতিনিধির উপর সমর্পিত ছিল। সাধারণতঃ রাজবংশীয়দের মধ্য হইতেই রাজপ্রতিনিধির নিয়োগ হইত।

সংবাদবাহক ও সংবাদ-লেখক।

দূরবর্ত্তী কর্ম্মচারিগণ কিরূপভাবে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা অবগত হইবার জন্য সংবাদ-লেখক ও সংবাদ-বাহক রাখা হইত। তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগের উপর লক্ষ্য রাখিতেন, এবং সহরে ও মফস্বলে যেখানে যাহা ঘটিত, তাহার বার্ত্তা সরকারে প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরিয়ান্ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা কখনও সত্যের অপলাপ করেন নাই, এবং তখন মিথ্যাবাদিতা ভারতবাসিমাত্রেরই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

সৈনিকবিভাগের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা।

সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের সৈন্যবল অশ্বারোহী, পদাতিক, গজারোহী ও রথারোহী, এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই চারি বিভাগ ব্যতীত নৌবিভাগ ও সৈন্যসংগ্রহবিভাগ নামক নূতন দুইটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৈন্যবলের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে কেবল কাগজে কলমে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে; যাহাতে সেই সকল বিধিব্যবস্থা যথারীতি কার্য্যে পরিণত হয়, সে দিকেও তাঁহার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই শৃঙ্খলা ও শিক্ষার গুণে তাঁহার সৈন্যবল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী

হইয়া উঠে। সেই সৈন্যবলেই তৎপৌত্র অশোক-সমস্ত ভারত জয় করিতে সমর্থ হন। মাকিদোন সৈন্যদলকে তাহারাই তাড়াইয়া দিয়াছিল, এবং সেলিউকসের আক্রমণও ব্যর্থ করিয়াছিল।

সৈনিক বল।

যে সৈন্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ও সাম্রাজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্রাট্ হইবার পরে সেই সৈন্যের সংখ্যা তিনি বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যপ্রথানুযায়ী তাহাদিগকে ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইতে হইত। চন্দ্রগুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রেরও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে পর্য্যাপ্ত বেতন পাইত। রাজসরকার হইতে তাহাদিগের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগান হইত। বিন্দুসারের (Xandrames) সময়ে ৮০০০০ অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, ৮০০০ রথ, ও ৬০০০ রণহস্তী ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তেরও এইরূপই বাহিনীবল ছিল। তৎপরে অশোক শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা ৬ হাজার, পদাতিকের সংখ্যা ৬ লক্ষ, এবং রণহস্তীর সংখ্যা ৯ হাজার ও বহুসংখ্যক রথ ছিল।

অস্ত্র শস্ত্র।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর হস্তে দুইটি বর্শা ও একখানি ঢাল থাকিত। পদাতিকদিগের প্রত্যেকের হস্তে একটি প্রায় সমকলা তরবারি থাকিত; তদ্ব্যতীত ছোট ছোট বর্শা বা ধনুর্ব্বাণও থাকিত। ধনুক মাটীতে রাখিয়া বামপদের দ্বারা চাপিয়া প্রচণ্ডবেগে তীর ছোড়া হইত।

রথ ও রণহস্তী।

দুইটি কি চারিটি অশ্ব রথ টানিত। প্রত্যেক রথে চালক ব্যতীত দুই জন করিয়া যোদ্ধা থাকিত। প্রত্যেক হস্তীর উপরে মাহুত ব্যতীত তিন জন ধনুর্দ্ধারী থাকিত।

রাজস্ব।

রাজস্ব বা কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষকে, ভূমির খাজনা নিরূপণ করিবার সময় কি উপায়ে জমীতে জলসেচন হইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। সাধারণতঃ রাজা উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকর-স্বরূপ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশও লইতেন। ইহা জমীর যাবদ রাজস্ব। এতদ্ব্যতীত জলকরস্বরূপও কৃষককে আবার প্রায় এই পরিমাণেই রাজকর দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত রাজা সকল প্রজার নিকট

হইতেই আবশ্যকমত চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন কারণে প্রজাদিগকে বহুপ্রকার কর দিতে হইত।

বিক্রয়ের উপর কর।

প্রাচীরবেষ্টিত সহরগুলিতে বাণিজ্যদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর রাজস্ব আদায় হইত। এই রাজস্ব যাহাতে সুচারুরূপে আদায় হইতে পারে, তজ্জন্য এই নিয়ম ছিল, যে দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, সেখানে তাহা বিক্রীত হইবে না। আইন করা হইয়াছিল যে, বিক্রেয় দ্রব্যাদি (শস্য ও গবাদি পশু ভিন্ন) সহরের সিংহদ্বারের মধ্যে মঞ্চগৃহের সন্নিকটে আনিয়া মজুত করিতে হইবে, এবং সেখানে বসিয়াই বিক্রয় করা হইবে। বিক্রয়ের পূর্ব্বে কর দিতে হইত না; কিন্তু বিক্রয় হইয়া গেলেই সেখানে বসিয়াই রাজকর দিয়া আসিতে হইত। শুল্কের হার নানা প্রকার ছিল। বাহির হইতে যে সকল দ্রব্যাদির আমদানী হইত, তাহার উপর সাত রকমের শুল্ক ছিল। মোটের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে শুল্ক দিতে হইত। শাক, ফলমূল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সহজে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপর মূল্যের একষষ্ঠাংশ বা শতকরা ১৬৲ টাকা হিসাবে কর আদায় হইত। অন্যান্য বহুবিধ বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শতকরা ৪৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজার প্রাপ্য ছিল। মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য জিনিসের সুদক্ষ জহুরীরা যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত, তাহার উপর রাজকর ধার্য্য হইত। বিক্রয় করিবার জন্য যে সকল জিনিস আনীত হইত, তাহার উপর সরকারী মোহর অঙ্কিত হইত।

লোকগণনা।

প্রত্যেক সহরেই এক জন নাগর (নগরাধ্যক্ষ) থাকিতেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশে কয় জন নূতন লোক আসিল, এবং সেখান হইতে কয় জন লোক অন্যত্র চলিয়া গেল, তাহার একটা হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত। লোকসংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক অধিবাসীর জাতি, শ্রেণী, নাম, উপাধি, ব্যবসায়, আয়, ব্যয় ও গবাদির পর্য্যায়ক্রমে একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইত। রাজস্বসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করিলে অপরাধীর অর্থদণ্ড বা সম্পত্তিদণ্ড করা হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিত, তবে তাহাকে চৌর্য্যাপরাধের দণ্ডভোগ করিতে হইত।

গুপ্তচর-নিয়োগ।

প্রকৃতিবর্গের মনোভাব অবগত হইবার জন্য রাজা অনেকগুলি গুপ্তচরের নিয়োগ করিতেন। ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। রাজকার্য্যসাধনের জন্য ইহারা নির্ব্বিবাদে যে কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত।

রাজস্ব।

পূর্ব্বকালে শস্যোৎপাদনক্ষম ভূমি সাধারণতঃ রাজসম্পত্তি বলিয়াই বিবেচিত হইত, এবং উৎপন্ন শস্যের বা তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পর্য্যাপ্ত অংশ রাজাকে নির্ব্বিবাদে প্রদান করিতে হইত। চন্দ্রগুপ্ত সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। কৃষীবলকে কখনও রাজার যুদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিতে হইত না। এমন কি, আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, উভয় দলই ইহাদিগকে সমানভাবে রক্ষা করিত। মেগাস্থেনিস্ বলেন যে, অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে, দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, অথচ তাহার সন্নিকটে নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃষকেরা আপনাদের কাজ করিয়া যাইতেছে!

কৃষিক্ষেত্র ও জলগমনের প্রণালী।

যাহাতে কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত জল আনয়ন ও জলসেচন করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জমীর পরিমাপ করিবার ভারও এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর সংন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক কৃষক যাহাতে প্রয়োজনানুযায়ী জল পাইতে পারে, তজ্জন্য ইঁহারা দায়ী ছিলেন। যে দেশে নদীনালা নাই, সে দেশে খাল খনন করিয়া দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল-আনয়নের ব্যবস্থা হইত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক পুষ্যগুপ্ত সৌরাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, একটি নদীকে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহা হইতে খাল খনন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এই সঙ্কল্প করিয়া গিরণারে তিনি নদী বাঁধিয়া সুদর্শনহ্রদ নির্ম্মাণ করান। কিন্তু খালগুলি অশোকের পূর্ব্বে শেষ হয় নাই। অশোকের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক যবনরাজ তুষাস্প তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

দণ্ডবিধি।

তখন ভারতবর্ষীয়েরা সাধারণতঃ অত্যন্ত সৎ ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। যখন অশোকের শিবিরে গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস্ বাস করিতেছিলেন, তখন সেখানে প্রায় ৪০০,০০০ লোক ছিল। এত লোকের সমাগম সত্ত্বেও সেখানে দৈনিক যে সকল চুরি হইত, তাহাতে কখনও সর্ব্বসাকুল্যে ৮০৲৮৫৲ টাকার অধিক মূল্যের জিনিস চুরি হয় নাই। গ্রীক দূত লিখিয়া গিয়াছেন যে, লোকেরাও যেমন সাধু, দণ্ডনীয় অপরাধগুলিতেও তেমনই কঠিন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ কেহ কাহারও কোনও অঙ্গহানি করিলে, তাহারও সেই অঙ্গের হানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত অপরাধীর হস্ত কাটিয়া দিত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কেহ রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোনও শিল্পী বা কারিকরের এইরূপ অঙ্গহানি করিত, সে ক্ষেত্রে অপরাধীর একেবারে প্রাণদণ্ড হইত। মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হস্তপদদ্বয়ের ও নাসিকাদির অগ্রভাগ কর্ত্তিত হইত। এতদ্ব্যতীত অন্য কতকগুলি গুরুতর অপরাধে অপরাধীর মস্তকমুণ্ডন হইত। কোনও পবিত্র চৈত্যবৃক্ষের অনিষ্ট করিলে, বিক্রীত সোনার উপর যে শুল্ক দিতে হইত, তাহাতে বঞ্চনা করিলে, এবং রাজা যখন শিকারে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার দলবলের গমনপথে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত।

মাদকদ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

মাদকদ্রব্যবিক্রয়ের জন্য সরকার হইতে রীতিমত অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত। বৈদেশিক মদ্যাদির উপর বিশেষরূপ শুল্ক আদায় হইত। রাজসরকার হইতে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, শৌণ্ডিকালয়ে আসনাদি সহ কতকগুলি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে ফুলের মালা, সুগন্ধদ্রব্যাদি ও যে ঋতুতে যে সকল জিনিসের উপভোগে সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, সেই ঋতুতে সেই সকল জিনিস সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

পূর্ত্তবিভাগ।

রাজপথগুলির তত্ত্বাবধান ও আবশ্যকমত সংস্কারাদি করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে রাস্তার পার্শ্বে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপ একটি প্রশস্ত রাজপথ পাটলিপুত্র-রাজধানী হইতে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সভ্যতার পরিচয়।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপন ও সৈন্যবল সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ করিবার জন্য, এবং বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজাদিগের কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও পাটলিপুত্র, বৈশালী, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন নগরীগুলির অভ্যন্তর-ভূভাগ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হয়, তবে হয় ত প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ আরও কত অমূল্য রত্নরাজির সহিত পরিচিত হইয়া সভ্যজগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বৃক্ষের ত্বক্ ও কার্পাসবস্ত্র লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শাসন-সংরক্ষণে রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তিগণ রাজার অনুগ্রহলাভে ও দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণ রাজদণ্ডভোগে বঞ্চিত হইত না। ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, পুরোহিত প্রভৃতিরাও আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও ক্রিয়াকার্য্যের সফলতা ও নিষ্ফলতার জন্য রাজানুগ্রহ বা রাজদণ্ড লাভ করিতেন। শিল্পী, জাহাজনির্ম্মাতা ও অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্য হইতে ভাল ভাল কারিকরদিগকে রাজকার্য্যের জন্য রীতিমত মাসহারা দিয়া নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। তখন আর ইহারা অন্য লোকের কাজ করিতে পারিত না। কাঠুরিয়া, সূত্রধার, কর্ম্মকার ও খনিকার প্রভৃতির উপরও রাজার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

রণসমিতি।

তৎকালে ভারতবর্ষে যত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও সৈন্যসংখ্যা চন্দ্রগুপ্তের বা অশোকের সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের সৈনিক বিভাগের শাসন ও বন্দোবস্তের ভার রণ-সমিতির উপর সংন্যস্ত ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথম বিভাগে সৈনিক ও নৌবিভাগের বিষয় নির্ব্বাহিত হইত; দ্বিতীয় বিভাগের উপর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্যপ্রেরণের ও রসদ ও সৈন্যসংগ্রহের ভার ছিল। ভেরীবাদক, তৃণচ্ছেদক, অশ্বরক্ষক ও কারিকরও এই বিভাগ হইতেই সংগৃহীত হইত। তৃতীয় বিভাগের উপর পদাতিকের, চতুর্থের উপর

অশ্বারোহীর, পঞ্চমের উপর রথের, এবং ষষ্ঠ বিভাগের উপর রণহস্তীর ভার অর্পিত ছিল।

রাজার আচার-ব্যবহার।

সাধারণতঃ রাজা স্ত্রীরক্ষীপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। বিচার, যজ্ঞ, পূজা, যুদ্ধ, মৃগয়া, বা উৎসব ব্যতীত প্রায় কখনই তিনি সাধারণের নয়নগোচর হইতেন না। তবে বিচার উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে একবার প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত। তখন তিনি স্বয়ং অভিযোগশ্রবণ ও বিচার করিতেন। বিচার করিবার সময় তখনকার রাজাদিগের গাত্রমর্দ্দনের সুখানুভব করিবার প্রথা ছিল। অভিযোগশ্রবণ ও মীমাংসা করিবার সময় চারি জন ভৃত্য আবলুস কাষ্ঠের চারিটি দণ্ড লইয়া আস্তে আস্তে সম্রাটের দেহমর্দ্দন করিত। জন্মদিনে সম্রাট যথারীতি অভিষিক্ত হইতেন। এই সময়ে রাজ্যের গণ্যমান্য প্রজারা রাজাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতেন। মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান হইত।

ষড়যন্ত্র।

এত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও সম্রাটের মনে শান্তিসুখ ছিল না। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কতই ষড়যন্ত্রের সংঘটন হইত। কখন কি হয়, এই ভয়ে দিবসে কখনও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিতেন না; এবং এক কক্ষে কখনও উপর্য্যুপরি দুই রজনী যাপন করিতেন না।

রাজপ্রাসাদ; দরবার।

সুবিস্তৃত প্রমোদ উদ্যানের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। প্রধানতঃ দারুময় হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের নিকট সুসার এবং একবাতনের রাজপ্রাসাদ দুইটিকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি নানা চিত্রে শোভিত ও সুবর্ণখচিত; স্বর্ণবিনির্ম্মিত দ্রাক্ষালতায় স্তম্ভগুলি পরিবেষ্টিত। তাহার উপরে রজতময় পক্ষী আসিয়া ফললোভে উড়িয়া বসিতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে মৎস্যসমাকীর্ণ পুষ্করিণী ও চিত্রবিচিত্র পত্রপুষ্পে শোভিত তরুরাজি ও লতামণ্ডপ। দরবার-গৃহ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার লীলাভূমি। সুবৃহৎ স্বর্ণময় পান-পাত্র, রত্নখচিত কারুকার্য্যশোভিত আসন ও পাত্রাধার, তাম্রবিনির্ম্মিত মণিমুক্তালঙ্কৃত বৃহৎ বৃহৎ পান-পাত্র ও বিচিত্রোজ্জ্বল বুটাদার বসন ও গাত্রাবরণ দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। বিশেষ কোনও রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রয়োজন হইলে রাজা,

স্বর্ণমুক্তাখচিত সুচিক্কণ মস্‌লিন্ বস্ত্র পরিধান করিয়া ও মুক্তাগুচ্ছশোভিত সুবর্ণশিবিকায় আরূঢ় হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। কোনও সমীপবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে সাধারণতঃ তিনি অশ্বারোহণেই গমন করিতেন। কিন্তু অধিক দূরে যাইতে হইলে সুবর্ণবিনির্ম্মিত সজ্জায় সজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইতেন। জন্তুযু দর্শন রাজ দরবারের প্রধান আমোদ ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে মেষ বৃষ, হস্তী ও গণ্ডারের যুদ্ধ প্রদর্শিত হইত। মল্লযুদ্ধেরও সমধিক আদর ছিল। এখন যেমন ঘোড় দৌড়, তৎকালে সেইরূপ ষাঁড়ের দৌড় প্রচলিত ছিল। ঘোড়দৌড়ের মত ইহাতেও বাজি রাখিবার প্রথা ছিল। রাজা এই সকল ব্যাপারে যোগদান করিতেন। দৌড়ের স্থান লম্বায় ছয় শত গজ ছিল। ষাঁড়ের দৌড় নাম হইলেও, দৌড়টি প্রকৃতপক্ষে ঘোড়া, ষাঁড় ও গাড়ীর দৌড়। মধ্যস্থলে একটি ঘোড়া ও দুই পার্শ্বে দুইটি ষাঁড় থাকিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত।

মৃগয়া।

মৃগয়াই ছিল রাজার প্রধান ব্যসন। খুব জাঁকজমক করিয়া রাজা শিকারে বাহির হইতেন। এই উপলক্ষে 'রক্ষিত' শিকার-ভূমিতে একটি মঞ্চ প্রস্তুত হইত; রাজা তাহাতে উপবেশন করিতেন। বনের অন্যান্য দিক্ হইতে পশুগুলিকে তাড়াইয়া এই মঞ্চের নিকট আনা হইত। তখন রাজা ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহাদিগকে শিকার করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গম বনেও মৃগয়া করিতে যাইতেন। শিকারের সময় রাজা স্ত্রীরক্ষীপরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইতেন। তাহারা শিকারের প্রধান অঙ্গ ছিল। যে পথে রাজা গমন করিতেন, তাহার উভয়-পার্শ্বে রজ্জু রেখা প্রদত্ত হইত। কেহ ইহা অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। সম্রাট্ অশোক এই রাজকীয় শিকার-প্রথা রহিত করেন।

হয়, হস্তী প্রভৃতি বাহন।

আরিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন বাহনের মধ্যে সাধারণতঃ অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। ধনীরা হস্তিপৃষ্ঠেও আরোহণ করিতেন। কিন্তু রাজার কার্য্যেই ইহা অধিকতর নিযুক্ত হইত। হস্তী, উষ্ট্র বা চারি-ঘোড়ার যানে ভ্রমণ বিশেষ সম্ভ্রমশালী ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পাইত। কিন্তু সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে, কি এক-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বিদেশী গল্প।

পণ-রক্ষা।

কার্থিজগণ বিলবাও নগর অবরোধ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি ফার্ণান্দো দে ইবারেটা সেনাদল সহ অবরুদ্ধ সৈনিকগণের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন। শত্রুসৈন্য সান্ পেড্রো এবাণ্টো শৈলমালা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অদ্রিপুঞ্জ যেমন দুরারোহ, তেমনই দুরধিগম্য। প্রধান সেনাপতি অগত্যা সদলবলে সোমোরোষ্ট্রো উপত্যকাভূমিতে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অনলবৃষ্টিতে চারি দিকে সৈন্যক্ষয় আরম্ভ হইয়াছিল।

সেনাপতি ফার্ণান্দো অধীনস্থ সামরিক কর্ম্মচারিবর্গ সহ এক কৃষকের গোলাবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অগ্নিবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অশ্বারোহণে অদূরবর্ত্তী তৃণশ্যামল উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে রাজপথের চতুর্দ্দিক সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ভীষণ অগ্নিবর্ষণে দুই সহস্র সৈনিক নিহত হইল; কিন্তু ফার্ণান্দো স্থান ত্যাগ করিলেন না। একটি বৃহৎ চুরুট ধরাইয়া প্রশান্তভাবে তিনি শৈলশিখরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেনাদলকে উৎসাহমদে মাতাইয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি জয়ধ্বনি করিতেছিলেন।

অপরাপর সামরিক কর্ম্মচারীও তাঁহার দেখাদেখি মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া প্রশান্তভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পারিতেছিলেন না। ধূমপানকালে তাঁহাদের হস্তধৃত চুরুট পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। আগে পাছে, চারি দিকেই অগ্নিগোলকসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ঢক্কাবাদক যুবক সেনাপতির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার ইঙ্গিত-মাত্রেই সে বাদ্যধ্বনিসহকারে সেনাগণের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। শূন্যপথে, বায়ুস্তর ভেদ করিয়া একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক ছুটিয়া আসিল, বাদকের মস্তক বিদ্ধ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে হতভাগ্য যুবকের প্রাণশূন্য দেহ তৃণাবৃত ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইল।

যুবকের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া সেনাপতি পার্শ্বচরদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিকালে আমায় স্মরণ করাইয়া দিও, যুবকের পিতামাতার নিকট আমি স্বয়ং পত্র লিখিব।"

ঠিক সেই সময়ে হাবানা সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল ভিসেন্টি ডিলা কিউভা সসৈন্যে সেই পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। প্রধান সেনাপতিকে দেখিবামাত্র কর্ণেল ঘোড়ার রেকাবের উপর পা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত 'হুররো' ধ্বনিতে সেনাদল উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

অধ্যক্ষকে সেনাগণ দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ-বাক্য শুনিয়াও তাহারা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সম্মুখে যে ধ্রুব মৃত্যু! অকস্মাৎ প্যাব্‌লো ডোমিনি নামক জনৈক সাহসী বীর বলিয়া উঠিল, "ভাই সকল, ভাবিতেছ,—ওখানে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব? নির্ব্বোধ! —এত ছেলে-খেলা!"

চর্ম্মনির্ম্মিত আধার হইতে তাম্রকূট বাহির করিয়া যুবক একটি সিগারেট পাকাইয়া লইল। দক্ষিণ কর্ণের পার্শ্বে উহা রক্ষা করিয়া সে আর একটি সগারেট ধরাইয়া লইল। তার পর সহচরবৃন্দের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বন্দুকটি স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইল। অবশেষে কোটের দুই পকেটে হাত রাখিয়া প্রশান্তভাবে চুরুট টানিতে টানিতে একাকী সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার চারি পার্শ্বে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিল না। চারি দিকে ঘটর অথবা কড়াই বৃষ্টি হইলে থাকিলে মানুষ যেমন নিঃসঙ্কচিত্তে তাহার মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, প্যাব্‌লোও ও ঠিক তেমনই ভাবে চলিতেছিল।

রোমাঞ্চিতকলেবরে বিস্ময়মুগ্ধ সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তার পর হুররো রবে গগনতল পূর্ণ করিয়া তাহারা যুবকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

খণ্ডশৈলের উপর হইতে সেনাপতি মহাশয় দূরবীনের সাহায্যে এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিলেন। আনন্দে ও গর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পার্শ্ববর্ত্তী কোনও সামরিক কর্ম্মচারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাকী শত্রুসম্মুখে অগ্রসর হইতেছে কে ঐ যুবক?" অভিনিবেশসহকারে সমস্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, "যুবক কেমন নিশ্চিন্তভাবে ধূমপান করিতেছে। সকলেই উহাকে লক্ষ্য করিতেছে। বাঃ! এখন ত সবাই দেখিতেছি উহার অনুসরণ করিল! বেশ! বেশ!"

সেনাপতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

"বাঃ! উহারা দুর্গ দখল করিল, দেখিতেছি! আজ আমাদেরই জয়! যাও, যে যুবক সর্ব্বাগ্রে গিয়াছিল, তাহাকে এখনই আমার কাছে লইয়া আইস।"

শরীররক্ষী সামরিক কর্ম্মচারী তৎক্ষণে অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে বারুদ মাখা, কৃষ্ণমূর্ত্তি প্যাব্‌লো ডোমিনিক সেনাপতির সম্মুখে নীত হইল।

"যুবক, আজিকার যুদ্ধ-জয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু বল দেখি, তুমি যে একাকী শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলে, তোমার কি কোনও রক্ষা-কবচ আছে?"

পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ও দৃঢ় ভাবে সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, সেনাপতি মহাশয়; সত্যই আমার রক্ষা-কবচ আছে।"

এই উত্তরে চারি দিক হইতে হর্ষ ও উৎসাহসূচক ধ্বনি উত্থিত হইল।

সেনাপতি সহাস্যে বলিলেন, "তুমি তবে যুদ্ধে অজেয়, কেমন?"

শার্টের অন্তরাল হইতে প্যাব্‌লো একখানি পদক টানিয়া বাহির করিল। সর্ব্বদাই সে উহা বক্ষে ধারণ করিত।

"যে বালিকাকে আমি ভালবাসি, ইহা তাহারই প্রদত্ত উপহার। সকল সময়ই আমি ইহা ধারণ করি। ভগবানের নিকট আমার জীবন-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সে প্রার্থনা করিয়া থাকে; এই জন্য বন্দুকের গুলি আমার দেহে বিদ্ধ হয় না।"

সেনাপতি ও সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ যুবকের মুখের পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও মুখ হইতে কোনও বাক্য নির্গত হইল না।

অবশেষে সেনাপতি বলিলেন, "যুবক, তুমি 'স্যান্ ফার্ণান্দো ক্রস্' নামক শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য আবেদন করিও।"

প্যাব্‌লোর বিবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল! আনন্দে তাহার নয়নযুগল জ্বলিতে লাগিল। যুবক ওষ্ঠে অধর চাপিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সময় যখন সে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল, তখনও সে এত চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই।

সকলেই জানিত, 'স্যান্ ফার্ণান্দো ক্রস্' লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রার্থীকে স্বয়ং আবেদন করিতে হয়। তাহার দাবী যে সঙ্গত নহে, সে সম্বন্ধে প্রমাণাদির জন্য সরকার পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি নিযুক্ত

হন। তাঁহার কার্য্য, শুধু প্রতিবাদ। এতদ্ব্যতীত প্রাবীর সাহস ও বীরত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। কোনও সামরিক কর্ম্মচারীকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে হয় যে, আবেদনকারীর বীরত্ব তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্যাব্‌লোর জনৈক সহচর তাঁহারই নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিতেছিল,—

"প্রিয়তমে প্যাকুইটা,

আশা করি, তুমি ভাল আছ। আমি বেশ আছি। 'স্যান্ ফার্ণান্দো ক্রস্' আমি পাইয়াছি। কেন যে আমি এ সম্মানের অধিকারী হইলাম, বলিতে পারি না। সেনাপতি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার কোনও-রূপ রক্ষা-কবচ আছে কি না। আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ; এবং তোমার প্রদত্ত কবচখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। আর চারি সপ্তাহ পরে বোধ হয় আমি তোমার কাছে ফিরিয়া যাইব। তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া না গিয়া থাক, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের বিবাহ হইবে। ইতি

প্যাব্‌লো।"

* * * * *

চারি সপ্তাহ তখনও অতীত হয় নাই। একদিন সেনাধ্যক্ষ ভিসেন্টি প্যাব্‌লোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যে, সেনাদলের ডাক্তার, প্যাব্‌লোকে অবদাসী স্বরূপ কাছে রাখিতে চাহেন। প্যাব্‌লো অত্যন্ত বিনয়ী ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন।

প্যাব্‌লো এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রহিল। তার পর সে সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, এ কার্য্য তাহার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না।

"জীবনে আমি কাহারও দাসত্ব করি নাই। আমার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বংশানুক্রমে আমরা স্বদেশে হুকুম চালাইয়াই আসিয়াছি, কখনও কাহারও হুকুম তামিল করি নাই। আমি কাহারও ভৃত্য হইতে পারিব না। কেহ অনুরোধ আমায় করিবেন না।"

"কিন্তু প্যাবলো, সম্রাটের দাসত্ব তোমাকে চিরকালই করিতে হইবে। আমার সমগ্র সৈন্যের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী। এখন অবশ্যই তুমি বিদ্রোহী হইবে না?"

প্যাব্‌লোর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রাণপণ যত্নে সে আত্মদমন

করিয়া প্রণাম করিল, "সেনাপতি মহাশয়, যখন আপনি এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়।"

তাহার কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্ট। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সে অধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইতেছে, প্যাবলোর ব্যবহারে তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইল। সেই দিবস অপরাহ্নে সে সেনাদলের ডাক্তার রেমন্ একব্যাষ্টারর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ডাক্তারকে বলিল, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

তিনি বলিলেন, "কি বলিবে, বল।"

ডাক্তার দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ। তাঁহার নয়নযুগল উজ্জ্বল, গুম্ফ তুষারশুভ্র। যদিও সামান্য ত্রুটী অথবা তুচ্ছ ব্যাপারেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে বটে, কিন্তু লোকটির অন্তঃকরণ করুণাময়।

"আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে আমি কাহারও দাসত্ব করি নাই। অবশ্য, কাজকে আমি ডরাই না। যে কাজ করিতে বলিবেন, সাধ্যমত আমি তাহা সম্পন্ন করিব। যদি কোনও ত্রুটী ঘটে, কোনও অন্যায় কাজ করি, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন, গালাগালি দিবেন, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত অথবা ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু ভ্রমেও কখনও আমার অঙ্গস্পর্শ করিবেন না। উহা আমার অসহ্য। এ কথাটি পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে জানাইয়া রাখা ভাল।"

একব্যাষ্টার নব নিযুক্ত আরদালীর এই বাক্যে হাসিয়া উঠিলেন। প্রফুল্লতাসহকারে বন্ধুভাবে তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি প্রহার করিব, এ চিন্তা তোমার মনে স্থান পাইল কেন? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার কার্য্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিব বলিয়াই আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম।"

"ভবিষ্যতে কখন কি ঘটে, কে বলিতে পারে? এ জন্য পূর্ব্বাহ্নেই আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমার অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে আমি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না। কথাটা গোড়ায় স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল।"

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "বেশ। তোমার এই কথা আমি কখনও ভুলিব না।"

সেই দিন হইতে প্যাব্‌লোর ব্যবহারেও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। কাজ সে সুচারুরূপেই নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু তাহার সহজ প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল। ইদানীং সরস কথাবার্ত্তায় আর সে সহচরদিগের চিত্তবিনোদন করিত না। গতির লঘুত্বও যেন ক্রমশঃ সে হারাইয়া ফেলিতেছিল।

একদিন ডাক্তারের সহিত বাক্যালাপকালে সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্যাব্‌লো কেমন কাজ করিতেছে?"

"চমৎকার! সে একাকী সমস্ত কাজই করে। খুঁটীনাটী সকল বিষয়েই তাহার দৃষ্টি আছে। বিরক্ত হইয়া কটুকথা বলিলেও সে দুঃখিত হয় না। প্যাব্‌লো রত্নবিশেষ।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "সে প্রকৃত বীর।"

ডাক্তার যখন আহত সৈনিকদিগকে পরীক্ষা করিয়া হাঁসপাতাল হইতে শিবিরে ফিরিতেন, প্যাব্‌লো তখন মাতার ন্যায় যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিত; নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন করিয়া রাখিত। ডাক্তার তাহার পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হইতেন।

যে দিন সহস্র সাবধানতা ও যত্ন সত্ত্বেও হাঁতপাতালে আহত বীরেরা প্রাণত্যাগ করিত, ডাক্তার সেদিন অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন।

একদা অপরাহ্ণে প্যাব্‌লো আদিষ্ট হইল যে, ঠিক সাতটার সময় আহার্য্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। সেদিন একটি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার হইবে। রোগ সাংঘাতিক, অতি সাবধানে ও কৌশলে রুগ্নদেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। প্যাব্‌লো বিশেষ যত্নসহকারে ডাক্তারের জন্য নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিল। ঠিক সাতটার সময় শিবিরে ফিরিয়াই যাহাতে তিনি আহার্য্য পান, সে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া প্যাব্‌লো ঘরবাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তার তখনও আসিলেন না।

অবশেষে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ ভাবে ডাক্তার শিবিরে ফিরিলেন। প্যাব্‌লো তাঁহার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিল, আজ ডাক্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে কোনও কথা না কহিয়া আহার্য্য পরিবেশন করিতে লাগিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল যে, অতিরিক্ত বিলম্ব হেতু যদি কোনও জিনিস জুড়াইয়া গিয়া থাকে, অথবা কোনও বিষয়ে ত্রুটী ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি যেন সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন। ডাক্তার বোধ হয় তাহার কথা শুনিতে পান নাই।

অস্ত্রোপচারকালে যাহারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগের নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্পবুদ্ধি সৈনিকদিগের অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া তিনি তখন বকিয়া যাইতেছিলেন।

অতঃপর এক্‌ব্যাষ্টার ছুরীর সাহায্যে মাংসের কিয়দংশ কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ মাংস তৈয়ার হইয়াছিল, সুতরাং সহজে তাহাতে ছুরী বসিল না। সব্‌জীও জুড়াইয়া গিয়াছিল। ডাক্তারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সলক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহার্য্যের পাত্র তিনি সশব্দে মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তার পর প্যাব্‌লোর গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন. "এরূপ কদর্য্য খাদ্য কুকুরেরও যোগ্য নয়।"

একটি কথাও না কহিয়া প্যাব্‌লো গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। তখন এক্‌ব্যাষ্টারের চৈতন্য হইল। আরদালীর উপদেশ অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, যে সময় খাদ্য প্রস্তুত রাখিবার কথা ছিল, তাহার পর দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

তখন নিজের ব্যবহারে ডাক্তার নিজেই লজ্জিত হইলেন। গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে সেই দিনের নিষ্ফল অস্ত্রোপচার ও প্যাব্‌লোর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। আরদালীর প্রণয়িনীর জন্য তিনি একটী অঙ্গুরীয় কিনিয়া দিবেন, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিলেন।

এ দিকে প্যাব্‌লো উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। তাহার শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে সে অপমানের প্রতিশোধ লইবে, প্যাব্‌লো তাহাই ভাবিতেছিল।

পর্য্যটন করিতে করিতে প্যাব্‌লো পথিপার্শ্বে একটি ক্রুস্ দেখিতে পাইল। তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সে ভগবানের আরাধনা করিবার চেষ্টা করিল। খৃষ্টের প্রচারিত ক্ষমা ও ধৈর্য্য সম্বন্ধীয় মহাবাণী সে আবৃত্তি করিয়া গেল বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হইল না। সে জানিত, অপমানের প্রতিশোধ লইতে গেলে তাহারও মৃত্যু অবধারিত।

প্যাব্‌লো বলিয়া উঠিল, "আর প্যাকুইটা? সে কি করিবে? তাহারা কুকুরের ন্যায় আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কোনও পবিত্র সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার স্থান হইবে না।".

ক্রুসের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া সে অন্ধকারে চলিতে লাগিল। যে স্থানে

সে অপমানিত হইয়াছিল, তথা হইতে ক্রমে সে বহু দূরে চলিয়া গেল।

"আমি ত আগেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। সে ত জানিত, আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারিব না। কিন্তু আজ কেন সে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল? অস্ত্রচিকিৎসা বিফল হইয়াছে বলিয়া কি? বোধ হয়। কিন্তু এক জন বেশী মরিল কি বাঁচিল, তাহাতে কি এমন আসে যায়? সে ত যুদ্ধক্ষেত্রেই মরিত, না হয় ডাক্তারের অস্ত্রপ্রয়োগকালে মরিয়াছে।"

সন্নিহিত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া সমুদায় ঘটনা সে আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিল। এই সে দিন সে যুদ্ধ-জয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছে! এত শীঘ্রই সে গুরুতর অপরাধ করিবে? বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যই কি সে পাপ করিয়াছে? ডাক্তার তাহাকে প্রহার করিলেন কেন? তার পর সে কর্ণেলের কথা চিন্তা করিল। তাঁহার আদেশমাত্র সে অবলীলাক্রমে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। আজ তাঁহার আদেশেই ত তাহার এই দুর্দ্দশা, তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে এই অপমানজনক দাসত্ব বরণ করিতে হইয়াছিল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হায়, ডন্ ভিসেন্টি! কেন তুমি আমাকে ডাক্তারের আরদালী হইতে আদেশ করিয়াছিলে? এখন যদি আমি অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য তাহাকে হত্যা করি, তুমিই ত আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিবে!"

আবেগে, উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। নিদারুণ ক্রোধভরে সে পুনঃপুনঃ ভূমিতলে পদাঘাত করিতে লাগিল। তার পর একব্যাষ্টারের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে সে ঘনান্ধকার রজনীতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। এইরূপে সে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিল। তখন তাহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না।

বাক্‌দত্তা পত্নীর কথা তাহার মনে উদিত হইল। যখন সে প্রণয়ীর পরিণাম জানিতে পারিবে, নিদারুণ বৈরাগ্যে তাহার হৃদয় কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

তখন ঝরঝর শব্দে বারিপাত হইতেছিল। ক্রমে উষার আলোক প্রাচীনললাটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দুঃখে নৈরাশ্যে উদ্‌ভ্রান্তনয়নে

প্যাব্‌লো আকাশে দৃষ্টিপাত করিল। পথিপার্শ্বে আর একটি ক্রুশ দেখিয়া সে দাঁড়াইল। ক্রুশে শুষ্ক পুষ্পমাল্য দুলিতেছিল; বৃষ্টিধারা মাল্যপ্রান্ত বহিয়া নীচে ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্যাব্‌লো নতজানু হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

সেই মুহূর্ত্তে আকাশ যেন মেঘমুক্ত হইয়া গেল। বিচিত্র বর্ণরাগে গগনমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিচ্ছিন্ন জলদজাল যেন এক একটা বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নবোদিত তপনের আলোকে তাহাদের প্রান্তদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

* * * * * *

সেদিন রবিবার। প্রধান সেনাপতি সদলবলে সৈন্যগণের কুচ কাওয়াজ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহণে সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। গমনকালে তিনি সকলকে সগর্ব্বে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া বলিল, "সেনাপতি দীর্ঘজীবী হউন।"

তার পর তাঁহার খাস সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ, পার্শ্বচর ও সর্ব্বশেষে সামরিক বিভাগের ডাক্তার সদলবলে উপস্থিত হইলেন। প্যাব্‌লো তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইয়াছিল। কর্ণেল ভিসেন্টির দিকে সে যখন চাহিয়াছিল, তখন কেহই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু অধ্যক্ষ গমনকালে দেখিলেন, প্যাব্‌লো সেদিন ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে নাই।

তখন রেমন্ একব্যাষ্টার অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। প্যাব্‌লো অকস্মাৎ সৈন্যশ্রেণী ত্যাগ করিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। ডন্ রেমন্ প্যাব্‌লোর দিকে চাহিলেন; কি যেন বলিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার কথা ফুটিল না। তাঁহার স্কন্ধদেশ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। প্যাব্‌লো বন্দুক ফেলিয়া দিল। উভয় বাহু বক্ষের উপর রক্ষা করিয়া সে ধরা দিবার জন্য দাঁড়াইল।

তাহার সহচরবর্গ ভাবিল, প্যাব্‌লো নিশ্চয় ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা স্তম্ভিতভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই দিন অপরাহ্ণে সামরিক বিচারালয়ে প্যাব্‌লোর অপরাধের বিচার হইতেছিল।

প্রশ্ন হইল, "তুমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ডন্ রেমন্‌কে হত্যা করিয়াছ?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন।"

সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

"কি অপরাধে তিনি তোমায় প্রহার করিয়াছিলেন?"

"বিনা অপরাধে।"

"কোনও অপরাধ কর নাই, অথচ তিনি তোমায় মারিলেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্যাব্‌লো সংক্ষেপে সমস্তই বলিল। উপরিতন কর্ম্মচারীরা তাহার অনুকূলে অনেক কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন।

"তোমার বন্দুকে গুলি ভরা ছিল, তুমি জানিতে?"

"হাঁ, আমি স্বহস্তে বন্দুকে গুলি ভরিয়াছিলাম।"

"কুচ কাওয়াজের সময় তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়া আসিয়াছিলে?"

"আমি ডাক্তারকে হত্যা করিব বলিয়াই আসিয়াছিলাম।"

"তাঁহাকে হত্যা করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে; এ কথা বোধ হয় তুমি জানিতে না?"

"আমি জানিতাম।"

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে উত্তেজনার কোনও চিহ্ন ছিল না। বিচারকগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামরিক বিধান অত্যন্ত কঠোর। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচারিত হইল, পর দিবস প্রত্যূষে প্যাব্‌লো ডোমিনিকে গুলি করিয়া মারা হইবে।

এই আদেশশ্রবণে প্যাব্‌লোর মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না। উন্মীলিতনয়নে সে প্রাণদণ্ডের আদেশ শ্রবণ করিল। পুরোহিতের সহিত শাস্ত্রালাপে সে সমুদয় রজনী কাটাইয়া দিল। তাঁহার হস্তে ক্রুস ও প্রণয়িনীপ্রদত্ত পদকখানি ফিরাইয়া দিয়া সে তাঁহাকে অনুরোধ করিল, উহা যেন তাহার বাক্‌দত্তা পত্নীর নিকট প্রেরিত হয়।

ম্লানহাস্যে প্যাব্‌লো বলিল, "এই কবচ আমাকে বন্দুকের গুলি হইতে রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু চপেটাঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"

সেই রজনীতে শিবিরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া সৈনিকবৃন্দ প্যাব্‌লোর বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিল। কেহ নিন্দা করিতেছিল, কেহ বা তাহার কার্য্যের সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু উষাগমের সহিত সকলেরই হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

যখন সূর্য্য উঠিল, নীলাকাশে তখন মেঘের লেশমাত্র ছিল না।

* * * * * * *

সোমেয়োষ্ট্রো উপত্যকাভূমির উপর একটি ধ্বংসাবশেষ সমাধিস্থান। সেখান হইতে বিস্‌কে উপসাগর দৃষ্টিগোচর হয়। বৃক্ষবল্লরীর অন্তরাল হইতে সমুদ্রের নীলজলরাশি দেখা যাইতেছিল। সমাধি-প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি ঈষৎ লোহিত।

প্রাচীন সমাধিপ্রাঙ্গণের জীর্ণ প্রাচীর নানাবিধ পুষ্পিত লতা-গুল্মে সমাচ্ছন্ন। সূর্য্য আজ বড় মধুর কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বহু শতাব্দীর প্রাচীন বৃক্ষরাজি সমুদ্রশীকরবাহী পবনে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন মৃদুস্বরে পরস্পর কি বলাবলি করিতেছিল। স্নিগ্ধ-প্রভাত-সমীর সেবন-মুগ্ধ একটি পাখী সহসা মধুরকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল।

তখন ঢাকের মৃদুগম্ভীর ধ্বনি ও সেনাদলের পদশব্দ শ্রুত হইল। সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহী, মধ্যে বল্লমধারী, এবং পশ্চাতে কামানবাহী সেনাদল আসিতেছিল। সর্ব্বশেষে স্প্যানিশ সেনাদল দেখা দিল। নয় জন সৈনিক সমাধি-প্রাঙ্গণে আসিবার পথ রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। সমুদয় সৈনিক সারি দিয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে একটি কথা নাই। প্রত্যেকেরই হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি যেন শোনা যাইতেছিল।

কর্ণেল ভিসেন্টি সময়োপযোগী আদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্ট; মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিবর্ণ; একরাত্রেই শতদেশের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পুরোহিত সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া নবনির্ম্মিত মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলেরই শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। মঞ্চের উপর একটি ক্রুস স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্ট যেন সেইখান হইতে সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। দুইটি বাতি জ্বলিতেছিল।

প্যাব্‌লো সগর্ব্বে, দৃঢ়ভাবে ও অকম্পিতচরণে ক্রুসের সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার হস্তযুগল পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ক্রুসের সম্মুখে সে নতজানু হইয়া বসিল। পুরোহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনাশেষে তিনি

প্যাব্‌লোকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। দূর চক্রবাল-সীমায় সে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল, যেন নীরব অন্তিম বিদায়বাণী সে সমুদ্রপারে কাহারও নিকট প্রেরণ করিতেছিল। জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কিছু বলিবার বা চাহিবার আছে কি?

"হাঁ, ডন্ ভিসেন্টির সহিত একবার করকম্পন করিবার ইচ্ছা আছে।"

প্যাব্‌লো সেনাধ্যক্ষের নিকট নীত হইল। তাঁহার আদেশে প্যাব্‌লোর হস্তের বন্ধন মুক্ত হইল।

অতিগম্ভীরভাবে একে অপরের হস্ত গ্রহণ করিলেন। এই পৃথিবীতে এই তাঁহাদের শেষ করকম্পন। সেনাধ্যক্ষের গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্যাব্‌লো অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অসঙ্কোচে সে প্রাচীরের দিকে চাহিল, তার পর ডন্ ভিসেন্টির দিকে চাহিয়া অকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "এখন—"

ভিসেন্টি মাথা নাড়িলেন। প্যাব্‌লো ফিরিয়া চলিল। দুই জন সৈনিক তাহার পাশে পাশে যাইতেছিল। হস্তান্দোলনে সে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রাচীরের নিকট পঁহুছিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধে সূর্য্যবিম্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অকম্পিতকণ্ঠে দৃঢ়ভাবে স্বয়ং আদেশ করিল, "গুলি কর!"

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ হইল। প্যাব্‌লোর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল। তখন কাহারও নয়ন শুষ্ক ছিল না। বীরগণ বহুচেষ্টাতেও হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিতে পারিতেছিলেন না। প্রধান সেনাপতি অতঃপর আদেশ করিলেন যে, সমগ্র সেনা মৃতদেহের পার্শ্ব দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া যাইবে।

জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী বলিলেন, "সেটা কি নিতান্তই আবশ্যক?"

প্রধান সেনাপতি বলিলেন, "নিশ্চয়ই। নিয়মপালনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু অদূরে ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরের কাছে ডন্ রেমনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আমার বাবতীয় কর্ম্মচারীকে সেই শবদেহের পার্শ্ব দিয়াও যাইতে হইবে। সকলেই যেন বিশেষরূপে স্মরণ রাখেন, অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার বা প্রতিবিধানে যাহারা অক্ষম, সে রূপ অধীনস্থ ভৃত্যের প্রতি তাঁহারা ভ্রমক্রমেও যেন ভবিষ্যতে কোনরূপ অত্যাচার না করেন।" *

---

* রুমেনিয়ার রাজ্ঞী 'কারমেন্ সিল্‌ভা' নামে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্যসেবী রাজা অথবা রাজ্ঞী গ্রন্থ-রচনায় এরূপ যশোলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারই রচিত অর্ণন্ গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে গল্পটি অনূদিত।

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ—এমন বাক্য কেন প্রয়োগ করিলাম, তাহাই বুঝিব, বলিব। ইন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন বা রাজনীতিগত প্রয়াসের পরিচয় দিবার সময় এখনও হয় নাই, ইহা তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্রও নহে। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় কতটুকু ও কেমন ধরণের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বলা বাহুল্য যে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ইংরাজি হিসাবে সুশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরাজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা চলে যে, তিনি ইংরাজি ভাষার এক জন পাকা মুন্সী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ বাঙ্গেন নাই, ইংরাজি ভাষার ও সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হন নাই। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; খাঁটি বাঙ্গালীর গোড়ায় ভাবের তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষায় ইংরাজি শব্দের বা কোটেশনের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তিনি ইংরাজি ভাবকে খাঁটী বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত "কল্পতরু", "কুদীরাম" ও "ভারত উদ্ধার" বাঙ্গ কাব্যে স্থানে-স্থানে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সম্পাদিত "পঞ্চানন্দ" নিভাঁজ গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে লিখিত হইত। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের ভাষা খাঁটী বাঙ্গালা করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন। এই হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ ছিলেন।

খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজীয়ানায় পরিবৃত থাকিলেও, শেষ জীবনে, আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ পরিচ্ছদে প্রায় ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরাজিনবীশ

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই। গোটা ভারত জোড়া দেশহিতৈষণা এবং বাঙ্গালার নিবদ্ধ দেশপ্রীতির কথা লইয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহারই কতক অংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"তুমি আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্র একটু জান; সৌরমণ্ডলের অনুমান তুমি করিতে পারিবে। জান ত, সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া নানা গ্রহ, উপগ্রহ সকল চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ভারতের হিন্দুত্ব এই সূর্য্য সদৃশ। উহারাই আকর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশ আকৃষ্ট এবং কেন্দ্র-সংবদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্র ভাবে সংস্থিত। হিন্দুর এক, কিন্তু দেশভেদে হিন্দুর আচার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র রকমের। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুত্বের পুষ্টি হইবেই। তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, undefined and indefinite units অর্থাৎ নির্দ্দেশ-শূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন বস্তু লইয়া কখনও কোনও সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রবিড় বা দ্রাবিড়ের আচারপদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও, পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী, যতী সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করি।"

ইন্দ্রনাথ এই হেতু তাঁহার শেষ জীবনে বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর সমাজের কথা, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কথাই অনবরত ভাবিতেন। বাঙ্গালীর দুঃখে, বাঙ্গালার অধঃপতনে, তিনি অহরহঃ কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তাই আমি তাঁহাকে "বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ" এই আখ্যা দিয়াছি।

এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব। ইংরাজিতে যাহাকে Satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে

অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার "ভারত-উদ্ধার" ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় Satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় এক দিকে যেমন ইংরাজি Wit ও Humour দেখান আছে, অন্য দিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামর্থ্য যে আমাদের অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও ইন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই তাঁহার সরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুরাগী হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি Satireটাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satiristদিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু De-Quinceyর মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার গাছমরীচ মিলাইয়া, কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিম বাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালার টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে; পরন্তু বেজায় emotional; নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কশাঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে, তখন তাহার এই অপূর্ব্ব Humour এবং নির্ম্মল তটনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।"

ইন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গালায় কদাচিৎ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্ঘের কেন্দ্র-মূর্ত্তি ছিলেন; হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনস্বী সকল উহার সদস্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য আকাশের Halley's comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশ শুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।" ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-সামর্থ্যের এমন পরিচয়পত্র আমি আর দেখি নাই। ইন্দ্রনাথের মনীষার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি কথায় যেরূপ ফুটাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে না।

Satirist-এর অবলম্বন *bonhomie* ইন্দ্রনাথের খুবই ছিল। একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে ইন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্‌নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠ্‌তে পারি নে।" উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"যখন অনুমতি পাইলাম, তখন করিব।" কিছু দিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বাহির হইল; বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে ইন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমার একটা রব করা সার্থক হইল।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার হাসির ছলছলার মধ্যে শোকের সকরুণ বোধনধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাঁহার "ক্ষুদীরাম" পুস্তকায় এই শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষুদীরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে; অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাসকৌশল এমনই অসামান্য যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এবংবিধ হাস্যের কার্পাস আবরণে শোকের অশ্রুধারা [illegible] "ভারত-উদ্ধারে" ও "কল্পতরু"তে আছে; পঞ্চানন্দের বহু ব্যঙ্গ [illegible] পাওয়া যায়। লেখকের আরাধ্য

আদর্শের পরিচয় পাইলে হাসির মধ্যে কান্নার অংশটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ পুরাতন-হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। অপূর্ব্ব ভাষায় তিনি সেই আদর্শ হইতে চ্যুতিজন্য সামাজিক উদ্ভটতা সকলের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থানে তিনি নিজেই সামলাইতে পারেন নাই, তাই পর্ব্বত-পঞ্জর ভেদ করিয়া গিরিতটিনী যেমন বিমল অশ্রুকণার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে হৃদ্‌গত শোকাশ্রুর দুই এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই হিসাবে তাঁহাকে হেল্‌ভেশিয়সের (Helvetius) ভাষায় Patriot satirist বলা চলে। কর্ণেল চেস্‌নীর Indian Polity নামক গ্রন্থ যখন প্রথমে প্রচারিত হয়, তখন "পঞ্চানন্দ" পত্রে উহার নকলে ভারতশাসনপদ্ধতির এক উদ্ভট পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাতে লেখা হয়, বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি সকলে ভারতশাসন পুঁথির মলাট-সদৃশ। এই মলাটের প্রসঙ্গে পঞ্চানন্দ যে করুণরসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব।

ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব-ব্যাখানে ও হিন্দুত্ব-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ উপার্জ্জনশীল ধনী হইলেও, ইংরাজিনবীশ হইলেও, কালপ্রভাবকে পরাভব করিয়া খাঁটী ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার পুরুষকার অপূর্ব্ব। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে একবার লিখিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মের আলোচনা আর ধর্ম্মের আচরণ—বলা সোজা, করা কঠিন। প্রায় অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তা' আচরণের ভাগ্যে যাহা হইবে হউক, কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারো? অদৃষ্ট আর জন্মান্তর, মৃত্যুর পর মানুষের কি দশা হয়, স্বর্গ নরকের স্বরূপ বা বিশেষ পরিচয় কি?—এই কথা-গুলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে কি প্রকার আছে, তাহা, প্রমাণ সহিত, সংগ্রহ করিতে পারো? পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হইবে। তাড়াতাড়ি কিছুই নাই; কিন্তু নিত্যকর্ম্মের মতন সংকল্প করিয়া অল্পে অল্পে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে কি?"

ইহার পর সমাজের ও অর্থতত্ত্বের কথা কহিতে যাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের লিখিত 'কি খাইব?' প্রবন্ধের অবলম্বনে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"খবরের কাগজে কিংবা গোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে যত কথার আলোচনা হইতে

পারে, তাহার মধ্যে 'কি খাইব' এই কথাই গোড়ার কথা অতএব, কথাটা যদি ভুলিয়াছ, তবে ছাড়িও না; আগামীতে আবার লিখিও, তাহার পরে, তাহার পরে, তাহার পরে, যত দিন পর্য্যন্ত লোককে না মাতাইয়া তুলিতে পারিবে, তত দিন পর্য্যন্ত লিখিতে থাকো।

"তবে, ক্রমশঃ আরও চাপিয়া লিখিতে হইবে। 'কি খাইব' প্রশ্নে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্নপানের কথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার—কর্ম্ম-মাত্রই উপস্থিত হয়। জীবিকাভেদের সুতরাং জাতিভেদের সমুদয় প্রসঙ্গই এ প্রশ্নের টানে আসিয়া পড়ে। অতএব ভুলিও না, কথাটা ছাড়িও না।

"কেবল শাস্ত্র-শাসিত সমাজকে অবলম্বন করিয়াও যদি 'কি খাইব' বিচার করো, তাহা হইলে কে প্রশ্নকর্ত্তা, ইহা মনে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইও। ব্রাহ্মণে 'কি খাইব' জিজ্ঞাসিলে যে উত্তর হইবে, শূদ্রে জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর হইবে না, অন্য উত্তর হইবে। শাস্ত্রাধীন রাজা যখন নাই, তখন প্রশ্নের উত্তরদাতা কে হইবে, তাহাও দেখিও। কেন না, 'কি খাইব' প্রশ্নের অভ্যন্তরে 'কোথায় পাইব' প্রশ্নও নিহিত আছে।

"কি খাইব"—ইহা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ হইলে, কিংবা হতাশের কাতর-ক্রন্দন হইলে বিচারের বিষয় হয় না। বাস্তবিক যা অন্নপূর্ণার সংসারে কোনও দিনই অন্নের অভাব হয় না, হয় নাই, এবং হইবে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের উপদ্রবে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা হইতেই এখানে ফেলা-ছড়া, আর ওখানে উপবাস হইয়া পড়ে। ইহা যদি পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারো, তাহা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত অর্থ নীতিতে সুবোধের শ্রদ্ধা হইবেই হইবে। শ্রদ্ধার পর আচার; আর, শ্রেষ্ঠের আচার হইলে ইতরে অনুসরণ করিবেই করিবে।

"আয়-ব্যয়, অর্থাৎ অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় আর অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থা—দুই-ই ভাবিতে হয়। ইহা ভাবিতে গেলেই (education) সুশিক্ষা কিসে হয়, সুশিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি কিপ্রকার হওয়া উচিত, এ সব বিচার্য্য হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যে এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টসিদ্ধিরই উপযোগী। তাহাতে আমাদের সম্যক্ ইষ্ট না হইয়া, অনিষ্টও হইতে পারে। এ অবস্থায় Education questionএ বিশেষরূপে আমাদের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। সুশিক্ষা যাহাতে সুলভ হয়, স্বল্পব্যয়-সাধ্য হয়, সমাজের প্রকৃতির

[illegible] বিহিত [illegible] উপযোগী হয়, তাহার উপায়চিন্তা [illegible]। বাঙ্গালীর মধ্যে যত মোর শত্রুর এম্ এ, বি এল্, কি দুই হাজার B. A.র পরিশ্রম অনায়াসে সাধিতে হইতে পারে—দেশের ছেলে মরিতে যায় কেন?

"কি খাইব খুব বড় কথা; ভুলিয়াছ; খুব ভাল করিয়াছ। ছাড়িও না। দিন রাত্রি ভাবিও, তথ্য সংগ্রহ করিও—আর লিখিও। যদি দশ বিশ জনকে ভাবাইতে পারো, তোমার জন্ম সার্থক হইবে।"

কর্ণিয়াল নিউম্যানের "সাহিত্যের ধর্ম্ম" শীর্ষক এক উপদেশ (sermon) অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক "হিতবাদী"তে দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ সেই সকল প্রবন্ধ-সমালোচনার ব্যাপদেশে স্বীয় নূতন ভাবগুলি এক নূতন কথা বলিয়াছিলেন, এবং বিষয়টি এতই নিখুঁত করিয়াছিলেন যে, উহা পুস্তকের আকারে প্রকাশ করিবার বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রনাথের বড়ই ক্ষোভ ছিল যে, আধুনিক লেখকগণের লিখিত রচনায় ধর্ম্মের ভাব নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিতেন যে, ভাষার Song ও Instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষা টিকে না। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অনুচিকীর্ষার বাঁশীয়ের উপর বিন্যস্ত, খোসখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, ইহার বাঁধন দৃঢ় নাই। ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, লেখক পাকা হিন্দু হইতে পারিলে, তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ভাষায় ধর্ম্ম নাই, প্রয়োগসংযম নাই, তাহা এ দেশে বিকাইবে না—টিকিবে না। এই হেতু তিনি একবার "পঞ্চানন্দে" লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কুচ্ছ রাশি, উহা রসিকক্ষেত্রেই শোভা পায়।

ইন্দ্রনাথের চরিত্র-বিশ্লেষণের, তাঁহার সাহিত্য-কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, তাহার মতন লেখক, ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবে না। আমি তাঁহার দাসানুদাস, অযোগ্য শিষ্যমাত্র। যদি সামর্থ্যে কুলায়, তবে তাঁহার মনীষার বিশ্লেষণের চেষ্টা পরে করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি, ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য যে নিধি হারাইল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্র-পরিচয়।

জল-রেখা।

ইহা স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট চিত্র। পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নায় পুলকিত শারদ-যামিনী বায়ুপ্রবাহবিহীন; স্বচ্ছ জ্যোৎস্নি, ধীরে ধীরে প্রবাহিতা; তীরে মৃত্তিকা ও বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া সংকীর্ণ পথে এক রমণী বারিপূর্ণ কুম্ভ শিরে ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। দূরে নদীর অন্য তীরে অস্পষ্ট বৃক্ষাদি দিগ্বলয়ের সহিত আকাশ ও পৃথিবীর সাদৃশ্য পরিস্ফুট করিতেছে। ইহাই এই চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিচয় না দিলেও এই চিত্র দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু চিত্রকলা হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হয় ত সকলে পারিবেন না। কারণ, তাহা বৈজ্ঞানিক বিষয়। তাহা বুঝিতে হইলে তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হইতে হয়; নতুবা ঠিক তাহার উপলব্ধি হয় না।

যেমন এক জন বৈষ্ণব ভিখারী তাহার একতারাটি বাজাইতে সুন্দর একটি পদাবলী ধরিয়াছে। তাহার সুর ও তাল ঠিক, বা না হউক, সাধারণ শ্রোতার দল সেই সঙ্গীতের কথা এক একটি চরণ শুনিয়াই মোহিত হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে, অন্যত্র এক জন সুবিজ্ঞ সঙ্গীতাচার্য্য তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট বসিয়া কোনও এক রাগের বা রাগিণীর আলাপ করিতেছেন; কতিপয় নিরক্ষর শ্রোতা সম্মুখে বসিয়া গীত রাগ রাগিণীর প্রত্যক্ষ-রূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে যেন তন্ময় হইয়া যাইতেছেন। অথচ পূর্ব্বোক্ত ভিখারীর সঙ্গীতে মুগ্ধ শ্রোতার দল ইহা শুনিয়া যেন হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, ইহাতে সেই ভাবপূর্ণ কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা যাহা শুনিতেছেন, তাহা গভীর সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; সুতরাং তাহা সাধারণ শ্রোতার পক্ষে দুরবগাহ বিষয়।

হিতেন্দ্র বাবুর এই চিত্রখানিও কতকটা সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাকে 'হিরোয়িক ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং' বা বীররসাত্মক নিসর্গ-চিত্রের মধ্যে গণিয়া লওয়া যাইতে পারে। হিতেন্দ্র বাবুর এ চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। চিত্রের অন্তর্ভূমি আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইলে চিত্রখানি আরও মনোজ্ঞ হইত। বাস্তবিক, আমরা স্বর্গীয় হিতেন্দ্র বাবুর চিত্রকলা দেখিয়া ক্রমেই অধিকতর মুগ্ধ হইতেছি।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সাহিত্য।

পিতৃত্ব ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গতি।

ফরাসী লা-মার্ক সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের প্রকৃতি বাহ্যিক বা প্রাকৃত জগতের প্রভাব দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা পরিস্ফুট হয় না। মানুষের সু ও কু প্রবৃত্তি সকল পুরুষানুক্রমিক চরিত্রের উন্মেষের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে চোর, স্বভাবতঃই চুরী করে, তাহার এই চুরী করিবার স্বভাব পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির দ্বারা উদ্ভূত নহে। পুরুষানুক্রমিক অপব্যহারের দ্বারা তাহার মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই সে চোর হইয়াছে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিলাতের ও জর্ম্মণীর নিদান-তত্ত্বের পণ্ডিতগণ বলেন,—কেবলই পিতৃত্বের প্রভাবে লোকের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে না। সাধু চোর হয় না, চোর সাধু হয় না। উহার সহিত প্রতিবেশ-প্রভাব থাকা চাহি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, তাঁহারা বলেন যে, শিশুগণকে যদি পাপ-সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সাধু-সঙ্গে রাখা যায়, তাহা হইলে চোরের ও সুরাপায়ীর সন্তান সাধু-পথের পথিক হইতে পারে।

স্কটলণ্ডের গ্লাসগো নগরের ডাক্তার মঙ্ লা-মার্কের শিষ্য। তিনি গ্লাসগোর মিউনিসিপাল কর্ত্তাদিগকে বলেন যে, গ্লাসগোর নিয়তম শ্রেণীর চোর, ডাকাত, মদ্যপ, লম্পট, জুয়াচোর, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি পাপীদিগের সন্তানগণকে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলসন্নিহিত মনোরম দ্বীপসমূহে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হউক। সেখানে বড় বড় পাদরী ও নীতিবিদেরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিন। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইলে, দ্বীপ সকলের বিমল বায়ুতে পুষ্ট হইলে, ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশে সাধু পন্থার পরিচয় ও আস্বাদ পাইলে, ইহারা সৎপথ অবলম্বন করিলেও করিতে পারে। ডাক্তার কবেট এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন, এবং গ্লাসগো মিউনিসিপালিটীর নিকট পর্য্যাপ্ত অর্থ লইয়া স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের সন্নিহিত প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের আলয়স্বরূপ দ্বীপসমূহে পাপের এই অভিনব উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পনের বৎসর কাল এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরে বৎসরে দলে দলে পাপ-জ অনাথ শিশুগণ এই আশ্রয়ে প্রেরিত হইতেছে। পনের বৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মঙ্

যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, লা-মার্কের সিদ্ধান্তই সমীচীন। পিতৃত্বের প্রভাবেই নর-নারীর হৃদয়ে সু ও কু ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রতিবেশ-প্রভাবে মন্দ স্বভাব কখনও সংস্কৃত হয় না। মজ্ বলেন যে, বারযোষার আড়াই বৎসর বয়সের কন্যাকে আনিয়া সাধ্বীর গৃহে রাখা হইয়াছে; পাদরীর দ্বারা তাহার শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাকে কখনও মন্দ ভাবের পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয় নাই; অশ্লীল কথা সে কখনও শুনিবার অবকাশ পায় নাই; তথাপি তাহার যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পাপলিপ্সা হৃদয়ের কোন অজ্ঞেয় কন্দর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপ বেশ্যাকন্যাদিগের জ্বালায় দ্বীপবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। চোরের সন্তান বয়স হইলেই চোর হইতেছে। মদ্যপের সন্তান বিনা শিক্ষায় মদ্যপানে প্রমত্ত হইতেছে। খুনী ও ডাকাতের সন্তান স্বতঃই দস্যুতা ও নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছে। পূর্ব্বেকার শান্ত পুণ্যময় দ্বীপসমূহ পাপ ও অশান্তির আগারে পরিণত হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে,—প্রতিবেশ-প্রভাবে, পারিপার্শ্বিক সমতির গুণে প্রকৃতিগত কুভাবগুলি নষ্ট হইবার নহে। যেমন পঙ্কিল জলকে নির্ব্বিল করিতে হইলে, অঙ্গার, বালুকা প্রভৃতির নানা স্তর দিয়া সেই জলকে প্রবাহিত করিয়া তবে তাহার মালিন্য দূর করিতে হয়, তেমনই দুষ্ট-প্রকৃতি নর-নারীকে আবার সৎপথে আনিতে হইলে কেবল সাধু সংসর্গে রাখিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সাধু শোণিতের সহিত অন্ততঃ তিন পুরুষ সম্পর্ক রাখিলে, তবে সেই বংশে সাধুচেতা সন্তানের উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে।

অধ্যাপক রেণান্ ইহুদী ও হিন্দুদিগের জাতীয়তা-রক্ষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া Conservation of Heredity অর্থাৎ পিতৃত্বের সঞ্চয় নামক এক মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। হিন্দু ও ইহুদীর বৈবাহিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া তিনি ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার মজের এই বিবরণী অবলম্বনে জর্ম্মণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের জীবতত্ত্ববিৎ ও অপরাধতত্ত্ববিৎ মনস্বিগণের সমাজে রিফর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে লা-মার্কের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতেন, প্রতিবেশ-প্রভাবে অপরাধীদিগকে সংযত ও সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব মত পরিবর্ত্তিত করিয়া সন্দর্ভ লিখিতে-

ছেন, এবং স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্বকথিত দ্বীপসমূহে গিয়া উপনিবেশের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত বহু সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতেছেন।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ।

"ন্যাশেস্ ম্যাগাজিন" নামক মাসিকের মার্চ্চ-সংখ্যায় অ্যালান বিসন্ নামক এক জন লেখক বিজ্ঞানবিৎ এডিসনের সহিত তাঁহার কথোপকথনের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এডিসনকে তাড়িত-শক্তির প্রচারক, পরিচয়দাতা ও প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এডিসন বলেন,—আমরা প্রকৃতি-রাজ্যের যে সকল গুপ্ত-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যে দিন স্বর্ণ ও রৌপ্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় প্রচুর হইবে! লোকে সমুদ্রের জলরাশি হইতে, বালুকাস্তূপ হইতে অল্পায়াসেই স্বর্ণ উদ্ধার করিতে পারিবে। এমন কি, অধম ধাতুসমূহকে রেডিয়ম বা অন্য কোনও পদার্থের শক্তির প্রভাবে মহার্ঘ রজত-কাঞ্চনে পরিণত করিতে শিখিবে। এই আবিষ্কার অতি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা; কেন না, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থ সকলের মূল তত্ত্ব ও নির্ম্মাণপ্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন।

এডিসন বলেন,—এখন যে পদ্ধতিক্রমে এরোপ্লেন বা বায়ু-প্লেনের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর হেতু এই যে, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বিহঙ্গকুলের উড়িবার পদ্ধতি সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষীর পক্ষ-গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পক্ষসমূহের যে কিরূপ ক্রিয়া, পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনের সময়ে ঐ উপপক্ষসমূহ হইতে কিরূপ শক্তি উদ্ভূত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজ এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিহঙ্গের গতি ও প্রকৃতি যেদিন বৈজ্ঞানিক-সমাজ বুঝিতে পারিবেন, এবং কোন বিহঙ্গের গতি ও উড়িবার যন্ত্র মনুষ্যের ব্যবহারের অনুকূল, তাহা জানিতে পারিবেন, সেই দিনই মানব অল্প আয়াসে বিমানে বা পুষ্পক-রথে আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে। এডিসন বলেন,—'বম্বল-বী' নামক এক প্রকার মধুমক্ষিকার উড়িবার ভঙ্গী বুঝিয়া, সেই আদর্শে উড়িবার যন্ত্র গড়িতে হইবে, এবং কেবল পবনের উপর নির্ভর না করিয়া ব্যোমগত 'শব্দ-তরঙ্গে'র প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও গতি বুঝিয়া উড়িবার যন্ত্র গঠন করিতে পারিলে, মানবের পুষ্পক-নির্ম্মাণের চেষ্টা সার্থক হইবে।

আজ কাল কাষ্ঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে কাষ্ঠের

অভাব হইয়াছে। তাই অনেকে কাগজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। এডিসন বলেন,—ভাবনা কি? আমি এমন একটি প্রাকৃত শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, যাহার প্রভাবে এক ইঞ্চির কুড়ি হাজার অংশের এক অংশ পরিমিত 'পাতলা' নিকেল বা ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিতে পারিব। ইহার উপর অনায়াসে পুস্তক ছাপা চলিবে। এই উপাদান ঠিক কাগজের মত অন্যান্য নানা কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। কাগজ অপেক্ষা উহা স্থায়ী ও মূল্যে সুলভ হইবে। এখন ক্ষুদ্রচর্ম্মী কবিরা কাগজের ঘায়েই মূর্চ্ছা যান। ইস্পাত বা নিকেলের কাগজের আবির্ভাব হইলে বাঙ্গালার সমতল হইতে তাঁহাদের তিরোধান হইবে কি না, তাহা কে বলিবে?

এডিসন বলেন,—কাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য হয়, হউক, আমি তাড়িত শক্তির প্রভাবে এত অল্প ব্যয়ে ইস্পাত প্রস্তুত করিব যে, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত আসবাব কেহই ব্যবহার করিবে না; ইস্পাতের টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানালা, এমন কি, ঘর বাড়ীও প্রস্তুত হইতে পারিবে। এডিসন বলেন, আমি জর্ম্মণ অধ্যাপক ভিরচাউর এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী যে, পৃথিবী কখনও বন-শূন্য হইবে না। আজ যেখানে নগর বা গ্রাম মনুষ্যের কোলাহল-কল্লোলে মুখরিত, কালে তাহা মহাবনে পরিণত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। মহামারী, মহারণ ও ভূমিকম্পে পৃথিবী মধ্যে মধ্যে স্বীয় বনাবরণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন।

ইউরোপে মস্‌লেম প্রভাব।

আদান প্রদান লইয়াই জগতের সভ্যতা পুষ্ট ও সুবিস্তৃত হইয়াছে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য জানুয়ারী মাসের "এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লী রিভিউ" পত্রে শ্রীযুত সেণ্টেনা একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি এই সন্দর্ভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার নিম্ন স্তরে সারাসিন বা ইউরোপের আদি মুসলমান বিজেতাদিগের সভ্যতা ও পুরুষকার নিহিত রহিয়াছে। স্পেন বা হিস্পানী দেশ, ইউরোপীয় তুর্কী প্রদেশ, গ্রীস, মাল্টা, সিসিলী, আফ্রিকার উত্তর অংশ ও মিসর প্রদেশ সারাসিন বিজেতা কর্ত্তৃক পরাজিত ও শাসিত না হইলে, ইউরোপে বীরোচিত ঔদার্য্য ফুটিত না। সারাসিনগণ ইউরোপবাসীদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন; শিষ্টাচার ও সৌজন্যের আদর্শ দান করিয়াছেন; দয়া, ধর্ম্ম ও দাক্ষিণ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, কলাবিদ্যার

জন্যও ইউরোপ সারাসিনদিগের নিকট ঋণী। জ্যামিতি, জ্যোতিষ, [illegible] নৌ-নির্ম্মাণ ও নৌ-চালন বিষয়ে সারাসিনগণই ইউরোপীয়দিগকে শিখাইয়াছিলেন। সারাসিনগণই নারীকে গৃহস্থলীতে গৌরব আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর নারী ইউরোপে উপেক্ষিত ছিল। কর্ডোভার আমীরগণের দৃষ্টান্তে ইউরোপ নারীর সমাদর করিতে শিখিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্মের অধঃপাতের সূচনা হইলে, নারী মুসলেম-সমাজে ভোগ্যা-রূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক গিবন তাঁহার "রোমের উত্থান ও পতন" শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ভিনিস ও জেনোয়ার বণিক-প্রধান শাসন-তন্ত্রের নিষ্পেষণে অধীর হইয়া হিস্পানীয়গণ মুরদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। মুরদিগের শাসনে স্পেন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল। আরবীয়গণ বীজগণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যা ভারতবাসী হিন্দুদিগের নিকট শিখিয়া ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। কেবল প্রচার নহে, তাঁহারা ইহাদের উৎকর্ষসাধনও করিয়াছিলেন। এই সারাসিনদিগের প্রভাব দক্ষিণ ইউরোপে যখন মলিন হইয়া পড়িল, তখনই ইউরোপে অন্ধ-যুগের সূচনা হয়। আদিম খৃষ্টানদিগের পরুষ পুরুষকারের প্রভাবে সারাসিনদিগের কলাবিদ্যা, সারাসিন-সভ্যতার মাধুরী, নারীর প্রতি সম্মানবুদ্ধি প্রভৃতি সভ্যতা-সূচক ব্যাপারগুলি কিছু কালের জন্য সংমূঢ় হইয়াছিল। সারাসিনগণই ইউরোপকে বারুদ প্রস্তুত করিতে, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ও কাগজ নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সারাসিনদিগের নির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা ও উপবন ও কুসুমস্তবক-রচনাকৌশল এখনও ইউরোপে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

শুনিলে সম্ভবতঃ অনেকে হাস্যসংবরণ করিতে পারিবেন না—পুরাকালে ইউরোপীয়গণ ফুলের মালা গাঁথিতে, ফুলের তোড়া বাঁধিতে জানিতেন না! কর্ডোভার এক আমীর বিনা সুতায় ফুলের মালা গাঁথিয়া পোপ সিলভেষ্টারকে উপহার দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ইসলাম-প্রভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। কেন না, যে সময় ভারতে মুসলমানের আক্রমণ আরব্ধ হয়, সে সময় ভারতের সভ্যতা জগতের আদর্শস্থানীয় ছিল। মুসলমান দেশবিজয় করিলেও, হিন্দুজাতির নিকট বহু বিদ্যা ও সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সারাসিন

মুসলমানগণ ভারতে অর্জিত এই সকল বিদ্যা পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। লেখক সেন্টেস্বা বলেন,—খলিফা ওমরের আদেশে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয় নাই। উহা ইতিহাসের বা ঐতিহাসিকের 'রচা কথা'। মুসলমানদিগের নিকট হইতেই ইউরোপ পরজাতীয়দিগকে আপনার সমাজ-দেহের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান যেমন জগতের সকল জাতিকে ইসলাম ধর্ম্মের প্রভাবে একাত্ম করিয়া তুলিতে পারে, খৃষ্টান ইউরোপ ততটা না পারিলেও, ইউরোপের নানা জাতির সমবায়ে এক মহাজাতির সৃষ্টি করিবার সমর্থ্য সঞ্চয় করিয়াছে।

রস্কিন বলেন,—ইউরোপের মধ্য যুগের কলাবিদ্যার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সারাসিন প্রভাব উহার স্তরে স্তরে নিহিত রহিয়াছে। রস্কিন ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসলাম ধর্ম্মের সংঘর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বন্যরতা অনেকটা লুপ্ত হইয়াছে; খৃষ্টান সমাজে ভদ্রতার প্রভাব বাড়িয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বসুর 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' এখনও সমাপ্ত হয় নাই। লেখক যুক্তিবিন্যাস করিয়া ভারতচন্দ্রকে গালি দিয়াছেন, কবিকঙ্কণের প্রশংসা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে মতামতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। প্রাচীন কবির ও কাব্যের আলোচনায় যে সহিষ্ণুতা ও দেশ-কাল-পাত্র বিচার আবশ্যক, নবীন লেখক নবযুগের নব তন্ত্রের প্রভাবে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র অশ্লীল হইতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বভাব-কবি। কবিকঙ্কণ কবি, অধিকন্তু তিনি বিধাতার মত সৃষ্টিকুশলী। তবে আধুনিক রুচির অণুবীক্ষণ প্রয়োগ করিলে কবিকঙ্কণের কাব্যেও নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'বরেন্দ্র-ভ্রমণে'র সর্ব্বত্র নিপুণ লেখনীর কাজ দেদীপ্যমান। ইহাতে আহার ও ঔষধ, দুই-ই আছে। কাব্যের আনন্দ, আর ঐতিহাসিক শিক্ষার ঔষধ। শ্রীযুত ইন্দুমাধব মল্লিক 'খাদ্য ও আহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিয়মে বিশেষ নূতন কিছু দেখিলাম না। মল্লিক মহাশয়ের মতে, 'গরম আহার

ও সুভার সুগন্ধ আহার সুহজমের জন্য বড়ই ভাল।' আমরা নমুনা-স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। 'আহার'=আহার্য্য।—ইতি ভরত মল্লিক। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী 'সূর্য্যমুখী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে এমন কোনও নূতন কথা দেখিলাম না, যাহা গিরিজা বাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্রে' ও মাসিকের চর্ব্বিতচর্ব্বণে দেখি নাই। কোনও বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নূতন লেখকগণ তাহা পড়িয়া লইলে ভাষা ও সাহিত্য পুনরুক্তির অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' তথ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মথুরায়' একটি ক্ষুদ্র গল্প;—বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের গুরুতর 'ষড়দর্শনে' ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শন' সমাপ্ত হইয়াছে।

দেবালয়। চৈত্র। প্রথমেই শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রী' নামক একটি 'চতুর্দ্দশপদী' পয়ার। শেষ দুই ছত্র এই,—

'যখন যেমন সুরে বেজেছে যে তার
সে সুর তোমারি প্রভু, তোমারি ঝঙ্কার!'

রচনায় প্রসাদগুণ আছে, কিন্তু ভাবটি অত্যন্ত পুরাতন। দ্বিতীয় চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। 'হৃদয়-বীণা' বাঙ্গলায় বহুদিন ধরিয়া বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোমারই বীণা হৃদয়-কুঞ্জে বাজে গো যেন বাজে গো!' এই প্রার্থনা সফল করিয়া মানসী বাঙ্গলা দেশকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। এখন সকল কবিই বীণ্-কার! এই 'দেবালয়ে'র ক্ষুদ্র চত্বরেই দুই জন—খুড়া সুধীন্দ্রনাথ ও ভাইপো দীনেন্দ্রনাথ—বীণা ধরিয়াছেন। দীনেন্দ্রনাথের 'সুরের মিলে' বীণার সঙ্গে আবার 'বিশ্ব-হৃদয়স্পন্দনে'র তালে তালে 'অম্বরে মৃদঙ্গ বাজিতেছে'। দীনেন্দ্রের বীণা 'নীরব পরশে' বাজিয়া উঠে। 'পরশ' তাহা হইলে দ্বিবিধ,—নীরব ও সরব। হাঁড়ির একটা ভাতই টিপিয়া দেখিলাম। সে যাহা হউক, বাঙ্গলার কবি সম্প্রদায় যদি গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া হৃদয়-বীণা বাজাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সমস্ত গোরা-বাজনার ধ্বনি ঢাকিয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আর, বাঙ্গলার হৃদয়-বীণার তার কি কঠিন! এত টানাটানি, তবু সে পাকা তার এখনও ছিঁড়িল না! শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'বরোদা' চলনসই ভ্রমণকাহিনী। শ্রীযুত ফকির

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'চক্রধরপুরে' কেলনারের দরজা বন্ধ হইতে প্লাটফরমের জরীপ পর্য্যন্ত নানা তত্ত্ব বিদ্যমান। ভবিষ্যতে ইনি জলধরকেও জব্দ করিতে পারিবেন, সূচনা দেখিয়া তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

সাহিত্য-সংহিতা। ফাল্গুন। 'সাধু-চরিত' ও শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের 'ধনুর্ব্বেদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'ভৌগোলিক রেণেল' সুলিখিত জীবনচরিত। 'জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'শিপ্রাতটে মহাকালপুরী অবন্তী দর্শনে' নামক ছন্দে গ্রথিত শব্দ-শম্বুকের খট্‌খটায়মান মালা কবিতা নহে। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজের 'শিশির-বিদায়ে' ও শ্রীযুত জগৎপ্রসন্ন রায়ের 'চন্দ্র ও জোনাকী' নামক পয়ারেও বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই। 'সাহিত্য-সভা'র পত্রে কবিতার এমনতর লাঞ্ছনা শোভা পায় না।

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গণেশ-জননী'র চিত্রখানি দেখিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি। ঘাঘরা-পরা গণেশ-জননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর লাল টুক্‌টুকে গণেশ শুঁড়ে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া 'পালা' ভক্ষণ করিবার চেষ্টায় মসগুল। 'অস্থানে পততাং সদৈব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্ গতিঃ'—অতএব দেবতা গণেশের জন্য আমাদের দুঃখ নাই। কিন্তু যে সকল চিত্রকর গণেশ তুলিকা-শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকী কল্পনাগুলিকে পদদলিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি বলিব? এমনতর উদ্ভট, অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক পটকে 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে যদি 'চার পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ' উঠে, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ নাচার। 'প্রবাসী'র প্রথম প্রবন্ধ—মহেশচন্দ্র ঘোষের রচিত 'আত্মা ও অনাত্মা' পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'অকালবার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ-জীবনলাভের উপায়ে' অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষের 'আবাহনে' বিশেষত্ব নাই। 'আবাহনে'ও 'বীণা' আছে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'হোরী খেলা'য় টানিয়া কবিতা বুনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চায়া ওয়া' সূচীপত্রের মতে গল্প, কিন্তু ইহাতে গল্পত্ব অত্যন্ত অল্প। 'চারু' আবার শ্রী ও চন্দ্রে ভূষিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'বৈদিক অগ্নিমন্থন ও যজ্ঞীয় পাত্র' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ীর 'নীহারিকা'র দ্বিতীয় স্তবক আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আরম্ভ ও শেষ মন্দ নহে। 'নীহারিকা' ক্ষুদ্র নীহার নহে। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাসের 'শিমলা' ও শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'অযোধ্যাবাসী বাঙ্গালী' উল্লেখযোগ্য। 'বাক্‌প্রয়াসী'র কবি শ্রীযুত জ্যোরেন্দ্রনাথ মিত্র বোধ হয় জানেন না, দুনিয়ার সকলেই 'বাক্‌প্রয়াসী' নহে। তাহা হইলে 'বাক্‌প্রয়াসী' কবিদের সুবিধা হইত বটে, কিন্তু দুষ্ট বিধাতা বিশ্বে সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। 'প্রবাসী'র অধিকাংশ প্রবন্ধই অনূদিত বা সঙ্কলিত।—শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি নবপ্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে 'ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ' আহরণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 'নদীর প্রতি অরণ্য' কবিতায় বাগচী কবির কবিত্বের পরিচয় নাই। 'প্রাপ্ত পুস্তকের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয়ে' সমালোচক লিখিয়াছেন,—'হিন্দুদের ছাগ মহিষ মারিলে কোনও আপত্তি নাই, যত আপত্তি গোবধে; কিন্তু গোরুর কোরবানি বন্ধ করিতে গিয়া কত মানুষ যে কোরবানি হইয়া গেল!' আমরা স্বীকার করিতেছি, হিন্দুর মনের ভাব এইরূপ জটিল বটে। হিন্দু কুসংস্কারের দাস। আমরা কুসংস্কারের অনুরোধে কোরবাণী করিতে অক্ষম। অগত্যা এই লেখককে ক্ষমা করিলাম। হিন্দুর দেশে, হিন্দু-পুষ্ট পত্রে এইরূপ মন্তব্য একটু অদ্ভুত, একটু উদ্ভট, একটু মায়াত্মক নয় কি? ধর্ম্মসংস্কার সু হউক, কু হউক, তাহাতে কাহারও ইঙ্গিতেও আঘাত করিবার অধিকার নাই, লেখক সভ্য সমাজের এই সহজ ও প্রাথমিক শীলতার সূত্রটি বিস্মৃত না হইলে, এমন মন্তব্য দিনের আলোয় বাহির করিয়া অসংখ্য হিন্দুর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইতেন না।

নব্য-ভারত। চৈত্র। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কবে মানুষ মরে গেছে' নামক কবিতায় কবির সেই চিরনূতন মধুর সুর শুনিতে পাইলাম না। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'অর্থশাস্ত্র' চলিতেছে। চন্দ্রগুপ্ত-যুগের ভারতের সুন্দর ছবি। সম্পাদকের রচিত 'সাধক-চূড়ামণি ইন্দ্রনাথ' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

দেশের কথা।

সকল দেশেই স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের পুরাতন নিদর্শন ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া সুপরিচিত। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর ইতিহাসের উপাদানের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংসস্তূপে সমাধি-নিহিত। তন্মধ্যে কত যুগের কত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কেহ তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত অতি অল্প স্থানেই যথাযোগ্য খনন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং যাহা ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান নাই, তাহা যে কখনও ছিল না, এরূপ তর্ক আমাদের ন্যায় পুরাতন সভ্যদেশের পক্ষে সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ অসমীচীন সিদ্ধান্তের উপর অত্যধিক আস্থা-স্থাপন করিয়াই বলিয়া থাকেন,—বঙ্গভূমির নদীমাতৃক সমতলক্ষেত্রের অধিবাসিগণ কোনরূপে পর্ণকুটীর বাঁধিয়াই বাস করিত, তাহাদের দেশে স্থাপত্যবিদ্যা বিকশিত হইবার অবসর লাভ করে নাই বলিয়াই অতি পুরাতন অট্টালিকাদির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালা দেশের যে সকল স্থান সত্য সত্যই অতি পুরাতন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে, সেই সকল স্থানেই অতি পুরাতন স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কালপ্রভাবে সেরূপ স্থান এখন সভ্যতার আধুনিক কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত; কোনও কোনও স্থান অরণ্যভূমিতে পর্য্যবসিত। তাহার মধ্যে পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনের অনুসন্ধান করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে পারিলে, এখনও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

বঙ্গভূমির সমতলক্ষেত্রে সহজে প্রস্তর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই বলিয়া এ দেশের অধিবাসিগণ যে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার রচনায় অনভিজ্ঞ ছিল, এ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশে পর্ব্বতমালার অভাব নাই। সেই সকল পর্ব্বতমালা হইতে নানা নদনদী প্রসূত হইয়া বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে। নদপ্রবাহের

অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতমালা হইতে শিলা সংগ্রহ করা এ দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে, আয়াসসাধ্য হইলেও, অসম্ভব ছিল না। সত্য সত্যই যে এই রূপে অনেক প্রাসাদশিলা সংগৃহীত হইত, তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কোন্ পুরাতন যুগে বঙ্গভূমিতে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা-রচনার আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল, এখন আর তাহার পরিচয়লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস লাভ করিতে হইলে, কোন্ পুরাতন যুগে এ দেশে সভ্যতা-বিস্তারের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে কেবল অর্থবল থাকিলেই প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা গঠিত হইতে পারে। সে কালের অবস্থা এরূপ ছিল না। যে সকল পর্ব্বত হইতে শিলা সংগ্রহ করিতে হইত, যে নদীপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া তাহা স্বদেশে আনয়ন করিতে হইত, তাহার উপর অপ্রতিহত আধিপত্য রক্ষা করিতে না পারিলে, সমতলক্ষেত্রনিবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে শিলাসঞ্চয় করিবার সম্ভাবনা ঘটিত না। সুতরাং বঙ্গভূমিতে শিলানির্ম্মিত পুরাতন প্রাসাদাবলীর যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল বাঙ্গালীর শিল্পকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াই নিরস্ত হয় না, বাঙ্গালীর অপ্রতিহত বাহুবলের ও শাসন-কৌশলেরও পরিচয় প্রদান করে। যে যুগে এই বাহুবল ও শাসন-কৌশল যে পরিমাণে প্রবল ছিল, সেই যুগে সেই পরিমাণে বঙ্গদেশে শিলানির্ম্মিত প্রাসাদাবলী গঠিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং কোন্ কোন্ যুগে এরূপ রচনারীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে বিবিধ শাসন-যুগের ইতিহাসেরও যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যে সকল প্রাসাদশিলা এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্বকীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাহাদের প্রকৃতি-বিচার আরব্ধ হয় নাই। সকল শিলা এক প্রকৃতির নহে,—কোনও শিলা রক্তাভ, কোনও শিলা ধূসর, কোনও শিলা সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণাত্মক। সকল শিলার উদ্ভবক্ষেত্রও এক স্থানে অবস্থিত ছিল না;—কোনও শিলা হিমালয় হইতে, কোনও শিলা বিন্ধ্যাচল হইতে সংগৃহীত। সকল শ্রেণীর শিলা একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না;—কোনও স্থলে এক শ্রেণীর, কোনও স্থলে বা অন্য শ্রেণীর শিলার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল কারণে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক শ্রেণীর শিলার যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে, বিচার কার্য্য আরব্ধ হইতে পারে না। এই আয়াসসাধ্য বিচার কার্য্যে লিপ্ত হইবার উপযোগী সহিষ্ণুতা না থাকিলে, পদে পদে অপসিদ্ধান্ত দ্বারা পরিশ্রান্ত হইবার আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে না।

বাঙ্গালার এই সকল প্রাসাদশিলার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে যে সকল সাহিত্যিক ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় সর্ব্বথা প্রশংসার্হ হইলেও, তাঁহাদিগের সম্মুখে বাধা বিপত্তির অভাব নাই। বাঙ্গালায় যাহা কিছু নিদর্শন দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সমস্তই পরানুকরণলব্ধ,—এইরূপ এক প্রচলিত সংস্কার তথ্যানুসন্ধানের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এতদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে এখনও ততটুকু আয়োজনেরও সূত্রপাত হয় নাই। ইহাতে লোকে অন্যান্য প্রদেশে যাহা দেখিয়াছে, তাহাকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, এবং বঙ্গদেশে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছে, তাহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত আদর্শের অনুকরণমাত্র মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এইরূপে মগধের ও উৎকলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এক অনির্ব্বচনীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অবলীলাক্রমে তাহারই অনুকরণলব্ধ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরবের নিদর্শন প্রচ্ছন্নভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; সমুচিত সমালোচনার অভাবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা এখনও নির্ণীত হইতে পারে নাই।

যে চতুঃসীমার মধ্যে বাঙ্গালাদেশ অবস্থিত আছে, তাহাই চিরকাল বাঙ্গালীর লীলাক্ষেত্র রূপে সীমানিবদ্ধ থাকা সভ্য হইলে, বাঙ্গালার অবস্থা স্বতন্ত্র হইত। বাঙ্গালীর বাহুবল ও শাসন-কৌশল চিরকাল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার মধ্যে সীমানিবদ্ধ ছিল না;—সময়ে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর রচনা-প্রতিভার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, বাঙ্গালা দেশের সুপরিচিত চতুঃসীমার বাহিরেও তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

একটি মন্দির বা অট্টালিকা কেবল উপাদান-বস্তুর উচ্চস্তূপমাত্র নহে,—তাহা দেশ-কাল-পাত্রোচিত ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই কথিত হইতে পারে। তাহার সন্ধান লাভ করিতে না পারিলে, রচনা-কৌশলের প্রকৃত মর্য্যাদা নির্ণয় করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে শিলানির্ম্মিত প্রাসাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ইষ্টকালয়ের অংশবিশেষ শিলা দ্বারা সুদৃঢ় করিবারও একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যে দেশে শিলা নাই, সে দেশে এইরূপে শিলার ব্যবহার কি কারণে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহা অবশ্যই সমধিক কৌতূহলের বিষয়।

এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রকৃত মর্য্যাদার সন্ধান লাভ করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী পুরাকালে একটি সম্মানিত মহাশক্তিরূপেই ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। সকল বিষয়েই সেই মহাশক্তি নানা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে,—এবং অল্প বিষয়েই অন্ধভাবে পরানুকরণ লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে সম্মত হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য যেমন জগদ্বিখ্যাত, পুরাকালেও সেইরূপ ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই, এমন অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী সগৌরবে অগ্রসর হইয়া পুরাকালে অতুল কীর্ত্তিতে জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ের এখনও প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা এখনও আলোচিত হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এখনও ইতিহাসের আলোচনা প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও অনেকে তাহাকে অকারণ সময়-ক্ষয়ের ব্যসনমাত্র বলিয়াই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শিশুর জন্ম।

১

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া নরেন্দ্রের মনে সুখ ধরিত না। মনোরমা সুন্দরী ও বিদুষী। মনোরমার কোঁকড়া কালো চুলগুলি যখন চঞ্চল সমীরণে দুলিত, তখন নরেন্দ্র অতৃপ্তনয়নে দেখিতেন। মনোরমা যখন কবিতা আবৃত্তি করিত, তখন নরেন্দ্র মুগ্ধ হইত।

বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পরে নরেন্দ্রের মনে কেমন একটা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে। পুত্র কন্যার অভাবে গৃহ যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে নরেন্দ্র বহির্বাটীতে শয়ন করিয়া আছেন। অঙ্গনের ঝাউগাছের পাতার ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বহিয়া যাইতেছে। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারি দিক প্রখর রৌদ্রের তাপে নিস্তব্ধ; জলে স্থলে কোনও সাড়া শব্দ নাই। নরেন্দ্রের মনে হইল, তিনি পৃথিবীতে অত্যন্ত একাকী। তিনি ছুটিয়া মনোরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা নিদ্রায় কাতর, কপালের উপর দুই এক বিন্দু বর্ম্মে দুই একটি স্থানচ্যুত অলক জড়াইয়া গিয়াছে, পবনান্দোলিত কচি কিশলয়ের ন্যায় ঠোঁট দুখানি একটু একটু কাঁপিতেছে। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু তৃপ্তি হইল না; দুইখানি কচি হাতের বেষ্টনের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি হতাশ হইয়া বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রতিবাসীর গৃহে বালক-বালিকার অস্ফুট কোলাহল শুনিয়া নরেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় সূর্য্যের ম্লান শেষরশ্মি সরোবরের সোপানে আসিয়া পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের দৃষ্টি সেই আলোর উপর, কিন্তু মন অন্যত্র। মনে সুখ নাই। পাড়ার ভিতর হইতে ছেলে মেয়ের কোলাহলধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে; নরেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অস্পষ্ট শব্দ শুনিতেছেন। হঠাৎ কানের কাছে অতি কোমলকণ্ঠে কে বলিল, "বাবু!" তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীর দুই বৎসরের পুত্র টলিতে টলিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রের হাতে একটি গোলাপফুল দিল। নরেন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। শিশুর ভাষায় কিয়ৎক্ষণ বকিয়া তাহার চক্ষু দুইটি ঈষৎ লাল হইয়া আসিল; তাহার পর মাতালের মতন ঢুলিতে ঢুলিতে নরেন্দ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ঘুমন্ত ছেলেটিকে তাহাদের বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিয়া আসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর নিজের কক্ষে বসিয়া মুমূর্ষু ছেলের মুখখানি নরেন্দ্র বার বার ভাবিতেছিলেন। তিনি একটি ছোট আলমারী খুলিয়া দেরাজের ভিতর হইতে একটি পুঁটলি বাহির করিলেন। পুঁটলির ভিতর একগাছি সোনার পেটা বালা, একটা ছোট ছিটের জামা ও একটা কাঠের পুঁতুল। এই সমস্ত তাঁহার ভাগিনেয় নন্দলালের। সে বহুদিন পূর্ব্বে তিন বৎসর বয়সে এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র তখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করেন। ভগিনী সুকুমারী পুত্রকে লইয়া তাঁহার কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ বাসায় অবস্থান করিত। শিশু নরেন্দ্রের বড় আদরের ছিল। নন্দলাল তাঁহার সহিত আহার না করিলে তাঁহার যেন ভোজনে তৃপ্তি হইত না। নন্দলালের মৃত্যুর দিন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনিতে না পারিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ মৃত শিশুকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল। শিশুর মস্তক ব্রাহ্মণের স্কন্ধে ন্যস্ত। হরিবোলের শব্দে নরেন্দ্র খড়খড়ি খুলিয়া একবার দেখিলেন। বাড়ীর নিকটে পথে একটা গ্যাসের আলো। ব্রাহ্মণ আলোর নিকটে আসিলে নরেন্দ্র দেখিলেন, শিশুর একখানি সুন্দর নধর অনাবৃত হস্ত শিথিলভাবে দুলিতেছে, হাতের সোনার বালার উপর আলোকরশ্মি পড়িয়াছে। নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া যাইয়া ব্রাহ্মণকে দাঁড়াইতে বলিলেন। সুগোল দক্ষিণ হস্তের উপর বালা আঁটিয়া বসিয়াছিল। সেই জন্য এই বালাগাছটি খুলিয়া লওয়া হয় নাই। অপর হস্তের বালা শিশুর মাতার নিকট। নরেন্দ্র বালা খুলিয়া লইলেন। বালা খুলিবার সময় নরেন্দ্রের নয়নাসারে শিশুর হাত ভিজিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিল, "দিদি ঠাকুরাণী আমাকে এই বালা দান করিয়াছেন।" নরেন্দ্র বলিলেন, "খোকার আর এ বন্ধন কেন? তোমাকে বালার মূল্য দিব; ক্ষুব্ধ হইও না।" সেই পর্য্যন্ত বালাটি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রের কাশীপুরের বাসভবন দ্বিতল। গঙ্গার জল বাড়ীর গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে। নন্দলালের মৃত্যুর পর দিবস নরেন্দ্র নিম্নতলে বারান্দায় বসিয়া আছেন। উপর হইতে কতকগুলি জিনিস কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। অধিকাংশ দ্রব্যই ডুবিয়া গেল। কেবল একটি জামা ও একটা কাঠের পুঁতুল ভাসিতে ভাসিতে বাটীর সংলগ্ন ঘাটে আসিয়া লাগিল। নরেন্দ্র দেখিলেন, জামা

ও খেলানা নন্দলালের। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া জামা ও পুঁতুল জল হইতে উদ্ধার করিয়া বাগার সহিত রাখিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর নন্দলালের জামার পকেট হইতে একটু দড়ি, ভাঙ্গা চার পেয়ালার একটা টুক্‌রা, একটা লোহার পেরেক বাহির করিয়া নরেন্দ্র সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিলেন। নন্দলালের শুভ্র অনিমিত্ত হাসি তাঁহার মনে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি আলমারী বন্ধ করিলেন। নরেন্দ্রের নিকট মৃত শিশুর দ্রব্যগুলি দেবতার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র। দেবতা বিসর্জ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূতস্মৃতি নির্ম্মাল্যে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মনোরমার রূপ আর নরেন্দ্রকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। নরেন্দ্র প্রায়ই শীকার লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অন্দরে আসেন না। পূর্ব্বে মনোরমার ডাকিতে হইত না, যখন তখন মনোরমার সহিত গল্প করিতে নরেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে আসিতেন। এখন ডাকিলেও মনোরমা শীঘ্র নরেন্দ্রের দর্শন পান না। মনোরমা বাছিয়া বাছিয়া কবিতা পড়েন, নরেন্দ্র কিন্তু অন্যমনস্ক। মনোরমা নিত্য নূতন বেশ পরিধান করেন, কিন্তু নরেন্দ্র প্রজাপতি তাহাতে মুগ্ধ হন না। প্রতি দিন শত চেষ্টা সত্ত্বেও মনোরমা নরেন্দ্রের মন পান না।

মনোরমা ভাবিলেন, কি হইল! তিনি দেবতাকে ডাকেন; ঠাকুরের কাছে পূজা মানেন; গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করেন; কিন্তু নরেন্দ্রের বিষাদ কিছুতেই অপসৃত হয় না। পাড়ায় এক জন সন্ন্যাসী আসিলেন। মনোরমা তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া নরেন্দ্রের জন্মকোষ্ঠী দেখাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর গ্রহ অনুকূল নহে, শান্তি স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন। তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা কর।"

মনোরমা খুব সমারোহের সহিত শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রের গৃহে গ্রামের ব্রাহ্মণদের ভোজন আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র শীকার উপলক্ষে কয়েক জন বন্ধুর সহিত বিদেশে ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্ত্যয়নের ধুম দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। মনোরমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য—তোমার মনে যাহাতে শান্তি হয়, সেই জন্য আমি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি না, কি দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতেছ।" নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। বহু দিবসের

রুদ্ধ আবেগ বন্যার ন্যায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে অনেক দিন হইতে একটা কথা বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। মনোরমা, দোষ কাহারও নহে, দোষ অদৃষ্টের! জানি না, কাহার অভিশাপে আমার গৃহ শূন্য। পুত্র কন্যার অভাবে, এক এক সময়ে নিজেকে বড় একলা মনে হয়। সম্পত্তি-রক্ষার জন্য আমি একটুও চিন্তিত নহি, তাহা হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

নরেন্দ্রের মানসিক অশান্তির কারণ শুনিয়া মনোরমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; তাঁহার অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। হায়! তাঁহার হৃদয়-ভরা ভালবাসা কি স্বামীর পক্ষে যথেষ্ট নহে! তাঁহার স্তূপীকৃত ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় এক দিনেই ভাসিয়া গেল! এই কথা ভাবিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। বহু কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিয়া মনোরমা বলিলেন, "আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তুমি পুনরায় বিবাহ কর।"

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া রাগ করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। মনোরমা মাটীতে পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। বারিবর্ষণে শরতের মেঘের মতন নয়ন জলে তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইল।

মনোরমা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেই বিবাহের কথা পাড়েন; নানা প্রকারে নরেন্দ্রকে সম্মত করিবার চেষ্টা করেন; পাড়ার লোককে দিয়া অনুরোধ করেন; কিন্তু নরেন্দ্র সে কথা বড় গ্রাহ্য করেন না।

মনোরমার এক মামার মেয়ের বিবাহ হইতেছিল না। মেয়েটি খুব সুন্দরী ও বয়স্থা। কিন্তু মনোরমার মামা বড় গরীব; সেই জন্য মেয়েটির এ পর্য্যন্ত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই। মনোরমা খবর দিয়া মামাত ভগ্নীকে বাড়ীতে আনিলেন।

নরেন্দ্র মনোরমার ভগিনী ষোড়শীকে হঠাৎ বাড়ীতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। নরেন্দ্র মনোরমাকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষোড়শীও কি আমার মন ভালো করিতে আসিয়াছে?" মনোরমা স্বামীর কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন। মনোরমা ষোড়শীকে পান জল দিবার জন্য নরেন্দ্রের নিকট যখন তখন পাঠাইতেন। নরেন্দ্র ষোড়শীর সহিত দুই একটি কথা কহিতেন,

কখনও বা কৌতুক করিতেন। ষোড়শীর সরলতায় নরেন্দ্র মুগ্ধ হইতেন। মনোরমার অনেক কার্য্যের ভার ষোড়শীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ভগিনীর শিক্ষায় ষোড়শী পাকা গৃহিণী হইতেছিলেন।

মনোরমার লক্ষ্য নরেন্দ্রের উপর। নরেন্দ্র যেন একটু একটু করিয়া ষোড়শীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। ষোড়শীর রূপের ফাঁদে নরেন্দ্রের মন অজ্ঞাতে ধরা পড়িতেছিল। নরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু মনোরমার এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল। এক দিন নরেন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত একটু প্রফুল্ল দেখিয়া মনোরমা বলিলেন, "তোমার ষোড়শীকে বিবাহ করিতে হইবে। সতীন বলিয়া ষোড়শীর উপর আমার মোটেই রাগ হইবে না।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহদেবতা রাধামাধব জীউর আরতি হইতেছিল। নরেন্দ্র বরাবর সেখানে উপস্থিত হইলেন। মনোরমাও পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেবগৃহে ধূপ, দীপ, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ। দীপালোকে দেবতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আরতি-সমাপনান্তে পুরোহিত চলিয়া যাইলে নরেন্দ্র পুরোহিতের আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি দেবতার উপর সংবদ্ধ—যেন কি ভাবিতেছিলেন।

মনোরমা তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি দেবতার সম্মুখে বলিতেছি, আমার আন্তরিক কামনা, তুমি ষোড়শীকে বিবাহ কর।"

নরেন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মনোরমা পুনরায় বলিলেন, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না? আমি দেবতার সিংহাসন স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি।"

মনোরমা সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমায় শপথ করিতে হইবে না; তোমার কথায় কি আমি কখনও অবিশ্বাস করিয়াছি? ভাবিয়া দেখ, তোমার সুখের পথে তুমি নিজেই কণ্টক রোপণ করিতেছ।"

মনোরমা বলিলেন, "আমার সুখ তোমার সুখ কি ভিন্ন? তোমার মনে যদি অহরহ এই অসুখের বহ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহাতে কি আমার মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি হইবে? তুমি এই বিবাহে অমত করিও না। তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

নরেন্দ্র সেই দেবগৃহে বসিয়া অনেক ভাবিলেন। ভাবিলেন, যখন

মনোরমার বিবাহে আপত্তি নাই, তখন বিবাহে কি বাধা আছে? কিন্তু নিজের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশের মৃদু বাণী নরেন্দ্র শুনিতে পান নাই। একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না যে, ষোড়শীর রূপলালসা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল।

নরেন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হউক।"

মনোরমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। মনোরমা তাঁহার মামাকে পত্র লিখিয়া বিবাহের সমস্ত স্থির করিলেন। তাঁহার মামার বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া স্থির হইল। মনোরমার মামা প্রথমে এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমার আগ্রহাতিশয়ে ও নিজের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের সহিত ষোড়শীর বিবাহে সম্মত হইলেন।

বিবাহের দিন নরেন্দ্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সম্প্রদানের সময় তাঁহার চোখে জল আসিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই রকম দিনে আর এক-খানি কঙ্কণভূষিত পাণির স্পর্শের কথা মনে পড়িল, সেই সঙ্গে দলিত-কমলপত্রের ন্যায় নেত্রযুগল স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। সে দিন তিনি একটি নবীন জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; পুনরায় আর একটি জীবনের ভার গ্রহণ করিবার তিনি যোগ্য কি না, এই কথা বারবার তাঁহার মনে হইতেছিল। সন্ধ্যার পর মনোরমা নরেন্দ্রকে বিবাহ-যাত্রায় বিদায় দিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বেও মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এখনও ফিরিবার পথ আছে, তুমি যদি বল, এখনই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দি।" মনোরমা তখন বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমাকে তুমি এত দুর্ব্বল ভাবিও না।" কিন্তু এখন মনোরমার মনে হইল, হায়, কেন তিনি স্বামীকে বারণ করিলেন না! যতদিন নরেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই, ততদিন মনোরমা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মানসিক বল অতি অল্প। তিনি আকুল হইয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিলেন, ভগবানের দয়ার উপরও যেন সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন সাহস করিয়া মনোরমাকে কেহ ডাকিল না।

২

বরবধূকে বরণ করিবার সময় মনোরমার মুখে হাসি। বিবাহের পর

মনোরমাকে কেহ বিষণ্ণ দেখে নাই। কিন্তু মনোরমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। নরেন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নরেন্দ্র ভাবিতেন, যখন মনোরমার অনুরোধেই তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তখন মনোরমার মনে কোনও অসুখ হইবার কারণ নাই। সেই বিশ্বাসে তিনি আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছিলেন।

বিবাহের পর ছয় মাস গত হইয়াছে। মনোরমা দিনে রাতে ভগবানকে ডাকিতেন। রাধামাধব জীউর কাছে প্রার্থনা করিতেন, "প্রভু, আমাকে উদ্ধার কর, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" বাড়ীতে প্রাণের ব্যথা জানাইবার লোক নাই। যাহার কাছে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া ছুটিয়া যাইতেন, সেই স্বামী অদ্য বহু দূরে। নগরে সহস্র লোক থাকিলেও নব আগন্তুক যেমন একাকী, বাড়ীতে অনেক পরিজনের মধ্যেও মনোরমার অবস্থা ও তদ্রূপ। স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে যাইতেছেন, এই ভাবনা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতেছিল।

মনোরমার এক এক দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ করিতেন। ভাবিতেন, শারীরিক পরিশ্রমে হয় ত মানসিক যন্ত্রণার লাঘব হইবে। পূর্ব্বে মনোরমা সংসারের কাজ কর্ম্ম বড় দেখিতেন না। পরিজনবর্গ ও দাস দাসীর উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল। এক্ষণে রন্ধনের ভার মনোরমা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ বলিল, "মাঠাকুরাণী! আমাকে কি পেন্‌সন্ দিয়াছেন?" মনোরমা হাসিয়া বলিতেন, "রান্না ভুলিয়া গিয়াছি। পুনরায় নূতন করিয়া তোমার কাছে শিখিব।" কোনও কোনও দিন মনোরমা হাসিতে হাসিতে ষোড়শীকে বলিতেন, "স্বামী তোমার ভাগে; গৃহস্থালী আমার ভাগে; তোমার কল্যাণে বোন, আমি যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।" মনোরমার সম্বন্ধে নরেন্দ্রের সে ঔদাসীন্য নাই। মনোরমার কিসে তৃপ্তি হইবে, তাহাই নরেন্দ্রের এখন প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু স্বামীর আদর মনোরমাকে এখন পূর্ব্বের ন্যায় মুগ্ধ করে না। নরেন্দ্র এখন কোনও নূতন অলঙ্কার বা কাপড় আনিয়া দিলে মনোরমা বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখেন; নরেন্দ্র নিতান্ত জিদ না করিলে আর পরিধান করেন না। মনোরমার বাঙ্গালা পুস্তকগুলির উপর ধূলা জমিয়া যাইতেছিল। তিনি খাঁচা হইতে পাখীগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সংসারের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, কে তাহাদের যত্ন করে? বাটীর সকলের আহারের যত্ন

তিনি আহার করিতেন। শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাঁহার মনে হইত না।

কিন্তু মনোরমার মনের আগুন কিছুতেই নিভিতেছিল না। নরেন্দ্র ও ষোড়শীকে এক স্থান দেখিলেই তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিত। ষোড়শী যে স্বামীর হৃদয় একটু একটু করিয়া অধিকার করিতেছে, এই কথা শয়নে স্বপনে তাঁহার মনে জাগিতেছিল। সহস্র চেষ্টা করিয়াও মন হইতে এই ভাবনা তিনি দূর করিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। তখন মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন। সে সময় কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে মনোরমা ভুল উত্তর দিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেন। এক দিন দেব-গৃহের উচ্চ বাতায়নের সমীপে দাঁড়াইয়া দেবতার জন্য মনোরমা বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন। গ্রন্থির অভাবে সূত্র-প্রান্ত হইতে ফুলগুলি একে একে পড়িয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মনোরমা দেখিলেন, হাতে শুধু সূতা রহিয়াছে! কক্ষ মধ্যস্থ পরিজনেরা হাসিয়া উঠিল। মনোরমা অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া গেল।

মনোরমার শয়নকক্ষের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সূর্য্যকরোদ্ভাসিত গৃহে নরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসিতেন। কক্ষটি প্রাচীন অস্ত্রে ও পুস্তকে সজ্জিত। মনোরমা এক দিন তথায় স্বামীর জন্য এক পেয়ালা চা লইয়া যাইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র অনিমিষনেত্রে একখানি ফটো দেখিতেছেন। সেখানি ষোড়শীর প্রতিকৃতি, কলিকাতা হইতে নূতন রং হইয়া আসিয়াছে। মনোরমার পদ-শব্দ নরেন্দ্রের কর্ণে পঁহুছায় নাই। ফটোখানি দেখিয়া মনোরমার বুকের মধ্যে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল; তাঁহার হাত হইতে চার পেয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। এই শব্দে নরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল; মনোরমাকে দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন; হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মনোরমা প্রাণপণে মনের ভাব চাপিয়া ছবিখানির প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে মনোরমার মানসিক যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রের গৃহ মনোরমার যেন কারাগার বলিয়া মনে হইতেছিল। ভাবনায় তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল! অবশেষে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাওয়া মনোরমা শ্রেয় মনে করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? শৈশবেই

মনোরমা পিতৃমাতৃহীনা; ঠাকুরমার নিকট লালিতপালিত হইয়াছিলেন; পিতৃগৃহে একমাত্র ভ্রাতা বর্ত্তমান। ভ্রাতৃজায়ার অধীনে থাকিতে তাঁহার মন সরিল না। পিতামহী কাশীতে বাস করেন। মনোরমা সেখানে যাওয়াই স্থির করিলেন। পিতামহীকে দেখিতে যাইবার জন্য নরেন্দ্রের অনুমতি চাহিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু মনোরমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া ও মনোরমার বিশেষ আগ্রহে মত না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মনোরমার কাশী-যাত্রার দিন ষোড়শী সত্য সত্যই খুব কাঁদিয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি না আনিলে আমি এ বাড়ীতে আসিতাম না।" মনোরমা ষোড়শীকে পুত্রবতী হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি এই সংসার ছাড়িয়া কয় দিন থাকিতে পারিব? শরীর একটু সুস্থ হইলেই ফিরিয়া আসিব।"

দুই তিন মাস চলিয়া গেল, কিন্তু মনোরমা ফিরিলেন না। নরেন্দ্রের পত্রের উত্তরে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা লেখেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হয় না। অবশেষে মনোরমা লিখিলেন,—

"প্রাণাধিক, আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিও না। আমি বেশী দিন বাড়ীতে থাকিলে পাগল হইয়া যাইতাম। আমি কিছু দিন কাশীতে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি তাহাতে বাধা দিও না। ঠাকুরমা এ জগতে বেশী দিন থাকিবেন না। তিনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ দিন কয়টা যাহাতে সুখে কাটে, তাহাও দেখা আমার কর্ত্তব্য।

তোমার সেবিকা মনোরমা।"

পত্র পাঠ করিয়া নরেন্দ্র সেই দিনই কাশীতে রওনা হইলেন। তিনি বারাণসীতে পঁহুছিয়া মনোরমাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তোমারই আগ্রহে আমি বিবাহ করিয়াছি; নতুবা আমি এ জঞ্জাল করিতাম না। তোমার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে কেন আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে? তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া চল; তুমি না থাকিলে গৃহ আমার পক্ষে অরণ্য।"

মনোরমা বলিলেন, "আমার মন যে এত দুর্ব্বল, তাহা জানিতাম না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে দিন কতক

কাশীতে থাকিতে দাও। আমাকে এখন লইয়া যাইতে চেষ্টা করিও না; সেখানে আমি পাগল হইয়া যাইব। সময়ে সব কষ্টই দূর হয়; ক্রমে আমার মানসিক যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া আসিবে, আমি তখন বাড়ী ফিরিয়া যাইব।"

মনোরমার ঠাকুরমা ও নরেন অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মনোরমার মন কিছুতেই ফিরিল না।

নরেন্দ্র অভিমানে ও দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে বাড়ী ফিরিয়া ষোড়শীর উপর তাহার একটু রাগ হইল। ভাবিলেন, হয় ত ষোড়শীকে না দেখিলে তাঁহার বিবাহে ইচ্ছা হইত না। যখন কোনও অশান্তি বা অসুখ উপস্থিত হয়, লোকে তখন নিজের দিকে না চাহিয়া পরের উপর ঝোঁক চাপাইতে ব্যস্ত হয়। নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিলেন, ষোড়শীর বা মনোরমার কোনও দোষ নাই, দোষ তাঁহার নিজের।

৩

প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কাশীর গোধূলিয়ায় একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীতে মনোরমা ঠাকুরমার নিকট বাস করেন। বাটীর সম্মুখে পথের ধারে একটি ছোট বাগান। বাগানে টগর ও করবীর গাছ। নরেন্দ্রের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মনোরমা দেশে ফেরেন নাই। নরেন্দ্রের নিকট হইতে যে টাকা পান, তাহার অধিকাংশ গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দেন। পূর্ব্বে লোকের দুঃখ দেখিলে মনোরমার মনে এমন ব্যথা লাগিত না। তখন সুকুমার শিল্প মনোরমার বড় প্রিয় ছিল। সুন্দর কবিতা, সুন্দর ছবি, মনোরম সূচীকার্য্য তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিত। কিন্তু এখন এই সকলে আর পূর্ব্বের অনুরাগ নাই।

প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরমার সঙ্গে দশাশ্বমেধের ঘাটে মনোরমা স্নান করিতে যান। গঙ্গাতীরে পূজা-সমাপনান্তে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদিন স্নানান্তে বাটীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাগানের প্রাচীরের সন্নিকটে একখানি ছেলেদের ঠেলাগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে দুই বৎসরের শিশু। শিশুর ভৃত্য একটা পদ্মকরবীর ডাল নুয়াইয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ছেলেটি হাতখানি বাড়াইয়া বার বার বলিতেছিল, "ফু!" "ফু!" শিশুর বিস্ফারিত নয়ন ও মুখশ্রী দেখিয়া মনোরমা চমকিত

হইয়া উঠিলেন। ঐ নয়ন, ঐ নাসিকা যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। পূর্ব্বদৃষ্ট সুপরিচিত একখানি মুখ যেন কে ছোট করিয়া আঁকিয়াছে! তাঁহার স্বামীর মুখের সহিত এই মুখের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। শিশুর মুখ মনোরমাকে আকুল করিয়া তুলিল। মনোরমা বলিলেন, "খোকা ফুল নে'বে? আমাদের বাগানে এস!" ভৃত্য বলিল, "মাঠাকুরাণী! খোকাকে আপনি বাড়ীর মধ্যে লইয়া যান, আমি এখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

শিশু ঝাঁপাইয়া মনোরমার কোলে গেল। মনোরমা ছুটিয়া ঠাকুরমার নিকট যাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা, কেমন সুন্দর ছেলেটি!" ঠাকুরমা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর এই রকম একটি খোকা দেখিলে আমি সুখে মরিতে পারিতাম।"

মনোরমা ছেলেটিকে ফুল, পুঁতুল ও খাবার দিলেন। সে ভারি খুসী! চাকরের সহিত বাড়ী যাইতে চাহে না। মনোরমার কক্ষের প্রত্যেক জিনিস দেখিয়া "এ ভি এ তি" (একি?) করিয়া মনোরমাকে পাগল করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশু মনোরমার সমস্ত জিনিস উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল। মনোরমার ঠাকুরমা ছাদে বসিয়া জপ করিতেছিলেন; সে তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া পথে ফেলিয়া দিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি মালা কুড়াইয়া আনিলেন। কিন্তু এই নগ্ন সন্ন্যাসীর দৌরাত্ম্য মনোরমার বড় ভাল লাগিতেছিল।

ভৃত্যের নিকট মনোরমা শিশুর পিতা মাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের নিবাস কলিকাতায়, কাশীর নারায়ণাবাদ পল্লীতে একটি বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কাশীতে তাঁহারা দুই তিন মাস থাকিবেন। তাহার মনিব সুরেশ বাবু একজন অবস্থাপন্ন লোক।

মনোরমা ভৃত্যের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "প্রত্যহ যখন খোকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে, তখন এই পথে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিও।" ভৃত্য আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিল। সে মনে মনে হাসিতেছিল; কারণ, মনোরমাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া খোকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার আদেশ সে পূর্ব্বেই প্রভুর নিকট পাইয়াছিল।

মনোরমা এখন হইতে তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসেন। এক এক দিন ঠাকুরমার পূজা ও আহ্নিক শেষ হইতে বিলম্ব হইলে মনোরমা একাকী গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার

ভয়, পাছে বাটী ফিরিয়া শিশুকে না দেখিতে পান। শিশুর অপেক্ষায় তিনি পথের দিকে চাহিয়া থাকেন! তিনি বুঝিতে পারেন না, কেন তাঁহার এই নূতন মায়া। তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার বড় তৃপ্তি হইত। মনোরমার কোলে একদিন শিশুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা! পায়ের নূতন শৃঙ্খল গড়াইতেছ?" মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! পুরাণো বেড়ী কি ভাঙ্গিতে পারিয়াছি?"

শিশু যখন মনোরমাকে "মা" বলিয়া ডাকিত, তখন মনোরমা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন। শৈশবের একটা ছড়া তাঁহার মনে হইত,—

"নতুন গাছে বেগুন হবে, পড়্‌বে ঝিঙ্গার জালি,
গোপাল আমায় মা বল্‌বে, ঘুচ্‌বে মনের কালি।"

সত্য সত্যই তাঁহার মনের কালি, হৃদয়ের বেদনা দূর হইতেছিল। শিশু হাত বাড়াইয়া খাবার চাহিত, মনোরমা শিশুর ঈষৎ-বিকশিত গন্ধকোরকের ন্যায় আরক্ত করতলে শত শত চুম্বন করিতেন।

বৃদ্ধা পিতামহী মনোরমার মুখে বড় হাসি দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু খোকার আগমন পর্য্যন্ত মনোরমা বেশ প্রফুল্ল হইয়াছেন। খোকাকে কোলে করিয়া মনোরমা সমস্ত বাড়ী ও বাগানে বালিকার ন্যায় ছুটছুটি করিতেন। মনোরমার মনের উপর অবিশ্বাসের তুষার-আবরণ নবীন প্রেমের কিরণে গলিয়া যাইতেছিল। হৃদয়-দর্পণের মলিনতা দূর হইয়া স্নেহের ও ভালবাসার ছবি পুনরায় প্রতিফলিত হইতেছিল।

এক দিন শিশুর স্কন্ধে একখানি শুভ্র রেশমী রুমাল দেখিয়া মনোরমা বিস্মিত হইলেন। রুমালের চারি কোণে চারিটি শুভ্র রেশমের গোলাপ ফুল। বহু পূর্ব্বে এই প্রকার কয়েকখানি রুমালের কোণ সূচীর দ্বারা গোলাপ ফুল তুলিয়া মনোরমা স্বামীকে উপহার দিয়াছিলেন। এক কোণে গোলাপের পাশে একটি রেশমের ক্ষুদ্র "ম" অক্ষর ছিল। এই অক্ষর দেখিয়া মনোরমার মনের মধ্যে ভারি একটা গোলমাল বাধিল। এই রুমাল খোকা কোথায় পাইল? মনোরমা ভৃত্যকে তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর সন্তোষজনক হইল না। ষোড়শীর পুত্র হওয়ার সংবাদ তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; এখন তাঁহার সন্দেহ হইতেছিল, ছেলেটি বুঝি বা নরেন্দ্রের হইবে। পুনরায় ভাবিলেন,—

"ধ" অনেক মহিলার নামের প্রথমে আছে। এই সূচীকার্য্য অন্য কোনও রমণীর হইতে পারে। কিন্তু মনোরমা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

বিকালে মনোরমা ঠাকুরমাকে বলিলেন, "খোকার মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। ঠাকুরমা! তুমি যদি অনুমতি দাও ত একবার খোকাদের বাসায় যাইয়া দেখিয়া আসি।"

ঠাকুরমা তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "মনোরমা! তুমি কোন ঘরের বউ? যার তার বাড়ীতে বিনা আহ্বানে তোমার যাওয়া ভাল দেখায় না।"

বৃদ্ধা পিতামহীর উপদেশ মনোরমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিলেও স্বামীর মান সম্ভ্রম তাঁহার হস্তে। অত্যন্ত ইচ্ছা হইলেও স্বীয় আভিজাত্য স্মরণ করিয়া তিনি যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু খোকাদের দেশে ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিলেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। মনোরমা এক এক বার ভাবিতেন, যদি খোকা নরেন্দ্রের পুত্র হইত, তাহা হইলে খোকাকে চোখের আড়াল করিতেন না। খোকাকে যতই দেখিতেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস হইত, নরেন্দ্রের সহিত খোকার নিশ্চয় কোনও সম্বন্ধ আছে। এক একদিন ঠাকুরমাকে লুকাইয়া খোকাদের নারাঙ্গাবাদের বাসাতে যাইবার কল্পনা করিতেন, কিন্তু অভিমান আসিয়া বাধা দিত।

এক দিন প্রাতে খোকা বেড়াইতে আসিল না। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, খোকার অসুখ। প্রত্যহ সংবাদ দিলে মনোরমা তাহাকে পুরস্কৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন, খোকার পীড়া ক্রমেই বাড়িতেছে, হয় ত এ যাত্রা শিশুর রক্ষা পাওয়া ভার, তখন মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; মান, সম্ভ্রম, আভিজাত্য, সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া ঠাকুরমার সহিত ভৃত্যের নির্দ্দেশমত নারাঙ্গাবাদের বাসাতে উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইবামাত্র এক যুবতী আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "দিদি! আসিলে, বাঁচিলাম; তুমি যে একদিন আসিবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি। খোকার বড় অসুখ। খোকাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য, তোমাকে দেখে লইয়া যাইবার জন্য আমরা কাশীতে

আসিয়াছি। কিন্তু খোকা বুঝি সকলকে ফাঁকি দিয়া যায়।" গলার আওয়াজ ভারি চেনা বোধ হইতেছিল। মনোরমা বহু বার যাহা মনে মনে তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাই হইল ;—যুবতী ষোড়শী!

মনোরমা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "ভয় কি বোন, খোকা ভাল হইবে।"

ষোড়শী মনোরমার হাত ধরিয়া যে ঘরে খোকা শুইয়াছিল, সেখানে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বিছানার এক পার্শ্বে খোকার শীর্ণ দেহ। মনোরমার প্রদত্ত খেলানাগুলি তাহার বামে ও দক্ষিণে। বিছানার পাশে নরেন্দ্র। নরেন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমার অভিমানের স্রোত উছলিয়া উঠিল। নরেন্দ্র মনোরমার হাতের মধ্যে খোকার পাণ্ডুর শীর্ণ হাতখানি দিলেন। মনোরমার হাতে খোকার হাত রহিল—মনোরমা স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কাঁদিলেন। ষোড়শীর অস্তিত্ব কাহারও মনে ছিল না।

মনোরমাকে দেখিয়া খোকা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মা!" মনোরমার অসম্পূর্ণ জীবন যেন সম্পূর্ণ হইল।

সেই দিন হইতেই খোকার অসুখ কমিতে আরম্ভ হইল।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

শবর স্বামী ও তাঁহার যুগ।

খৃষ্টাবির্ভাবের ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে মেসিডনের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হইতে ভারতবর্ষের সাল-তারিখ-বিশিষ্ট ইতিহাসের সূত্রপাত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণের গ্রন্থে, প্রাচীন শিলালিপিতে ও মুদ্রায় এই সময়ের পরবর্ত্তী যুগের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপাদান অবলম্বনে রাজকীয় ইতিহাসের অস্থিপঞ্জরের কিয়দংশের পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের সঙ্কলন সম্ভব নহে। এইরূপ ইতিহাসের সঙ্কলনের জন্য প্রাচীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ হইতে, এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে উপাদানের আহরণ আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান দুইটি বিভাগ,—মূল ও ব্যাখ্যা। অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের নাম ও কাল না জানা থাকায় এবং একই গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের রচনা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় মূল গ্রন্থ হইতে উপাদান-

সংগ্রহ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলি এই তিনটি দোষের মধ্যে দুটি প্রধান দোষ হইতে মুক্ত। ব্যাখ্যামাত্রেরই রচয়িতার নাম জানা আছে, এবং একের রচিত ব্যাখ্যা-মধ্যে অপর কাহারও রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের সময়-নিরূপণ করিতে পারিলে, তাঁহার গ্রন্থ হইতে স্বচ্ছন্দে ইতিহাসের উপাদান আহরণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা-শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাৎস্যায়নের "ন্যায়ভাষ্য", পতঞ্জলির "ব্যাকরণমহাভাষ্য" ও শবর স্বামীর "মীমাংসাভাষ্য" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। "অভিধানচিন্তামণি"-কার হেমচন্দ্রের মতে, বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য চাণক্য অভিন্ন। এই জনশ্রুতি সত্য হইলে বাৎস্যায়নকে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক মনে করিতে হয়। পতঞ্জলি আনুমানিক ১৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জীবিত ছিলেন, ইহা সন্তোষজনক প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শবর স্বামীর কালনিরূপণের চেষ্টা করিব।

শবর স্বামী মীমাংসা-দর্শনে ২।৩।৩ সূত্রের ভাষ্যে "রাজা স্বর্গরাজ্য কামনায় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন" এই শ্রুতির বিধি উদ্ধৃত করিয়া রাজন্ শব্দের অর্থবিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার দুই প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

"কিং পুনঃ রাজকর্ম্ম। জনপদপুরপরিরক্ষণে, তদুচ্ছোদ্ধরণে রাজশব্দমার্য্যা-বর্ত্তনিবাসিনঃ প্রযুঞ্জন্তে।"

"রাজকর্ম্ম কাহাকে বলে? আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা 'রাজা' শব্দ দেশ ও নগরের রক্ষা এবং উহাদের উদ্ধারসাধনে ব্যবহার করেন।"

"ননু জনপদপুরপরিরক্ষণবৃত্তিমনুপজীবত্যপি ক্ষত্রিয়ে রাজশব্দমান্ধ্রাঃ প্রযুঞ্জন্তে প্রযোক্তারঃ।" *

"যে ক্ষত্রিয় দেশ ও নগরের রক্ষা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে না, অন্ধ্র-গণ তাহাকেও 'রাজা' বলেন।"

পরে শবর স্বামী এই শেষোক্ত মতকে "অন্ধ্রগণের প্রয়োগ (আন্ধ্রাণাং প্রয়োগঃ)" এবং "অন্ধ্রগণ বলেন=(আন্ধ্রা বদন্তি)" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট "তন্ত্রবার্ত্তিক" নামক মীমাংসা-ভাষ্যের টীকায় "আন্ধ্রাণাং" অর্থ লিখিয়াছেন, "দাক্ষিণাত্যবাসিমাত্র বা সমগ্র দাক্ষিণাত্য অর্থে ভাষ্যকার এখানে

* বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মীমাংসা দর্শন"; প্রথম খণ্ড; ১৭২ পৃঃ।

'আন্ধ্রাণাং পদের ব্যবহার করিয়াছেন (দাক্ষিণাত্যত্বসামান্যেনান্ধ্রাণামিতি ভাষ্যকারেণোক্তম্)।" * এখন জিজ্ঞাস্য, শবরস্বামী সমগ্র দাক্ষিণাত্য অর্থে "অন্ধ্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? দাক্ষিণাত্যের একটি অংশ-বিশেষে, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপে অন্ধ্রগণ বাস করিতেন। প্রাচীন অন্ধ্রদেশ এখন ত্রিলিঙ্গ বা তেলুগু দেশ নামে পরিচিত, এবং অন্ধ্রগণের বর্ত্তমান বংশধরেরা তেলুগু নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মীমাংসা-ভাষ্যে সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে অন্ধ্র বলিয়া অভিহিত করিবার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম,—শবরস্বামীর সময়ে দাক্ষিণাত্য নাম প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তিনি নামান্তর-ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ যুক্তি অমূলক। কারণ, শবর স্বামী স্বয়ং ১।৩।১৫ সূত্রের ভাষ্যে "দাক্ষিণাত্য" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "আহ্বীনৈবুকাদয়ো দাক্ষিণাত্যৈরেব (কর্ত্তব্যা)।" পুনশ্চ, ১।৩।১৯ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"যে 'দাক্ষিণাত্যাঃ' ইতি সমাখ্যাতাঃ, তে আহ্বীনৈবুকাদীন্ করিষ্যন্তি।" "দাক্ষিণাত্যবাসীরা আহ্বীনৈবুকাদির অনুষ্ঠান করে।" জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে মাধবাচার্য্য "আহ্বীনৈবুক" অর্থ লিখিয়াছেন,— †

"স্বস্বকুলাগতং করঞ্জার্কাদিস্থাবরদেবতাপূজাদিকমাহ্বীনৈবুকশব্দেনোচ্যতে।"

"নিজ নিজ কুলক্রমাগত করঞ্জবৃক্ষ, অর্ক (আকন্দ) বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পূজা অর্থে 'আহ্বীনৈবুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়।"

দাক্ষিণাত্যের মারাঠাগণের মধ্যে ও অনেক তামিল ও তেলুগু ভাষাভাষী জাতির মধ্যে এখনও স্থাবর কুলদেবতা বা 'দেবকে'র পূজা প্রচলিত আছে। ‡ সুতরাং আহ্বীনৈবুকাদির উল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, শবর স্বামী যে শুধু 'দাক্ষিণাত্য' নামটি জানিতেন, এমন নহে; তিনি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহারের সহিতও বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন।

---

* বারাণসী হইতে প্রকাশিত "তন্ত্রবার্ত্তিক"; ৫৯১ পৃঃ।

† আনন্দাশ্রম সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী; গ্রন্থাঙ্ক ২৪; ৩৫ পৃঃ।

‡ "Maratha families have *devaks* or sacred symbols, which appear to have been originally totems, and affect marriage to the extent that a man cannot

দ্বিতীয় কারণ, – শবর স্বামী যখন ভাষ্যের রচনা করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দাক্ষিণাত্য অন্ধ্ররাজগণের করতলগত থাকায়, তিনি দাক্ষিণাত্যের শাদিক-গণের প্রয়োগকে অন্ধ্রগণের প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য অন্ধ্ররাজগণের করতলগত ছিল। নানাঘাটের পর্ব্বতগুহায় ক্ষোদিত লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে, জনৈক অন্ধ্র নৃপতি রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * প্রসিদ্ধ কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য শালিবাহন বা সাতবাহন নামক অন্ধ্রবংশীয় রাজার শিক্ষক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, অন্ধ্ররাজসভায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ও শব্দশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল, এবং অন্ধ্ররাজগণের আশ্রিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতসমাজের মতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারিতেন, শবর স্বামী অন্ধ্ররাজ্য-ধ্বংসের পর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া অন্ধ্রমতের উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপও বলা যাইতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তের তুলনায় দাক্ষিণাত্য ও তদন্তর্গত অন্ধ্রদেশ ম্লেচ্ছ জনপদ-রূপে গণ্য হইত। শবর স্বামী ২।৩।৩ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষের যে আপত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ্রমত "অন্ত্যজনপদবাসী ম্লেচ্ছগণে"র মত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। † সংশয়স্থলে শিষ্টপ্রয়োগ উল্লেখেরই প্রথা ছিল। পাণিনির ৬।৩।১০৯ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী সদাচারসম্পন্ন ও সর্ব্ববিদ্যা-বিদ্ ব্রাহ্মণকে শিষ্ট বলিয়াছেন। ‡ সুতরাং বিশেষ কোনও কারণ যখন

---

marry a woman whose *devak* reckoned on the male side is the same as his own. They are totems worshipped during marriage and other important ceremonies ....Most of these are vegetable products, four animal products, while gold, iron, and the brilliant crystal *surya-kanta* are the three minerals venerated." – *Bombay Gazetteer*.

* *Archæological Survey of Western India*, volume V. (London 1883), Chapter XII.

† "অপিচাবিপ্রগীতা লৌকিকা অর্থা বিপ্রগীতেভ্যঃ প্রত্যয়িততরা ভবন্তি, তথা আর্য্যাবর্ত্তনি-বাসিনাং পদার্থোপায়েষভিযুক্তানামভিব্যাহরতাং কর্ম্মাণি চানুষ্ঠিতানি অন্ত্যজনপদবাসিভ্যো ম্লেচ্ছেভ্যঃ সমীচীনতর আচারো ভবতি।"

‡ "কে পুনঃ শিষ্টাঃ। .....এবং তর্হি নিবাসতশ্চাচারতশ্চ। স খল্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তে এব।

অন্ধ্র মতের অত্যধিক প্রচার ও আদর হইয়াছিল, ঠিক তৎকালে ভিন্ন ভৎ-পরবর্ত্তী সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের মতের প্রতিযোগিরূপে অন্ধ্র মতের উল্লেখ অসম্ভব। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যে যুগে আর্য্যাবর্ত্তের অনেকাংশ যথাক্রমে যবন, শক ও কুষাণগণের পদানত হইয়াছিল, এবং অন্ধ্ররাজ সাতকর্ণি মগধের অধীশ্বর কাণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া যখন আর্য্যাবর্ত্তে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন অন্ধ্রদেশীয় শাব্দিকগণের মত সেইরূপ আদরলাভের ও শিষ্টপ্রয়োগতুল্য বিবেচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে অনুমান করা যায়, মীমাংসা-ভাষ্যকার শবর স্বামী অন্ধ্র-রাজ্যের স্থিতিকালমধ্যে, ২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী অন্ধ্র-প্রয়োগে যেরূপ পক্ষপাত করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যের আচার ব্যবহারে যেরূপ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয়, তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। শবর স্বামীর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে শবর স্বামীর তুল্য সুধী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন "লোকে বেদে" (লোকেষু বেদেষু না বলিয়া) "লৌকিকে বৈদিকে" (লৌকিকেষু বৈদিকেষু) বলিয়াছেন বলিয়া পতঞ্জলি কাত্যায়নকে "দাক্ষিণাত্যগণ তদ্ধিতপ্রিয়" (প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ) বলিয়া উপহাস করিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়াছেন।

যে যুগে মীমাংসা-ভাষ্য ও অন্যান্য প্রাচীন ভাষ্য ও বার্ত্তিক রচিত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের এই যুগকে "প্রাচীন ভাষ্য-যুগ" বলা যাইতে পারে। এই যুগের সূচনায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সূত্রে এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে তেমনই প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্রবে আসিয়াছিলেন। এই যুগের আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যগণ কিরূপ উদারচেতা ছিলেন, এবং বিদেশীয় ও বিজাতীয় আচার্য্যগণকে কি ভাবে দেখিতেন, ন্যায়-ভাষ্যের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিব। ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যে 'শব্দ' প্রমাণ অন্যতম। গৌতম

ঃ পুনরার্য্যাবর্ত্তঃ। প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্‌কালকবনাৎ। দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিযাত্রমতস্মিন্নার্য্যাবর্ত্তে নিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুত্তীধাস্থা অলোলুপা অগৃহ্যমানকারণাঃ কিংচিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারম্বতাঃ তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ।"

'শব্দে'র এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ (১।১।৭)।" অর্থাৎ, আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের নাম শব্দ প্রমাণ। এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।"

"যে ব্যক্তি অর্থসাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছে, এবং অনুভূত অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় উপদেশ প্রদান করে, সে আপ্ত। অর্থানুভবের নাম আপ্তি; আপ্তির দ্বারা যে প্রণোদিত, সে আপ্ত। ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের ইহা সাধারণ লক্ষণ। অর্থাৎ, ঋষি, আর্য্য, বা ম্লেচ্ছ, যে কেহ যোগ্য হইলে আপ্ত হইতে পারে।"

'ম্লেচ্ছও আপ্ত বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য', ন্যায়ভাষ্য-কারের এই উক্তি যে শুধু কথার কথা, তাহা নহে। বস্তুতই তদানীন্তন আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা কল্যাণকর, তাহা ম্লেচ্ছগণের নিকট হইতেও শিক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং অনেক বিষয়ে যে তাঁহারা ম্লেচ্ছ আচার্য্যগণের উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালের শিল্প, বিজ্ঞান, এমন কি, ধর্ম্মের আলোচনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীন ভাষ্য-যুগের ভারতীয় শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কতটা আর্য্যাবর্ত্তবাসীর নিজস্ব, এবং কতটা পরস্ব, এই জটিল প্রশ্ন বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না। তবে যাঁহারা বলিতে চাহেন, আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাহা কিছু প্রচার করিয়াছেন, বা সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরকীয় কিছুই নাই, তাঁহারা যেন বাৎস্যায়নের এই উক্তিটি স্মরণ রাখেন। অপর পক্ষে যে সকল পাশ্চাত্য সমালোচক বলিতে চাহেন, ভারতীয় শিল্পে ও ভারতীয় গণিতে ভারতবাসীর নিজস্ব বিশেষ কিছুই নাই,—সমুদয়ই গ্রীক ও পারসীকগণের নিকট হইতে লব্ধ, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, যে যুগের ভারতবাসী এতই সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, নূতন সত্য-লাভের আশায় ম্লেচ্ছকেও ঋষিবৎ পূজা করিতে প্রস্তুত, সেই যুগে তাঁহারা যে স্বাধীন গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের কোনও নূতন সত্য বা শিল্পের কোনও নূতন প্রণালীর আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এরূপ অনুমান অসমীচীন। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজ, ফরাসী ও জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ

পরস্পরের নিকট হইতে অনেক সহায়তালাভ করিতেছেন। তাই বলিয়া এই সকল দেশের কোথাও স্বাধীন চিন্তার অভাব হইয়াছে, বা স্বাধীন আবিষ্কার আদৌ হইতেছে না? জর্ম্মাণীতে বিজ্ঞানচর্চ্চার আধিক্য আছে বলিয়া কি ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিতগণ জর্ম্মাণদিগের অনুকরণ ও অনুবাদেই লিপ্ত আছেন? নিজেরা কি কিছুই করিতেছেন না? জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের হিসাবে আজ ইউরোপের যে অবস্থা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সত্যের ও তথ্যের যেরূপ আদানপ্রদান চলিতেছে, প্রাচীন ভাষ্য-যুগে রোম হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ 'ইউরেসিয়া' মহাদেশে সেইরূপ আদানপ্রদান, সেইরূপ বিনিময় চলিয়াছিল।

নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কামনাকারী নৈয়ায়িক বৎস্যায়ন নিঃশ্রেয়স-সাধন জ্ঞানের প্রসঙ্গে যোগ্য ম্লেচ্ছকে ঋষিবৎ আপ্ত গ্রহণ করিয়া, তৎকালের ধর্ম্মে যে ম্লেচ্ছপ্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের আদিম ধর্ম্ম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডে অতৃপ্তির ফলে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড, এবং তাহার বিকারে বৌদ্ধ জৈনাদি অবৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়। প্রাচীন ভাষ্য-যুগের শিলালিপিতে ও মুদ্রায় আমরা ভক্তিমার্গের অনুসরণকারী শৈব, বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। হিন্দুসাধারণের সংস্কার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিমার্গও বেদমূলক। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পরিণামফলে যে বিষ্ণু-শিবাদি দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্বাভাবিক পরিণাম কিরূপ, তাহা পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসকগণের মতে, কর্ম্ম বা যাগ যজ্ঞই ধর্ম্মের সার; দেবদেবীর স্থান তাহার অনেক নিম্নবর্ত্তী। সুতরাং বাহ্য প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইলে যে বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীরা বিষ্ণু, রুদ্র আদি বৈদিক দেবতার উপাসনায় ব্রতী হইতেন, এরূপ মনে হয় না। সে বাহ্য প্রভাব কোন দিক হইতে আসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়গণের নিকট হইতে আর্য্যাবর্ত্তবাসী ধর্ম্ম বিষয়ে কতটা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধান কার্য্যে প্রাচীন ভাষানিচয় হইতে বিশেষ সহায়তালাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাষ্যগুলি এমনই দুরূহ যে, বিশেষজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন উহাদের অধ্যয়ন ও অনুশীলন অসম্ভব। সুতরাং যাঁহারা এখন প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদাদি প্রকাশ করিয়া ভাষার সম্পদবর্দ্ধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রাচীন ভাষ্যগুলির বঙ্গানুবাদ-প্রচারের আয়োজন করেন, তাহা হইলে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

পেঁপে সুন্দরী।

পেঁপে ফল কাটি', আমি হেরিনু বিস্ময়ে,—
কচি কচি দুটি হাত, কচি পা দুখানি ;
আয়ার ঘোমটা খোলা ; সোনার বলয়ে
এ কি শোভা! চুপে বসি' হাসে পেঁপে রাণী!
"বাছা!' বলি," আহা মরি তুলি' ক্ষুদ্র পাণি,
আশীষেন ভক্ত পুত্রে! বিজন আলয়ে
হেরি তাঁরে, দর দর আঁখি দুটি বয়ে—
দুগ আনন্দধারা ; নাহি সরে বাণী!
তোমরা হেস না রঙ্গে, কঠিন বিজ্ঞানী!
প্রীতি-অণুযন্ত্র দিয়া হেরেছি এ রূপ ;
আমার এ শুভ্র কাচ অতি অপরূপ!
তোমাদের কালো কাচ হারি যায় মানি!
তোমরা কি জান না'ক, মোর সোনা মেয়ে,
অণু-রূপে বিভু-রূপে বিশ্ব আছে ছেয়ে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিদেশী গল্প।

কাবুলী বিড়াল।

তাহার কোনও আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। একে সে বোবা, তাহার উপর তাহার চেহারা অতি বদ্ ছিল। একটু না একটু শ্রী সকলেরই থাকে, কিন্তু তাহার চেহারায় যত রকম দোষ থাকা সম্ভব, সবগুলিই ছিল। আলাপ করা ত দূরের কথা, তাহার চেহারা দেখিয়াই সকলে তাহার নিকট হইতে দশ হাত দূরে সরিয়া যাইত। তাহার প্রকৃতিও খুব গম্ভীর ছিল। এই জন্য, বিশেষ কোনও প্রয়োজন না হইলে, কেহ বড় একটা তাহার কাছে আসিত না।

বোবারা কথা কহিতে পারে না। তাহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, কেহই তাহা জানিত না। সকলেই তাহাকে মালী বলিয়া ডাকিত।

বাগানের সমস্ত ভারই তাহার উপর ছিল। বাগানের এক পাশে ছোট একটি খুড়ে-ঘরে সে থাকিত—অন্যান্য চাকরেরা থাকিত বাড়ীর ভিতর। তাহার সহিত কাহারও বড় একটা দেখা হইত না।

কিন্তু মানুষ বন্ধু না জুটিলেও মালীর আর একটি বন্ধু জুটিয়াছিল। সেটি একটি কাবুলী বিড়াল। একদিন সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধমৃত বিড়ালটিকে সে নদীতীরে কুড়াইয়া পায়, এবং ঘরে আনিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে বাঁচায়। সেই অবধি বিড়ালটি মালীর কাছেই আছে।

সাদায় কালোয় মেশানো বড় বড় কোঁকড়া চুলে বেড়ালটিকে বড় সুন্দর দেখাইত। সুন্দর বিড়ালটিকে দেখিয়া সকলেরই লোভ হইত।

মালী বিড়ালটিকে এত ভালবাসিত যে, তাহাকে একদণ্ডও কাছছাড়া করিত না। বিড়ালটিও মালী ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না। মালী যখন আদর করিয়া 'মুমু' বলিয়া ডাকিত, সে ছুটিয়া মালীর পাশে গিয়া লেজ নাড়িতে থাকিত।

বিড়ালটিকে যে দেখিত, সে-ই তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিত। কিন্তু মালীর তাহা আদৌ ভাল লাগিত না—তাহার মনে হইত, যেন অন্যের আদরে সে তাহার বিড়ালটিকে হারাইবে। বিড়ালটিও অন্যের কাছে যাইতে বিশেষরূপ আপত্তি প্রকাশ করিত।

মুমু একদণ্ডও মালীর কাছছাড়া হইত না। মালী জল আনিতে যাইতেছে, মুমু তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে; মালী বাগানে কাজ করিতেছে, মুমু চুপ্ করিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে; মালী গাছে চড়িয়া প্রভুর জন্য ফুল পাড়িতেছে, মুমু গাছের তলায় বসিয়া ফুল আগলাইতেছে।

মালী যখন মনিব-বাড়ীতে আহার করিতে যাইত, মুমু বাহিরে দরজার কাছে মালীর জন্য অপেক্ষা করিত। একটু শব্দ হইলেই মুমু ভাবিত, বুঝি মালী আসিতেছে। দু' একবার নিরাশ হইয়া সত্য সত্যই যখন সে মালীকে দেখিতে পাইত, তখন সে আনন্দে ছুটিয়া গিয়া মালীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। কি জানি কেন, মুমু কখনও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিত না—মালী যখন কোনও দরকারে ভিতরে যাইত, মুমু অস্থিরভাবে তাহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিত।

মালী যাঁহার নিকট চাকরী করিত, তিনি বয়স্যা বিধবা, বেশ অবস্থাপন্না; দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন ছাড়া বিধবার আর কেহই ছিল না।

বিধবার নানা গুণ ছিল—দোষের মধ্যে তিনি বড়ই খামখেয়ালী ছিলেন। মাথায় কোনও খেয়াল চাপিলে আর রক্ষা ছিল না। চাকর বাকর সকলেই এই জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

একদিন অপরাহ্ণে বিধবা বারান্দায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। মালী তখন বাগানে ফুলের গাছে জল দিতেছিল—মুমুও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বিধবার দৃষ্টি হঠাৎ মুমুর উপর পতিত হইল। মুমুকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! বেশ সুন্দর বেড়াল ত!"

সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল।

বিধবা এক জন চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কা'র বেড়াল রে?

চাকরাণী বলিল, "ঐ বোবা মালীটার।"

"বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর বেড়াল। ওটাকে এখানে ধরে' নিয়ে আয়।"

এক জন ভৃত্য বাগানের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। চাকরাণী তাহাকে চীৎকার করিয়া কহিল, "মুমুকে শীগ্‌গীর উপরে ধরে' নিয়ে আয়—মনিবঠাক্‌রুণ দেখ্‌তে চাচ্ছেন।"

বিধবা আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "মুমু!—নামটিও ত বেশ মিষ্ট!"

চাকরাণীর কথায় ভৃত্য মুমুকে ধরিতে ছুটিল। তাহাকে দ্রুতপদে নিকটে আসিতে দেখিয়া, মুমু মালীর কাছে পলাইয়া গেল। ভৃত্যও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। মালীর কাছাকাছি আসিয়া সে যেমন মুমুকে ধরিতে যাইবে, অমনই মুমু একলাফে সরিয়া গেল। মুমুকে ধরিবার জন্য সে আরও দুই তিন বার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না।

মুমুকে ধরিবার চেষ্টা বারংবার নিষ্ফল হইতেছে দেখিয়া, মালীর গম্ভীর মুখেও একটু হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু ভৃত্য যখন আকার ইঙ্গিতে মালীকে বুঝাইয়া দিল যে, মনিবঠাক্‌রুণ বিড়ালটিকে চাহিতেছেন, তখন তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল—বর্ষাকালের মেঘের মত মালীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালী মুমুকে ধরিয়া ভৃত্যের হাতে দিল।

মুমুকে লইয়া ভৃত্য উপরে চলিয়া গেল। মুমু ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর ভিতর আর কখনও আসে নাই। সে ভৃত্যের হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাধা পাইয়া আর পারিল না। বিধবা "মুমু" "মুমু" বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, দুধের বাটি আনিয়া তাহার

সম্মুখে ধরিলেন, কিন্তু 'মুমু' তাঁহার কাছে না গিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মুমুর ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য বিধবা কত রকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে যখন তাহাকে ধরিবার জন্য কাছে গেলেন, মুমু খ্যাঁক করিয়া উঠিল,—বিধবা ভয়ে হাত সরাইয়া লইলেন। মুমু তাহার পর আর একবার করুণস্বরে শব্দ করিল।

সকলে বলিয়া উঠিল, "আহা, আহা, কাম্‌ড়ালে নাকি?"

বিধবা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দে বেড়ালটাকে দূর করে'!—হতভাগা কোথাকার!" বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। চাকর চাকরাণীরা তাঁহার অনুসরণ করিলে বিধবা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোদের আমি সঙ্গে আস্‌তে বলি নি।"

বিধবা চলিয়া গেলে, ভৃত্য মুমুকে ধরিয়া বারান্দা হইতে জোরে ছুঁড়িয়া বাগানে ফেলিয়া দিল।

মুমুকে লইয়া যাইবার পর হইতে মালী কাজ ফেলিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুমুকে উপর হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে দেখিয়া মালীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

সেদিন বিধবার কোনও জিনিসই ভাল লাগিল না—রাত্রিতেও তাঁহার ভাল ঘুম হইল না।

প্রভাতে উঠিয়া বিধবা তাঁহার দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের মতলবটা কি? তোমরা কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও? রাত্রিতে যে একটু স্বচ্ছন্দে আরাম করে' ঘুমোবো, তারও যো নেই! একটু তন্দ্রা আসে, আর অমনই 'ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও!' এ ত ভারি আপদ দেখ্‌চি।"

বিধবার এক জন আত্মীয়া তাঁহার কথায় সায় দিয়া চাকরদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা, বাপু, তোমাদেরও কি একটু আক্কেল নেই! কোথায় দিনের বেলায় খেটে খুটে লোকে রাত্রিতে একটু ঘুমোবে, তাও বুঝি তোমাদের জ্বালায় হ'বার যো নেই।"

পূর্ব্ব হইতেই সকলে বুঝিয়াছিল, কেন তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন কথা টানিয়া টানিয়া কহিল, "আ—আ—জ্ঞে, ও—ওই বোবা—"

ভৃত্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই বিধবা বলিয়া উঠিলেন, "বোবার আবার বেড়াল! আর ওটা যে কত দিন এ বাড়ীতে আছে, তাও ত আমি জানি নে। কাল বিকেলে দেখি যে, বেড়ালটা বাগানের ভিতর দৌড়া-দৌড়ি করে' গোলাপ গাছগুলো সব নষ্ট করে' দিচ্ছে! এ সব কি?" বলিয়া বিধবা চুপ করিলেন।

ভৃত্য পূর্ব্বের ন্যায় কথা টানিয়া টানিয়া কহিল, "আ—আ—জ্ঞে, না, এ—এবার যে—একে—"

"ও সব কিছু শুন্‌তে চাইনি। এখনি বেড়ালটাকে দূর করে' দে। এখনি,—বুঝ্‌লি?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সকলে চলিয়া গেল।

নীচে আসিয়া সকলে দেখিল, দ্বারবান দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাকে ধাক্কা দিয়া এক জন তাহার কানে কানে কি বলিল। সে চোখ বুজিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা।"

সন্ধ্যার পর মালী গোলাপফুলের তোড়া লইয়া উপরে গেল—মুমুও বাহিরে দরজার পাশে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল্।

চীলে যেমন সুবিধা বুঝিয়া খাবার জিনিস ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, দ্বারবানও তেমনই কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুমুকে ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সে রাস্তায় বাহির হইয়াই এক জন খরিদ্দার জুটাইয়া মুমুকে চারি আনায় বিক্রয় করিল।

বাহিরে আসিয়া মুমুকে না দেখিতে পাইয়া মালী অবাক্ হইল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ আর কখনও হয় নাই। মালী সমস্ত বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মুমুকে কোথাও দেখিতে পাইল না। দাসদাসীদিগের নিকট হইতে কিছু জানিতে না পারিয়া মালী মুমুকে খুঁজিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মালী আর একবার সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। মুমুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল।

পরদিন মালী তাহার ঘরের দরজা খুলিল না—এক ফোঁটা জলও মুখে না দিয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি উপবাসী হইয়া রহিল।

বিধবা ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে।

পরদিন মালী যখন ঘরের বাহির হইল, তখন তাহার চোখ দুটো জবা-ফুলের মত লাগ, এবং তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়াছে। সে আপন মনে সমস্ত কাজই করিয়া গেল।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত্রি। আকাশে তারার মালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মালী বাগানে সবুজ ঘাসের উপর গিয়া বসিল। তাহার কোনও দিকে দৃষ্টি নাই—আজ দু'দিন তাহার মনে সুখ নাই।

হঠাৎ মালীর চমক ভাঙ্গিল। তাহার বোধ হইল, কে যেন তাহার পিছনের কাপড় ধরিয়া টানিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া মালী দেখিল, মুমু!—তাহার গলায় একটা ছেঁড়া লাল ফিতে বাঁধা। মালীর মুখ হইতে একটা অস্ফুট আনন্দের ধ্বনি নির্গত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর মুমুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মালী নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

পূর্ব্বেই সে চাকরদের নিকট শুনিয়াছিল যে, মুমু মনিবঠাকুরুণকে কামড়াইতে যাওয়ায়, তাহাকে দূর করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। সেই-জন্য, মুমুকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে ভাবিয়া মালী অস্থির হইয়া পড়িল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মালী ঠিক করিল, দিনের বেলায় মুমুকে ঘরে লুকাইয়া রাখিবে, এবং রাত্রিকালে সকলে ঘুমাইলে তাহাকে ঘরের বাহির করিবে।

পরদিন প্রাতে মালী যখন কাজ করিতে বাগানে আসিল, সে জোর করিয়া তাহার মুখখানা গম্ভীর করিল। মালী ভাবিয়াছিল, এইরূপ চাতুরীতে মুমু আসিয়াছে বলিয়া কেহ আর সন্দেহ করিবে না। মনের আনন্দে মালী একলাই দু' তিন জনের কাজ করিয়া ফেলিল।

মালীকে বেশী খাটিতে দেখিয়া বিধবা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মালী, এত বেশী খাটবার দরকার কি? আরও ত অনেক লোক রয়েচে।"

মালী আস্তে আস্তে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, ইহা আর তেমন কি বেশী খাটুনি?

কাজ করিতে করিতে একটু সুবিধা পাইলেই, মালী মুমুকে দুই একবার লুকাইয়া দেখিয়া আসে। ক্রমে মুমুর আসার কথা জানাজানি হইতে আর বাকী রহিল না। কিন্তু মুমুর প্রতি টান থাকায়, এবং মালীর জন্যও বটে, কেহ আর এ কথা বিধবার কানে তুলিল না।

সেদিন রাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় বিধবা বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। বাড়ীর আর আর সকলেই নিদ্রিত। মালী মুমুকে লইয়া বাগানে বেড়াইতেছিল। বিধবার দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে পড়িল। সম্মুখে কোনও বিকট মূর্ত্তি দেখিলে শিশু যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, মুমুকে দেখিয়া বিধবা সেইরূপ শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বিধবার চীৎকারে দাসদাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখিল যে, তাহাদের মনিব ঠাকুরুণ অজ্ঞানাবস্থায় একটি আরামকেদারায় পড়িয়া আছেন।

পাখার বাতাস করিতে করিতে বিধবার একটু জ্ঞান হইল।

একটু সুস্থ হইয়া বিধবা উঠিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য, দাসদাসীরা কেহই তাঁহাকে যত্ন করে না, তাঁহার সেবা করে না, কেহই তাঁহার কথা পর্য্যন্ত শোনে না, সকলেই তাঁহার মৃত্যু-কামনা করে, ইত্যাদি। ঠিক এই সময়ে বাড়ীর কুকুরটা একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিধবা আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া সকলেই মালীর সন্ধানে নীচে নামিয়া গেল। মালী ইতিপূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে খিল্ দিয়াছিল।

বাগানে মালীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া সকলে হাঁকডাক্ করিতে আরম্ভ করিল। মালী কোনও সাড়া দিল না।

ভৃত্য উপরে গিয়া বিধবাকে জানাইল যে, বিড়ালটা কেমন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মালী দরজা খুলিলেই বেড়ালটাকে মারিয়া ফেলা হইবে।

বিধবা একটু উদাসীনতার ভান করিয়া কহিলেন, "তোরা ত আর আমার কথা শুনে কাজ করবিনে—তোদের যা খুসী তাই কর্"—বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভৃত্য নীচে নামিয়া গেল।

বিজয়ী সেনা পরাস্ত শত্রুর দুর্গ যেরূপ ভাবে বেষ্টন করে, দাস-দাসীরাও মালীর গৃহখানিকে ঠিক সেই ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিল। মালী যখন কোনও মতেই দরজা খুলিল না, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল।

বিধবার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের কনক-রৌদ্র চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া হতাশস্বরে বিধবা কহিলেন,

"আচ্ছা, তোরা কি একটা তুচ্ছ বেড়ালের জন্যে আমার প্রাণ নিতে চাস্?" বলিয়া পাশের থালিসটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিলেন।

ভৃত্য মনিবের কথা সকলকে জানাইল। সকলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মালীর ঘরের কাছে গিয়া দরজায় দমাদম্ ঘা মারিতে লাগিল। দরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ থাকায়, দরজা খুলিল না। কেবল ভীতি-কম্পিত মুমুর আওয়াজ বাহির হইতে অস্পষ্ট শোনা গেল।

এক জন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওহে, ও যে বোবা, তোমাদের চীৎকারে কোনও ফল হ'বে না। বোবা লোক যে কালা হয়, তাও কি ভুলে গেছ!"

হঠাৎ খিল্ খোলার শব্দে সকলে চম্‌কাইয়া উঠিল, দেখিল, মুমুকে বুকে ধরিয়া মালী সম্মুখে দণ্ডায়মান। সকলে হাঁ করিয়া মালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যদের মধ্যে এক জন দুই হাত দিয়া নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহার পর মুমুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আকারে ইঙ্গিতে মালীকে বুঝাইয়া দিল যে, মুমুকে হত্যা করিবার আদেশ হইয়াছে।

মালী নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। চমক ভাঙ্গিলে সে চাকরদের বুঝাইয়া দিল যে, সে নিজেই মুমুকে হত্যা করিবে—অন্য কাহারও হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

এক জন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "যদি তুমি না কর?" একটুখানি মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া মালী সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া খিল্ দিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মালী ঘর হইতে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ—মনিবপ্রদত্ত একটি ফরসা আধছেঁড়া জামা ও একখানি ময়লা পুরাতন পায়জামা পরিয়া, বাহিরে আসিল। তাহার সঙ্গে মুমু। মুমুর সাদায় কালোয় মেশান লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুলগুলি বেশ আঁচ্‌ড়ান। একটি নূতন লাল ফিতা তাহার গলায় বাঁধা; ফিতাটি মালী ধরিয়া আছে।

ভৃত্যদের কেহ কেহ তখন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া জটলা করিতেছিল। মালীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। মালী কাহারও দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া মুমুকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাজারে গিয়া মালী মাছ দুধ কিনিয়া মুমুকে ভাল করিয়া খাওয়াইল। মুমুও আনন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে সমস্ত খাইয়া ফেলিল। মুমুর আহার শেষ হইলে মালী তাহাকে লইয়া নদীর দিকে চলিল।

নদীতীরে পঁহুছিয়া, মালী মুমুকে লইয়া একটি ছোট ডিঙ্গীর উপর উঠিয়া ডিঙ্গী খুলিয়া দিল। তখন সন্ধ্যা; মধুর বাতাস বহিতেছিল।

নৌকা নদীর মাঝখানে পঁহুছিলে, মালী হাল ছাড়িয়া দিয়া মুমুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শিশিরের মত তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। মুমুও একদৃষ্টে মালীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

মালী দুইখানি বড় ইঁট সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে মুমুর গলার ফিতার সহিত ইঁট দুইটি বাঁধিয়া দিল। মুমুর মুখে তখনও কোনও ভয়ের চিহ্ন নাই।

মালী শেষবার মুমুর মুখচুম্বন করিয়া জলের উপর মুমুকে ধরিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। মুমুর নির্ভয় দৃষ্টি তখনও মালীর মুখের উপর!

নদীর কলকল্লোল, তরুর মর্ম্মরধ্বনির সহিত মুমুর নদীগর্ভে পতনের শব্দ মিলাইয়া গেল—মালী আর কোনও শব্দ শুনিতে পাইল না।

দুই বন্ধুর প্রথম মিলনস্থান সেই নদীর গর্ভে বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিয়া মালী মনিববাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

বাড়ী পঁহুছিয়া মালী তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার কাপড় চোপড় জিনিসপত্র একটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইল; তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

পরদিন মালী কাজ করিতে আসিল না। ভৃত্য তাহাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, তাহার ঘর শূন্য।

মালী চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, তিনি কখনই মুমুকে হত্যা করিবার আদেশ দেন নাই!

বিধবা মালীকে আনিবার জন্য তাহার দেশে লোক পাঠাইলেন।

কিছু দিন পরে লোক একাকী ফিরিয়া আসিল। বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, মালী এল না?"

"আজ্ঞে না, সে আপনার বাড়ীতে আর আস্‌বে না।"

"কেন?"

"আজ্ঞে তা কিছু বল্‌লে না।"

"আমি নিজে তোকে পাঠিয়েছিলাম—তুই বলেছিলি।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

বিধবা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "না আসে ত বড়ই ব'য়ে গেল! তাকে আর কেউ সেধে খোসামোদ করে' আন্‌তে যাবে না! গিয়াছে—ভালই হয়েচে।" এই বলিয়া তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মানী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে এখনও তাহার সেই নির্জ্জন পল্লীভবনে বাস করে; এখনও তাহার শরীরে পূর্ব্বের মতই বল আছে; এখনও সে দশ জনের কাজ একাকী করিতে পারে; কিন্তু বিধবার বাড়ী হইতে বিদায় লইবার পর সে আর কাহারও চাকরী গ্রহণ করে নাই, কাহারও সহিত মেশে নাই—আপনার সামান্য জমীটুকু চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। *

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা। †

উপক্রমণিকা।

মুখবন্ধ।

রঙ্গরস অনেক করিয়াছি। আজ একটা কঠিন প্রশ্নের আলোচনা করিব। কিন্তু সম্প্রতি রঙ্গরচনার জন্য বর্ত্তমান লেখকের নামটা যৎকিঞ্চিৎ জাহির হইয়া পড়িয়াছে; গম্ভীরভাবে কোনও প্রশ্নের উত্থাপন করিলে তাঁহার শুনানি পাওয়াই শক্ত। তিনি যাহা বলিতে যাইবেন, তাহা 'পরমার্থ' হইলেও সকলে 'পরিহাস' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজ সত্য সত্যই একটা গুরুতর কথা পাড়িব। এবার আর হাসির ফোয়ারা নহে, ব্যাকরণের সাহারা।

---

* রুসিয়ার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টুর্‌গেনিভের একটি গল্প হইতে সঙ্কলিত।

† বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে ময়মনসিংহ সহরে আংশিকভাবে পঠিত। ইচ্ছুক পাঠক উপক্রমণিকা অংশ ছাড়িয়া 'বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী' হইতে আরম্ভ করিতে পারেন।

বিষয়-নির্দ্দেশ।

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশ আকারে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে, এই প্রশ্নটি আজ আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতেছি।

প্রথম পক্ষের যুক্তি।

বাঙ্গালা সাধুভাষার ব্যাকরণ লইয়া দুইটা দল আছে। দুইটাই প্রবল দল। দুই পক্ষই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চাহেন। এক দলের মতে, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণবিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধুভাষাতেও অপপ্রয়োগ; কেন না, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী (বা মাতামহী)। 'প্রাচীন বাংলা' শব্দের বেলায় লেখকগণ যা' খুসী করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ যথেচ্ছাচারের তাঁহাদিগের অধিকার নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া সেগুলির উপর একটা উদ্ভট-ব্যাকরণের রুলজারী করা নিতান্ত অত্যাচার; কথায় বলে, 'যা'র শিল তা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' [লাটিন, গ্রীক বা হিব্রু হইতে যে সমস্ত শব্দ অবিকল ইংরাজীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বেলায় ইংরাজীতে কি নিয়ম খাটান হয়? Seraph, cherub, datum, erratum প্রভৃতি শব্দের বহুবচন, superior, inferior প্রভৃতি শব্দের appropriate preposition, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরাজীর সাধারণ নিয়ম চলে কি?] ফলতঃ, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রবেশদ্বারে এই বাক্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'কেহ জ্যামিতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যেন এখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে না আসে', সংস্কৃতানুরাগী সম্প্রদায়ও সেইরূপ নিয়ম করিতে চাহেন যে, 'কেহ সুসংস্কৃত-ব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন বাঙ্গালা সাধুভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে।' ইঁহাদের আশঙ্কা, বাঙ্গালা রচনায় একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে সংস্কৃত রচনা পর্য্যন্ত দূষিত ও অধোগামী হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি।

অপর দলের মত, বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেমন রাসায়নিকের বিবেচনায় ঘি ও চর্ব্বি একই পদার্থ, সেইরূপ সংস্কৃত বৈয়াকরণের বিবেচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা একই পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষা

[illegible]ষ ও তাঁর প্রকৃতি অনুসারে ব্যাকরণ গড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে, কেহ বা ইহা জীবন্ত ভাষা। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-ভাষার কন্যা (বা দৌহিত্রী) নহে, কনিষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গালা ভাষা কোনও দিন সংস্কৃতভাষার চালে পরচালা বাঁধিয়া বাস করে নাই, এখনও করিবে না। ইহা কুটীরবাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখায় কোনও ফল নাই। যে সকল ইংরেজ অধিকাল বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, তাহারা যখন বাঙ্গালা মুলুকে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তখন তাহারা বাঙ্গালীর আইনকানুন মানিতে বাধ্য। তাহাদিগের মূলভাষার আইনকানুন এ ক্ষেত্রে চলিবে কেন? When you are in Rome, do as the Romans do; শাস্ত্রে আছে, 'প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।' [গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষা হইতে শব্দ লইয়া ইংরাজী ভাষায় তাহাদিগের বহুবচন, প্রত্যয়, বা উপসর্গ যোগ করিবার সময় মূলভাষার নিয়ম রদ হয় না কি? Genius-এর বহুবচন Geniuses, Genii, দুই প্রকারই হয়, তবে অর্থভেদ আছে: radius, nucleus-এর বেলায় দুইরূপ হয়, কোনও অর্থভেদ নাই। প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে (hybrid word) দোআঁশলা-শব্দ-নির্ম্মাণও হয়।] ফলকথা, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ভেজাল চাহেন না। বিশ্বামিত্র যেমন নূতন সৃষ্টি জগৎ ছাড়িয়া দিয়া একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ একটা অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। ইঁহারা আরও দেখান যে, সকল আধুনিক ভাষারই জটিলতা ঝরিয়া সরলতার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়, বাঙ্গালার বেলায়ই কেন তাহার অন্যথা হইবে? ভাষা-শিক্ষার্থী শিশু ও বিদেশীর শ্রমলাঘবের জন্য ভাষা সহজ করার চেষ্টা আবশ্যক, তাঁহারা কেহ কেহ এ যুক্তিরও অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আর একটি যুক্তি ও তাহার বিচার।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার এক সম্প্রদায় আর একটা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা এখন শিশু, এখন হইতেই ইহাকে ব্যাকরণে নিগড়ে বাঁধিলে ইহার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সহজ স্ফূর্ত্তি বিরুদ্ধ হইবে। লেখকসম্প্রদায়কে পদে পদে বাধা দিলে প্রতিভার বিকাশ

অধ্যাপক ললিতকুমার।

I. A. School, Calcutta.

হইবে না। ইহার ফলে আমরা অনেক উদ্গীয়মান ও উদ্দেধ্যমাণ লেখক হারাইব, 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্র হইয়া পড়িবেন। বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞ অভিভাবকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শিশুর উচ্চৃঙ্খলতানিবারণ কর্ত্তব্যানুরোধে নহে কি? শৈশবে সংশোধন না করিলে শেষে যে রোগ মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইবে। পাছে লেখকসংখ্যা কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা ও পাছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করা দুই-ই একপ্রকারের কথা।

বাঙ্গালাভাষা এখনও শিশু, এ কথাটা আমি অনেকবার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিক অর্থপরিগ্রহ করিতে পারি নাই; বোধ হয়, সেটা আমার স্থূলবুদ্ধির দোষ। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শিশু বলেন, তাঁহাদিগের বোধ হয় বিশ্বাস, মহাত্মা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার পুষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইংরাজের আমলে ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই এই ভাষার উদ্ভব। ব্রাহ্মসমাজ দেখিলেই এই নবপ্রণীত ভাষার বয়ঃক্রম জানা যায়। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষা কি এতই অর্ব্বাচীন? সংস্কৃত গ্রীষ্টিয়ের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও বাঙ্গালার ইংরাজের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের বহুশতবৎসর পূর্ব্ব হইতে বিরাট একটা বাঙ্গালা সাহিত্য যে ছিল, তাহা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিগণের কীর্ত্তিতে স্বতঃপ্রকাশ। এমন কি, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যেরও একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল। তবে বর্ত্তমান যুগে এই সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, গদ্যপদ্য উভয় সাহিত্যে নব ভাব, নব আদর্শ, নব শক্তি আসিয়াছে, ইহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই—অন্ততঃ অনেকেই—সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায়, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না, প্রাচীন আমল হইতে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিগত ধারা চলিয়া আসিতেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃত ব্যাকরণের বোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই। যে ত প্রাকৃতব্যাকরণ ইহার কতকগুলি লক্ষণ বুঝাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা প্রাকৃত ও পালিভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা

সম্ভবতঃ উপস্থিত প্রশ্নের সমাধান অতি সহজে করিয়া দিবেন। এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে কি? বর্ত্তমান লেখক শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃতব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁহার অজ্ঞতাই তাহার কারণ।

আধুনিক যুগের বাঙ্গালা লেখক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন যুগে দুই সম্প্রদায় বাঙ্গালা লেখক দেখা দিয়াছেন। এক সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ; যথা, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদি। অপর সম্প্রদায় ইংরাজীনবীশ; যথা, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি। (জীবিত লেখকদিগের নাম করিলাম না।) সাধারণতঃ ইংরাজীনবীশেরা সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের রচনায় দু'দশটা অপপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের রচনায়ও যে এরূপ দুষ্টপদ খুঁজিলে না মেলে, এমন নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে ডিগ্রীধারীরা ডিক্রী-জারী করিয়াছেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পাঁতি দিয়াছেন। আমার এক এক সময় মনে হয়, দেবীবর ঘটক যেমন প্রত্যেক কুলীনেরই এক একটা দোষ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কুলীন লেখকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকেরই এক একটা দোষ পাওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' জিনিসটা উঠাইতে গিয়া 'পৌত্তলিকতা' দুষ্টপদটা চালাইলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উভচর,' অক্ষয়কুমার দত্ত 'সৃজন', কালীপ্রসন্ন 'সক্ষম', বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' চালাইলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিতজনের 'রোমাবতী' আখ্যায়িকায় 'আত্মাপুরুষ', 'দুরাচারিণী'র, 'পিতাস্বরূপ', 'একত্রিত', এই সকল প্রয়োগ রহিয়াছে। কেন এমন হয়? ইহার কি কোন মীমাংসা নাই?

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে দুইটা দল আছে। এক দল সংস্কৃতরীতিশুদ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর দল অনেকপরিমাণে উদারপ্রকৃতি (liberal)। কিন্তু ইঁহাদিগকে দলে পাইয়া

* এ চার্জ্জ আমার মনগড়া নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই চার্জ্জ আনিয়াছেন। (আর্য্য ৩য় বৈশাখ-সংখ্যা দেখুন)। কৃষ্ণকমল বাবুর সংস্কৃতজ্ঞানে অবশ্য কেহ সন্দেহ করিবেন না।

বাঙ্গলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের গৌরব করিবার কিছু নাই। কেন না, ইঁহাদিগের এই উদারতা অবজ্ঞাজনিত। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালা একটা অপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পামরের ভাষা, পৈশাচিক ভাষার সামিল, অতএব বাঙ্গালায় এত বাঁধাধরা কি? বাঙ্গালায় সবই শুদ্ধ, সবই চল। এটা ভাষার জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে কোনও বাছবিচার নাই। এ ক্ষেত্রে ভাষার খিচুড়ী অবাধে চলিতে পারে।

এই মতই কি শিরোধার্য্য করিয়া লইব? বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধার্য্য করিব? যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই; না মানিলে উপায়ান্তরও নাই; কেন না, তাহার রোধ করা অসম্ভব। 'মনান্তর', 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতি পদ কথাবার্ত্তায় চলিলেও, সাহিত্যের ভাষায় চলিতে দিব না বলিয়া কোট ধরিলে সে কোট বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু লেখকসম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা, বা অনবধানের ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইতেছে, সেগুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে একটি কথা।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষা নূতনই হউক, পুরাতনই হউক, যতদিন তাহা জীবন্ত ভাষা থাকে, ততদিন ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া তাহার স্বাভাবিক-গতিরোধ করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, খরস্রোতা নদীর প্লাবন-নিবারণের জন্য এক স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ফল হয় নাই, আবার অন্যত্র বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। এইরূপ বাঁধের পর বাঁধ নদীপ্রবাহের গতির রহস্যটা বেশ বুঝাইয়া দেয়। সেইরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র, সূত্রের পরে বার্ত্তিক, তাহার পর ভাষ্য, তাহার পর টীকা, এই ক্রমিক চেষ্টা ভাষার ক্রমবিকাশের রহস্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন নূতন পদ আসিয়াছে, নূতন প্রয়োগের উদ্ভব হইয়াছে, অমনই নূতন নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সৃষ্টি ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি রুদ্ধ করিবার জন্য নহে; অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম

আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যখন ভাবের বন্যা বহিবে, তখন ব্যাকরণের পুরাতন বাঁধে সকল সময়ে তাহা আটকাইতে পারিবে না, বাঁধ ছাপাইয়া যাইবে। তবে যদি কোন মনস্বী কাঠযুড়ীর বাঁধের ন্যায় এমন শক্ত বাঁধ বাঁধিতে পারেন যে, চিরদিনের মত ভাবের বন্যায় ভাষার খাতে নূতন জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখক বাধা দিবেন না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী।

আমার কার্য্য অন্যপ্রকারের। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ব্যতিক্রমের রাশি রাশি উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা হইতে ব্যাকরণজ্ঞান, এবং ঋজুপাঠ হইতে সাহিত্যজ্ঞান সম্বল করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃতব্যাকরণে সুপণ্ডিত, তাঁহারা এই ভার লইলে বিচারবিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এ সকল হীন কার্যে হাত দেন না। তবে অন্ধমের অকৃতিত্ব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত অধিকারীরা যদি এ পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না। গালাগালিটুকু আমার উপরি পাওনা হইবে, মীমাংসায় লাভ হইবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের।

উদাহরণ-সংগ্রহ, প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজীনবীশ, পেশাদার ও সৌখীন, উপাধিধারী ও নিরুপাধি, সকল শ্রেণীর লেখকদিগের রচনা হইতেই করিয়াছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য জীবিত লেখকদিগের কোথাও নাম উল্লেখ করি নাই। তবে তাঁহাদিগের রচনা হইতে, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতে, যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিতে বিরত হই নাই; কেন না, আমার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতিনির্ণয়। যাঁহারা রচনাপ্রকরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দৃষ্টান্তমালা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি, উপরন্তু তাঁহাদিগের বিধান ও নিজের রচনা হইতেও উদাহরণ মিলিয়াছে। যে সকল লেখক এ কারণে বিরক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের আশ্বাসের জন্য বলিতে পারি যে,

বর্ত্তমান লেখকের নিজের রচনায় যে সকল দুষ্টপদ আছে, সে দৃষ্টান্তগুলিও ছাড় পড়ে নাই। এমন কি, কতকগুলি গলদ ভুক্তভোগী হিসাবেই প্রথম তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও সাহিত্যে যথেচ্ছাচার-নিবারণের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের উপকার ও উন্নতির জন্য, এরূপ অপ্রিয় আচরণ দোষাবহ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগতের স্থায়ী উপকারের জন্য জীবন্তপ্রাণিদেহব্যবচ্ছেদ (vivisection) পর্য্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না। ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

(১) বর্ণচোরা শব্দ।

অনেক লম্বপাটপটাবৃত লোককে হঠাৎ দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়; পরে বুঝা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইতর লোক। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির ভবিষ্যদ্বক্তা চেহারা দেখিলে হঠাৎ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে তাহাদের স্থান নাই। প্রবন্ধের প্রথমেই এগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

'আলুয়িত' বা 'এলায়িত' (সংস্কৃত 'আলুলায়িত'র সংক্ষেপ), 'উলঙ্গ' ও তস্য স্ত্রীলিঙ্গ 'উলঙ্গিনী' (বা 'উলাঙ্গিনী'); 'কুহেলিকা' বাঙ্গালার আকাশ হইতে কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া প্রহেলিকার ন্যায় প্রকাশমান; 'গাভী' (সংস্কৃত 'গবী'), 'গল্প', 'গোলমাল', 'গোলযোগ', 'চন্দ্রিমা' (সংস্কৃতে চন্দ্র আছে, চন্দ্রিকা আছে, চন্দ্রমাঃ আছে); 'চাকচিক্য', 'জালায়ন' (বাঙ্গালায় দেখাদেখি, 'জাল' সংস্কৃত), ঝটিকা (সংস্কৃত 'ঝঞ্ঝা' হইতে 'ঝড়', সম্ভবতঃ 'ঝড়ে'র প্রকৃত-মূল না জানাতে 'ঝটিকা'র উদ্ভব); 'ঝলকিত', 'ঝলসিত', 'তত্রাচ' ('তথাচ'র অশুদ্ধরূপ, 'তত্রাপি'), 'তাচ্ছিল্য' (সংস্কৃতে 'তাচ্ছীল্য' আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ, হয় ত 'তুচ্ছ' হইতে বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; 'কটুকাটব্য' সংস্কৃতে চলে), 'পুত্তলিকা', 'পৌত্তলিকতা' (সংস্কৃতে এ দুটি শব্দ নাই, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন; 'পুত্তল', 'পুত্তিকা' আছে); 'ভগ্নী' ('ভগিনী'র দ্রুত উচ্চারণ), 'ভয়শা', 'ভাস্কর্য্য' (সংস্কৃতে প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা অর্থে 'ভাস্কর' নাই), 'মতি', বা 'মোতি', ('মুক্তা'র, অপভ্রংশ), 'মর্ম্মন্তুদ' ('অরুন্তুদ'র দেখাদেখি), 'মাত্র' (সংস্কৃতে 'মাত্রা' আছে, 'মাত্রচ্' প্রত্যয় আছে, মাত্র শব্দ নাই,) 'মূর্চ্ছাভঙ্গ' (সম্ভবতঃ 'উৎসাহভঙ্গ'), 'রাণী' ('রাজ্ঞী'র অপভ্রংশ), 'বনানী' ('অরণ্যানী'র দেখা-দেখি), 'বালি' ('বালু'র অশুদ্ধ উচ্চারণ), 'বিদ্রূপ', 'ব্যবসা' (ব্যবসায়ের

দ্রুত উচ্চারণ), 'স্বীকার' (বাস্তবিক 'স্বীকারে'র অর্থবিশেষ নহে কি?) 'সৌদামিনী' ('দামিনী' ও 'সৌদামনী' সংস্কৃতে আছে), 'হুহুঙ্কার' (সংস্কৃত 'হুঙ্কার'; বাঙ্গালী বীরের জাতি, হুঙ্কারে কুলায় নাই, 'অভ্যস্ত' করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া লইয়াছে!)। তাম্রকূট (তামাক) কত দিনের?

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্. এ. মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায়) প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন, 'গঠিত' ('ঘটিত'র অপভ্রংশ), 'চমকিত' ('চমৎকৃত'র সংক্ষেপ), 'টিকা' ('তিলকে'র অপভ্রংশ), 'পুনরায়' ('পুনর্ব্বারে'র অপভ্রংশ), মাকুন্দ (মৎকুণের অপভ্রংশ) 'মিনতি' ('বিনতি'র অনুনাসিক উচ্চারণ) 'বিজলী' বা 'বিজুরী' ('বিদ্যুতে'র অপভ্রংশ), 'ব্যভার' ('ব্যবহারে'র দ্রুত উচ্চারণ) 'সরম' ('শরমে'র অপভ্রংশ)। অতএব এগুলিও বর্ণচোরা শব্দ।

(২) ভোলফেরা শব্দ।

১। বিসর্গবিসর্জ্জন করায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাগান-সমস্যায় দেখাইব। কতকগুলি হসন্ত শব্দ অজন্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগেরও ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাগান-সমস্যায় দেখাইব। দুই চারিটি সংস্কৃত শব্দ কেহ কেহ চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতে সেগুলিরও ভোল ফিরিয়াছে। যথা—কাঁচ, শাঁপ, পুঁয, পাঁচন। শেষেরটি পাঁচের দেখাদেখি (false analogyতে) হইয়াছে; বাস্তবিক ইহার পাঁচটি উপাদান নহে, ইহা পাচন (decoction) কথি।

ঁ অক্ষর অনুচ্চারিত হওয়া বাঙ্গালায় একটা সংক্রামক ব্যাধি; কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের শেষের অক্ষর বাঙ্গালায় আকারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, হসন্ত উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া লোকে এইরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ত্ব' 'ন্ব' উচ্চারণের চেষ্টা? উদাহরণ,—বণ্ড (বণ্ডা), মল (মলা বা ময়লা), চুল (চুলা), মূল (মূলা, দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য), তুল (তুলা, তুলাদণ্ডের দেখাদেখি), তল (তলা), গল (গলা), ফেন (ফেনা), অলক তিলক (অলকা তিলকা), মাম (মামা), পৃষ্ঠ (পৃষ্ঠা; 'পৃষ্ঠ' সাধারণ অর্থে আছে, কেহ কেহ বলিবেন, দুই অর্থের প্রভেদের জন্য দুইরূপ বাগান সুবিধা), চোর (চোরা), দার

(দারা, নিত্য বহুবচন দারাঃ বিসর্গলোপ ?) কণ্ঠ (চলিত ভাষায় কণ্ঠা) শিরোনাম (শিরোনামা), অষ্টমঙ্গল (অষ্টমঙ্গলা), একচ্ছত্র (একচ্ছত্রা), শকাব্দ (শকাব্দা), পরিক্রম (পরিক্রমা, যথা কাশীপরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা ইত্যাদি), সুন্দরকাণ্ড উত্তরকাণ্ড (সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড), নিষ্ফল (নিষ্ফলা, যথা রবিবার নিষ্ফলা বার, এ মেঘ পশ্চিমে মেঘ, নিষ্ফলা যাবে না।) নির্জ্জল (নির্জ্জলা, যথা নির্জ্জলা দুধ), চঞ্চল (চঞ্চলা, স্ত্রীলোকেরা বলেন, 'ছেলেটা বড় চঞ্চলা'), সভা-উজ্জ্বলা জামাই ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ নহে। কেহ যদি বলেন, এগুলি খাঁটী বাংলা 'আ' প্রত্যয়, তবে নাচার। 'বচসা'র ব্যুৎপত্তি কি ?

কয়েকটি স্থলে অলীক সাদৃশ্যের দরুণ (false analogyতে) আকার আসিয়াছে। 'হাওয়া'র দেখাদেখি বাঙ্গালায় 'মলয়া' ছুটিয়াছে (মলয়ানিলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ?), 'ছায়া'র আকার থাকাতে 'কায়া'র আকার প্রকট হইয়াছে। এই আকারের সঙ্গে আমাদের সাকারোপাসনার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে না কি ?

লিঙ্গবিচার।

সংস্কৃতব্যাকরণে লিঙ্গজ্ঞান সহজ নহে। ইহার দুইটি বিকট দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। পত্নীবাচক হইয়াও 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ (ও নিত্য বহুবচন)। চেলীর পুঁটুলি কপালে বরবধূকে দেখিয়া 'কলত্র'-শব্দের ক্লীবত্ব-নির্দ্দেশ ও কাছাকোঁচা-দেওয়া সারাঠী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া 'দার'শব্দের পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশ, (এবং এরূপ পুংপ্রকৃতি নারী একাই একশ বলিয়া নিত্য বহুবচনের ব্যবস্থা) হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগ—পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ।

১। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় শব্দরূপের সময় লিঙ্গজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগের বেলায় লিঙ্গনির্ণয়ের প্রয়োজন উভয় ভাষাতেই আছে, তবে সমপরিমাণে নহে। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ যে স্ত্রীলিঙ্গ করিতেই হইবে, বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি নাই। সাধারণ লেখকদিগের রচনায় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষণ দুই রকমই চলিত ; স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ থাকিলে কোনটা পুংলিঙ্গে কোনটা স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। অনেক সময় যেটা শুনিতে ভাল, সেটাই লেখা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর

মহাশয় শকুন্তলার বিশেষণ কখন পুংলিঙ্গ কখন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন। পুংলিঙ্গ বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া সেটাকে সমর্থনও করা যায়। 'অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা', 'অসাধু প্রবৃত্তি', 'অমূলক আশঙ্কা', 'প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি', 'সুখদায়ক কল্পনা', 'নিরর্থক ক্রিয়া', 'ভ্রমাত্মক ধারণা', 'সংস্কৃত ভাষা', 'প্রাকৃত ভাষা', 'সাধু ভাষা', ইত্যাদি বাঙ্গালার ধাতে বেশ সহিয়া গিয়াছে। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে ত সব গোঠাই চুকিয়া যায়। স্থানবিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ দিলে বিকট শুনায়। 'ভবিষ্যৎ পত্নী' বা 'ভাবী বধূ' না বলিয়া 'ভবিষ্যতী পত্নী' বা 'ভবিষ্যতী বধূ' বলিলে বাঙ্গালায় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। 'বৌটি প্রিয়মন্ত' না বলিয়া 'পয়স্বিনী' বলিলে কেমন শুনায়! ফল কথা, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রয়োগরীতি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে স্বাতন্ত্র্যটুকু রাখাই ভাল নহে কি?

২। তবে সাধারণতঃ এরূপ শিথিলতা চলিলেও, ইন্, বিন্, ভূন্, মৎ, বৎ, ফল্গু প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের বেলায় ইহা বড় কাণে লাগে। এ সব স্থলে সমাস করিয়াছি বলা ত চলে না; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপদের রূপান্তর হইত। এক জন নব্য কবি লিখিয়াছেন,—'যত দূরে যাও, তত শোভা পাও, ধ্রুবতারা জ্যোতিয়ান্'; আর এক জন নব্য কবি তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিয়া 'একতান মনঃ-প্রাণ' হইয়া লিখিয়াছেন,—'অশ্রুযুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিয়ান্'; এখানে 'অশুদ্ধ যা' ব্যাকরণ, তা' মাপ করিতে হইবে কি? 'বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি'তে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই কি? বাঙ্গালা গদ্যে পদ্যে 'মহৎ প্রতিভা', 'সারবান্ রচনা', 'বলবান্ যুক্তি', 'ওজস্বী ভাষা', 'মর্ম্মভেদী বর্ণনা', 'বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারা', 'দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা', 'বহুবর্ষব্যাপী ধনধারার বৃষ্টি', 'অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী পূজা', 'উপযোগী প্রণালী', 'স্থানোপযোগী প্রস্তাবনা', 'চিরস্থায়ী স্মৃতি', কিছুরই অভাব নাই, কেবল যা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব! বাঙ্গালায় কোথাও 'অভ্রংলেহী চূড়া' দেখিতেছি, কোথাও 'যোজন-ব্যাপী সুধাধিনগরী' দেখিতেছি, কোথাও 'ব্রহ্মপুত্র নদী' প্রবাহিত, কোথাও 'বলবান্ বা বেগবান্ শাখা'। এক দিকে 'অসিভল্লধারী মহারাষ্ট্রবামা' 'রাজোয়ারা নারী', অন্য দিকে 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'। 'জাগৎ দেবতা,' 'মূর্ত্তিমান্ দয়া', 'বিশ্বব্যাপী করুণা', 'মর্ম্মভেদী তীব্রতা', সবই সমান অসহ্য নহে কি? 'অপরাধী অভাগী জানকী', 'সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী'

এ 'সংস্থবিকেতা জেনেনী', এই ত্রিমূর্ত্তিরই সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। 'বিদ্বান্ ও গুণী ব্যক্তি' ত সর্ব্বত্র। পরন্তরে ইহাও স্বীকার করি, সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা 'ঋণী' না বলিয়া 'ঋণিনী' বলিলে, ধনটা অসহ্য হইত না কি? বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে 'ঋণী' না করিয়া 'ঋণিনী' করিলে প্রতাপ কি অধিকতর কৃতার্থ হইত?

৩। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকট, (পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ। 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে পরীয়সী স্বাধীন নরকবাস' এখনও থাকিয়া থাকিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি পরীয়সী'র সুরে কাণে বাজিতেছে। বাঙ্গালার আসরে কোথাও বা 'মোহিনী সঙ্গীত' বা 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' শ্রুত হইতেছে, কোথাও বা 'অমানুষী তত্ত্ব' উদ্ঘাটিত হইতেছে, কোথাও বা 'মানুষী প্রেম' উছলিত হইতেছে, কোথাও বা 'চিত্তহারিণী চিত্র' প্রদর্শিত হইতেছে, কোথাও বা 'মনোরঞ্জিনী সাহিত্য' সৃষ্ট হইতেছে ও 'সান্ত্বনাবিধায়িনী প্রবন্ধ' পঠিত হইতেছে, কোথাও বা 'শস্যশালিনী ভারতবর্ষের' 'উর্ব্বরা ক্ষেত্রে'র কথা বিবৃত হইতেছে, কোথাও বা 'গর্ভিণী জীবনান্ত' প্রলাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। কেহ 'রামায়ণী গল্প' লিখিতেছেন, কেহ 'ঐশ্বর্য্যশালিনী পূর্ব্বপ্রদেশে'র 'মহীয়সী মহিমা' কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ 'অমানুষী শ্রম' স্বীকার করিয়া 'বেগবতী চক্র' সবেগে ঘুরাইতেছেন। মেয়েলি ছড়ায় 'দূরবর্ত্তী ভাই'এর আবির্ভাব হইয়াছে। 'মর্ম্মভেদিনী দীর্ঘনিশ্বাস', 'নিদ্রাসহচরী মোহ', 'চিত্তহরণী কটাক্ষ', 'প্রেমময়ী মুখ', কিছুরই ত্রুটী নাই। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈলনির্ম্মাতে'র বাঙ্গালা সাহিত্যবৃক্ষ 'ফলবতী' হইতে আর বাকী কি?

ইমন্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ প্রেমের বেলায় কেবল ক্লীবলিঙ্গ বাঙ্গালায় চলিত। সেগুলিকে আকারান্ত দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গ ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। অসভ্যাগত শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (যথা চন্দ্রমাঃ) দেখিয়াও (বিসর্গ-বিসর্জ্জনে) এ গোল ঘটিতে পারে। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈল, চন্দ্রমুখী তৈল, সুকুন্তলা তৈল প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বিশেষণ না বলিয়া সংজ্ঞা বলিয়া ধরিলে গোল মিটিতে পারে। 'বাসন্তী রং' বা 'বসন্তী রং' খাঁটি বাঙ্গালা 'ই' বা 'ঈ'

---

* 'কলী ছেলে' না বলিয়া 'কলেজে ছেলে' বলিতে হইবে কি? ইহাও উহাকে বলিব, উপমাস্থলে এখানে সপ্তমীর আবির্ভাব, বিশেষণরূপে নহে। পুংলিঙ্গের প্রথমার দ্বিবচনে এ ভাবে।

প্রত্যয় ধরিলে চলে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত স্থলগুলি যে অসাবধানতার ফল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। আর এক জাতীয় উদাহরণ দিতেছি, সে সকল স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও সমাসবদ্ধ (অথবা প্রত্যয়ান্ত) থাকাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ 'সমস্ত' বা 'অসমস্ত' কোন ভাবেই সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মে চলিতে পারে না। অথচ পুংলিঙ্গ বিশেষণ বসাইলেও কেমন কেমন ঠেকে, উভয়-সঙ্কট। 'প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ', 'প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ', 'জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক', 'সধবা স্ত্রীলোক', 'কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়', 'গঙ্গাযমুনানায়ী নদীদ্বয়', 'ধৈর্য্যশীলা বধূকুল', 'পয়স্বিনী গাভীকুল,' 'অন্তঃপুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ', 'বীর-বিনোদিনী বামাগণ', এগুলি লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। প্রথম দুইটি উদাহরণে 'বৎ' প্রত্যয় ও স্বরূপের পরিবর্ত্তে 'মূর্ত্তির বা পত্নীর ন্যায়' লিখিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তৃতীয় চতুর্থ স্থলে 'স্ত্রীলোক' 'স্ত্রীজাতি' বলিয়া সামলান যায়; অন্যগুলিতে 'দ্বয়' 'কুল', 'গণ' উঠাইয়া দিয়া খাঁটী বাংলা বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ' 'রা' বসাইলে হাঙ্গামা মেটে। কিন্তু এ মীমাংসা কি টিকিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ সকল স্থলে সমাস হয় নাই, 'গণ', 'কুল', 'সমূহ', 'সকল', ইত্যাদি বহুবচনের চিহ্ন, বিভক্তি (inflection)। ('দ্বয়' শব্দ কি দ্বিবচনের বিভক্তি?)

স্ত্রী প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ দেখা যায়। কবিতায় ও গানে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—দিগম্বরী, প্রেমাধীনী, সুচিরযৌবনী (হেমচন্দ্র) ইত্যাদি; 'নীলবরণী' (বরণ শব্দ অপভ্রংশ হওয়াতে) খাঁটী বাংলার নিয়মে চলিতে পারে। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে 'চতুর্থী কন্যা, পঞ্চমী কন্যা, ষষ্ঠী (বা ষষ্ঠমী!) কন্যা, সপ্তমী কন্যার দর্শনলাভ নিত্য ঘটনা। এক ষষ্ঠী কন্যার পিতাকে এই ভ্রম দেখাইতে গিয়া জবাব পাইয়াছিলাম—"তিথির বেলায় যা' হইবে, কন্যার বেলায়ও কি তাই হইবে? কন্যা ত আর মা ষষ্ঠী নহেন! একাদশী কন্যার বেলায় কি 'একাদশী' লিখিয়া অকল্যাণ করিব?" এ উত্তরে আমি নিরুত্তর হইয়াছিলাম, কিন্তু বৈয়াকরণ নিরুত্তর হইবেন কি? এই ষষ্ঠী কন্যার পিতাকেই আবার বেহাইনকে 'বৈবাহিকী' পাঠ লিখিতে

দেখিয়াছি! স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার সময় অনেকে বিশুদ্ধ করিয়া মঙ্গলাস্পদা, কল্যাণভাজনা, ইত্যাদি পাঠ লেখেন। আস্পদ, ভাজন যে অজহল্লিঙ্গ, তাহা খেয়াল থাকে না। অনেককে 'রঙ্কী' 'নর্ত্তকী'র ন্যায় 'পাচকীর' চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। ব্যাকরণ অভিধানে যাহা মেলে না, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে পাইলেন কি না, জানি না। 'ভ্রমরী' 'চমরী'র পালের সঙ্গে 'অমরী' অপ্সরী'র আমদানী হইতে দেখি, রাজ্ঞীর দেখাদেখি 'সম্রাজ্ঞীর'ও অভ্যুদয় হইয়াছে, 'উদাসীনী' রাজকন্যাও বিরল নহে। ব্যাকরণ মানিতে হইলে, 'প্রেমাধীনী', 'দিগম্বরী', 'সুচিরযৌবনী'দের কি দশা হইবে? 'নীলাম্বরী শাড়ী' লইয়াই বা কি হইবে? 'বধূবেশী সতী', 'অপূর্ব্ববেণী কন্যা,' লিঙ্গবিপর্য্যয়ের উদাহরণ, না স্ত্রীপ্রত্যয়ে প্রমাদ, কে বলিয়া দিবে? এ সব স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিব, না অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণে এগুলি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে?

২। 'ইনী' প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ পদ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, সেগুলির সংস্কৃত ব্যাকরণে অস্তিত্ব নাই। চণ্ডীদাস 'রজকিনী'র চল করিয়াছেন। সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনুপ্রাস অলঙ্কারের খাতিরে (কুতুকিনী) 'চাতকিনী' কাব্যাকাশে উড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যারণ্যে 'পদ্মিনী', 'শঙ্খিনী' ও হস্তিনী'র সঙ্গে সঙ্গে 'নাগিনী সর্পিণী মাতঙ্গিনী ভুজঙ্গিনী বিহঙ্গিনী'র বহুলসমাগম; তরঙ্গিণীর কূলে 'কুরঙ্গিণী' বিচরণ করিতেছে; আশঙ্কা হয়, কোন্ দিন 'পুরুষিণী কোকিলিনী'রও সাড়া পাইব। ব্যাকরণের হিসাবে ব্রজের 'গোপিনী' ও কাণাচের 'প্রেতিনী', 'পিশাচিনী' একই পদার্থ। 'উলঙ্গিনী'* ও 'পাগলিনী'র মত খাঁটী বাঙ্গালিনী কাঙ্গালিনী, তাহার সাত খুন মাপ। 'ননদিনী' বাঙ্গালার একটি অদ্ভুত জীব: 'ইন্দ্রাণী, সর্ব্বাণী, রুদ্রাণী'র পাশে 'শূদ্রাণী' 'নাপিতানী' 'পণ্ডিতানী'কেও স্থান দিতে হইবে কি? 'সুকেশিনী', 'শ্যামাঙ্গিনী' বা 'শ্বেতাঙ্গিনী' বা 'হেমাঙ্গিনী' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে কেহ শুনিবেন কি? 'অনাথিনী' 'নির্দ্দোষিণী' 'নিরপরাধিনী', দুরাচারিণী', 'চৈতন্যরূপিণী', 'জ্ঞানস্বরূপিণী' প্রভৃতি লইয়াও বড় মুস্কিল।

খাঁটী বাংলা শব্দে খাঁটী বাংলা ইনী প্রত্যয় দিয়া কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয় বটে, যথা উলঙ্গ উলঙ্গিনী, কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, পাগল

* বর্ণচোরা শব্দের কর্দ্দ দেখুন।

পাগলিনী (পাগ্‌লী), গোয়াল বা গোয়ালা গোয়ালিনী ; কিন্তু সংস্কৃত শব্দের উত্তর খাঁটী বাঙ্গলা প্রত্যয় করিয়া সোনার পাথরের বাটী গড়া উচিত কি ? এরূপ দোআঁশলা শব্দের (hybrid word) প্রয়োজনই বা কি ? কতকগুলি কবিপ্রয়োগ (l'oetic license) বলিয়া সোঢ়ব্য হইলেও গদ্যের ভাষায় চলিবে কি না, তাহাও বিচার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ আছে, ইহা ইংরাজীনবীশ সম্প্রদায়ের হাল আমদানী নহে।

ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ লইয়াই যখন এই বিভ্রাট, তখন আবার পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ভেদের জের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় চালাইতে গেলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে কোষ বা লিঙ্গানুশাসন ঘুষিয়া বলবান্ নিয়ম, বলবৎ প্রমাণ, বলবতী যুক্তি, হৃদয়স্পর্শি প্রবন্ধ, হৃদয়স্পর্শী বাক্য, হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা, এত ধরিয়া লেখা চলিবে কি ? বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ যত সহজে লক্ষণে চেনা যায়, পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদ তত সহজে ধরা যায় না। অতএব বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবই পুংলিঙ্গ, এইরূপ একতরফা ডিক্রী দিলেই আমার যেন ভাল বোধ হয়। *

ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী।

(১)

আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী ;
ডাকিনী, বাঘিনী তারা বিমাতা-রূপিণী।
"সব খান—খেতে হবে"—দুরন্ত ঝটিকা-রবে,
সারি সারি ফণা তুলি' দাঁড়ায় নাগিনী !
বিন্ধ্যগিরি এ মিষ্টান্ন ! ক্ষীরনিধি পায়সান্ন !
আমি বুঝি কুম্ভকর্ণ, বল আদরিণী ?
গুড়ের হাঁড়িতে পড়ি' এই বুঝি যাবে মরি !
সাগরে ডুবিয়া যাবে ক্ষীণ তরঙ্গিণী !

---

* এই পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

দেখেই তো চক্ষুঃস্থির! হস্তে লয়ে ধনুর্ভীর,
সমরে নেমেছে যেন দানবদলনী!
সক্ সক্ লোল-জিভা যেন ত্রিনয়নী শিবা!
অসিকরা, ভয়ঙ্করা!—কম্পিতা অবনী!

২

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটি নন্দিনী,
দেবেন্দ্রের সাত কন্যা, জননী-রূপিণী!
ব্যাধি মোরে ধরিয়াছে, ছায়া তুল্য কাছে কাছে,
তাই দাঁড়াইয়া আছে ত্রিতাপহারিণী।
বিষাদে সরে না বাণী, কাঁদিছে কোমল প্রাণী,
পাষাণ ভেদিয়া যেন ধায় নির্ঝরিণী।
গিয়াছে গিয়াছে জানা, এই বেদনার দানা
প্রীতি-কাশ্মীরের—হেন দু'চক্ষে দেখিনি!
গান্ধার তো বহু দূর, রসে ভরা এ আঙুর
শ্রদ্ধা-কাবুলের বুঝি, বল্ সোহাগিনী?
অলোকসামান্যা ধন্যা, তোরা সাত দেব-কন্যা
সাত শ্বেতভুজা, সাত ত্রিভঙ্গীবাদিনী!
ও তোর চরণস্পর্শে হৃদিপদ্ম ফোটে হর্ষে;
সাতটি ইন্দিরা তোরা আনন্দরূপিণী,
আমার কবি-ভ্রাতার সাতটি নন্দিনী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

চিত্রশালা।

ভগ্ন কুটীর।

ভগ্ন-কুটীর স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রিত একখানি তৈলচিত্রের ক্রৈবর্ণিক প্রতিলিপি। হিতেন্দ্র বাবু একাধারে কবি ও শিল্পী; তিনি তাঁহার এই সুন্দর চিত্রখানির "ভগ্ন-কুটীর" নামকরণ করিয়াছেন। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়,—পল্লীপথ-পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীর কালের কুঠারাঘাতে সম্মুখে হেলিয়া পড়িয়াছে; পল্লীসুলভ স্বভাবজাত বন্য তরুগুল্মাদি কুটীরটির পশ্চাতে ও পার্শ্বে চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। স্থানটি দেখিয়া বোধ হয়,

ইহা কোনও গ্রামের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রান্তে অবস্থিত। আরও বোধ হয়, যেন কুটীরস্বামী ইহার অন্তিম দশা দেখিয়াও এখনও সম্পূর্ণভাবে ইহা পরিত্যাগ করেন নাই। এখনও যেন ঐ বিশীর্ণ পর্ণাচ্ছাদনের মধ্যে কোনও দীন কুটীরাধিকারী তাহার দুঃখের দিন কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া থাকে। সম্মুখে বিস্তৃত ক্ষেত্র। তাহার পশ্চাতে দূরে বিবিধবৃক্ষলতাদিসমাচ্ছন্ন ভিন্ন গ্রামের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। সকলের পশ্চাতে দিগন্তপরিব্যাপ্ত আকাশ। কুটীরের সম্মুখে জনৈক কবিহৃদয় দর্শক সংসারের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও কুটিল কালধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে করিতে যেন মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

চিত্রখানির এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে Rural Landscape Painting 'অর্থাৎ পল্লীচিত্র' বা 'পল্লীনিসর্গচিত্র' শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। ইহার পাত্র-সমাবেশ (Composition) বেশ সুন্দর হইয়াছে। এই ত্রিবর্ণ-প্রতিলিপির বর্ণবিকাশ দেখিয়া মূলচিত্রের বর্ণসম্পাতও যে সুন্দর, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কারণ, এ দেশে এখনও ত্রিবর্ণ-চিত্রে মূলের অনুরূপ বর্ণের বিকাশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি এই প্রতিলিপিও মন্দ নহে। পারিপ্রেক্ষিতিক বিশুদ্ধি ইহাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বিজ্ঞানানুসারে সম্মুখের ও দূরের দৃশ্য যেমন সহজে অনুভূত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাও শিল্পী ঐ কুটীরটির 'পাতার চাল', যাহা ঔদ্ধিক পরিপ্রেক্ষিত (Accidental or Aerial perspetive) বিজ্ঞানের নিয়মে অঙ্কিত করিতে হয়, তাহাও অনেকটা শুদ্ধ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। অধুনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পিগণের অনেকেই এই ঔদ্ধিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না; অথবা অনেকেই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। তবে আলোকচিত্রের (Photograph) অনুকরণ দ্বারা আজকাল অনেকটা সুবিধেই এই সকল বিষয় বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এই চিত্রখানির সম্মুখভূমি (foreground) নিসর্গচিত্রের বিধি অনুসারে সুচারু-রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শিল্পী এই অংশে চিত্রকলার দুইটি প্রধান নিয়ম রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই। একটি নিসর্গচিত্র মধ্যে, যথায় শৈলাদির আদৌ সমাবেশ নাই, বা শিলা-সংখ্যা বিরল, অথবা তড়াগাদিও নাই, তথায় চিত্রের সম্মুখ-ভূমি-মধ্যে স্থানে স্থানে ষড় ঋতু ও মৃত্তিকার বর্ণভেদে তৃণ দূর্ব্বা

ও গুল্মাদি চিত্রিত করিতে হয়। তাহাকে প্রতীচ্য শিল্পীর পরিভাষায় Turfing বা Verdure বলে। অন্যটি, "উচ্চ সম্মুখভূমি" (Terraces); এই উভয়বিধ কার্য্যের দ্বারা চিত্রের দূরত্ব ও দূর-দৃশ্যের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীভূত হয়। এ চিত্রে তাহা বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দূরের নারিকেল বৃক্ষগুলি দূরত্ব হেতু আরও অস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। দূরের অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত উহাদের সেরূপ মিল নাই। উহার তীব্র সীমারেখাসমূহ এমন মনোরম চিত্রখানির সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে হিতেন্দ্রবাবুর আরও দুইখানি চিত্রের সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখানি সে দুইটি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বোধ হয়, এগুলি তাঁহার পরলোক-গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই চিত্রিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

জীবন-সোপান।

১

গৃহ-চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর,
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে?

২

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ,
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

৩

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা— তোমারি কি হোম-শিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

৪

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি অসাধনা ?
এই কাম, এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ ?
লোভে মোহে হতেছে কি তোমার ধারণা ?

৫

জগদ্-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায় ?
বই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে ;
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

৬

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল ;
অমনি কি দেহ-শেষে আসিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুখ-ভুল ?

৭

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—
কহ দয়াময় !
উঠিয়া গর্ব্বত-চূড়ে, ধরণীরে হেরি' দূরে,—
পথের ত দুখক্লেশ ভ্রম মনে হয় !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কর্ণাট।

১

বেঙ্গলুর কর্ণাট দেশের মধ্যে এক্ষণে প্রধান নগর। আমাদের প্রতিবেশী সেনানিবাসী মহাশয়ের পুত্রে কৃষ্ণমূর্ত্তির নামে লিখিত পরিচয়-পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি যাহাকে বাস মনোনীত করিয়া দিতে কহিলেন, তাঁহার বিবেচনায়, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মশালা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উকীল কহিলেন, সে স্থান দেখাইয়া দিলে তাঁহার শিষ্টাচারের হানি হইবে। কৃষ্ণমূর্ত্তির ব্রাহ্মণ-দেহ, গৌর, বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়।

এই স্থান ঘাট-গিরিযুগলের মধ্যস্থ মালভূমির ঊর্দ্ধে অবস্থিত; সমুদ্রতল হইতে দুই হাজার পাদ উচ্চ; অপেক্ষাকৃত শীতল ও অনাময়। রাত্রিকালে বিলক্ষণ শৈত্য বোধ হইতে লাগিল। বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি সেনা সহ এখানে বসতি করেন। মহিসুর রাজ্যের বিচার-বিভাগ এখানে অবস্থিত। সমগ্র মহিসুর প্রদেশ আটানব্বইটি নগর ও ১৬৭৮৪ গ্রামে বিভক্ত। ভূ-পরিমাণ, আনুমানিক ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল। রাজ্যের আয়, এক কোটীর অধিক। এখন আর শস্য দ্বারা রাজস্ব গৃহীত হয় না। এক সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক ও দুই সহস্র প্রহরী দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছে। রাজা বার্ষিক তের লক্ষ টাকা বৃত্তি পান। দেওয়ান শেষাদ্রি আইয়ার মাসিক সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া রাজার নামে ভারত-সম্রাটের অধীনে তাঁহার প্রতিনিধির পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রশাসন করিতেছেন। মহিসুরের রাজা ও রাজার গবর্মেণ্ট পৃথক সামগ্রী। নৃপতির অতিরিক্ত ব্যয় ও দুর্গসংস্কার করিতে হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রশাসককে জানাইতে হয়।

আমরা প্রথমে লালবাগ দর্শন করিতে যাই। উপবন সৌন্দর্য্যশালী করিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, দুর্ব্বাক্ষেত্র, গালিচা, ফিতা, নকলই প্রস্তুত। হক অর্কেয়িয়া, ম্যাগনোলিয়া, ক্যামেলিয়া ও রোটিকাবৃক্ষ না থাকিবে কেন? বাজারে যে সকল তরকারী বিক্রীত হইতেছে, তাহার সকলগুলি আমাদের পরিচিত নহে। কাশ্মীরের 'সেও' এখানে রোপিত হইয়া অন্নগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মিষ্টান্নের মধ্যে, এ দেশে একমাত্র মহিসুর পাফ্ উল্লেখযোগ্য। এই জন্য, হিন্দুস্থানী মিষ্টান্নকারগণ স্থানে স্থানে তাঁহাদের দেশীয় পক্কান্ন বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে। রসনাকে তৃপ্ত করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতে হইলে অনেকক্ষণ আড়ম্বর করিতে হয়। সম্প্রতি 'আলবুমেন' ও 'প্রোটিড' যে প্রকারে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে আশা হয়, অন্নযান, জলযান, যন্ত্রকারযান ও অঙ্গারবাষ্প দ্বারা শীঘ্র রাসায়নিক কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত হইবে। কিন্তু তাহাতে বিবিধ স্বাদসুখ মিলিবে না। সুতরাং রুচি ও ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যাঘাত করিবে।

দুর্গমধ্যে হায়দার আলির পিতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্ম্মিত জনাশ্রম আছে। এখানে মহারাজের বন-বিভাগের লেখশালা প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয় ও 'ইনাম' বন হইতে গৃহীত চন্দন বৃক্ষ আনীত হইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ড কাগজ দ্বারা বেষ্টিত। এই দারুসম্ভার নিলামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস মন্দির-সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইল। দেবালয় যদি করিতে হয়, এবং তাহাতে দাতব্যশালা থাকিলেও তৎসহ পুস্তকালয় করিয়া দিলে, জ্ঞানদানের পথ প্রশস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য মথুরার শেঠ দেবভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। পুস্তকালয়ের দ্বারে তত্ত্ব-সভার যন্ত্র অঙ্কিত। বেঙ্গলুর নগরে প্রকাশিত দুইখানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র আছে। দেশীয় ভাষায় লিখিত কোনও কাগজ দেখিলাম না। কেবল রাজার গবর্মেণ্ট গেজেট,—তাহা মূল না অনুবাদ, বলিতে পারি না,—সেই অভাব পূরণ করিতেছে।

চিত্রশালিকায় হলেবিদ্ হইতে আনীত প্রস্তরের কারুকার্য্য অতি মনোহর। তবে, অর্বুদাচলের মত হইতে পারে না। শিবসমুদ্র ও কৈটভেশ্বর মন্দির দর্শন করিবার বাসনা ছিল, এই স্থানে তাহা পূর্ণ করিয়া লইলাম। সৌরচিত্রে কাবেরী প্রপাতকে অধিকতর সুন্দর বা কুৎসিত করিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব?

রাজহর্ম্ম্য ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজা ও রাণীর প্রকোষ্ঠ দর্শন করিয়া আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। রাজপুত্র ও রাজকন্যার পৃথক পাঠাগার ও পরিচ্ছদ-গৃহ আছে। রাজার পুস্তকালয়ের নিকটেই 'বিলিয়র্ড'-শালা। গৃহোপকরণের মধ্যে উদ্যানবৎ তরুবিতান ও গল্পের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। শয়নগৃহে স্ফটিকনির্ম্মিত খট্টা; ইহা আমি কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দর্শন করিয়াছিলাম। তদুপরি কৌষেয়-রচিত শয্যা শোভা বিস্তার করিতেছে।

রাজার প্রকৃতি নম্র। তিনি বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে সম্মান বা ভয় করিয়া থাকেন। প্রতিনিধির নিবাস, পালঘাট। তত্রত্য ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন দেখিয়া অপরেরা অসূয়াপর হইয়া উঠিতেছেন।

মহিসুর রাজ্যে কোলার প্রদেশের নানা স্থানে স্বর্ণখনি আছে। তাহা হইতে মাসিক বারো লক্ষ টাকার সুবর্ণ উত্তোলিত হইয়া ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ভারতে হিরণ্যের আধিক্য করিতে দেওয়া হয় না। খনি-সম্ভূয়ের অংশপত্র বিদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। তবে মহিসুর-রাজ কতকগুলি অংশখণ্ড গ্রহণ করিতে পাইয়াছেন।

রাজার প্রতিনিধি-সভা ৩৪০ জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। তাহাতে

ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচার ও কফি প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রয়োজন ও প্রজার হিতাহিত সমালোচিত হইয়া থাকে। দেওয়ান উপস্থিত থাকেন। বৎসরে চারি দিন মাত্র সার্ব্বজনিক সভার অধিবেশনের কাল নির্দ্ধারিত আছে। সচিব শেষাদ্রি বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। আয় ও ব্যয় সমালোচিত হয়। সে বিষয়ে প্রতিনিধিগণের সম্মতি-সংখ্যা গণনা করিয়া কাজ করিবার নিয়ম নাই। রাষ্ট্রের জন সংখ্যা ৫০ লক্ষ। প্রধান প্রধান স্থানে যাঁহারা এবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১০৩৯। নির্ব্বাচন প্রথার স্বরূপ কি, এই সংখ্যা হইতেই তাহা বুঝা যায়। মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অবশ্য প্রজার নাই। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থায় জন-সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইবার নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ হীনবল হওয়ায়, সমুদ্রজাত মেঘ মহিসূরে প্রবাহিত হয় নাই। উত্তর-পূর্ব্ব-মৌসমী-বায়ু-চালিত পর্জ্জন্যও বিমুখ হইয়াছে। ফলে শস্যক্ষেত্র প্রান্তরে পরিণত, সরোবর শুষ্ক, তৃণাভাবে পশু বিগতপ্রাণ, মানব দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হইয়াছে। রাজা কর-গ্রহণ কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে শস্য আহরণ করিয়া আনয়ন করিতেছেন। অবাধবাণিজ্য না থাকিলে লোকে প্রাণ হারাইত। বাণিজ্য ও নীতি, অতি জটিল। রাজনীতি উহাতে সম্বদ্ধ হইয়া কার্য্য করে। সবাধ ও নির্ব্বাধ, কোথায় কি প্রয়োজনীয়, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। এখানে আমাদের হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে বাতাবরণে তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। তৎকালে উহা মেঘধারণে অক্ষম হয়। তখন কুজ্ঝটিকা বা মেঘ বৃষ্টি-রূপে পতিত হইতে থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অক্ষ দ্রবিড়ের মত, কর্ণাটে ঘূর্ণীবায়ু উৎপন্ন হইতে পারে না। পরস্পর-বিপরীতগামী ঝটিকা-প্রবাহ মিশ্রিত হইলে, উহা ঘটে। ঘূর্ণীবায়ু জলে পতিত হইলে জলস্তম্ভ হয়।

মহিসূরের প্রাকৃতিক অবস্থা স্কটল্যাণ্ডের তুল্য। এক জন মুসলমান মক্কাযাত্রী তথা হইতে কফী ফল আনয়ন করিয়া সামান্য কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অধুনা, স্কচ বণিকগণ প্রভূতপরিমাণে কফী উৎপাদন করিতেছেন। ইয়ুরোপীয় বণিকগণ মহারাজের প্রতি বিলক্ষণ প্রসন্ন। তাঁহারা কহেন, এই রাজ্য স্বায়ত্তশাসনসুখ ভোগ করিতেছে। বস্তুগত্যা ভারতে ইহা অন্যতর আদর্শ রাজ্য। ঋণগ্রস্ত কৃষিজীবী বিচারালয়ের ব্যয় সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া, বিবাদ-মীমাংসার জন্য পল্লীসমাজ

আহূত হইয়া থাকে। শিল্পের উন্নতিকল্পে ক্রিয়াসিদ্ধ উপদেশ দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অসহায় বৃদ্ধদিগকে অবদান-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রেশম ও লৌহের ব্যবসায় লাভজনক হইবে না, বিবেচনা করিয়া, তাহার প্রতি আর মনোযোগ নাই। দেওয়ান প্রতিনিধি-সভায় বাল্য ও বার্দ্ধক্য বিবাহ নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কর্ণাটপতি পণ্ডিতরত্নম্ কস্তরী রঙ্গাচারীকে প্রয়াগের সামাজিক সম্মিলনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রযাত্রার বৈধতা ও বাল্য বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবেন। মঠের মোহন্ত-নিয়োগ সম্বন্ধে রাজ-সম্মতি প্রয়োজনীয়, প্রতিনিধি-সভা এই প্রস্তাব করিয়াছেন। এই রাজ্যে আট শত দেবমন্দির ও সপ্ততি সত্রের, জীর্ণসংস্করণের জন্য বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের জন্য ভারত গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা হয়। চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি হইয়াছে। ধর্ম্মাম্বুধি সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইবে।

মহিসুর কর্ণাটপতির রাজধানী। আমরা নন্‌জরাজ ভূম্যধিকারীর ছত্রে আশ্রয় পাইলাম। ভারত-রাজপ্রতিনিধির সমাগম-উৎসব উপলক্ষে মণিকার গোপীনাথ চেন্নপট্টন হইতে আসিয়া এই বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দুগ্ধ আহরণ করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সে অভাব দূর করিলাম। তিনি তাঁহার সূপকার দ্বারা আমাকে কয়েকখানি ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিলেন। কচুর শাক দিয়া ডাইল পাক করিয়াছে। ইহা কটুরসে লঙ্কা ও তিন্তিড়ী সহযোগে প্রস্তুত পানীয়ের তুল্য, সুতরাং আমাদের অখাদ্য।

ভোজনে তৃপ্তি না হইলে, বহির্দেশে যাইয়া, দ্রাবিড়ভোগ্য তিলপক্ক সলুরী ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগে লুচি ভাজিতে দেখিয়া এক জন চমৎকৃত হইলেন! ঘোল দিয়া ভাত পাইলেই তাঁহার যথেষ্ট। এক ডাইল ভিন্ন মাংসপেশী-নির্ম্মাণকারী, যবক্ষারজানময় খাদ্য নাই।

আমাদের রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা সিমলা শৈল হইতে অবতরণ করিয়া শারদীয় ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ভূপালের বেগম জানাইয়াছেন, "গতবারে লেডী ল্যান্‌সডাউন আসিতে পারেন নাই; এবার রেল-ষ্টেশনে আপনার সাক্ষাৎ হইলে কৃতার্থ হইব।" বেগমের রাজ্য দিয়া আসিবেন, অথচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, ইহা অপমানজনক। ছোট সাহেব অবতরণ করিয়া আহার করিলেন। লক্ষ টাকা ব্যয় হইল।

তিনি নিজামের রাজধানীতেও গিয়াছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যের জন্য ষোল শত যোধ-রক্ষণের ব্যয় দিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বতন রাষ্ট্রপতিগণ সাধ্যপক্ষে, সম্রাট-স্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। মহিস্থর রাজকে এই উপলক্ষে দুই চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দজ্ঞাপক পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহারাণীর হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়,—হিন্দু বলিলে জাতি আসে, তজ্জন্য ইহার নাম হিন্দু না হইয়া জাতি-ঘটিত পাঠশালা হইয়াছে,—এবং রাজপথের অধিকাংশ প্রকোষ্ঠ মাঙ্গল্যভাবসূচক পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছে। পথিমধ্যে কয়েকটি বিজয়-তোরণ লতাপল্লব ও পুষ্পদামে সজ্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কর্ণাটের আকারে আপাদমস্তক চন্দ্রমল্লিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। বনমালী বাবু কহিলেন, আমরা যখনই আসি, প্রতিবারেই হেমন্তসুন্দরী-বিভূষিত পুরদ্বার দর্শন করি। ব্যাঙ্গালুরুটন নগরের মার্কুইস, মহিস্থরপতি চমরাজেন্দ্র ওড়েয়রের সহিত চতুরশ্বযোজিত এক যানে উপবেশন করিয়া, অগ্রপশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন। অগ্রে গজোপরি রৌপ্যবিনির্ম্মিত-চক্কা ও উষ্ট্রসজ্জা গিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। প্রতিহারীর দল মৎস্যলাঞ্ছিত সুবর্ণযষ্টি ও রৌদ্ররোধক আনতভাবে বহন করিতেছে। তন্মধ্যে কর্ণাটেশ্বরের দ্বিগ্রীব পক্ষিধ্বজ সভয়ে বক্র হইয়া চলিতেছে। পণ্যবীথি পীতরেখাবিশিষ্ট-কৃষ্ণাম্বর-পরিহিতা, অনবগুণ্ঠিতা, মণিমুক্তাধারিণী শ্যামাঙ্গীদের প্রদর্শনীক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা এক্ষণে ক্রমশঃ শূন্য হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে মঞ্চরচনা করিয়া, আপাদলম্বিত-শ্বেতবস্ত্রধারী রোমীয় খ্রীষ্টান প্রচারক ছাত্রসমূহ লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; করবস্ত্র আন্দোলন সহকারে তিন বার আনন্দধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। জনতার মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। লোকতরঙ্গ ভেদ করিয়া রাজভবনের সম্মুখীন হইলাম। বৃহৎ প্রাঙ্গণে, অশ্বারোহী সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তৎপরে চাকচিক্য-বিশিষ্ট-ভল্লধারী, তদনন্তর পদাতিক সৈন্য, সর্ব্বশেষে রাজনামখ্যাপনকারী ও ধ্বজবাহকগণ। স্থানে স্থানে ছত্রধারিগণ ও এক পার্শ্বে সজ্জিত হস্তিযূথ উপস্থিত। তাড়িত আলোকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল অংশুমালায় সকলই আচ্ছন্ন। বিজয়ার দিনও এইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। মহারাজ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রাসাদোপরি হস্তিদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন

করেন। তোপধ্বনি হইতে থাকে। ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, বাদ্যধ্বনি হয়। সেনাগণ জয় উচ্চারণ করে। তাহার পর রাজা সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণতি করেন। এক্ষণে সে কথায় প্রয়োজন নাই। বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও গবর্ণর উপরে সেই স্থলে আসীন। কুর্গবাসীর সামরিক নৃত্য দেখিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

পর-রজনীতে আগ্নেয়ক্রীড়া ও দীপান্বিতা উৎসব। দেবরাজ হ্রদের বক্ষে তরণীর উপর রঞ্জিত কাচাধারে আলোকের দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা ঘূর্ণ্যমান হইলে, জলাশয়ে রামধনুবর্ণে চিত্রিত প্রতিবিম্ব অতি রমণীয় দৃশ্য ধারণ করিতে লাগিল। দুর্গোপরি নবরত্নের মত রঞ্জিত কাচপাত্রের আলোকবর্ত্তিকা-সমাবেশ, তামিস্রের মধ্যে, অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কারবৎ প্রতিভাত। এই চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, নাট্যশালার পার্শ্ব দিয়া পান্থ-নিবাসে উপসীত হইলাম। একবার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া, দূরস্থ দীপমালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। নিকটে তেমন দেখায় না।

জগন্মোহন নামক অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলির প্রাচীরে অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র সমুদায় সুসজ্জিত।

যে চামুণ্ডা শৈলের সানুদেশস্থ বিস্তীর্ণ উপত্যকা-মধ্যে এই নগর স্থাপিত, সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে মেষ ও কুক্কুট বলি প্রদত্ত হয়। এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও রাজা-দিগের কুলদেবী চামুণ্ডা মহিষাসুরকে নিহত করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্নিকটে পুরোহিতদিগের বাস ও রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণের জন্য বিশ্রামভবন। দেবী প্রস্তরময়ী, অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। বঙ্গদেশের ন্যায় দশভুজা নহেন। নবরাত্রিতে বিশেষ সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন ও সরস্বতী মূর্ত্তি সহযোগে মৃণ্ময়ী মাকে বাঙ্গালী যেমন ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া দেশের মা বলিয়া বন্দনা করিতে পারে, এখানে তেমন শারদীয় উৎসব হয় না।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

হিন্দী সাহিত্য।

পৃথ্বীরাজ-রাসো।

"পৃথ্বীরাজ-রাসো" বোধ হয় হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রাচীন মহাকাব্য। ভারতের শেষ ক্ষত্রিয় নরপতি বা সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের সভাকবি ভট্টবংশীয় "চন্দ বরদায়ী" এই প্রায় লক্ষশ্লোকপরিমিত মহাকাব্যের রচয়িতা। শাহবুদ্দীন ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধঘটনা এই মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়; রাজপুতসমাজে এই মহাগ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। ভট্টকবিগণের মুখে এই মহাকাব্যের বীররসপূর্ণ কবিতাবলী শ্রবণ করিয়া রাজপুতের হৃদয়ে অদ্যাপি প্রাচীন বীরগৌরব সমুদ্দীপিত হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক টড্ এই গ্রন্থকে invaluable as historic and geographical memoranda, besides being treasures in mythology, manners, and the annals of the midd বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূলগ্রন্থের অত্যল্পাংশমাত্র প্রকাশের পর ঐ কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। ডাক্তার হর্ণলি উহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনেক বৎসর পূর্ব্বে "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে উহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্রের প্রথম পর্য্যায়ের অকাল-বিলোপের সহিত সে কার্য্যও স্থগিত হইয়া যায়।

সংপ্রতি বিগত ১৮৮৪ অব্দ হইতে বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ "নাগরীপ্রচারিণী সভা"র পরিচালকেরা বহুপরিশ্রমে বিশুদ্ধপাঠ সংগ্রহপূর্ব্বক "পৃথ্বীরাজ-রাসো"র একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের চেষ্টায় এই অমরকাব্যের ৬৬ সর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে—অবশিষ্ট অল্পাংশও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পণ্ড্যা মহোদয় এই মহাকাব্যের সন্দিগ্ধ ও বিবাদাস্পদীভূত স্থলসমূহে বিবিধবিচারপূর্ণ ঐতিহাসিক টিপ্পনী যোগ করিয়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রাসোর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুত শ্যামসুন্দর দাস বি. এ. মহোদয়দ্বয় প্রত্যেক খণ্ডের শেষে আধুনিক সরল গদ্যচ্ছন্দে চন্দ কবির রচনার

সারমর্ম্মের সংকলন করিয়া সাধারণ পাঠকের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন। ফলতঃ, রাসোর এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। আমরাও এই সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে রাসোর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

মহাকবি চন্দ পৃথ্বীরাজের সভাকবি ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি ভট্ট বা ভাটের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজবংশের প্রশস্তি-রচনা ভাটদিগের প্রধান কার্য্য। রাজপুতানা, গুজরাথ, কাঠিয়াওয়াড় প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে রাজপুত জাতির বাস, সেই সকল প্রদেশেই ভাটদিগের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাটেরা স্তুতিপাঠক হইলেও, রাজপুতসমাজে ষট্‌কর্ম্ম-নিরত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভাটদিগের সম্মান অধিক। রাজপুত-সমাজে ভট্টগণ অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলিয়া পরিগণিত। ভাট যাঁহার জামীন হন, রাজপুত-দরবারে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তির কখনও অভাব হয় না। অন্তঃপুরেও ভাটের প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ। ভাট সঙ্গে থাকিলে রাজপুত যুবতীগণ যে কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন। কল কথা, ভাটের ন্যায় বিশ্বাসভাজন রাজপুতের নিকট আর কেহই নহেন। ভাটেরা রাজবংশের বা স্বীয় প্রভুবংশের কীর্ত্তিকলাপ ছন্দোবদ্ধ করিয়া গান করেন; যুদ্ধকালে বীরবৃন্দকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরগাথা শুনাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করেন; সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে সদাচারে প্ররোচিত ও অনাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ভাটের ভয়ে অনেক রাজপুত রাজাকে কদাচার পরিত্যাগ করিতে হয়। রাজপুতদিগের বিশ্বাস, সত্যযুগে স্বয়ং মহাশক্তিরূপিণী কালী যখন রণচণ্ডীর বেশে দৈত্য-সংহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট দুই জন ভাট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিল। শেষনাগ যখন পৃথিবী মস্তকে ধারণ করেন, তখনও তাঁহার নিকট ভাট ছিল। ত্রেতাযুগে বলিরাজার ও মহারাজ রামচন্দ্রের সভাতেও ভাট ছিল। দ্বাপরযুগের সঞ্জয় ও নৈমিষারণ্যবাসী সূতকে রাজপুতেরা ভট্টজাতীয় বলিয়া মনে করেন। অধুনা রাজপুতজাতির অবনতির সহিত ভাটগণেরও অবস্থার ও গৌরবের অবনতি ঘটিয়াছে। রাজ-পুতানায় ব্রাহ্মণ-ভাটের ন্যায় মুসলমান-ভাটেরও অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আলোচ্য পৃথ্বীরাজ-রাসোর রচয়িতা চন্দ ব্রাহ্মণ-ভাটের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বেণ রাও। বেণ রাও পঞ্জাবের

অন্তর্গত লাহোরের অধিবাসী ও পৃথ্বীরাজের পিতা মহারাজ সোমেশ্বরের সভাকবি ছিলেন। মহাকবি চন্দ গুরুপ্রসাদ নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, পুরাণ, নাটক, সঙ্গীত ও মন্ত্রশাস্ত্রাদি যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চন্দের প্রথমা পত্নীর নাম কমলা ও দ্বিতীয়ার নাম গৌরী। তাঁহার শূর, সুন্দর, সুজান প্রভৃতি দশটি পুত্র ও রাজবাঈ নাম্নী একটি কন্যা ছিল। এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। পরে দুই বার কাল পরিশ্রম-পূর্ব্বক তিনি রাসোকে বর্ত্তমান আকারে গ্রথিত করেন।

চন্দের এই কাব্য যে ভাষায় রচিত, তাহার সহিত বর্ত্তমান হিন্দীর সাদৃশ্য অতি সামান্য। স্বীয় গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনের জন্য কবি যথাসম্ভব প্রাচীন প্রাকৃতমিশ্রিত হিন্দী ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও রাজপুতানার সুপ্রসিদ্ধ ভাটগণ যে সকল বীরগাথার রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও প্রাচীন প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃত ভাষা পূর্ব্বকালে প্রদেশভেদে ছয়টি প্রসিদ্ধ বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া চন্দ উহাকে "ষট্‌ভাষা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার গ্রন্থে চয় প্রকার প্রাকৃতের প্রয়োগই দৃষ্ট হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাসোর বহু স্থলে পঞ্জাবী ও আরবী-পারসী শব্দের প্রয়োগ আছে।

এই সকল বৈদেশিক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে পৃথ্বীরাজ-রাসোকে একখানি জাল কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উদয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজকবি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দাস মহাশয় এই মহাকাব্যকে একখানি অতি আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সবিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত পৃথ্বীরাজ-রাসোর নানা পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পণ্ড্যা মহোদয় অতীব দক্ষতার সহিত সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন।—তিনি বলেন, লাহোরে কবির জন্ম ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া রাসোতে ঐ দুই (পঞ্জাবী ও পারসী) ভাষার বহু শব্দ স্থানলাভ করিয়াছে। কবির জন্মের প্রায় সপ্তাব্দী-কাল পূর্ব্বে যে পঞ্জাবে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং

সেই জন্যই পঞ্জাবের ভাষায় পারসী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহা তিনি বিশিষ্টভাবে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। আমরাও জানি, খ্রীষ্টীয় ১১শ, ১২শ, ও ১৩শ শতাব্দীতে, বা মুসলমানের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের বহুপূর্ব্বে রচিত মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থসমূহে পারসী শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ফল কথা, ঐরূপ প্রয়োগের জন্য কোনও গ্রন্থকে মুসলমান-বিজয়ের পরে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। এই মহাকাব্যখানি যে পৃথ্বীরাজের সভাকবিরই রচিত, পণ্ডা মহোদয় তাহা একপ্রকার অসংশয়িতরূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে ইহাতে যে পরবর্ত্তী কবিদিগের দ্বারা কোনও অংশ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। বরং অনেক স্থলে সেরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্তু ঐরূপ প্রক্ষিপ্তাংশের জন্য মূল আখ্যায়িকার তাদৃশ বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবি আদিদেব, গুরু, সরস্বতী, বিষ্ণু, সদাশিব, ব্রহ্মা ও গণেশের বন্দনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের স্তুতি-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দকার জয়দেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কবি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রশ্নের উত্তরে এই মহাকাব্যবর্ণিত বিষয়সমূহের ক্রমশঃ অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও জনমেজয়ের সর্পসত্রের বৃত্তান্ত ও উতঙ্কের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর অগ্নিকুলের বিবরণ। কবি বলেন,—কুণ্ডলাহরণের জন্য উতঙ্ক যে পথে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা একটি বিশাল গহ্বরে পরিণত হয়। ঐ স্থানেই পূর্ব্বে বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি করিতেন। সেই মহাগর্ত্তে একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনী নিপতিত হওয়ায় ঋষি হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তর প্রার্থনা করেন। হিমালয় স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রেরণ করিলে ঐ গর্ত্তমুখ নিরুদ্ধ ও বর্ত্তমান আবু পর্ব্বতের সৃষ্টি হইল। তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য ঋষিগণের সাহায্যে ঐ পর্ব্বতোপরি এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যথারীতি রাক্ষসেরা আসিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, বশিষ্ঠের তপোবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিহার, চালুক্য ও প্রমার নামক তিন জন ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার না হওয়ায় মহর্ষি বশিষ্ঠ আর একটি যজ্ঞকুণ্ড রচনাপূর্ব্বক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক চতুর্ভুজ মহাবীর উদ্ভূত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে "চাহুওয়ান" (চৌহান) নামে অভিহিত করিয়া

রাজ্যাভিষেকপূর্ব্বক রাক্ষসবিনাশের আদেশ করিলেন। চৌহান সে কার্য্য সম্পাদন করিলে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া অগ্নিকুণ্ডোদ্ভব চারি জন ক্ষত্রিয়কেই আশীর্ব্বাদ ও ছত্রিশ কুলের রাজপুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিলেন। কবি বলেন,—পৃথ্বীরাজ এই চৌহান-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত আদি চৌহানের বংশে ১৭৩-পুরুষ পরে বীসলদেব জন্মগ্রহণ করেন। আজমীরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ ছিলেন। সেই জন্য সময়ে সময়ে প্রকৃতিপুঞ্জেরও কুলমান রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিত। একদা প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে রাজাকে তিরস্কার করিলে তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ১০২৯ খ্রীঃ গুজরাথ বিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুষ্করতীর্থে এক তপস্যা-নিরতা বণিককন্যার লাবণ্যে মোহিত হইয়া তিনি উহার প্রতি বলপ্রয়োগ করেন। সেই অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া কন্যা রাজাকে অভিশাপদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। কন্যার অভিশাপে সর্পদংশনে রাজার মতিভ্রম ঘটিল; তিনি রাক্ষসবৃত্তি লাভ করিয়া স্বরাজ্যস্থ প্রকৃতিপুঞ্জকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জনৈক ঋষির উপদেশে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বীসলদেব প্রকৃতিস্থ হইলেন। পৃথ্বীরাজ এই বীসলদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।

পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বরের রাজত্বকালে দিল্লীতে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামক নরপতি আধিপত্য করিতেন। একদা কনোজের রাজা বিজয়পাল রাঠোড় দিল্লী আক্রমণ করিলে, অনঙ্গপাল আত্মরক্ষার জন্য মহারাজ সোমেশ্বরের সাহায্যপ্রার্থী হন। সোমেশ্বর ক্ষিপ্রতাসহকারে অনঙ্গপালের সাহায্যার্থ ধাবিত হন, এবং বিজয়পালের পরাভব সাধন করেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অনঙ্গপাল স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা সোমেশ্বরকে দান করিলেন। ইহারকিছু দিন পরে বিজয়পালের সহিত অনঙ্গপালের আবার প্রণয় ঘটে, এবং অনঙ্গপাল স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা সুরসুন্দরীকে বিজয়পালের হস্তে অর্পণ করেন। কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজ ও সুরসুন্দরীর গর্ভে জয়চন্দ্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে পৃথ্বীরাজ ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবারে চিত্রা নক্ষত্রে উষাকালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তাঁহার লগ্নস্থান হইতে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র দশম স্থানে, শনি ৮ম, চন্দ্র ৫ম, মঙ্গল ২য়, রাহু ১১শ ও রবি ১২শ স্থানে ছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয়বালকোচিত অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা-

লাভ করিয়া বন্যবরাহের শিকারে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। গুরুরাম নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট তিনি যুদ্ধবিদ্যা, বিবিধ শাস্ত্র ও কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়সকালে অনঙ্গপাল তাঁহাকে স্বীয় দিল্লী রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। পৃথ্বীরাজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে, তাঁহার পিতা মহারাজ সোমেশ্বর পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি মণ্ডোবরের পরিহার-বংশীয় রাজা নাহর রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া স্বীয় পুত্রের জন্য তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। নাহর রায় ইতঃপূর্ব্বে একবার পৃথ্বীরাজকে কন্যাদান করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সময়ে দুর্বুদ্ধিবশে মহারাজ সোমেশ্বরের দূতের নিকট চৌহান বংশের শ্রেষ্ঠতায় সন্দেহপ্রকাশ পূর্ব্বক দূতকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন। এই সংবাদে পৃথ্বীরাজ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডোবর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। নাহর রায় মীনা ও ভীল সেনার সাহায্যে আত্মরক্ষার বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। তখন তিনি পৃথ্বীরাজকে জস্তাযতী নাম্নী স্বীয় কন্যা দান করিয়া সন্তুষ্ট ও বিদায় করিলেন। ইহার পর মেবাত প্রদেশের রাজা মুদ্গল রায় করদান করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করায় সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযানপূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করেন। মুদ্গল রায়ের অধীনতায় ওয়াজিদ খাঁ নামক এক পাঠান সর্দার ছিলেন; তিনি এই যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নিহত হন। চন্দ কবির এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এ দেশে ফরাসী ও ইংরাজেরা যেরূপ দেশীয় নরপতিদিগের সামরিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের আত্মবিগ্রহে সহায়তা করিতেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে পাঠানেরাও সেইরূপ করিতেন।

শাহাবুদ্দীন গোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের শত্রুতার কারণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—গোরীর দরবারে চিত্ররেখা নাম্নী এক পঞ্চদশবর্ষীয়া পরম-সুন্দরী নর্ত্তকী ছিল। সিন্ধুদেশের জনৈক হিন্দু নরপতির নিকট হইতে তিনি উহাকে লাভ করিয়াছিলেন। গোরীর খুল্লতাতপুত্র মীর হোসেন সৌন্দর্য্য ও বিক্রমের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নর্ত্তকীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ের বিষয় অবগত হইয়া সাহাবুদ্দীন মীর হুসেনকে গজনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু হুসেন

চিত্রলেখাকে লইয়া দেশত্যাগী হইলেন, এবং পৃথ্বীরাজের নিকটে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ম্লেচ্ছকে আশ্রয় দান করিবার অভিপ্রায় পৃথ্বীরাজের ছিল না। কিন্তু তাঁহার বাল্য বন্ধু কবিবর চন্দ শরণাগত-বাৎসল্যের মহিমাকীর্ত্তনপূর্ব্বক অনুরোধ করায় পৃথ্বীরাজ মীর হুসেনকে আশ্রয়দান করিলেন। মীর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপায়ন-দানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে হাঁসি ও হিসার নামক দুইটি পরগণা জাইগীর-স্বরূপ দান করিলেন। গোরী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মীর হুসেন ও পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই গোরীর অনুরোধ-রক্ষায় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় শাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পৃথ্বীরাজও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। (১১৯৮ খ্রীঃ) সারওপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গোরীর পক্ষীয় প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য ও হিন্দু পক্ষে তের শত সৈন্য নিহত হয়। মীর হুসেন গোরীর কতিপয় সেনানীর প্রাণনাশপূর্ব্বক স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হন। শাহাবুদ্দীনকে পরাভূত হইয়া পৃথ্বীরাজের হস্তে বন্দী হইতে হয়। চিত্রলেখা মীর হুসেনের শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া সমাধিগর্ভে প্রবেশ করে। পৃথ্বীরাজ গোরীকে পাঁচ দিন স্বীয় শিবিরে সাদরে অতিথিরূপে রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মীর হুসেনের পুত্র গাজী হুসেনকে অভয়দান করিয়া শাহাবুদ্দীন স্বদেশে লইয়া গেলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মুসলমান লেখকেরা এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু মিঃ হর্ণলি "তবাকৎ-ই-নাসিরী" প্রভৃতি কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনার আলোচনা করিয়া কবিবর চন্দের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গজনীতে উপস্থিত হইয়াই শাহাবুদ্দীন গাজী হুসেনকে বন্দী করিলেন। কিন্তু এক মাস পাঁচ দিন কারাবাসের পর গাজী হুসেন তথা হইতে পলায়ন ও পৃথ্বীরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতদুপলক্ষে গোরীর মনে পৃথ্বীরাজের প্রতি বিষম বিরাগের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি এবার প্রকাশ্যভাবে অভিযান না করিয়া সহসা আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। পৃথ্বীরাজ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন; তিনি বহুদূরবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিতেন। ১১৭০ খৃঃ বসন্তকালে তিনি পাঁচ শত পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বারোহী এক সহস্র সুশিক্ষিত কুকুর ও ৫৫টি চিত্রক (চিতা বাঘ) লইয়া কোনও

অরণ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন,—এমন সময়ে শাহবুদ্দীন গোরী পাঠান সেনা লইয়া সহসা বনমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন! কিন্তু পৃথ্বীরাজের সহচরেরা অসীম বীরত্ব প্রকাশ করায় গোরীকে পরাভূত ও পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে হয়। কবি চন্দ বলেন, নীতি রাও নামক এক জন দেশদ্রোহী ক্ষত্রিয় অর্থলোভে অন্ধ হইয়া গোরীকে দিল্লী হইতে পৃথ্বীর গতিবিধির সংবাদ গোপনে প্রদান করিত। তাহারই সহায়তায় এবার গোরী বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিতভাবে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাদেশিক ভাষা।

ভারতের আধুনিক প্রাদেশিক ভাষা সকলের আলোচনা করিতে যাইয়া যুক্ত-প্রদেশের এক জন সিবিলিয়ান শ্রীযুত মোরল্যাণ্ড অনেকগুলি যুক্তিযুক্ত কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান কালের প্রাদেশিক গদ্য যদি লোকশিক্ষার জন্য, সমাজে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সকল উদ্দেশ্য অধুনা ব্যর্থ হইতেছে। বর্ত্তমান কালের ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ লেখকগণের বাঙ্গালা বা হিন্দী গদ্য দেশের লোকসাধারণের সহজবোধ্য নহে। বর্ত্তমান কালের হিন্দী গদ্য ও বাঙ্গালার অনুকরণে অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল হইয়া পড়িতেছে। এই হেতু যুক্তপ্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানের দুইটা স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইতেছে। মুসলমানের উর্দ্দুতে অনেক ইংরাজী শব্দের প্রয়োগবাহুল্য ঘটিয়াছে। ইহার উপর ইংরাজী গদ্যের অনুকরণে বর্ত্তমান হিন্দী বা বাঙ্গালা গদ্যের রচনাভঙ্গী এতই জটিল ও আবর্ত্তময়, এতই সুদীর্ঘ ছত্রে পূর্ণ হইতেছে যে, সে সকল রচনার অর্থবোধ সাধারণ পল্লীবাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। পুরাতন ঠেট্ হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তাহার রচনাকৌশল এমনই সুন্দর ছিল যে, যে সে রচনা শুনিত, বা পাঠ করিত, সেই তাহার অর্থবোধ করিতে পারিত। এখনকার হিন্দী বা বাঙ্গালা ইংরাজীনবীশ না হইলে বুঝা যায় না। হেতু এই, প্রাদেশিক ভাষায় ইদানীং যাঁহারা বড় বড় লেখক হইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও ইংরাজী রচনাপদ্ধতির অনুরাগী।

ফলে, তাঁহারা ইংরাজি 'ইডিয়ম' ও 'এপিগ্রাম' সকলকে সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে এমন জটিলভাবে প্রাদেশিক ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন যে, সে সকলের প্রকৃত অর্থ, যাহারা ইংরাজি না জানে, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মোরল্যাণ্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ও যুক্তপ্রদেশে যে নূতন প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা টিকিবে না। এ সাহিত্য ষোল আনা ইংরাজী ছাঁচে গড়া হইয়াছে বলিয়া, জন-সাধারণের সহজে বোধগম্য নহে বলিয়া, প্রচলিত ভাষার অনুকূল নহে বলিয়া, ইহা টিকিবে না। তিনি বলেন,—বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা বা হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি নভেল নাটকে ও গল্পের বহিতেই হইতেছে। ধর্ম্মের কথা এখনও লোকে সেই পুরাতন ভাষাতেই কহিয়া ও শুনিয়া থাকে। নূতন ভাষায় যে ধর্ম্মভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা সমাজে বিকায় না, দেশে ও সমাজে তাহার চর্চ্চা নাই।

আমরা "পাইওনীয়র" হইতে মোরল্যাণ্ডের লিখিত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। আমাদের মনে হয়, মোরল্যাণ্ড অনেকটা খাঁটী কথাই কহিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষায় নভেল নাটক ও ডিটেক্‌টিভের গল্পই বিকায় অধিক। রচনা যদি একটু গম্ভীরভাবপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা বিকায় না। যে দেশে এখনও বটতলার রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পতরু, রামরসায়ন প্রভৃতি পুস্তক হাজার হাজার বিকাইতেছে, সে দেশের লোকে যে বহি কিনিয়া পড়ে না, এমন কথা বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যখন ঘরে ঘরে রহিয়াছে, তখন ইহাও বলা চলে না যে, বর্ত্তমান গদ্যের প্রতি লোকের তেমন শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক, গভীর ভাবপূর্ণ কাব্য—এ সকল কিছুই তেমন বিকায় না। বাস্তবিক, সাহিত্যের কল্যাণকল্পে এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুধ্যান আবশ্যক।

বিবাহ-প্রথা।

বিলাতে তথা মার্কিণদেশে বিবাহ-প্রথা লইয়া বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গ্রাণ্ট অ্যালেনের "The woman who did" নামক নভেল প্রকাশ হইবার পর হইতে এই আন্দোলনটা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে বিবাহসম্পর্কীয় কথা লোকে একটু যেন রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিত,

এখন যেন চক্ষুর্জ্জাশূন্য হইয়া এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। নিউইয়র্কের এক বিদুষী নারী "মিসেস্ বার্ব্বা" নাম দিয়া "ম্যারেজ" নামক একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তিকা লইয়া বিলাতে ও মার্কিণদেশে বিষম আন্দোলন উঠিয়াছে। তিনি বলেন যে, যখন সভ্যসমাজে বিবাহটা চুক্তিনামার হিসাবে গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন উহাকে স্থায়ী বন্ধন বলিয়া গ্রাহ্য করা ঠিক্ নহে। লেখিকা বলেন যে, জাতির পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিলে সমাজেরই লাভ; ব্যক্তিবিশেষের উহাতে কোনও লাভালাভ নাই। কাজেই নরনারীর সম্মিলনে যে সকল পুত্রকন্যা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের ভরণপোষণের ভার গবর্মেণ্টকেই লইতে হইবে। টেক্স দিব, আবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যা পোষণ করিব, তাহাদিগকে সমাজের ভূষণ-স্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিব,—এমন দ্বিগুণ বোঝা কেহ ত বহিতে চাহে না। তাই পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ভয়ে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না; যাহারা বিবাহ করে, যাহাতে অধিকসংখ্যক পুত্রকন্যা না জন্মে; এমন ব্যবস্থা তাহারা করে। লেখিকার মতে, এ পদ্ধতি দোষার্হ নহে। তিনি বলেন,—নরনারীর খোস্ মেজাজের উপর বিবাহবন্ধন নির্ভর করিলে ভাল হয়। যদি নিতান্তই কালনির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে দশ বৎসরের অধিক বিবাহবন্ধন টিকিতে দেওয়া ঠিক্ নহে। জর্ম্মাণ সমাজতত্ত্বজ্ঞ সপেনহরের কথা তুলিয়া লেখিকা বলিয়াছেন যে, নর ও নারীকে একনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে দেওয়া ঠিক্ নহে। উহা অস্বাভাবিক। ফলে, কোনও পক্ষেই বিবাহবন্ধনটা আমরণ স্থায়ী হওয়া ঠিক্ নহে। বিলাতের "ফেবিয়ান সোসাইটী"তে এই পুস্তক লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। 'সফরীজিষ্ট'দিগের মধ্যেও এই পুঁথির খুব আদর হইয়াছে। এমন কি, একটি বিখ্যাত সফরীজিষ্ট রাজস্বসচিব লয়েড জর্জ্জ মহোদয়কে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আপনি যেমন জাতির জীবনবীমা গড়িতেছেন, তেমনই সন্তানপালনের জন্য জীবনবীমা না গড়িলে সমাজ থাকিবে না, প্রজাবৃদ্ধি হইবে না। "লিটারারী টাইম্‌সে"র সমাজতত্ত্বের লেখক স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, বিবাহ ব্যাপারে যখন ধর্ম্মের ভাব আর নাই, উহা যখন চুক্তিনামার মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে, তখন উহাকে আর ধর্ম্মের সহিত বাঁধিয়া রাখা সঙ্গত নহে। বিবাহের তালাক্ বা ডাইভোর্সের পদ্ধতি আরও সহজ হওয়া উচিত। বিবাহের পূর্ব্বে ডাক্তারের দ্বারা নরনারীর দেহের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, বিলাতী সমাজে এই বিবাহ

ব্যাপার লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। এই উপলক্ষে একটা নূতন ইংরাজী কথার সৃষ্টি হইয়াছে। কথাটি duogamy, ডুয়োগামী; অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রী উভয়েই দুইটি বিবাহ করিবে। ফ্রান্সে বিবাহিতা নারীর একটি করিয়া 'বন্ধু' থাকে। এই 'বন্ধু' রাখিবার প্রথা বিলাতেও কতকটা প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল 'বন্ধু'কে স্বামীর পদবী দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ডুয়োগামী বিবাহ সমাজে গ্রাহ্য হইবে।

জর্ম্মণীর নূতন সোসিওলজী বা সমাজতত্ত্ব।

সমাজের মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য জর্ম্মণীতে এক নূতন সমাজতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছে। ইহা একপ্রকারের সোসিও-কমিউনিজম্; নূতন নাম দেওয়া হয় নাই। সমাজের অর্থে সকলেই সমভাবে ভাগী হইলেও, যাহারা চিন্তাশীল-সম্প্রদায়-ভুক্ত, ভদ্র ও মধ্যবিত্ত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ অধিকারে অধিকারী করিয়া রাখিতে হইবে। ইউরোপ এখন 'ক্যাপিটাল' ও 'লেবর', অর্থাৎ মূলধনী ও শ্রমজীবীর বিবাদ লইয়া বিব্রত। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য সকল দেশের গবর্মেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু সে উপায়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী রক্ষা পাইতেছে না। লেখাপড়ার অভিপ্রচার হওয়াতে এখন সকলেই লেখাপড়া শিখিতেছে, এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাজ কাড়িয়া লইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাকালের ভদ্রতা, বদান্যতা, তিতিক্ষা ও শিষ্টাচার সমাজ হইতে লোপ পাইতেছে। ইহার দ্বারা সমাজের ক্ষতিই হইতেছে। জর্ম্মণী এখন 'হেরিডিটি' বা বংশের ধারার প্রতি বড়ই আস্থাবান্ হইয়াছে। জর্ম্মণীর জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমাত্রই বলিয়া থাকেন যে, বংশের ধারা বা বংশগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবার নহে; সমাজ উহার রক্ষা করিলে, উহার উৎকর্ষসাধন করিলে, সমাজেরই মঙ্গল। এই হেতু মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ একটা নূতন ব্যবস্থা করিতে চাহেন। বিলাতের বহু 'পজিটিভিষ্ট' জর্ম্মণীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শিল্পের সহিত জীবনের সম্বন্ধ।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পার্সী ব্রাউন একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "কলাবিদ্যার সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ"। তিনি বলেন যে, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির

চেষ্টা মনুষ্যের সহজাত। শিক্ষা ও সভ্যতার সাহায্যে এই অনুভূতি ও চেষ্টার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটে; কিন্তু "কলাবৃত্তি" মনুষ্যের সহজাত। যত দিন মানুষ, ততদিন উহার স্থিতি। এই কলাবৃত্তিকে ইংরাজিতে Art Impulse বলে। অতি অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে এ বৃত্তি আছে। তাহারাও গান করে, ছবি আঁকে, নিজেদের বাসস্থান, কুটীর, বা পর্ব্বতগহ্বর সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। এই সহজ চেষ্টাই শিল্পকলার মূল। মিঃ পার্সী ব্রাউন বলেন, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইলে, সুখের উপভোগ স্বীয় আয়ত্তগত থাকিলে, "কলাবৃত্তি" বা চেষ্টার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটিয়া থাকে।

সামাজিক স্বাধীনতা থাকিলে, যখন আমোদ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখনই আমোদ করিতে পারিলে, হৃদ্‌গত উল্লাসের ভাবকে একেবারে চাপিবার বা প্রশমন করিবার প্রয়োজন না হইলে, কলাবৃত্তির বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার জন্যই শিল্পকলার সৃষ্টি হয়, বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়, বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিও নির্ণীত হয়। যাহা হৃদ্‌গত উল্লাসের ভাব হইতে উৎপন্ন, তাহার মধ্যে খেলার ভাব,—বৃত্তির লীলা-বিকাশ থাকিবেই। সকল কলাবিদ্যার মূলে একটু খেলার ভাব আছেই। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যখন একটা সর্ব্বাবয়ব সামঞ্জস্যের—একটা রীতিপদ্ধতির সৃষ্টি হইবে, তখনই সে খেলা কলাশিল্পে উন্নত হইবে। বালক বা বর্ব্বর মনের উল্লাসে যেখানে সেখানে আঁচড় টানিয়া দেয়। কিন্তু যে এই আঁচড়গুলির সামঞ্জস্য ঘটাইয়া একটা মূর্ত্তি বা ভাবের উন্মেষ করিতে পারে, সেই শিল্পী। যে উল্লাসের জন্য বালকে আঁচড় টানে, বর্ব্বরে গহ্বরমুখে রঙের প্রলেপ দেয়, সেই উল্লাসের জন্য শিল্পী মূর্ত্তির আলেখ্য বা দৃশ্যপট আঁকিয়া থাকে। কেবল শিল্পীর উল্লাসে সামঞ্জস্যের ভাব প্রবল, তাই তাহার কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রণালীসঙ্গত। এই প্রণালীসঙ্গত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লাস হইতেই কলাবিদ্যার সৃষ্টি। ফলে সমাজে ব্যক্তিগত স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা না থাকিলে কলাবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর নহে। চিত্তবৃত্তি স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হইলেই মনুষ্যের মধ্যে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের উপভোগ-সামর্থ্য জন্মে। বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সামর্থ্য হইলেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়। এইটুকু বুঝাইবার জন্য শ্রীযুত পার্সী ব্রাউন মিশর, ব্যাবিলন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিয়াছেন।

শ্রীযুত ব্রাউন এই প্রসঙ্গে একটা নূতন কথার প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন কলাবিদ্যার উন্নতি ঘটে না। যখন সমাজে অশান্তি বিরাজিত, চারি দিকে যুদ্ধের ভেরীনাদ হইতেছে, জিগীষা প্রবৃত্তি যখন সকলের মনে সদা জাগরূক, তখনই পৃথিবীর সকল দেশে কলাবিদ্যার উন্নতি ঘটিয়াছে। গ্রীসে যুদ্ধের ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেই কলা বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইউরোপের মধ্য-যুগে গথিক ভাস্কর্য্য-বিদ্যার উন্নতি বিপ্লব বিবাদের কালেই হইয়াছিল; রিনেসেন্স বা ইউরোপের পুনরভ্যুদয় যুদ্ধের কালেই সম্ভবপর হইয়াছিল। মানুষ যুযুৎসু হইলে তাহার চিত্তবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ঘটে; সেই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কলাবিদ্যার উন্নতি হয়। তখন তাহার ইচ্ছা, কিসে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের উপর ভাবের প্রলেপ লাগাইয়া তাহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিব, কিসে সৌন্দর্য্য-বিকাশের সহিত অজ্ঞেয় অনন্তের পথকে মনুষ্য-কল্পনার অনুগত করিব; এইপ্রকার চেষ্টা হইতেই কলাবিদ্যার উন্নতি হইয়া থাকে। শান্তির ভাব 'একঘেয়ে'র ভাব, শান্তির জন্য উল্লাস হয় না; উল্লাস না হইলে কলাবিদ্যার চর্চ্চাও সম্ভবপর হয় না।

শ্রীযুত পার্সী ব্রাউন এই সঙ্গে ধর্ম্মের কথাও কহিয়াছেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মভাব না থাকিলে কলাবিদ্যার উন্মেষ ঘটে না। ধর্ম্ম অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে অনন্ত অজ্ঞেয় বিষয়-বিস্তার রহিয়াছে, ধর্ম্মই বিশ্বাস ও কল্পনার সাহায্যে তাহাকে মনুষ্যের ভাবগোচর করে। প্রথম প্রভাতে অরুণোদয়ের অনুরাগবল্লরীবিস্তার দেখিয়া মানুষ সহজেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু এ মোহ ক্ষণস্থায়ী। যতক্ষণ অরুণরাগের মোহন মাধুরী বিকসিত থাকে, ততক্ষণ সে মোহ থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম তাহাকে যদি বলিয়া দেয় যে, এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের আকর এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে,—তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্—এক মহাভাবময় ভর্গদেব রহিয়াছেন—তখন এই সৌন্দর্য্যমোহ স্থায়ী হয়—সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যের ভাব জাগিয়া উঠে। এই ভাবটাই "কলাচেষ্টা"র বনীয়াদ। সমাজে সরল, উদার, উন্নত ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, সে ধর্ম্মে সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকট থাকিলে, কলা বিদ্যার উন্নতি একরূপ অবশ্যম্ভাবী। গ্রীসের ইতিহাস-কথার আলোচনা করিয়া শ্রীযুত ব্রাউন এই তত্ত্বের যথার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মের ভাব প্রবল ছিল, যখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রকট ছিল, তখন কলাবিদ্যার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটিয়াছিল। সরল বিশ্বাসী না হইলে উল্লাস হয় না; উল্লাস না থাকিলে শিল্পকলার চর্চ্চা কেহ করে না। ভারতবাসী বিদেশীয় নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতেছে বটে, কিন্তু যাহাতে হৃদ্‌গত উল্লাসের ভাব আবার প্রকট হয়, সে পক্ষে দেশবাসীর তেমন কোনও চেষ্টাই নাই। যাঁহারা এ দেশে কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা এইটুকু ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সুপ্রভাত।—চৈত্র। শ্রীযুত ইন্দুমাধব মল্লিকের 'খাদ্যবিচার ও খাদ্যপাক' অজীর্ণ রোগীর সুপথ্য। শ্রীযুত সরৎকুমার লাহিড়ীর 'বিদ্যাসাগর-কথা' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত বিজয়কুমার সরকারের 'গৌড়ভ্রমণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণ-কাহিনী—'ফো-কো কি' বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। লেখক মাতৃভাষায় ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। শ্রীযুত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'শঙ্খ' পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কেন না, বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর 'অমিয়কুমার' নামক কবিতাটি এক প্রকার অতিলোত্তমা। শোকস্মৃতি পবিত্র,—আমরা আর কিছু বলিব না।

গৃহস্থ।—চৈত্র। শ্রীযুত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্যের 'ব্যায়ামে বিজ্ঞান' উল্লেখযোগ্য। আর কোনও প্রবন্ধে বিশেষত্ব নাই। 'বেদান্ত-সামন্তক' ও 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুত মাখনলাল রায় চৌধুরীর বি. এ. 'একবার এসো' নামক উদ্গার ছাপিয়া অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়াছেন। কে বলে, বাঙ্গালী ভীরু?

জগজ্জ্যোতিঃ।—চৈত্র। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনার বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীযুত কৃপাশরণ ভিক্ষুর 'প্রবাসীর পত্র' ভিন্ন আর কোনও পাঠযোগ্য প্রবন্ধ নাই। কবিতাগুলি অপাঠ্য। শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দী 'ধর্ম্মপদে'র দেড় পৃষ্ঠা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। লেখক নূতন ব্রতী। হেলে ধরিবার পূর্ব্বেই কেউটে ধরিয়া কোনও লাভ নাই।

বঙ্গদর্শন।—চৈত্র। 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'ভারতে ইংরেজের পদার্পণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'কুন্তী-ব্রাহ্মণ-সংবাদে' কবিত্ব বা কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায়ের 'নব্য ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে পাঠ করিতে বলি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' সুলিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'যোকদা' ঠিক ছোট গল্প নহে। কিন্তু ইহার আখ্যানবস্তু মনোরম।

নব্যভারত।—চৈত্র। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজে'র পঞ্চম প্রস্তাব 'নব্যভারতে'র প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধ। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কবে মানুষ মরে গেছে' নামক কবিতায় রস-কস্ কবিত্ব পাইলাম না। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অনূদিত 'অর্থশাস্ত্রে'র ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রাচীন ভারতের এই চিত্রগুলি বাঙ্গলা ভাষায় সংগ্রহ করিয়া যোগীন্দ্র বাবু বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক জন সমালোচক 'অর্থশাস্ত্র' ও 'অর্থনীতি'কে অভিন্ন ভাবিয়া যে রসোদ্গার করিয়াছেন, আশা করি, সমাদ্দার মহাশয় তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। এই জন্যই ভারতের প্রাচীন নীতি-কার বলিয়াছেন,—

'অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা'য় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোমের 'চৈত্র-সংক্রান্তি' নামক হেঁয়ালি আমরা ভাঙ্গিতে পারিলাম না। সূর্য্যের রথ একচক্র; তাই কবি লিখিয়াছেন,—

'অরুণ চালায় রথ এক চক্রাকার!'

বিস্ময়াবহ বটে। 'কাব্যি'র খাতিরে রথ, এক ও চক্র, একাকার হইয়া গেল। শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবীর 'প্রকৃতি' নামক কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার উপভোগ্য। লেখিকার ছন্দে যেরূপ অধিকার, ভাবসম্পদে সেরূপ অধিকার নাই। উভয়ের সমাহারেই দুর্লভ কবি-যশ সুলভ হইতে পারে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'বুদ্ধে' বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য নাই। শ্রীযুত মহেশচন্দ্রের 'উদ্বোধ' ঈশ্বরবাদের আমসত্ত্ব। কবিতাও নয়, দর্শনও নয়।

বলিবার কিছু নাই, তবু শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। শ্রীযুত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভুসনা'য় লিখিয়াছেন,—

'অসীম অনন্ত মেরা,
সীমা নাই, সংখ্যা নাই।'

বাঙ্গালা মাসিকগুলি খুলিলে রজনীকান্ত-শ্রেণীর কবিদিগের সম্বন্ধে তাহাই মনে হয় বটে। শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন ঘোষের 'কে তোমরা' ছড়ার উত্তর কে দিবে? কবিতায় বিপ্লববাদের বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভব নহে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন কবি সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রহসনও হইতে পারে, কিন্তু কোনও মতে কবিতা হয় না। শ্রীযুত বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নববধূর শয্যাত্যাগ' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছে। চারি ছত্র কবিতা; প্রথম দুই ছত্রে 'যাও' ও 'রও' মিলিয়াছে! শেষ দুই ছত্র—

'প্রতিবেশী বলে,—লজ্জা নাহি তোর,
বধূ বলে—গলে বাঁধা প্রেস-ডোর।'

'প্রেস-ডোর' নিশ্চয়ই কম্পোজের ভুল,—বোধ হয় 'প্রেম-ডোরই' কবির অভিপ্রেত। কারণ, 'প্রেম-ডোর' তত মজবুৎ নয়; তাই বধূ অনায়াসে সে ডোর ছিঁড়িয়া 'নব্য-ভারতে'র আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'প্রেস-ডোর' অর্থাৎ প্রেসের গ্যালী বাঁধা দড়ী 'গলে বাঁধা' থাকিলে বধূ সহজে সে ডোর ছিঁড়িতে পারিতেন না। শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "সদল" কবিতার সকল চরণের অর্থ করিতে পারিলাম না। শব্দ মামুলী, ভাবও মামুলী। অতএব কবিতাটিকে 'বনীয়াদী' বলা যায়। সম্পাদকের 'সাধক-চূড়ামণি ইন্দ্রনাথ' উল্লেখযোগ্য। লেখক ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শিশিরকুমার ও ইন্দ্রনাথের পূজা করিয়াছেন।

সমাজ।—চৈত্র। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ছায়া' কবিতায় লিখিয়াছেন,—

'দুর্ব্বল হৃদি করিতে সবল হাসি ল'য়ে চারু বয়ানে'

এ ভাব নূতন, সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা মাসিকের কবিরা 'চারু বয়ানে'র হাসিতে খুন হইতেন, অন্ততঃ খুব 'কাহিল' হইয়া পড়িতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মানসীর হাসি অর্জ্জুনের দুর্গের মত, তাহা 'দুর্ব্বল হৃদি'কে সবল করে। যাবতীয় কবিতা,—যেমন হইয়া থাকে। শ্রীযুত প্রমথনাথ ভর্ক-

ভূদেবের বৌদ্ধধর্ম্ম' ও শ্রীযুত বিজয়দাস দত্তের 'প্রাচীন ভারতে গোধন ও গব্যবিদ্যা' উল্লেখযোগ্য। শঙ্কর-ভাষ্য সমেত বেদান্তসূত্রের মূল ও অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে 'সমাজে' প্রকাশিত হইতেছে।

ভারত-মহিলা।—বৈশাখ। প্রথমেই শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ 'নববর্ষের আবাহন করিয়াছেন। 'কুপ্রবৃত্তির ঝুল' ও 'বাসনার মূল' প্রভৃতি বহু উৎকট উপমা ও রূপক আছে। আর কিছু নাই। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাসের 'আমাদের শিশু' পুরস্কীগণের উপযোগী। 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস' শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ। সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুত শ্রমণ পূর্ণানন্দের 'কুলবধূ সুজাতা' সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শুভগ্রহ' নামক 'কৌতুক-নাট্যে' দাসীর মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা কোন দেশের? শ্রীযুত জগদীশনন্দ রায়ের 'ভূগর্ভ' এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

প্রবাসী।—বৈশাখ। প্রথমেই শ্রীযুত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'শ্রীরামচন্দ্রের বরযাত্রা' নামক একখানি পটের প্রতিলিপি। এইটিও যদি চিত্র হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই অপরূপ ছবি কোন্ পদ্ধতির অনুমত, তাহা বৃন্দাবনের সর্ব্বান্তর্য্যামী নন্দলালও বলিতে পারিবেন না। 'ইরাণে নওরোজ' শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। সুন্দর। শ্রীযুত সুরেশ্বর শর্ম্মার 'উষা' নামক সনেট দুটি উল্লেখযোগ্য। উষায় যে অরুণরাগ দেখিতেছি, তাহা ভাবী উজ্জ্বল দিবসের আভাস দিতেছে। শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীর 'বাঙ্গলায় ঐকারণ' ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'আসামী ভাষা' সুলিখিত 'নিবন্ধ;—সাহিত্যিকগণের অনুশীলনযোগ্য। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। যাহা বলিবার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া চুকিয়াছি। 'একঘেয়ে' মন্তব্যে কবিবরের গুণপাঠক-সম্প্রদায়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া কোনও লাভ নাই। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। অনবরত প্রসবে লাউ কুমড়াও ছোট হইয়া যায়। হাস্যরস বিতরণের বেলা আধার বহু হইলে একটাও পুষ্ট হয় না। গল্প হিসাবেও তাহা পটে। সৌরীন্দ্রমোহনের রচনাতেও তাহা দেখা যাইতেছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিতে' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা ছবি আঁকিবার প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের অস্তিত্বের পর 'মিতে' গল্পটির আলো

বিশেষ মনোরম অনে হয়ন গল্পটি সমবেদনায় সিক্ত, করুণ রসের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত 'মিতে'র অন্তঃস্তরে বহিয়া যাইতেছে। শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসুর ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ দেশের অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিকে মুদ্রিত হইত। এবার তাহা 'প্রবাসী'র 'একচেটিয়া' হইয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতাও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই রীতি। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র সে রীতির ব্যতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি উপাদেয়। 'মৌনবিকাশে'র দুই একটি চরণে সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির অর্থ কি, তাহা দৈবজ্ঞও খড়ি পাতিয়া ধরিতে পারিবেন না। সত্যেন্দ্রনাথের 'মৌন পাখী' নিতান্তই 'অজ্ঞেয়' বস্তু। ইহার তত্ত্বও গুহায় নিহিত।

বর্ণ-পরিচয়।

প্রসিদ্ধ সুইস্ চিত্রকর গ্লেইরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য আলবার্ট অ্যাঙ্কার শিশু-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ফ্রান্সে প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত "বর্ণ-পরিচয়" নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্রের প্রতিলিপি "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইল।

চিত্রখানির মূর্ত্তি-সমাবেশ সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে। জরা ও শৈশবের একত্র সন্নিবেশে চিত্রকরের প্রতিপাদ্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রখানি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ঠাকুর মা গুরুমার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া টেবিলের উপর উন্মুক্ত বৃহৎ পুস্তক হইতে নাতিকে বর্ণপরিচয়ে দীক্ষিত করিতেছেন। ঠাকুরমার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শিশু অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে অক্ষরটি দেখিতেছে, কিন্তু স্মৃতি হইতে তাহার নাম সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না,—মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিপুণ চিত্রকর দক্ষতাসহকারে গৃহাশ্রমের এই স্নেহস্নিগ্ধ মধুর দৃশ্যটি চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

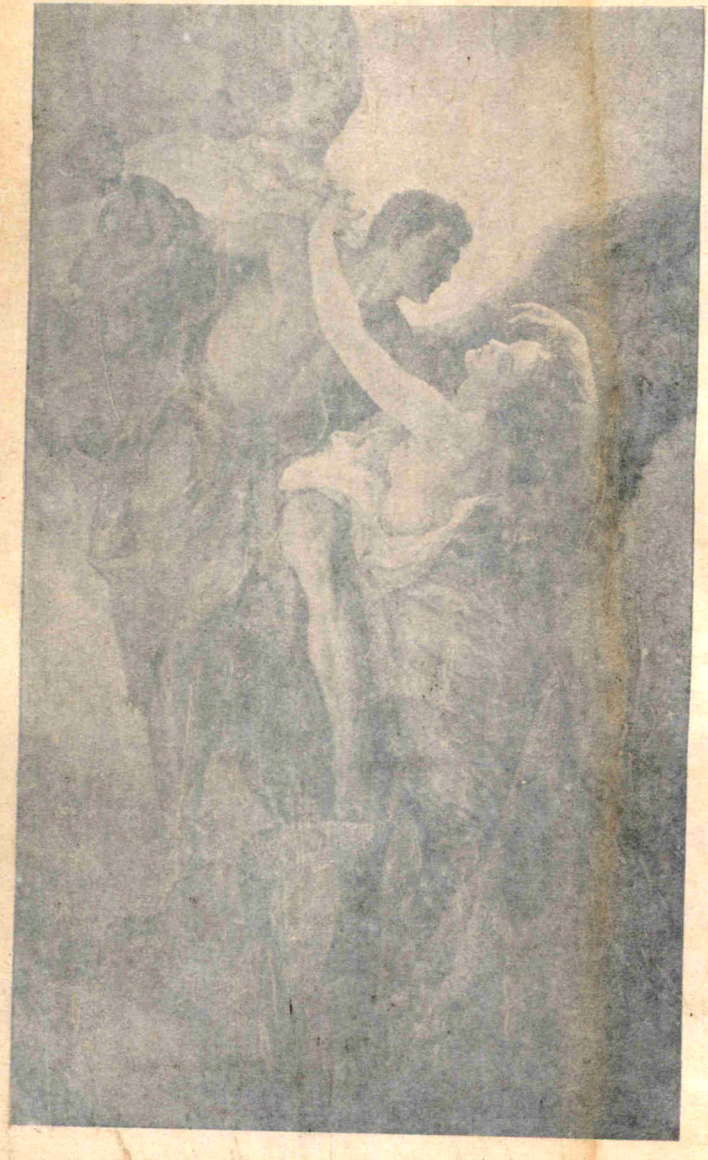

প্রভাত ও শুক-তারা।

ভারতে শক-শোণিত।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শকজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য-পতি মহারাজ শালিবাহন সেই শকজাতিকে পরাস্ত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে অব্দের প্রবর্ত্তন করেন, তাহা 'শকাব্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে। শকজাতি সম্বন্ধে ইহাই এ দেশের প্রাচীন প্রবাদ। মতান্তরে, উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যই শক-জাতির পরাভব সাধন করিয়া 'শকারিত্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রানুসারে শকজাতি 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়'। ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল; পরে কোনও অপরাধে সগর রাজার আদেশে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত বা নির্ব্বাসিত হয়। অতঃপর ব্রাহ্মণের অদর্শনে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছত্ব-লাভ করে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত অন্যপ্রকার। তাঁহারা শকজাতিকে সোবোলীয় প্রদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মধ্য-এসিয়াতেও এই জাতির দীর্ঘকাল আধিপত্য ও বসতি ছিল। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই ঘটনা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ রাজপুতানা ভেদ করিয়া গুজরাথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহারা একবার দক্ষিণাপথ অধিকার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারে নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ ও মালব প্রদেশের হিন্দু নরপতিদিগের চেষ্টায় শকজাতি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। ভারতে প্রবেশের পরই তাহারা প্রথমে বৌদ্ধ ও পরে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করে, এবং বহুপরিমাণে ভারতীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তাহারা হিন্দুসমাজে এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল সিদ্ধান্তের মূলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণের ও অনুমানের অবতারণা করিয়া থাকেন। সে সকল প্রমাণ ও অনুমান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

এই সকল তথ্যের নির্দ্দেশ করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গবেষণা নিরস্ত হয় নাই। শকজাতি যদি একদাকালে ভারতে উপনিবেশ ও অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, যদি এ দেশের নানা স্থানে তাহাদিগের ঐতিহাসিক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে হিন্দু রাজন্যবর্গের চেষ্টায় তাহাদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটিবার পর তাহারা গেল কোথায়? যখন তাহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তখন তাহারা বর্ত্তমান সময়ে কোন্ নামে বা কোন্ জাতি বলিয়া পরিচিত? তাহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কোনও উচ্চবর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, অথবা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়া হীনদশায় কালাতিপাত করিতেছে? গবেষণা-প্রিয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহারও মীমাংসায় যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বা বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিদধিক অশীতি বৎসর পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জেম্‌স্ টড্ স্বপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রাজস্থানের ইতিহাস"-গ্রন্থের প্রথমাংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাজপুতানার বর্ত্তমান ছত্রিশকুলের রাজপুতগণ প্রাচীন শকবংশ হইতে সমুদ্ভূত—পৌরাণিক সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণের সহিত বর্ত্তমান রাজপুতগণের প্রায় কোনও সম্বন্ধই নাই। পুরাণেও প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশের বিলোপের কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুতদিগের কতিপয় উপাস্য দেবতার প্রকৃতি, ধর্ম্মোৎসবের পদ্ধতি, সতীদাহের প্রথা, অশ্বপ্রীতি, মৃগয়া ও সমরোৎসাহ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত প্রাচীন শকজাতির ঐ সকল বিষয়ের বহুল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উভয় জাতির মধ্যে কতিপয় বিষয়ে নামগত সাদৃশ্যেরও অভাব নাই। এই সকল কারণের নির্দ্দেশ করিয়া ঐতিহাসিক টড্ সর্ব্বপ্রথম ভারতের গৌরবস্থল রাজপুত জাতিকে শকবংশোৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন। কালক্রমে টডের এই অনুমান অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকট ও তাঁহাদিগের শিষ্যস্থানীয় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। টডের গ্রন্থ-প্রচারের বহু দিন পরে সুপণ্ডিত কাউয়েল এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এলফিন্‌ষ্টোন-প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" একটি পরিশিষ্ট যোজনা করেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পাঠ করিয়াও অনেকের মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সম্প্রতি স্যার হার্ব্বার্ট রিজলি ভারতীয় জাতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া টডের উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। রিজলি বলেন, রাজপুত ও জাঠ জাতি শক-বংশোৎপন্ন নহে—তাহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত। তাঁহার মতে, মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরাই প্রকৃতপক্ষে শকজাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। শকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিল, তাহাই বর্ত্তমান মারাঠী ভাষার আদি জননী। মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসে ও চরিত্রেও তিনি শক-প্রকৃতির নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রিজলির এই সিদ্ধান্ত বিগত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রকাশিত "ভারতীয় ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-পুস্তকে'র প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে তিনি মহারাষ্ট্র-জাতিকে শক ও দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রকাশিত "ইম্পীরিয়েল গেজেটীয়র অব ইণ্ডিয়া"-নামক গ্রন্থের নূতন সংস্করণেও তাঁহার এই মতবাদ অবিকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিশেষে বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রিজলি "দি পিপ্‌ল্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামে যে গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই নূতন মত পুনরুক্ত হইয়াছে।

নৃ-জাতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ-কার্য্যে প্রথমতঃ দৈহিক বর্ণ, নেত্রের দীপ্তি, কেশ-বিন্যাস-বৈচিত্র্য, ভাষা-গত পার্থক্য, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-ব্যবহার-মূলক বিশেষত্বের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, জলবায়ুর অবস্থানুসারে প্রায়ই দৈহিক বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; নেত্র-দীপ্তি ও স্বাভাবিক কেশবিন্যাসবিষয়ক বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া সকল সময়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মানবসমাজে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও এত ঘন ঘন সংঘটিত হয় যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মৌলিক তত্ত্বের নির্দ্ধারণ কখনও সমীচীন হইতে পারে না। কাজেই এই সকল পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক গঠনের পার্থক্যের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে অধুনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত অবধারণপূর্ব্বক প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আদর্শ নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকজাতি ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় পাষাণমূর্ত্তিকারগণ যেরূপ নরদেহ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেইরূপ জাতিতত্ত্বের মীমাংসার জন্য নরদেহতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে যে, উত্তমাঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ অনুসারে মানবসমাজের শ্রেণীবিভাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, বাহ্য কারণাবলীর প্রভাবেও নর-কপালের গঠনে প্রায়ই তারতম্য ঘটে না; কেবল তাহাই নহে, কোনও সমাজে সঙ্করত্ব ঘটিয়াছে কি না, অথবা কি পরিমাণে ও কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে ঘটিয়াছে, নরকপালের আয়তন দেখিয়া তাহাও নির্দ্দেশ করা যায়। সেই সঙ্গে নাসিকার উচ্চতা ও স্থূলত্ব এবং দৈহিক দৈর্ঘ্যের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও মানবজাতির শ্রেণী-বিভাগ-কার্য্যে বহুপরিমাণে সফলকাম হওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সে যাহা হউক, এইরূপে নরদেহতত্ত্বের আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রথমে মানবসমাজকে ষষ্ঠাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম ফাউলার 'ককেশীয়', 'মোঙ্গোলীয়' ও 'ইথিওপীয়', এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে সমগ্র মানবসমাজকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শ্রেণী-বিভাগই অধুনা অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট আদরণীয় হইয়াছে।

ককেশীয়গণ সাধারণতঃ গৌরবর্ণ, দীর্ঘশীর্ষ ও উন্নত-নাসিক এবং পণ্ডিত-সমাজে 'আর্য্য' নামে পরিচিত। ইউরোপ, উত্তর-আফ্রিকা, আফগানিস্থান পর্য্যন্ত পশ্চিম-এসিয়া ও ভারতবর্ষের একাংশ লোক এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও তাতার দেশের লোকেরা মোঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পীতবর্ণ, স্থূলমস্তক ও হ্রস্বনাসিক। ইথিওপীয়গণ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও সাধারণতঃ নিগ্রো নামে পরিচিত। আফ্রিকায় ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ইহাদিগের বাস। দক্ষিণ-ভারত, সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের অধিবাসিগণ বহুপরিমাণে এই ইথিওপীয়দিগের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদিগের অন্যান্য বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক হক্সলি ইহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা অষ্ট্রেলয়েড বা দ্রাবিড়ীয় জাতি

নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, পৃথিবীর যাবতীয় মানব এই চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীযুক্ত রিজলি এই পাশ্চাত্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভারতীয় জন-সমাজকে সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর-কাল এ দেশের নানা স্থানের লোকের মস্তক, নাসিকা ও দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ-সংগ্রহ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এ দেশে সপ্ত প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোকের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বলেন, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতনার লোকেরা সাধারণতঃ দীর্ঘশীর্ষ ও উন্নতনাসিক। সুতরাং বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত তাহাদিগের ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যুক্তপ্রদেশ হইতে যতই পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অধিবাসীদিগের মস্তকের দীর্ঘতা ও নাসিকার উচ্চতা হ্রাস পাইতেছে, দেখা যায়। বিহার অঞ্চলের লোকের মস্তক মধ্যমাকৃতি, অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশবাসীর অপেক্ষা বিহারীদিগের মস্তকের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অল্প ও বিস্তার কিঞ্চিৎ অধিক। খাস বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি জাতির মধ্যে বেহারীদিগের অপেক্ষা স্থূলশীর্ষতা অধিকতর পরিস্ফুট। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে মস্তকের স্থূলতা দৈর্ঘ্যের অনুপাতে আরও অধিক। নাসিকার স্থূলতা সম্বন্ধেও সেই কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, মস্তকের ও নাসিকার স্থূলতা মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহাদিগের মতে, বিহারবাসীর অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসীর ধমনীতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় শোণিত অধিকতর মাত্রায় বিদ্যমান। দেহযষ্টির দৈর্ঘ্যা-ল্পতার উল্লেখ করিয়াও তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুর ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিতের অল্পতা-প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত রিজ্‌লির মতে (১) কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ ও ক্ষত্রী প্রভৃতি জাতি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশসমুদ্ভূত, (২) যুক্তপ্রদেশবাসীর শোণিতে কিয়ৎপরিমাণে অনার্য্যশোণিত মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তাঁহাদের নাসিকা ও মস্তক দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী প্রভৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল। বিহারে উচ্চবর্ণের লোকের মধ্যেও ঐ স্থূলতা আরও অধিক পরিস্ফুট। এই দুই প্রদেশের লোককে স্থূলতঃ আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয় অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩) বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় দ্রাবিড়ীয় ও মোঙ্গোলীয় ভাব

আরও অধিক। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে আর্য্য-মুখভাব অনেকটা দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা বিহারের উচ্চবর্ণের লোকের অপেক্ষা অল্প। এই কারণে এই দুই প্রদেশের লোক 'মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৪) নেপাল, আসাম, ব্রহ্মদেশে ও হিমালয় প্রদেশে মোঙ্গোলীয় ভাব খুব প্রবল। ইহাদের মস্তক স্থূল, মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিস্তৃত, নাসিকা হ্রস্ব, আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ পীতকৃষ্ণ ও কেশ বিরল। ইহারা বিশুদ্ধ মোঙ্গোলীয়। (৫) সিংহল, মান্দ্রাজ প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, মধ্য প্রদেশ ও ছোটনাগপুরের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীয়। ইহারা খর্ব্বকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিবিড়-কুঞ্চিত-কেশ, স্থূলনাসিক, ঈষদ্দীর্ঘমস্তক। (৬) পশ্চিমভারত বা গুজরাথ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু ও কুর্গ প্রদেশের অধিবাসী-দিগের মস্তক স্থূল, বর্ণ অনতিগৌর, শ্মশ্রু বিরল, দেহযষ্টি অনতিদীর্ঘ, নাসিকাও অনতিসূক্ষ্ম। ইহারা সম্ভবতঃ শকজাতি ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন; তবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শক-শোণিত ও নিম্নশ্রেণীতে দ্রাবিড়ীয় শোণিতের প্রভাব অধিক। এই কারণে ইহাদিগকে শক-দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। (৭) ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের ও বেলুচিস্থানের লোকেরা তুরস্ক ও ইরাণীদিগের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। শ্রীযুক্ত রিজলির ইহাই সিদ্ধান্ত।

কতিপয় পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য বা অনুমানের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রিজলি আপনার এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে এই দেশ দ্রাবিড়জাতীয় জনগণে পরিপূর্ণ ছিল। দ্রাবিড়ীয়েরা হ্রস্বনাসিক ও কৃষ্ণবর্ণ। বেদে ইহারা 'নাসাহীন কৃষ্ণবর্ণ দস্যু' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই জাতিকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া আর্য্যগণ কাশ্মীর ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান রাজপুতানার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার ও উপনিবেশ বিস্তার করেন। দ্রাবিড়ীয়েরা তাঁহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

* শ্রীযুক্ত রিজলি বলেন, বেহারী ব্রাহ্মণের মস্তকের দৈর্ঘ্য শত অংশে বিভক্ত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, তাঁহাদের মস্তকের স্থূলতা ঐ দৈর্ঘ্যের ৭৫ অংশ মাত্র; কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা উহার দৈর্ঘ্যের ৭৯ অংশ। সুতরাং বেহারী অপেক্ষা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা প্রায় ৪ অংশ অধিক; আবার নাসিকার স্থূলতা ৬ অংশ অধিক।

এই ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে, মধ্য-এসিয়া হইতে আর এক দল আর্য্য বীরবেশে গিলগিট ও চিত্রলের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করেন। ডাক্তার হর্ণলি ও ডাক্তার গ্রিয়ার্সন এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই পশ্চাদাগত আর্য্যগণের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। সেই কারণে তাঁহারা অন্তর্বেদী-নিবাসী অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী-সংগ্রহে বাধ্য হন। এইরূপে আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্য-দ্রাবিড়ীয় বংশের সৃষ্টি হইল। প্রথমে যে সকল আর্য্য বেলুচিস্থানের সুগম পথ দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকের অভাব না থাকায় তাঁহাদিগকে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী-সংগ্রহ করিতে হয় নাই। এই হেতু নরদেহ-তত্ত্ববিদেরা (Anthropologists) তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের দৈহিক গঠনে দ্রাবিড়ীয় প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পান নাই।

বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় আর্য্যগণের প্রবেশের পূর্ব্বে ঐ দুই ভূখণ্ডে দ্রাবিড়ীয় ও মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিত। বঙ্গবিজেতা আর্য্যগণ বিহার প্রদেশের আর্য্য দ্রাবিড়ীয়গণের বংশধর ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এখানকার অনার্য্য-রমণীগণের গর্ভে তাঁহারা যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাহাদিগকে লইয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপরিতন অংশ গঠিত হইয়াছে। উড়িষ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা। শ্রীযুক্ত রিজলির বিশ্বাস, এই দুই প্রদেশের মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ও উড়িয়া শূদ্র-সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে, তিনি এই দুই প্রদেশবাসীকে 'মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়'সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহাদিগের নাসিকা ও মস্তকের স্থূলতা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগকে মিঃ রিজ্‌লি এইরূপ যুক্তির বলেই সঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে তিনি দ্রাবিড়ীয় শোণিত ভিন্ন আবার শকজাতীয় শোণিতেরও নিদর্শন দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার ন্যায় মাতৃবংশ হইতে অনার্য্য-শোণিত লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পিতৃবংশই শক-জাতীয়!

এই সকল সিদ্ধান্তের বা অনুমানের যাথার্থ্য-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম এই যে, শ্রীযুক্ত রিজলি কি ভারতের অধিকাংশ লোকের নাসিকা বা মস্তকের পরিমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রত্যেক জাতির বা সমাজের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের—ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? শ্রীযুক্ত রিজলি বলেন, যে কোনও জাতীয় একশত জন লোকের মস্তক ও নাসিকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ-সংগ্রহ করিলেই, সেই জাতীয় লোকের মূল বংশ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি প্রত্যেক জাতি হইতে গড়ে ৬৭ জন মাত্র, (উত্তর-ভারতের ১২ কোটী লোকের মধ্যে ৬ হাজার মাত্র) লোক বাছিয়া লইয়া তাহাদের দৈহিক বিশেষত্ব অনুসারে সমগ্র জাতির বংশনির্ণয় করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি, একবংশের বা পরিবারেরই সকল লোকের—এমন কি, এক পিতামাতারই সকল সন্তানের মস্তক ও নাসিকাদির পরিমাণ যখন সকল সময়ে এক প্রকার দৃষ্ট হয় না, তখন এক এক জাতীয় এত স্বল্পসংখ্যক লোকের দৈহিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেই জাতির মূলবংশ-নির্ণয়ে যত্ন-প্রকাশ কি দুঃসাহসের কার্য্য নহে? তাই সিবিলয়ান-প্রবর ক্রুক্ শ্রীযুক্ত রিজলির মতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

When anthropometry claims to do more than distinguish the main types and its methods are applied to individual tribes or castes, it becomes obvious that the foundation is unable to bear the stately structure which has been reared upon it.—*The Natives of Northern India*—W. Crooke. B. A. (Bengal Civilian).

তিনি আরও বলেন, কেবল নাসিকা ও মস্তকের পরিমাণের উপর নির্ভর করাও সঙ্গত নহে; অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ-গ্রহণও আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই,—

In the first place, we are not at present in possession of a complete series of skull measurements of the people of India, still less of its borderlands. Secondly, these measurements are confined to skull and nasal orms. Though these may be of primary value, it is rash to base the classification of suc ha complex organisation as the

human frame on these organs alone. Skull and nose measurements, while valuable as a test of race types, seems to fail when applied to the mixed races and half-breeds which form the majority of the people.—Ibid. P. 19,

মিঃ ক্রুক অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্য হইতে ২।৪ জন মাত্র লোকের অঙ্গবিশেষের পরিমাণ-গ্রহণ করিয়া মানবদেহের ন্যায় জটিল যন্ত্র-সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। তাহার পর, আর একটা প্রধান কথা এই যে, স্থূলমস্তক জাতিমাত্রই যে মোঙ্গোলীয় বা শক শোণিত হইতে উৎপন্ন, এমন কথা কি সাহসপূর্ব্বক বলা যায়? আয়ারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অধিবাসীরা কি স্থূলশীর্ষ নহে? তথাপি তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন কেন?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

অনুশোচনা।

সাধারণ্যে সুপরিচিত কারিগর গ্রেগরী তাহার বৃদ্ধা পত্নীকে লইয়া আপনই গাড়ী হাঁকাইয়া হাঁসপাতালে চলিয়াছে। তাহার আবাস হইতে হাঁসপাতাল প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পথ অতি বন্ধুর, দুর্গম। ডাকগাড়ী-চালকের পক্ষেই সেই পথ অতিক্রম করা বড় কঠিন। বার্দ্ধক্য-পীড়িত দুর্ব্বল গ্রেগরীর পক্ষে উহা কত কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিধুনিত কার্পাসের ন্যায় তুষাররাশি আসিয়া তাহার চোখে মুখে পড়িতেছিল। তুষার-বৃষ্টির ভিতর দিয়া চারি দিকে মেঘমালা দেখা যাইতেছিল। ক্ষেত্রসমূহ তুষার-সমাচ্ছন্ন—তরুরাজি ভগ্নশীর্ষ। ক্ষীণ শ্রান্ত অশ্ব এই তুষাররাশি মথিত করিয়া অতি কষ্টে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। অশ্বের মন্থরগতি গ্রেগরীর পক্ষে অসহনীয়। সে অনর্গল অকথ্য ভাষায় অশ্বকে গালি দিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সবলে তাহার পৃষ্ঠে, কর্ণমূলে কশাঘাত করিতেছে। শ্রান্ত অশ্ব দ্রুতগমনে অক্ষম। গ্রেগরী হাঁসপাতালে পৌঁছিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত,—অধীর।

জড়িতকণ্ঠে গ্রেগরী তাহার পত্নীকে বলিল, "মাত্রেণা, কেঁদো না। আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। ভগবানের কৃপায় আমরা এখনই হাঁসপাতালে পঁহুছিব, এবং অবিলম্বে পল্-আই-ভ্যান্-উইচ্ হয় ত একটা চূর্ণ ঔষধ তোমার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিবেন, কিংবা মালিশ্ করিবার জন্য ঔষধ দিবেন, অথবা রক্ত-মোক্ষণও করিতে পারেন। তবে ইহা নিশ্চিত, তুমি যাহাতে সুস্থ হও, সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ, হয় ত তিনি ক্রোধাবিষ্টের ন্যায় চীৎকার করিবেন, সবলে ভূতলে পদাঘাত করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাকে নিরাময় করিবার জন্য তাঁহার যত্ন-চেষ্টার কোনও ত্রুটী হইবে না। তিনি খুব সুচিকিৎসক, ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।"

"বুঝেছ মাত্রেণা, যে মুহূর্ত্তে আমরা হাঁসপাতালে গিয়া পঁহুছিব, তখনই তিনি ছুটিয়া আসিবেন, এবং তোমাকে দেখিবেন। আমাকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিবেন, 'কি, হয়েছে কি? পূর্ব্বাহ্নে এসো নাই কেন? তুমি কি আমাকে কুকুর ঠাওরাইয়াছ যে, আমি তোমার পিছু পিছু ঘুরিব? কেন সকালে এসো নাই? যাও—চ'লে যাও। কাল সকালে এসো।' আমি তখন করযোড়ে বলিব, 'ডাক্তার মহাশয়, আপনি অতি দয়ালু—আপনি মহাশয় ব্যক্তি',—"

গ্রেগরী পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল, এবং পত্নীর দিকে না ফিরিয়াই বলিল,—"ডাক্তার মহাশয়! আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি প্রত্যুষেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, কিন্তু দিনের অবস্থা তো দেখিতে পাইতেছেন। ভগবান্ যে ক্রুদ্ধ হইয়া এমন তুষারবৃষ্টি করিবেন, তাহা ত আমি জানিতাম না। এ অবস্থায় কি প্রকারে পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া পঁহুছিতে পারি? আপনিই বলুন না! খুব ভাল ঘোড়া হইলেও এই দুর্য্যোগে ইহার পূর্ব্বে আসিয়া পঁহুছান সম্ভব পর হইত না। আর আমার এ ঘোড়ার অবস্থা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছেন। 'হাঁ, হাঁ, তোমাকে আমি খুব জানি—' বলিয়া ডাক্তার আমার মুখের দিকে চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিবেন, 'একটা কোনও ওজর-আপত্তি তোমাদের লেগেই আছে। বিশেষতঃ তোমার। তুমি অতি জঘন্য লোক আমি তোমাকে বহুদিন হইতে চিনি। তুমি পাঁচবার মদের দোকানে যা, যাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিলে। বদ্‌মায়েস্!' আমি তখন বলিব, 'ডাক্তার মহাশয়, আমাকে নির্ম্মম পিশাচ মনে করিবেন না। আমার বৃদ্ধা পত্নী

ঘর-ঘর, আমি কি মদের দোকানের কাছে যেতে পারি? মদের দোকান জাহান্নমে যাক্।'

"তখন ডাক্তার তোমাকে হাঁসপাতালের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য পরিচারকদিগকে আদেশ করিবেন। আমি অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতস্বরে বলিব,—'আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমরা মূর্খ—হতভাগ্য। আপনি আমাদের লাথি মারিয়া এখান হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন; তথাপি যে আপনি এই তুষার-বৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য বাহিরে আসিয়াছেন, ইহা আপনার অসামান্য মহানুভবতার পরিচায়ক।'—বলিয়া আমি তাঁহার পায়ে ধরিতে যাইব। তিনি পা টানিয়া লইয়া বলিবেন, 'খবরদার! আমার পায়ে হাত দিও না। আমার পায়ে ধরার চেয়ে তুমি যদি মদ ছাড়িতে পার, এবং তোমার পত্নীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইব। তোমার মত লোককে চাবুক্-পেটা করিতে হয়।' আমি বলিব, 'আপনি ঠিক্ বলিয়াছেন। আমি চাবুকের উপযুক্ত। ঈশ্বর ত চাবুক্ মারিতেছেনই, আপনিও মারুন। কিন্তু তাই বলিয়া আপনার পা ধরিব না কেন? আপনি গরীবের মা-বাপ। আপনি আমাদের পরম উপকারী—হিতাকাঙ্ক্ষী। ডাক্তার মহাশয়, আমার মাত্রেণা—আমার এই মাত্রেণাকে আপনি রোগমুক্ত করিয়া দিন, আপনি যা' চাইলে খুসী হন, আপনাকে আমি তাহাই তৈয়ার করিয়া দিব। ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি না দিই, আপনি আমার মুখে থুথু দিবেন। আপনাকে আমি একটি চমৎকার চুরুটের 'কেস্' তৈয়ার করিয়া দিব। বাজারে আপনি তেমন 'কেস্' বড় একটা দেখিতে পাইবেন না। সহরে তেমন একটি চুরুটের 'কেস্' আমি পাঁচ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু আপনার নিকট আমি এক কপর্দ্দকও লইব না।' তখন ডাক্তার হাসিয়া বলিবেন, 'আচ্ছা, তা হবে। দুঃখের বিষয়, তুমি দুরন্ত মাতাল। তোমার কথা মনে হইলে কষ্ট হয়।' মাত্রেণা, বুঝেছ? এই সব ভদ্রলোককে কি করিয়া হাত করিতে হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। উঃ! চোখ-মুখ যে তুষারে ঢাকিয়া গেল! ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। ভগবানের কৃপায় যেন পথ ভুল না হয়।" গ্রেগরী সমস্ত জীবনের মধ্যে এত নির্ভরশীলতার সহিত ভগবানের নাম আর কখনও মুখে আনে নাই।

অবিশ্রান্ত তুষারবর্ষণের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গ্রেগরীর শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। শীতে তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। তথাপি তাহার বাক্যের বিরাম নাই। সে মনে করিতেছিল, এইরূপে কথায় বার্ত্তায় স্ত্রীকে অন্যমনস্ক রাখিতে পারিলে বুঝি তাহার রোগ-যন্ত্রণার উপশম হইবে। তাহার মুখ হইতে বাক্যস্রোত যেমন অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, মস্তিষ্কও চিন্তাপ্রবাহে তেমনই আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। নিতান্ত অতর্কিতভাবে এই অপ্রত্যাশিত দুঃখের বোঝা আসিয়া তাহার উপর চাপিয়া পড়িয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত সে সুরাপানেই বিভোর হইয়া থাকিত। সংসারে সুখ-দুঃখ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা অনুভব করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই। সে জানিত, পানীয়ের মধ্যে সুরা। আহার? প্রত্যহ তাহা না হইলেও চলিতে পারে। উপার্জ্জন? পান-পিপাসা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহাই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু আজ এই অলস, অত্যাচারী, সুরাসক্ত গ্রেগরীর নিদ্রালসা অন্তঃপ্রকৃতি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া তাহার হৃদয় মথিত করিতেছিল।

তাহার মনে হইতেছিল, দুঃখের সহিত তাহার কেবল কাল পরিচয় হইয়াছে। মদ্যপানে মত্ত হইয়া পূর্ব্বরাত্রিতে, অন্যান্য দিনের ন্যায়, যখন সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং চিরাচরিত অভ্যাসমত পত্নীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া তাহার মুখের উপর বদ্ধ-মুষ্টি উদ্যত করিয়াছিল, সেই সময় তাহার পত্নীর নয়নে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই চাহনি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। অন্য দিন যখন সে পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিত, তখন তাহার পত্নীর এরূপ দৃষ্টি আর কখনও সে লক্ষ্য করে নাই। সে দৃষ্টি ভীতিব্যঞ্জক—কাতরতাপূর্ণ। অনশনক্লিষ্ট, প্রহৃত, পালিত কুক্কুর যেমন প্রভুকে দেখিয়া সস্নেহ কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকে, সে দৃষ্টি তেমনই। কিন্তু গত রাত্রিতে তাহার দুর্ব্ব্যবহারের সময় পত্নীর যে চাহনি সে দেখিয়াছিল;—সে চাহনি স্থির—অচঞ্চল, অথচ বিষাদময়। সে তখন তাহার সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখ পতি-পদে নিবেদন করিয়া নিখিল-স্বামীর চিরশান্তিনিলয়ে প্রয়াণ করিবার নিমিত্ত উন্মুখ। পত্নীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃষ্টিই যত অনর্থের মূল। ভীত—উৎকণ্ঠিত গ্রেগরী প্রতিবেশীর অশ্বযান চাহিয়া লইয়া স্বয়ং গাড়ী হাঁকাইয়া পত্নীকে হাঁসপাতালে লইয়া চলিয়াছে। আশা,—

চিকিৎসক পুনঃ চিকিৎসা-কৌশলে তাহার পত্নীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃষ্টি পুনঃসম্বদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

গ্রেগরী পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, "শুন মাত্রেণা, ডাক্তার যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাকে প্রহার করি কি না—তোমার প্রতি কোনও প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করি কি না, তুমি অস্বীকার করিও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আর কখনও তোমাকে প্রহার করিব না। আমি ত প্রত্যহ তোমাকে মারিতাম না, এক এক দিন মারিতাম। বোধ মাত্রেণা, অপর কেহ হইলে তোমার এ অসুখের প্রতি লক্ষ্যই করিত না; কিন্তু আমি তোমাকে এই দুর্য্যোগেও কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছি। উঃ, কি ঝড়! জগদীশ, সকলই তোমার ইচ্ছা! এখন পথ না হারাইলে বাঁচি! তুমি পার্শ্বদেশে ব্যথা পাইতেছ মাত্রেণা? কথা কহিতেছ না যে? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি পার্শ্বদেশে বেদনা বোধ করিতেছ?"

গ্রেগরী নিরুত্তর পত্নীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। "এ কি!"—বলিয়া স্বীয় অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর আপন মনে বলিতে লাগিল,—"আমার শরীরে যে তুষারপাত হইতেছে, তাহা ত গলিয়া যাইতেছে; কিন্তু মাত্রেণার মুখের উপর তুষার জমিয়া যাইতেছে কেন? আশ্চর্য্য!"

সে বুঝিতে পারিতেছিল না, কেন তাহার পত্নীর মুখের উপর সঞ্চিত তুষার বিগলিত হইতেছে না, কেন তাহার পত্নীর মুখ এরূপ দীর্ঘ ও অবিশুদ্ধ মোমের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

গ্রেগরী পত্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সে বলিল, "তুমি নিতান্ত মূর্খ। আমি তোমাকে ডাকিতেছি—আদর করিতেছি, আর তুমি এমনই অভদ্র যে, আমার একটি কথারও উত্তর দিতেছ না। তোমার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নাই। তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি, তুমি যদি এমনই ভাবে চুপ করিয়া থাক—কথার উত্তর না দাও, তবে স্থির জানিও, আমি তোমাকে কিছুতেই হাঁসপাতালে লইয়া যাইব না।"

পত্নী নিরুত্তর।

গ্রেগরীর মুষ্টি হইতে অশ্ববল্গা খসিয়া পড়িল। পত্নীর প্রতি ফিরিয়া চাহিতে আর তাহার সাহস হইল না। পত্নীর নিস্তব্ধতা তাহাকে অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

"মরে গেছে বুঝি! হা ভগবন্!"

গ্রেগরী কাঁদিতে লাগিল। শোকবিহ্বলতাই যে তাহার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। সে ক্রন্দন বিরক্তিজনিত। সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পত্নীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছিল, তাহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না! সে ভাবিতে লাগিল, এ পৃথিবীতে ঘটনাপরম্পরা কত দ্রুত চলিয়াছে! তাহার একটি দুঃখ অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই আবার নূতন দুঃখ আসিয়া জুটিল! পত্নীর সহিত একটি দিনও যে নির্ব্বিরোধে ভাল-ভাবে বাস করিতে পায় নাই, ভালমুখে তাহাকে দুইটা কথা বলে নাই, তাহার ব্যথা বেদনা বোঝে নাই! সত্য বটে, তাহারা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর একত্র বাস করিয়াছে, কিন্তু সে চল্লিশ বৎসর যে ঝটিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! কেবল বিবাদ, বিরোধ, দারিদ্র্য, পানাসক্তির মধ্য দিয়া এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপ এই যে, যে মুহূর্ত্তে সে তাহার পত্নীর জন্য বেদনা অনুভব করিতেছিল, পত্নীর জন্য তাহার অন্তর স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, পত্নীর সঙ্গ সুখকর বলিয়া মনে হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কি না, না বলিয়া কহিয়া, তাহাকে অপরাধী রাখিয়াই চলিয়া গেল! প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত দিল না!

গ্রেগরী অন্যমনস্কভাবে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। গাড়ীর প্রতি তাহার কোনও লক্ষ্য ছিল না। কখনও বা গাড়ী পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-বল্লরীতে স্পৃষ্ট হইতেছিল, কখনও বা কণ্টকবৃক্ষে গ্রেগরীর দেহ আহত হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাহার চক্ষুর সম্মুখে তুষারমণ্ডিত শুভ্র ক্ষেত্রসমূহ যেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতেছিল।

এক একটি করিয়া অতীতের সকল কথা গ্রেগরীর মনে পড়িতে লাগিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই মাত্রেণা—! তাহার সেই উদ্ভিন্ন-যৌবন-বিভাসিত হাস্যপ্রফুল্ল কমনীয় মুখকান্তি, তাহার সেই স্নেহপূর্ণ সাদর আচরণ, সেই মমতা-স্নিগ্ধ সুমিষ্ট আলাপন!—এ সকলই আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মাত্রেণা সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা। সেই সযত্ন-লালিত, কবোষ্ণ-মমতায় প্রস্ফুটিত পেলব-প্রসূন দারিদ্র্যের খরতাপে, অত্যাচারের কঠোর পেষণে, এমনই করিয়া শুকাইয়া, ঝরিয়া গেল!

গ্রেগরী আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমারই অবজ্ঞায়—অবহেলার ফলে

মাত্রেণা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল! প্রতিবেশীদের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাকে দিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে! কেন, আমি কি উপার্জ্জনে অসমর্থ বা অক্ষম ছিলাম? আমার অনন্যসাধারণ শিল্পখ্যাতির কল্যাণে আমি এমন নারীরত্ন লাভ করিয়াছিলাম! সে খ্যাতির মর্য্যাদা আমি রক্ষা করিয়াছি কই? কেবল রক্তনেত্রা সুরারাক্ষসীর সেবায় এই সুদীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! আমার গৃহে আসিয়া মাত্রেণা একটি দিনের জন্যও সুখী হয় নাই—শান্তির স্বাদ পায় নাই!

তুষারধারাচিত্রিত শুভ্র মেঘমালা অসিতবর্ণ ধারণ করিল। সন্ধ্যা সমাগতা।

গ্রেগরী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ভগবন্! আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছ? আর এখন হাঁসপাতালে গিয়া কি ফল? গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই ত এখন আমার কর্ত্তব্য।" বলিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে প্রবলবেগে কশাঘাত করিল। ক্লান্ত অশ্ব হ্রেষারব করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

গ্রেগরীর পশ্চাদ্ভাগে কেমন একটা ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ফিরিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না, কিন্তু সে অনুমানে বুঝিল, শকটগাত্রে তাহার অভাগিনী পত্নীর মস্তক আহত হইতেছে।

গ্রেগরী অশ্বরশ্মি ত্যাগ করিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু পারিল না। শিথিল বাহু তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতে অস্বীকার করিল। সে আপন মনে ভাবিতে লাগিল, "যাক্, সমানই কথা!—অশ্ব আপনি পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে। ততক্ষণ একটু ঘুমাইয়া লই। ইহার পরেই ত সমাধিক্ষেত্র।—"

গ্রেগরী নিদ্রার ধ্যানে নয়ন মুদ্রিত করিল। কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার বোধ হইল, যেন অশ্ব চলিতেছে না—থামিয়া গিয়াছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিদ্রাসক্ত নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিয়া সে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে, অন্ধকার-আবরণের মধ্যে প্রকাণ্ড খড়ের স্তূপ।

স্থাননিরূপণের নিমিত্ত সে গাড়ী হইতে নামিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিদ্রার গাঢ় আলিঙ্গন তখন তাহার নিকট এমনই সুখকর বোধ হইতেছিল যে, সে ইচ্ছা সত্ত্বেও নড়িল না। নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে লাগিল।

* * * * * *

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে একটি রক্তবর্ণ-প্রাচীর-বেষ্টিত

সুবিস্তীর্ণ কক্ষে শায়িত। তাহার সম্মুখে দুই তিনটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "ভাই সকল! একবার ধর্ম্মযাজককে ডাকিয়া আন। আমাকে ভগবানের নাম শুনাও।"

অপর পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "চুপ্ করিয়া শুইয়া থাক। কথা কহিও না।" গ্রেগরী ফিরিয়া চাহিল। "এ কি? ডাক্তার মহাশয় যে! আপনি—আপনি!"

ডাক্তার বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন "স্থির হ'য়ে থাক।"

গ্রেগরী উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই গিয়া ডাক্তারের পদযুগল জড়াইয়া ধরে; কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। তাহার হস্তপদ তখন অবশ।

"ডাক্তার মহাশয়! আমার হাত-পা কোথায় গেল?"

"তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। রাত্রিকালে তুষারবর্ষণের মধ্যে যখন গাড়ীর উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, তখন বুঝি হাত-পায়ের ভাবনা ভাবিবারও অবসর পাও নাই? কাঁদছ কেন? কাঁদিবার কারণ কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে, তোমার ন্যায় ব্যক্তি এই দীর্ঘকাল তাঁহার মহিমার রাজ্যে বাস করিতে পাইয়াছে।"

"ডাক্তার মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। আর পাঁচ ছয় বৎসর যাহাতে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিন।"

"কেন, তোমার এ সাধ হইতেছে কেন?"

"এ গাড়ী ঘোড়া আমার নয়। আমার একটি সহৃদয় প্রতিবেশীর নিকট হইতে আমি ইহা চাহিয়া আনিয়াছি। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তা' ছাড়া আমি আমার পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিলে আপনাকে একটি সুন্দর চুরুটের 'কেস্' প্রস্তুত করিয়া দিব। মাত্রেণা নিশ্চয়ই এতক্ষণ——"

ডাক্তার মুখ বিকৃত করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

অসমাপ্তবাক্ হতভাগ্য গ্রেগরীর প্রাণশূন্য দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।*

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

---

* প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ক্ষুদ্র গল্পের রচনায় সুনিপুণ এণ্টন্ চেক্‌হফের লিখিত রুসীয় গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

জীব-বন্ধন।

এই ধরাতলে অসংখ্য জীব বাস করিতেছে, স্থূলদৃষ্টিতে ইহাদিগকে পৃথক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল! ইহারা পরস্পরের সহিত প্রকৃতপক্ষে এক সূত্রেই গ্রথিত; এক মহাবন্ধনরজ্জুই ইহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ইহারা সকলেই সকলের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। কাহারও অভাবে কেহ বাঁচিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, জড়ের সহিতও ইহাদিগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মৃত্তিকা, বায়ু ইত্যাদি জড় পদার্থ উদ্ভিদ্‌গণকে পোষণ করে; উদ্ভিদ জন্তুগণকে পোষণ করে। সুতরাং জীব ও জড়, এক বন্ধন-সূত্রেই আবদ্ধ। এ বন্ধন-সূত্র কোথাও ছিন্ন হইলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

জীবগণ যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনে জীবনযাপন করে, তাহা তাহাদিগের অভ্যস্ত হইয়া যায়। যদি এই অবস্থায় তাহাদিগের দেহ ও মন পুষ্ট থাকে, এবং তাহারা উপযুক্তরূপে বংশ-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহারা এ অবস্থার উপযোগী। বিভিন্ন জীবগণ এই একই অবস্থায় বসবাস করায় তাহাদিগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠে। তখন একের অভাবে অবশিষ্টের সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। সকলেই জানেন, বিড়াল ইন্দুর খায়। গৃহস্থ বিড়ালের উৎপাতে অনেক সময় তাহাদিগকে স্থানান্তরে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এই কার্য্যের পরিণাম-ফল কি? ঐ গৃহস্থের বাড়ীতে ইন্দুরের সংখ্যা বাড়িয়া যায়; সুতরাং তাহার খাদ্য সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্রাদি অধিক নষ্ট হয়, তাহার সাংসারিক সুশৃঙ্খলায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যদি গৃহস্থ ধনবান না হয়, তবে তাহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর ভাগে একটি প্রদেশে কাঠবিড়ালের অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ কাঠবিড়াল মারিলে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলেন; তাহাতে অনেক কাঠবিড়াল কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু পরিণামে দেখা গেল যে, কাঠঠোক্‌রা পক্ষী অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। উহারা কাঠ কাটিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন অধিবাসিগণ বুঝিতে পারিল, কাঠবিড়াল বধ করা সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। (১)

(1) Darwinism and Human life P. 6.

এতদ্দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশে জঙ্গলবিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্থানের উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে অনেক জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে দাঁড়াইল যে, বৃষ্টিপাত কম হইয়া গেল, চাষ-আবাদের অসুবিধা হইল, জল-বায়ু রুক্ষ হইয়া উঠিল এবং কোন কোন স্থানে তদ্দেশ-বাসিগণের স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রুক্ষদেশে বাস করিলে, চাষ আবাদের অসুবিধায় অন্নাভাব উপস্থিত হয়; মানুষের স্বভাব স্থির থাকিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। সম্প্রতি গাছ কাটার ঢেউ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

আমার বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি জঙ্গলা গ্রামে কতকগুলি বাঘের বাস ছিল। শীকারীরা ঐ ব্যাঘ্রগুলিকে বধ করিয়া গ্রামটিকে নিরাপদ করে। কিন্তু সেই কারণেই কুকুরের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়া গেল। তাহাতে গ্রাম-বাসিগণ সর্ব্বদাই উৎপাত বোধ করিত। সময়ে সময়ে বিপদের আশঙ্কাও উপস্থিত হইয়াছিল।

পতঙ্গ ধরা অনেকের অভ্যাস আছে। যদি আজি পতঙ্গকুল নির্ব্বংশ হয়, অথবা অনেকপরিমাণে কমিয়া যায়, অনেক গাছ আর ফুলে ফলে শোভিত হইবে না। তাহাতে বাহ্যপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইবে, এবং মানব অনেক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর আহার হইতে বঞ্চিত হইবে।

ডারুইন দেখাইয়াছেন, কেঁচো মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি অনেক বর্দ্ধিত করে। তাহাতে মানুষ অশেষপ্রকারে লাভবান্ হয়। কেঁচো না থাকিলে মানবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী—এ সকল মানবের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কতই আবশ্যক। ইহাদিগকে বধ করিলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে না; ইষ্টের সংখ্যা কমিয়া যায়, অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে।

যে সকল জীব ও জড় লইয়া যে প্রদেশে প্রকৃতি যেরূপ ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা হইতে কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। তেমনই তাহাতে কিছু যোগ করাও চলে না। অষ্ট্রেলিয়া দেশে খরগোশ ও আমেরিকাতে চড়াই পাখী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ঐ সকল দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বহু ব্যয়ে আংশিকরূপে সে ক্ষতির পূরণ হয়। (২) কখনও বা মানবের অজ্ঞাতসারেও নূতন উদ্ভিদ বা জন্তু সকল

(2) I bid P.64.

এক দেশ হইতে অন্য দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ফল প্রায় সর্ব্বত্রই অনিষ্টজনক হইতে দেখা গিয়াছে।" অষ্ট্রেলিয়া দেশ এই কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জ্যামেকা দ্বীপে আপনা হইতেই বহু ইন্দুর আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ক্রমে তাহারা আপদস্বরূপ হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বেজীর আমদানী করা হইল; কিন্তু বেজীরা ইন্দুরবংশ ধ্বংস করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; উহারা গৃহ-পালিত পক্ষী ও পক্ষি-শাবকদিগকেও ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং দ্বীপবাসীদিগের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মানুষও এ নিয়মের বাহিরে নহে। কোথাও নূতন জীবের আমদানী হইলে, কিংবা কোথা হইতে বাদ পড়িয়া গেলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অধ্যাপক টমসন্ বলেন, "নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নূতন জীব আনিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। নূতন মানুষের আমদানী করাও নিরাপদ নহে।" (৩) ডারুইন্ দেখাইয়াছেন, যখন বিভিন্ন-জাতীয় মানবগণের প্রথম সমাগম হয়, তখন তাহাদিগের সংস্রববশতঃ কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে, নূতন নূতন পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। (৪) জগতে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। ধূলিকণা হইতে প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে মানব পর্য্যন্ত যে যেখানে যে ভাবে অবস্থিত, তাহা যুগযুগান্তরের সামঞ্জস্যের ফল। একটি চড়াই পাখী খসিয়া পড়িলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। এই মহাজনবাণী গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে যে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার ফল অনেক সময়ই আমরা বুঝিতে পারি না। আর মুখ্য ফল যদিও বা কখনও বুঝিতে পারি, গৌণ ফল কাহার সাধ্য বুঝে? (৫) হিন্দু ও বৌদ্ধ এ

---

(3) We should be careful in our introductions of new organisms—man included—into new surroundings. Ibid P.65.

(4) It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease. Descent of Man P.233.

(5) The primary consequences may be predictable, but the secondary and

কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাহারা সর্পও বধ করিত না। আজ অধ্যাপক টমসন্ বলিতেছেন,—Even in regard to snake killing may be carried too far. কিন্তু এই স্থলেই সবিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়। কারণ, জীবন-সংগ্রামে বধ ভিন্ন জগতে বাঁচিবার উপায় নাই। এখন করি কি? সমস্ত জগৎকে একখানি প্রকাণ্ড জাল মনে করিতে হয়। ঐ জালে অসংখ্য গ্রন্থি। জালের প্রান্তভাগের গ্রন্থি সকল কিঞ্চিৎ ছিঁড়িলে বা খসিলেও কোনরূপে মাছ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ভিতরের গ্রন্থি খসিলে সে জালে মাছ ধরা হয় না—এই উপমাটি অধ্যাপক মহাশয়ের। ইহাতে কথাটি এক প্রকার বুঝা গেলেও, প্রকৃত অবস্থার সহিত এ উপমার ঐক্য নাই। প্রশ্ন হইয়াছিল, "আমরা করি কি? জীব বধ করিতেও পারি না, না করিলেও জীবনধারণ করা চলে না।" ইহার উত্তরে এইমাত্রই বলা যায়, অনেক বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও মধ্যপথই প্রশস্ত। অকারণ প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট করিব না, কিন্তু যখন তদ্রূপ না করিলে আর চলিতে পারে না, মানবের জীবনধারণ করাই অসম্ভব হইয়া উঠে, অথবা মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সে অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া সঙ্গত হইতে পারে। (৬) ইহাই বৈজ্ঞানিকের উত্তর। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ও নীতি-তত্ত্ববিৎ এ উত্তরে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মতে, এরূপ করিলেও পাপ স্পর্শে, মানবের চরিত্র-হানি হয়। আর চরিত্র গেলে জগতে কোনও সম্বলই থাকে না। এ কথা সকলেরই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

এই জীবন-সমস্যার মীমাংসার নিমিত্তই এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন,—"তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" যজ্ঞ বিবিধ প্রকার, এবং মানবের অপরিহার্য্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বধ অবধ-তুল্য। এইরূপেই বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিলন করিয়া এতদ্দেশে ক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়মিত হইয়াছিল। মানব স্বভাবতই দুর্ব্বল। তাহার এই পথ ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না। আদর্শ, প্রকৃতির সামঞ্জস্য-রক্ষা; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব। তাই পুরুষ-

---

the tertiary consequences—who is sufficient for these things?—Darwinism and human life P.65.

(9) The naturalist's answer is that every crusade should be carefully considered on its own merits, and that every careless and hasty destruction of life is to be condemned Ibid P.63.

কারের স্থল নির্ণয় করা আবশ্যক, আর সেই কারণে মধ্যপথই প্রশস্ত পথ। এই পথ অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে যথাসম্ভব ফলাফলের বিচার করা আবশ্যক। প্রত্যেক পথই পৃথক্‌রূপে বিবেচ্য। কিন্তু পরিণামে সফলতা শ্রীভগবানের হস্তে। মানবের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই।

শ্রীশশধর রায়।

আত্মত্যাগ।

"বিদায়, হেন্‌রিচ্‌; তোমার বিমান-যাত্রা সফল হউক!"

দীর্ঘাকার, কৃশাঙ্গ যুবক খর্ব্বকায়া যুবতীর করপল্লব পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহার নয়ন পানে চাহিল। যুবতী নয়নে নয়ন মিলিত হইবার আশঙ্কায় অদূরবর্ত্তী প্রান্তরস্থিত ব্যোমযানটি দেখিতেছিল। জনতাভেদ করিয়া আর এক জন তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া রমণীর নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"লিস্‌বেথ, তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?"—মাতুল-পুত্রের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।—"আজিকার দিনেও কি কিছু বলিবে না?"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে যুবতী মাথা নাড়িল, হাতখানিও বিযুক্ত করিয়া লইল। ত্বরিতকণ্ঠে সে বলিল, "হেন্‌রিচ, আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিও না, উহা ভিত্তিহীন।"

যুবতী একবার যুবকের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিয়া লিসবেথের হৃদয় অবর্ণনীয় ভাবে অভিভূত হইল। তাহাকে যে সে একান্তমনে বিশ্বাস করে, ইহা বুঝাইবার জন্য, জানাইবার জন্য যুবতী ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার অন্তরঙ্গ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। যুবকের হস্তে সে নিজের সুখ—অদৃষ্ট সঁপিয়া দিবে।

যুবতী তাহার দিকে আবার হাত বাড়াইয়া দিল।

"হেন্‌রিচ্‌, তোমার হৃদয়, উদার, মহৎ, করুণার্দ্র। আমি তোমাকে ভালরূপ জানি, সেই জন্যই—"

"সেই জন্য কি, লিস্‌বেথ?" মস্তক নত করিয়া সে যুবতীর মুখের কাছে কান রাখিয়া বলিল, "বল লিস্‌বেথ, কি বলিতেছিলে, শুনি?"

"তাই বলিতেছিলাম—আমার সুখ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তুমি তাহা

করিও। আজ শুধু তোমারই নিকট আমার অন্তরের গূঢ় কথা প্রথম প্রকাশ করিলাম। বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিও; আমার কাছে ফিরাইয়া আনিও।"

যাহা বলিবার ছিল, বলা হইল। যুবকের করপ্রকোষ্ঠে রমণীর কোমল হস্ত শিহরিয়া উঠিল। প্রণয়পাত্রের শুভ-কামনায় প্রণয়িনীর অশ্রুসিক্ত নয়নে গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

এতদিন তাহার হৃদয়ের গুপ্ত রহস্য কেহই জানিত না। হেনরিচই প্রথমে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই আবার ব্যোমযানে লিস্‌বেথের প্রণয়পাত্রের সহযাত্রী,—সহস্র অনিশ্চিত বাধা, বিঘ্ন ও বিপদের অংশী!

ওষ্ঠে অধর চাপিয়া নির্ব্বাক ও নিঃস্পন্দভাবে যুবক দাঁড়াইয়া রহিল। লিস্‌বেথ তাহার মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে এ কি করিল? কাজটা কি সঙ্গত ও বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত হইয়াছে? সে হেন্‌রিচের হৃদয়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার রুদ্ধ স্রোত মুক্ত করিয়া দেয় নাই ত? ইহার পরিণাম কি, কে জানে?

চতুর্দ্দিকে জনতা। কিন্তু তথাপি রমণী আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে লিস্‌বেথ বলিল, "হেন্‌রিচ্!" যুবক সে আহ্বানের উত্তর দিতে পারিল না। নির্ব্বাকভাবে সে পশ্চাতে সরিয়া গেল। আর এক জন তাহার স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

হৃদয়ের চাঞ্চল্য অতিকষ্টে দমন করিয়া যুবতী হাস্যপ্রফুল্লমুখে নবাগতের পানে চাহিল। তাহার ললাটে আসন্ন ঝটিকার মেঘ যেন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নয়নে সন্দেহের ছায়া। লিস্‌বেথের মনে হইল, প্রণয়পাত্রের মানসিক উদ্বেগ দূর করিবার জন্য তাহার কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু কথা অতি সাধারণভাবেই আরব্ধ হইল।

"ডাক্তার, আপনারা এখনই যাত্রা করিবেন না কি?"

নবাগত মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আপনার ভ্রাতা সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধে সমস্তই বলিয়াছেন।"

কথাটা অত্যন্ত নীরস। কণ্ঠস্বরে লিস্‌বেথ্ যেন দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার লক্ষ্য করিল।

"আমার সঙ্গী বহুক্ষণ ধরিয়া বিদায় লইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া থাকিবে। আমি তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছি।"

"আমি প্রস্তুত। এখানে বিলম্ব করিবার আর কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।" বলিতে বলিতে হেন্‌রিচ সম্মুখে অগ্রসর হইল। লিস্‌বেথকে অভিবাদন করিয়া সে গমনোদ্যত হইল। যুবতীর নীরব দৃষ্টির, ব্যাকুল প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে?—পার্শ্বেই যে প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান!

ডাক্তার ষ্টোরমার নীরবে চলিয়া যাইতেছিলেন। লিস্‌বেথ তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিল।

"বিদায়, ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন; নিরাপদে ফিরিয়া আসুন।"

যুবতীর কম্পিত করপল্লব চুম্বন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তবে এখন আসি লিস্‌বেথ!"

লিস্‌বেথ যুবকদ্বয়ের দীর্ঘ দেহে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়ে আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিল। আকাশযান হেলিয়া দুলিয়া নীল শূন্যে উড়িয়া চলিল। যুবতী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে ব্যোমযান ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন যুবকদিগকে আর চেনা যাইতেছিল না। সঞ্চরণশীল মেঘমালার মধ্যে ব্যোমযান সূর্য্যালোক-দীপ্ত গোলকের ন্যায় জ্বলিতেছিল। ক্রমশঃ উহা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

ডাক্তার ষ্টোরমার ও হেন্‌রিচ্ ফ্রেঞ্জিয়স্ নীরবে শূন্য পথ অতিক্রম করিতেছিল। নিম্নে রৌদ্রদীপ্ত অথবা অথবা মেঘচ্ছায়াশীতল নগর, পল্লী, অরণ্য ও প্রান্তর! পাখীরা বিমানের আশে পাশে উড়িতেছিল।

ক্রমে রজনীর অন্ধকার অবগুণ্ঠনে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাতাস শীতল হইয়া আসিল। কুজ্ঝটিকার আবরণ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যোমযানের রজ্জু ও বসিবার আসনের চতুষ্পার্শ্বে গাঢ় কুজ্ঝটিকা দুলিতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে উভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে ব্যোমযানকে চালিত করিতেছিল।

চারি দিকে ছিদ্রশূন্য অন্ধকার। বৈদ্যুতিক-আলোক-সঞ্চালনে তাহারা শুধু কুহেলিকার ধূম্র ছায়াই দেখিতে পাইতেছিল। মেঘ-সমুদ্রের মধ্য দিয়া বিমান-পোত প্রচণ্ডগতিতে সম্মুখে ছুটিতেছিল—কিন্তু কোথায়?

উভয়ে তখন একই রমণীর চিন্তায় বিভোর। তাহাকে লাভ করিবার বাসনা উভয়েরই মনে জাগিতেছিল। উভয়েই ভাবিতেছিল, এ সময়ে

পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। জীবনে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়,—উভয়ের মধ্যে সমুদ্রবৎ অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু অদৃষ্টবশে এখন তাহাদের ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত, উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী! তাহাদের পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; সুতরাং অনিশ্চিত।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উভয়ে সেই গভীর নিশীথে মেঘরাজ্যে উড়িয়া যাইতেছিল! এই মহাশূন্যে, অনন্ত গভীর নির্জ্জনতায় যদি উভয়ের বলপরীক্ষা হয়, তার পর বলবান যদি একাকী গৃহে ফিরিয়া যায়, তবে সে ঘটনার কথা কে জানিতে পারিবে? গাঢ় কুজ্ঝটিকার অন্তরালে সব কাজ অনায়াসে শেষ হইয়া যাইতে পারে। কোনও মনুষ্য-কণ্ঠে এ কথা প্রকাশ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

চঞ্চলহৃদয়ে অবিশ্বাসভরে একে অপরের পানে চাহিল। এই সময়ে উভয়ের মনে কি একই চিন্তার উদয় হইয়াছিল? ধীরে ধীরে কুহেলিকার ধূম্র আচ্ছাদন ভেদ করিয়া নবোদিত তপনের কনক-কিরণ ঊর্দ্ধে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কুজ্ঝটিকা তখনও দিগন্ত আবৃত করিয়া দুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে ব্যোমযান নীচের দিকে নামিতে লাগিল। দূরের কোনও পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাহারা যে কোথায় আসিয়াছে, তাহাও বুঝা যাইতেছিল না। তাহারা যে ক্রমশঃ নীচে নামিতেছে, কেবল তাহাই অনুভব করিতেছিল। তখনও নিম্নদেশ হইতে কোনও শব্দ শুনা যাইতেছিল না।

কিন্তু ও—কি?

সহসা জলোচ্ছ্বাস, গম্ভীর কল্লোলধ্বনি তাহাদের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইল। উভয়ে নির্ব্বাকভাবে উভয়ের মুখপানে চাহিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, পদতলে সীমাহীন, ভীমকান্ত সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। ক্রমশঃ তাহারা দেখিতে পাইল, নীল জলধির প্রর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জনে লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায়-ঊর্দ্ধদেশে যেন বাহু বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

তখন ফেনময় সমুদ্রতরঙ্গ ব্যোমযানের নিম্নভাগ প্রায় স্পর্শ করিতেছিল। সমুদ্রশীকর তাহাদের দেহ সিক্ত করিয়া দিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাহারা অবশিষ্ট ব্যাগটি ফেলিয়া দিল। কিছু কালের জন্য বিমান সমুদ্রবক্ষ হইতে শত ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

বিশাল বারিধিবক্ষে কোথাও একখানি অর্ণবপোতের চিহ্নমাত্র নাই। সমুদ্রের ভীমগর্জ্জন ব্যতীত দ্বিতীয় শব্দ শুনা যাইতেছিল না। মৃত্যু যেন তরঙ্গোপরি বসিয়া ধ্রুব শিকারের প্রতীক্ষায় দুলিতেছিল। ব্যোমযান আবার নীচে নামিতে লাগিল।

একে একে যাবতীয় দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইল। গরম কাপড়, আহার্য্য দ্রব্য—অবশেষে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র পর্য্যন্ত—সমস্তই তাহারা ফেলিয়া দিল। ব্যোমযান কিছু ঊর্দ্ধে উঠিল বটে, কিন্তু তথাপি নিম্নে সলিল-সমাধি মুখব্যাদান-পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আর রক্ষা নাই, আমরা গিয়াছি!"

ব্যোমযান তখন প্রায় জলের উপর দিয়া চলিতেছিল। বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে?—অগাধ সমুদ্রে, অথবা কূলের দিকে?

দড়ি বাহিয়া উভয়ে উপরের দিকে উঠিল। বিচ্ছিন্নপ্রায় কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, দূরে—বহু দূরে ছায়াচ্ছন্ন শৈল-সঙ্কুল তীরভূমি বিরাজিত। ঐখানে পঁহুছিতে পারিলেই তাহারা নিরাপদ হইতে পারে; কিন্তু ক্রমেই যে তাহারা নীচের দিকে নামিতেছে!

সমুদ্রতরঙ্গ তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গাভিঘাতে তাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। চৈতন্য বিলুপ্ত হইতেছিল। কূলে পঁহুছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ব্যোমযানকে লঘুভার করিবার জন্য আর কোনও ফেলিবার জিনিস ছিল না। কূল দেখিতে দেখিতেই তাহারা জলধির অতল গর্ভে সমাহিত হইবে!

ডাক্তার ষ্টোরমার অকস্মাৎ বলিলেন, "ফ্রেঞ্জিয়াস্, মৃত্যুর পূর্ব্বে মনের ধাঁধা ঘুচাইয়া ফেলা দরকার। লিস্‌বেথ কি তোমায় ভালবাসে?"

হেন্‌রিচের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথিত ম্লান হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাস্যেও কি যন্ত্রণার চিহ্ন!

মস্তক আন্দোলিত করিয়া সে বলিল, "না। আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তাহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই সে আমাকে বলিয়াছিল;—'তোমার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম, আমার নিমিত্ত তাহাকে রক্ষা করিও। সে যেন আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসে।' আমি তখন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি আমার হইয়া উত্তরটা দিও।"

সমুদ্র-গর্ভ আলোড়িত করিয়া এক রোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দূরে—দূরে তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিয়া গেল।

ব্যোমযান আবার ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইল। কিন্তু বসিবার আসনে তখন একটিমাত্র আরোহী! সমুদ্রতরঙ্গ কি হেন্‌রিচকে আশ্রয়চ্যুত করিয়াছিল?

লঘুভার ব্যোমযান তখন বায়ুচালিত হইয়া তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল।

আতঙ্কে অভিভূত ডাক্তার ষ্টোরমান সেই অনন্তবিস্তার নিষ্ঠুর সলিল-রাশির দিকে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়াছিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছিল। মনুষ্যমুণ্ড অথবা ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্ত বাহু, কিছুই দেখা গেল না। কুজ্ঝটিকার অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন তাঁহার হস্ত রজ্জুদণ্ড হইতে খসিত হইল। ষ্টোরমারের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্যোমযান তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল; নৌকাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল। তীরের সন্নিহিত হইয়া ব্যোমযান আবার জলের উপর নামিয়া পড়িল। তখন নৌকার লোকে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল।

ডাক্তার বহুদিন হাঁসপাতালেই ছিলেন। চৈতন্যসঞ্চারের পর তিনি লিস্‌বেথের উৎকণ্ঠামলিন মুখ দেখিতে পাইলেন। বাহুবন্ধনে তিনি প্রণয়িনীকে আবদ্ধ করিলেন।

বাহিরে, অনতিদূরে অনন্ত বারিবিস্তার। উভয়ে কান পাতিয়া তরঙ্গোচ্ছ্বাসে যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন! তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, উভয়ের মিলন-কামনায় যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহারই হৃদয়স্পন্দন যেন সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে!

আজ মৃদুকণ্ঠে প্রণয়চর্চ্চার সময় নয়। ভবিষ্যতের সুখ শান্তির কথাও তখন কাহারও মনে ছিল না। বন্ধুর উদারতাই তখন তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। লিস্‌বেথও আজ প্রণয়পাত্রের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিল না! যে লিস্‌বেথের ব্যগ্র প্রার্থনা কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছিল, লিসবেথ কম্পিতকণ্ঠে আজ সর্ব্বপ্রথম তাহারই নাম উচ্চারণ করিল,—"হেনরিচ!"*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* হেলেন উইটির রচিত কোনও জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—গ্রন্থখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই বৎসর লেখনী ধারণ করিলেন না। যে লেখনী কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রসব করিবে সে লেখনী উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া রহিল। জানি না কেন—দুই বৎসর পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থল অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল,—সঞ্জীবচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন।

প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে তখন কতকটা চিনিলেন। উপেক্ষিত লেখনী তুলিয়া লইয়া তিনি কপালকুণ্ডলা লিখিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কাহাকেও শুনাইলেন না—অথবা দেখিতে দিলেন না। তখন তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস, এই আত্মনির্ভরতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার ঘা খাইয়া তিনি পাণ্ডুলিপি কখনও কাহাকে আর দেখান নাই। কিন্তু আমি গোপনে তাহা দেখিতাম। আমার এক্ষণে ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয়, আমি এ জন্য তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকিব। যে জন্যই হউক, আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পাণ্ডুলিপি অপর কেহ দেখে, এটা তিনি পছন্দ করেন না। এই বিশ্বাসের

বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিলাম। রমেশ বাবু তখন মেদিনীপুরের কালেক্টার। লোয়াদার ডাক্‌-বাংলোতে বসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কাকা এক্ষণে কি বই লিখিতেছেন?" কাকার মনোভাব স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম, "জানি না।" অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে বাসনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন একদিন নিশীথে তাঁহার দ্বারে সবলে করাঘাত হয়। রাত্রি তখন প্রায় আড়াই প্রহর—গৃহের সকলে নিদ্রিত। পুনঃপুনঃ করাঘাতে ভৃত্যেরা জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী। ভৃত্যেরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবুকে ডাকো।" ভৃত্যেরা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, পরে পরামর্শ করিয়া বাবুকে উঠাইল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, এক জন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নর-কপাল-হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত, কর্ণে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গার-রেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন?" কাপালিক উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে এস।"

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপা। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল, এবং পরদিবস নিশীথে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করিল; এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। সে তৃতীয় দিবসেও আসিয়াছিল। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। আমার মনে হয়, এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি; তাই কথাটার উল্লেখ করিলাম।

এ স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লিখিবার প্রণালীর উল্লেখ করিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। তাঁহার লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি

খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইত—প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃপুনঃ ঘটিত। এমন কি, সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। যে পরিচ্ছেদ কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সে পরিচ্ছেদে হয় ত দেখিলাম, হীরার আমি আসিয়া কেটরস ও ইষ্টরসের অবতারণা করিতেছে। যে পরিচ্ছেদে দলনী বেগমের আসিবার কথা, সে পরিচ্ছেদে নবেল কটার আসিয়া দেখা দিল। এত কাটাকুটি করিতে, এত পরিবর্ত্তন করিতে, সম্পূর্ণ লিখিত পরিচ্ছেদ এককালে উঠাইয়া দিতে আমি আর কোনও গ্রন্থকারকে দেখি নাই। আমি কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। আমার শ্বশুর স্বর্গীয় [illegible] মহাশয়কে কখনও এক ছত্র পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই। [illegible] মাত্র লেখা ফাইতেন না, বরং বাড়াইতেন। হেমবাবু খুব [illegible] যাইতেন, পরিশেষে [illegible] পরিবর্ত্তন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তন [illegible] লিখিবার সময় করিতেন—পর-দিন করিতেন—ছয় মাস এক বৎসর [illegible] করিতেন। যতক্ষণ না কথাটি তাঁহার পছন্দসই হয়—যতক্ষণ না [illegible] মনের মতন হয়, ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা [illegible] তাহা লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দে[illegible]

যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্টের [illegible] করিতেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। [illegible] সান্ কিভাঙ্গার বাসার অবস্থানকালে দেখিয়াছি, [illegible] আফিসের পর লিখিতে আরম্ভ করিতেন, এবং রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তখন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটা কাচের শামাদানে মিটু মিটু করিয়া তামাকু সাজা থাকিত, এবং দক্ষিণ দিকে কিছু আহার্য্য থাকিত, প্রকাণ্ড চাটুয্যের গলীতে আসিয়া এ কাচের কর্ম্মি করিয়া দাড়াইল, এবং কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জন্য ঠ্রপার ফর্সি আসিল।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকল সময়ে একটু

একটু লিখিতেন—রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনই সময় পাইতেন, তখনই কিছু কিছু লিখিতেন। সময় কখনও বৃথা নষ্ট করিতেন না।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখনও সজল মেঘের ন্যায় গম্ভীর, কখনও বা তরলমতি বালকের ন্যায় চঞ্চল দেখিতাম। কখনও হয় ত তিনি এক ছত্র লিখিয়া তখনই তাহা কাটিয়া দিতেন। আবার একটু ভাবিতেন,—পুনর্ব্বার লিখিবার উদ্যোগ করিতেন, পর মুহূর্ত্তেই হয় ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন, এবং গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে থাকিতেন। কখনও বাতায়ন-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সুদূর সৌধচূড়া-পানে চাহিয়া থাকিতেন —কখনও বা কোনও পুস্তক বা দেওয়ালের গাত্রে হস্তার্পণ করিতেন। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া অন্তর্জগতেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এমন আমার মনে হয় না। লিখিবার সময় আমরা কেহ আসিয়া পড়িলে কখনও বিরক্ত হইতেন, কখনও বা আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এমন দিন অনেক গিয়াছে, যে দিন বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লিখিতে পারিতেন না; যদি বা লিখিতেন, তাহাও আবার কাটিয়া দিতেন। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন তাঁহার লেখনী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সান্‌কিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি?"

কৃষ্ণধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না—লিখিয়া রাখিতেছি; আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।"

কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরমুহূর্ত্তে—একটু চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন; তাহাতেও লেখা ছিল—"কমলাকান্তের দপ্তর।"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশাল বারিবিবক্ষে কোথাও একখানি অর্ণবপোতের চিহ্নমাত্র নাই। সমুদ্রের ভীমগর্জ্জন ব্যতীত দ্বিতীয় শব্দ শুনা যাইতেছিল না। মৃত্যু যেন তরঙ্গোপরি বসিয়া ধ্রুব শিকারের প্রতীক্ষায় দুলিতেছিল। ব্যোমযান আবার নীচে নামিতে লাগিল।

একে একে যাবতীয় দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইল। গরম কাপড়, আহার্য্য দ্রব্য—অবশেষে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র পর্য্যন্ত—সমস্তই তাহারা ফেলিয়া দিল। ব্যোমযান কিছু উর্দ্ধে উঠিল বটে, কিন্তু তথাপি নিম্নে সলিল-সমাধি মুখব্যাদান-পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল: "আর রক্ষা নাই, আমরা গিয়াছি!"

ব্যোমযান তখন প্রায় জলের উপর দিয়া চলিতেছিল। বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে?—অগাধ সমুদ্রে, অথবা কূলের দিকে?

মড়ি বাহিয়া উভয়ে উপরের দিকে উঠিল। বিচ্ছিন্নপ্রায় কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, দূরে—বহু দূরে ছায়াচ্ছন্ন শৈল-সঙ্কুল তীরভূমি বিরাজিত। ঐখানে পঁহুছিতে পারিলেই তাহারা নিরাপদ হইতে পারে; কিন্তু ক্রমেই যে তাহারা নীচের দিকে নামিতেছে!

সমুদ্রতরঙ্গ তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গাভিঘাতে তাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। চৈতন্য বিলুপ্ত হইতেছিল। কূলে পঁহুছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ব্যোমযানকে লঘুভার করিবার জন্য আর কোনও ফেলিবার জিনিস ছিল না। কূল দেখিতে দেখিতেই তাহারা জলধির অতল গর্ভে সমাহিত হইবে!

ডাক্তার ষ্টোরমার অকস্মাৎ বলিলেন, "ফ্রেঞ্জিয়াস্, মৃত্যুর পূর্ব্বে মনের বাঁধা ঘুচাইয়া ফেলা দরকার। লিস্‌বেথ কি তোমায় ভালবাসে?"

হেন্‌রিচের ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লানিত ম্লান হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাস্যেও কি যন্ত্রণার চিহ্ন!

মস্তক আন্দোলিত করিয়া সে বলিল, "না। আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তাহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই সে আমাকে বলিয়াছিল,—'তোমার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম, আমার নিমিত্ত তাহাকে রক্ষা করিও। সে যেন আসে আমার কাছে ফিরিয়া আসে।' আমি তখন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি আমার হইয়া উত্তরটা দিও।"

সমুদ্র-গর্ভ আলোড়িত করিয়া এক রোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দূরে—দূরে তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিয়া গেল।

ব্যোমযান আবার ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইল। কিন্তু বসিবার আসনে তখন একটিমাত্র আরোহী! সমুদ্রতরঙ্গ কি হেন্‌রিচকে আশ্রয়চ্যুত করিয়াছিল?

লঘুভার ব্যোমযান তখন বায়ুচালিত হইয়া তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল।

আতঙ্কে অভিভূত ডাক্তার ষ্টোরমার সেই অনন্তবিস্তার নিষ্ঠুর সলিল-রাশির দিকে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়াছিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছিল। মনুষ্যমুণ্ড অথবা ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্ত বাহু, কিছুই দেখা গেল না। কুজ্ঝটিকার অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি নৌকা বীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন তাঁহার হস্ত রজ্জুদণ্ড হইতে স্খলিত হইল। ষ্টোরমারের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্যোমযান তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল; নৌকাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল। তীরের সন্নিহিত হইয়া ব্যোমযান আবার জলের উপর নামিয়া পড়িল। তখন নৌকার লোকে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল।

ডাক্তার বহুদিন হাঁসপাতালেই ছিলেন। চৈতন্যসঞ্চারের পর তিনি লিস্‌বেথের উৎকণ্ঠামলিন মুখ দেখিতে পাইলেন। বাহুবন্ধনে তিনি প্রণয়িনীকে আবদ্ধ করিলেন।

বাহিরে, অনতিদূরে অনন্ত বারিধিতরঙ্গ। উভয়ে কান পাতিয়া তরঙ্গোচ্ছ্বাসে যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন! তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, উভয়ের মিলন-কামনায় যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহারই হৃদয়স্পন্দন যেন সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে!

আজ মৃদুকণ্ঠে প্রণয়চর্চ্চার সময় নয়। ভবিষ্যতের সুখ শান্তির কথাও তখন কাহারও মনে ছিল না। বন্ধুর উদারতাই তখন তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। লিস্‌বেথও আজ প্রণয়পাত্রের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিল না। যে লিস্‌বেথের ব্যগ্র প্রার্থনা কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছিল, লিসবেথ কম্পিতকণ্ঠে আজ সর্ব্বপ্রথম তাহারই নাম উচ্চারণ করিল,—"হেনরিচ!"*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* হেলেন উইটর রচিত কোনও জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

মগধ সাম্রাজ্য।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ-কৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব বিনষ্ট হইয়াছিল। অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে সমগ্র ভারতবর্ষে মগধ সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র [illegible] ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যে [illegible] করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদীয় ভ্রমণ-[illegible] বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটি অধ্যায় কেবল মগধ সাম্রাজ্যের [illegible] শ্রীলাক্ষেত্র বলিয়া মগধ দেশ হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের নিকট [illegible] এই কারণে তিনি উহার বিস্তৃত [illegible] সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক কথা [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। [illegible] নিকট [illegible] আনন্দের [illegible]। এই জন্য তিনি মগধ [illegible] দেখিয়াছেন যা [illegible] মগধই বিপুল আয়তন [illegible] করিয়া [illegible] বৌদ্ধ ইতিহাস [illegible] [illegible] যায়। আমরা [illegible]

[illegible] দেশ চক্রাকার প্রায় ৫ সহস্র লি পরিমিত। এই দেশের অধিবাসিগণ নগরসমূহে লোকের বসতি বিরল, কিন্তু পল্লী সকল জনপূর্ণ। ভূমি উর্ব্বরা, আবাদ যথেষ্ট। মগধ দেশে এক প্রকার [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বৃহৎ, সুগন্ধ ও রসনার তৃপ্তিকর। [illegible] ও আম্র, এ অঞ্চলে [illegible] বসতি সকল [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] এবং [illegible]।

প্রায় [illegible] দেবমন্দিরের সংখ্যা [illegible] চক্রাকার ১০ লি পরিমিত একটি নগরের ভগ্না[illegible] দেখিতে [illegible] অবধি এই নগর পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] বিলাস আছে। [illegible]

নাম পাটলিপুত্র। (১) মহারাজ অশোক মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে মৌর্য্যেরা বহু পুরুষ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভিত্তিপ্রাচীরমাত্র বিদ্যমান আছে। শত শত সজ্ঞারাম ও দেবমন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কেবল দুই তিনটি সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির এখনও সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে ও গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরের গৃহ-সংখ্যা দশ সহস্র।

অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নৃশংস আচরণে ও লোক-পীড়নে, প্রবৃত্ত হন, এবং জীবিত নরনারীকে যন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্যে এক নরকের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই নরকের চতুর্দ্দিক্, সমুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া পরলোকস্থ নরকের অনুকরণে সেখানে যন্ত্রণাদায়ক নানা প্রকার যন্ত্রাদি রাখিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের আদেশে প্রথমে অপরাধী ঐ নরকে প্রেরিত হইত। তার পর এরূপ দাড়াইয়াছিল যে, দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তি ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া গমন করিত, তাহাকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

---

(১) পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব নাম কুসুমপুর ছিল। এই নাম-পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে হিউ-এনথ্‌সঙ্গ যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—একদা এক জন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য কোনও কার্য্য উপলক্ষে কুসুমপুরের সংলগ্ন বনে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক জন শিষ্য বিমর্ষ হইয়া পড়েন। তদীয় সহচরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি জন্য দুঃখিত হইয়াছ?" বিমর্ষ শিষ্য উত্তর করিলেন, "আমি বয়স্ক হইয়াছি, এখনও সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।" এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে একটি সপুষ্প পল্লবের সহিত পাটলী বৃক্ষের নীচে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রিকাল আগত হইলে শিষ্যগণ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ঐ শিষ্য সে রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিবার সংকল্প করিয়া তথায় রহিলেন। গভীর রজনীতে চারি দিক্ অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং এক জন বৃদ্ধ নর ও এক জন বৃদ্ধা নারী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে তরুণী কন্যা অর্পণ করিলেন। অতঃপর শিষ্য কন্যাকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাটলী বৃক্ষতলে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এক বৎসর পরে একটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইলেন। এই শিশু পাটলিপুত্র নামে খ্যাত হয়, এবং তাহার নামানুসারে কুসুমপুর পাটলিপুত্রপুর অথবা সংক্ষেপে পাটলিপুত্র নাম ধারণ করিয়া উঠে।

একদা এক জন শ্রমণ অশোকের নরকের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন। রাজ অনুচরেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া নরকে লইয়া যায়। তিনি তথায় নীত হইয়া নরনারীকুলের অশেষ ক্লেশ দেখিয়া নির্ব্বিণ্ণ হন, এবং ইহসংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করেন। তৎকালে তাঁহার অর্হৎত্বলাভ ঘটে। অতঃপর মহারাজ অশোকের নরক দূত তাঁহাকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অর্হৎত্ব লাভ হেতু তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন বলিয়া কটাহ হইতে অক্ষতশরীরে বহির্গত হন। ইহাতে নরক-দূত ভীত হইয়া রাজ-সকাশে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা তথায় গমনপূর্ব্বক ঐ বিস্ময়াবহ দৃশ্য দর্শন করেন। নরক-দূত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মহারাজ, আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; কারণ, যে কেহ এই স্থানে আগমন করিবে, তাহাকেই মৃত্যুর দণ্ড সহিতে হইবে, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা এই নিয়মের অতীত, আমি এই প্রকার কোনও আদেশ প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার ঐ নিয়মের অধীন নহ, এরূপ কোনও আদেশ কি আমি দিয়াছি? তুমি দীর্ঘকাল লোকহত্যা করিয়াছ, আমি এখন তাহার অবসান করিব। অতঃপর তাঁহার আদেশে অনুচরেরা নরক-দূতকে ধৃত করিয়া উত্তপ্ত-তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার জীবনান্ত করিল, এবং সমগ্র নরকাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইহার পর মহারাজ অশোক চিরখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্য উপগুপ্তের সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাঁহার উপদেশে নবজীবন প্রাপ্ত হন। মহারাজ অশোক নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎসাহে বৌদ্ধ প্রচার আরম্ভ করেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জম্বুদ্বীপের প্রধান প্রধান স্থানে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত কেশের ভস্মাবশেষের পূজা অর্চ্চনা-বিধানের উদ্দেশ্যে তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া প্রসিদ্ধ স্থান সকলে বিতরণপূর্ব্বক মহারাজ অশোক তত্তৎ স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটলিপুত্র নগরের মধ্যস্থানে একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার গাত্রে যে অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—"মহারাজ অশোক স্বধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের হিতার্থ তিনবার সমগ্র জম্বুদ্বীপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তিনবারই স্বীয় রত্ন ও ধনভাণ্ডার প্রদান করিয়া সে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল।"

মহেন্দ্র নামে মহারাজ অশোকের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। (১) তিনি নিষ্ঠুর স্বভাব ও লোক-পীড়ক ছিলেন। একদা প্রকৃতিপুঞ্জ তদীয় উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসকাশে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজ অশোককে বলিয়াছিলেন, অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে প্রজাকুল সন্তুষ্ট থাকে; যদি প্রজাকুল সম্মতি প্রকাশ করে, তবে শাসনকর্ত্তা শান্তিলাভ করেন। আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজনিয়ম দেখিয়া আসিতেছি। আমরা প্রার্থনা করি যে, মহারাজা এই চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করিবেন, এবং কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। মহারাজ অশোক প্রজাকুলের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রকে স্ব-সমীপে আনয়ন করেন। মহেন্দ্র এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলে। মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সপ্তাহ মধ্যে মহেন্দ্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি অনুশোচনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অশোক তাঁহার তাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, এবং তাঁহার বাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

কোনও সময়ে দক্ষিণ-ভারত হইতে গুণমতি নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ শ্রমণ মাধব নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। গুণমতি মাধবের বাস-গ্রামের সমীপস্থ হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। এ জন্য গুণমতি নিরুপায় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনে প্রবেশ করেন। রজনী সমাগত হইলে মাধবের এক জন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী প্রতিবাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তদীয় যত্ন ও উদ্যোগে গুণমতি মগধাধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করেন। অতঃপর মগধাধিপতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার আবেদনানুসারে তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরদিন প্রত্যুষে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহোদয়গণ সে মহাতর্ক শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হন। গুণমতি প্রথমে গাত্রোত্থান করিয়া স্বধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া, পরে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশপূর্ব্বক গম্ভীর মন্দ্রে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে মাধব গুণমতির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া

(১) মহেন্দ্র অশোকের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সভাগৃহ কম্পিত করিয়া তুলেন। এই ভাবে ষষ্ঠ দিন আগত হয়। এই দিন মাধব হঠাৎ রক্ত বমন করেন, এবং তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি তীক্ষ্ণধীশালিনী, আমার অপমান-কথা বিস্মৃত হইও না। মাধবের তেজস্বিনী পত্নী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গুপ্ত রাখিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভাস্থলে গমন করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বলেন, আত্মাভিমানী মাধব গুণমতির প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং স্বীয় ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবার জন্য পত্নীকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ধীশালিনী রমণীকে দর্শন করিয়া গুণমতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলেন, পণ্ডিত মাধবের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার পত্নী আমার সহিত তর্ক করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মরণাহতা রমণীর ন্যায় মলিন হইয়াছে, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর বিদ্বেষে জড়িত হইয়া পড়িতেছে; ইহাই তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতেছে। গুণমতির প্রজ্ঞার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হন, এবং তাঁহার সাধুবাদ করেন। ব্রাহ্মণগণ শ্রমণ গুণমতিকে জয়-লাভ করিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন, এবং কতিপয় অশেষশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করেন। এই নির্ব্বাচিত পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ উদ্যমসহকারে আপনাদের ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া স্বদলভুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লাসিত করিয়া তুলেন। কিন্তু গুণমতি তৎসমুদায়ের উত্তর প্রদান করিবার জন্য নিজের পার্শ্বচরকে নিযুক্ত করেন। এই অনুচর পণ্ডিত ধীরগতিতে নির্ম্মল সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ যুক্তির অবতারণা করিয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী অতীব বিস্ময় প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণগণ পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া ভগ্নচিত্তে প্রস্থান করেন।

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ-ভারতের আর এক জন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিগ্বিজয় উপলক্ষে মগধরাজ্যে আগমন করেন। তিনি স্বদেশে অবস্থানকালে মগধের অন্তর্গত ভারতীয় লীলাস্থল নালন্দা বিহারের আচার্য্য ধর্ম্মপালের গুণ-গরিমার খ্যাতি অবগত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি ঈর্ষ্যাকুলচিত্তে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া মগধরাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দক্ষিণদেশবাসী পণ্ডিতবর মগধাধিপতির সভায় উপনীত হইয়া বলেন, আমি আচার্য্য ধর্ম্মপালের খ্যাতি

শ্রবণ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এইবাক্য শ্রবণ করিয়া মগধরাজ আচার্য্য ধর্ম্মপালকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি রাজার আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া অগৌণে যাত্রার জন্য উদ্যোগী হন। এই সময় শীলভদ্র (১) ও অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়ান। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করেন, গুরুদেব, আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন? তার পর গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলেন, আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি। এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ সমস্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্রের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। এই কারণে শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন, কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দন্ত উদ্গত হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, শীলভদ্র এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশ হইতে লোক আসিয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তার পর শীলভদ্র অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন। মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে

(১) শীলভদ্র সমতট অর্থাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র সাতিশয় জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র মগধ রাজ্যে উপনীত হইয়া নালন্দায় আচার্য্য ধর্ম্মপালের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার মুখে জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেখানি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি ত্রিপিটক সমস্যা-সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এই ভাবে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। সুদূরদেশেও তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, ধর্ম্মরাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে; যদি এই সময় পণ্ডিত ও মূর্খে পার্থক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্ম্মপথে গমনকালে উৎসাহ-প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দান গ্রহণ করুন। অতঃপর শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমস্ত আয় ন্যস্ত করিয়া দেন।

ভারভ-ললাম-ভূতা গয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে আমরা স্রোতস্বিনী-অভিষিঞ্চিত কঠোরদর্শন তুঙ্গ শৈল দর্শন করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে এই শৈল সাধারণতঃ ধর্ম্মশিলা নামে খ্যাত। পুরাকাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, পদাভিষিক্ত মগধাধিপ প্রজাবর্গের প্রীতিসম্পাদন ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভের অভিপ্রায়ে ঐ শৈল-শিরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান-অন্তে স্বীয় রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

চির-যৌবনা গয়া নগরীর অদূরে বিধিক্রম বিদ্যমান আছে। অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ এই বিধি-ক্রম বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন। কিন্তু ধূমরাশি বিলীন হইবামাত্রই সমস্ত দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিয়াছিল যে, একটি বৃক্ষের স্থানে দুইটি বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে! এই অলৌকিক ঘটনায় অশোক রাজার পাপদিগ্ধ চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং সমস্ত বৃক্ষে সুগন্ধ দুগ্ধ সেচন করিয়া দেন। অতঃপর এক রাত্রি মধ্যেই বিধিক্রম পুনর্ব্বার শাখা প্রশাখায় শোভিত হইয়া উঠে।

ভারতীয় ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বিশ্রাম করেন। তাঁহাদের বিশ্রামকালের অবসান হইয়া আসিলে বহু দিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র সৌগত বোধিক্ষেত্রে উপনীত হন। তাঁহারা ক্রমাগত সপ্ত অহোরাত্র বোধিক্ষেত্রের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং তৎকালে পুষ্পবর্ষণে, ধূপ-ধূনাদি-দানে এবং গীতবাদ্যাদিতে নিরত থাকেন। এই সময় তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা ও দানাদিকার্য্যও সম্পন্ন করেন।

কুশাগড়পুর মগধ সাম্রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত। পুরাকালে মগধাধিপতিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। (১) কুশাগড়পুরে একপ্রকার সুগন্ধ তৃণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তজ্জন্যই নগরের এই নাম হইয়াছিল। কুশাগড়পুর নগর চারি দিকে উচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত। এই নগরের সমস্ত রাজপথের পার্শ্বে কনক বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান আছে। কনক বৃক্ষের পুষ্প স্বর্ণবর্ণ ও সুগন্ধ।

বিম্বিসার রাজার রাজত্বকালে কুশাগড়পুর অতি জনপূর্ণ নগর ছিল। ইহার গৃহ সকল পরস্পর-সংলগ্ন ছিল, এই জন্য অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে সমস্ত গৃহই দগ্ধ হইয়া যাইত। এই হেতু প্রজাকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইত। তাহারা শান্তিতে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজা অমাত্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পাপে প্রজাকুলের কষ্ট হইতেছে। ইহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য?" অমাত্যবৃন্দ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনার ধর্ম্মসঙ্গত শাসনে শান্তি ও ঐক্য বিস্তার লাভ করিতেছে, আপনার ন্যায়মূলক শাসনে প্রজাকুল উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে; দেশমধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। লোকের দোষেই অগ্নিতে গৃহদাহ হইয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দোষী ব্যক্তিকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেই লোকে সাবধান হইবে, এবং অগ্নিভয় নিবারিত হইবে।" বিম্বিসার রাজা তাঁহাদের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং সেই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিয়া দেন। অতঃপর দৈববশতঃ প্রথমেই রাজপ্রাসাদে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই কারণে সমদর্শী বিম্বিসার নিজের নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী শীতবন নামক স্থানে গমন করেন। বৈশালীর অধিপতিকে বিম্বিসার রাজধানীর বহির্ভাগে হীনরক্ষক অবস্থায় বাস করিতে দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সহ অভিযান করিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-রক্ষকগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া বিম্বিসার রাজার রক্ষার জন্য তথায় নূতন নগর

(১) কুশাগড়পুর রাজগৃহ বা গিরিব্রজ নামে সমধিক পরিচিত।

নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও প্রজাকুল সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। (১)

এই স্থান হইতে ত্রিশ লি দূরে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা-বিহার অবস্থিত। এই বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকার অপর পার্শ্বে বিস্তৃত আম্রকানন। পাঁচ শত বণিক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রায় ঐ আম্রকানন ক্রয় করিয়া বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাস কাল যাপন করেন, এবং তদীয় অমৃতময় উপদেশে বণিকগণ পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর শক্রাদিত্য নামক মগধাধিপতি এই স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুদ্ধগুপ্ত রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও পিতৃ পদবীর অনুসরণ করিয়া ঐ স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর তথাগত গুপ্তরাজা আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে নালন্দা বিহার সম্প্রসারিত ও উন্নত হয়। তার পর বালাদিত্য মগধ সাম্রাজ্যাধিকারী হইয়া সেখানে একটি নূতন সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অভিনব সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাকালে ধার্ম্মিক ও সাধারণ নির্ব্বিশেষে সৌগতগণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সৌগতগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরব্ধ হইলে দুই জন সৌগত আগমন করেন। সমস্ত সৌগতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এত বিলম্বে কোন দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন? তাঁহারা উত্তর করেন, আমরা চীনদেশবাসী। আমাদের অধ্যাপক পীড়িত হইয়াছিলেন; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার পর আমরা রাজার নিমন্ত্রণরক্ষাকল্পে যাত্রা করিয়াছিলাম; এই জন্য আমাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সমাগত সৌগতমণ্ডলী বিস্মিত হন, এবং রাজাকে তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বয়ং সভাস্থলে উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় রাজার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তিনি রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনাশ্রম গ্রহণ করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র বজ্র পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত

(১) বিম্বিসার রাজার পরবর্ত্তী বাসস্থান নূতন রাজগৃহ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এরূপও কথিত আছে যে, অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নালন্দা বিহারের পার্শ্বে আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মধ্য-ভারতবর্ষের একজন নৃপতি নালন্দা বিহারের পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ সংঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ভয়ে সমগ্র বিহার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ বহু কাল ধরিয়া নৃপতিগণ ক্রমান্বয়ে নালন্দা বিহারের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন।

এই বিচিত্র বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে বহু সহস্র আচার্য্য বাস করিতেছেন। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের যশঃ-প্রভা সমুজ্জ্বল, শত শত আচার্য্যের যশোরাশি অতি দূরবর্ত্তী দেশেও বিকীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। তাঁহারা সরলভাবে নৈতিক বিধানাবলী প্রতিপালন করিতেছেন। নালন্দা বিহারের নিয়মাবলী কঠোর। কিন্তু তদন্তর্গত আচার্য্যমাত্রেই তৎসমুদয় প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শস্থল। সর্ব্বত্র তাঁহাদের সম্মান। আচার্য্যগণ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসায় নিমগ্ন থাকেন। সে সময়ে বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরের সহায়তা করেন। শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী হইয়া বহু পণ্ডিত শিক্ষার্থীর বেশে নানাস্থান হইতে নালন্দায় সমাগত হন। এই বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তাঁহাদের যশোরাশি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন ও নূতন, উভয়বিধ শাস্ত্রে যাহার কিয়ৎপরিমাণও পারদর্শিতা নাই, এরূপ ব্যক্তির শিক্ষার্থিরূপে নালন্দা-বিহারে প্রবেশ নিষিদ্ধ। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) স্বয়ং হিউএন্থসঙ্গ পাঁচ বৎসর কাল নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্র নালন্দা বিহারের প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

২

(৪) সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ।

বাঙ্গালায় সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের সাধারণতঃ ব্যবহার নাই, কেন না, বাঙ্গালায় শব্দরূপ ধাতুরূপ স্বতন্ত্র প্রকারের। তথাপি কয়েকটি তিঙন্ত পদ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যথা, বৈষ্ণব পদাবলীতে ও কীর্ত্তনে দেহি ও কুরু; প্রাচীন কাব্যে ছিন্দি ভিন্দি, সংহর, স্মর, ত্রাহি, জয় জয়, অস্ত (তথাস্তু, সিদ্ধিরস্তু, জয়োঽস্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু); দীয়তাং ভুজ্যতাম্; (আশ্চর্য্যের বিষয়, সবগুলিই অনুজ্ঞার পদ); অস্তি (নাস্তি, যৎপরোনাস্তি, আস্তিক, নাস্তিক); মাভৈঃ (বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়)।

বাঙ্গালায় সুবন্ত পদের চল তিঙন্ত পদ অপেক্ষা অধিক। কতকগুলি স্থলে প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যথা পিতা, মাতা, সখা, বিদ্বান্, রাজা, সম্রাট্, গুণী, হনুমান্, শ্রীমান্, শর্ম্মা, আত্মা, 'দম্পতি' (নিত্য দ্বিবচন বলিয়া 'দম্পতী' প্রথমার দ্বিবচন কেহ কেহ বাঙ্গালায় লেখেন, আবার কেহ কেহ 'দম্পতি' লেখেন) ইত্যাদি। 'অগত্যা', 'বস্তুগত্যা', 'যেন তেন প্রকারেণ' এই তৃতীয়ার একবচনের পদগুলি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। 'বলবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জ্ঞানবন্ত' প্রভৃতি বাঙ্গালায় চলিত; এগুলি যদি সংস্কৃতপদ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিসর্গবিসর্জ্জন হইয়াছে ও বহুবচনান্ত পদ একবচনে চলিয়াছে। চিঠি লেখার প্রাচীন রীতিতে, খতপত্রে, আদালতের কাগজে, অনেকগুলি শুদ্ধ অশুদ্ধ সুবন্ত পদ চলিত আছে, যথা অধিকন্তু, কিমধিকমিতি। 'শকাব্দাঃ'র বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'কার্য্যম্' শুদ্ধ পদ, কিন্তু 'কার্য্যঞ্চাগে' কি কার্য্যঞ্চাগ্রে? 'বরাবরেষু' নিরাপদেষু (নিরাপৎসু) 'সমীপেষু'র দেখাদেখি চলিত হইয়াছে। 'শ্রীচরণেষু,' 'মঙ্গলাস্পদেষু' প্রভৃতি সপ্তমীর পদ খুব চলিত। 'মঙ্গলাস্পদাসু, কল্যাণভাজনাসু' সম্বন্ধে লিঙ্গবিচারে বিচার করিয়াছি। 'পরমপোষ্টাবরেষু' সমাস-প্রকরণে 'পিতাস্বরূপে'র দলে পড়িবে। 'পরমকল্যাণবরেষু'তে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে। মম, তব, ষষ্ঠীর পদ, পদ্যে চলে। অন্যান্য ষষ্ঠীর পদ, যস্য, অস্য, কস্য, তস্য, তস্যাঃ (অস্যার্থঃ)। হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ, দৈবাৎ, বলাৎ (বলাৎকার), অকস্মাৎ, প্রসাদাৎ, প্রযুত্নাৎ, সাক্ষাৎ (সাক্ষ্য,) পক্ষাৎ (পক্ষ), এই

পঞ্চমীর পদগুলিও চলিত। 'কস্মিন্' এই সপ্তমীর পদটি 'কস্মিন্ কালে' এই পদসঙ্ঘে (phrase এ) চলিত।

শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ প্রভৃতি ষষ্ঠীর পদ নাম-সহিতে চলে। এগুলিতেও কখন কখন বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'দেব্যাঃ, দাস্যাঃ' ও 'দেবী' দাসী'র মধ্যে একটা আঙ্গবি প্রভেদ বাঙ্গালায় চলিত। প্রথম যোড়াটি বিধবার বেলা ও দ্বিতীয় যোড়াটি সধবার বেলা প্রযুক্ত হয়। ইহার হেতু কি ?

সম্বোধন-পদের ব্যবহার লইয়া বাঙ্গালায় বেশ একটু গোল দেখা যায়। কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত—'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?' 'কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,' 'পর্ব্বতদুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,' 'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে ?' 'সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি,' 'এই না ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার ?' 'হা দগ্ধ বিধাতা রে' ইত্যাদি। আমার মনে হয়, শব্দটির রূপান্তর না করিয়া অবিকল রাখিয়া দিলে বাঙ্গালায় ভাগবত অশুদ্ধ হয় না।* তবে ঋকারান্ত শব্দের বেলায় এবং অন্য কতকগুলি স্থলে অবশ্য প্রথমার একবচনকেই (বাঙ্গালার নিয়মে) মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঋকারান্ত শব্দের বেলায় প্রথমার একবচনকে মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কিন্তু এক অনর্থ ঘটিয়াছে। দুহিতার সম্বোধনে 'দুহিতে' দেখিয়াছি, পিতের দেখাদেখি 'পিতে'ও কবির গানে বাক্রাগানে শুনা গিয়াছে। মাতে, ভ্রাতে, এখনও হইতে দেখি নাই।

মৎ, বৎ, ইন্, বিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (অনভাগান্ত ইনভাগান্ত) শব্দের বেলায়ও পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং সম্বোধনে ঐরূপই অবিকৃত থাকে ; যথা 'দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান্,' 'বৃথা এ সাধনা তব হে ধীমান্', 'কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলিরে ?' 'অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা ?' 'শুন শুন ওহে রাজা করি নিবেদন' ইত্যাদি। কেহ কেহ 'রাজন্,' 'মণিন্,' 'ধনিন্' ইত্যাদি সংস্কৃতানুরূপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু এক সম্প্রদায় লেখক উৎকট মৌলিকতা দেখাইয়া 'মণি ধনি,' ইত্যাকার লিখিতেছেন।

গদ্যে ও পদ্যে যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেইরূপ লেখা হয়। এ

* রামসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্রও এই রায় দিয়াছেন।

স্বাধীনতাটুকু কি থাকা উচিত? এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক একটু রঙ্গরসের অবতারণা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—'শশি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তোমাকে শশিন্ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না।' অবশ্য শশী রাগ করিয়াছেন কি না, চন্দ্রলোক হইতে আজও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে 'শশি' বলিলে শশীর রাগ করিবার কথা; লেখকগণ খেয়াল করেন না যে, 'শশি' বলিয়া সম্বোধন করিলে শশীকে ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করা হইল! 'ধনি' সম্বন্ধেও সেই কথা। গানে স্ত্রীলোককে যে 'ধনী' বলা হয়, সেটা কি? যে সকল লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের মারপেঁচের ভিতর যাইতে চাহেন না, তাঁহারা সোজাসুজি পুংলিঙ্গের প্রথমার এক বচনটাই সম্বোধনে বাহাল রাখিলেই পারেন। উৎকট মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়।

সম্বোধনে বিস্ময়-চিহ্ন দেওয়া বাঙ্গালায় একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(৫) তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ।

তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি দুষ্টপদ বাঙ্গালায় চলিত। কতকগুলি স্থলে (false analogy তে) অলীক সাদৃশ্য দেখিয়া পদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ পদটি দিয়াছি।

তদ্ধিত।

পঞ্চম, সপ্তম এর দেখাদেখি	ষষ্ঠম	এ তিনটি পদ কচিৎ দেখা যায়
দশম " "	দাদশম	
মধ্যম " "	জ্যেষ্ঠম	
অরণ্যানীয়	বনানী	আধুনিক রচনায়, খুব চলিত।
শ্রীমান্ এর "	লক্ষ্মীমান্	স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়, কেতা- বেও দেখিয়াছি।
বুদ্ধিমান্ এর "	জ্ঞানমান্	
হনুমান্ এর "	ভাগ্যমান্	
মদীয়, ত্বদীয়, তদীয় ব	যাবদীয়	তাবদীয় (যাবত্তীয় তাবত্তীয়)

তথাচ তত্রাপি	র "	তত্রাচ
ইষ্ঠ, অনিষ্টর	"	ঘনিষ্ঠ, (ঘনিঠ, ইষ্ঠ প্রভৃতি)
রথীয়	"	দাশরথী (দাশরথি)
ওষধিয়	"	ঔষধি (ঔষধ)
বাহ্যিক (বাহ্য)।		সৌকার্য্য (সৌকর্য্য)।
(/০) দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, রাজনীতিক দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক, রাজনৈতিক		

দুই রূপই হয় কি?

(৶০) চতুর্দ্দিক্‌ময়, জগৎময়।

এ দুইটি স্থলে সন্ধি হয় নাই কেন? ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'ময়' প্রত্যয় (যেমন পরময় জল, পথময় কাদা)?

(৶০) বোধতর গুরুতর, গাঢ়তর, বহুতর—শব্দগুলির বাঙ্গালায় যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ হয়, এগুলি সংস্কৃত উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রত্যয় কি খাঁটী বাঙ্গালা স্বতন্ত্র 'তর' প্রত্যয় (যথা বেতর, কেমনতর, এমনতর)?

(।০) সৎ শব্দের দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য এক অর্থে 'সত্তা' ও অন্য অর্থে 'সততা' পদ প্রস্তুত করা হয়। শেষেরটির বেলায় শব্দটিকে অল্প ভগ্ন করিয়া লওয়া হয়। অদ্ভুত!

(।৵০) বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, লক্ষ্মীমন্তঃ (লক্ষ্মীবন্তঃ) প্রভৃতি বহুবচনান্ত পদের বিসর্গবিসর্জ্জন করা হয় ও একবচনে প্রয়োগ করা হয়। ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র প্রত্যয়?

(।৶০) সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনকে বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ পদগুলি হইয়াছে—স্বামীত্ব, কর্ত্তাত্ব, চন্দ্রমাবৎ, আত্মাময়, মহিমাময়, কালিমাময়, ভাগ্যবান্‌তর (মাইকেল)!

(।৶০) কেহ কেহ 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' অশুদ্ধ বলেন, 'ইতোমধ্যে" ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ বলেন। কেন, তাঁহারাই জানেন। কেহ কেহ আবার 'ইতোপূর্ব্বে' লিখিয়া বসেন!

(৷০) রক্তিমতা, প্রসারতা, বিমর্ষতা, উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, সখ্যতা, মৈত্রতা, ঐক্যতা, হ্রাসতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি বাঙ্গালা আধিক্যিতা?), শমতা, শীলতা, এগুলিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। বৈরক্তি, বৈভব ঠিক ওরূপ না হইলেও (স্বার্থিক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন); বিরক্তি, বিভব দ্বারাই উহাদের অর্থ প্রকাশ করা যায়। নিরাকার অর্থে নৈরাকার, নিরাশ অর্থে নৈরাশ, বিমুখ অর্থে বৈমুখ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। 'সৌগন্ধ', 'অনবধানতা,' অজ্ঞানতা, বহুব্রীহি করিয়া রাখা যায়। সংস্কৃতে 'কুতুহল', 'কৌতূহল',' দুইই আছে।

(৷৵০) মান্যমান্, আবশ্যকীয়। এখানে বিশেষণের উত্তর প্রত্যয় করিয়া আবার বিশেষণ করা হইয়াছে।

(৷৶০) শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে।

(৷৶০) পৌত্তলিক, সাহিত্যিক, মানব হইতে মানবিক ও মানবীয়, বৈষ্ণবীয়, নামীয়, নামিক। এগুলি ভুল না হইলেও বাঙ্গালায় উদ্ভাবিত, সংস্কৃতে বোধ হয় প্রয়োগ নাই।

(৷৹০) স্বত্ব ও সত্তা ও সত্ত্ব (গুণ) এই তিনটি শব্দের বাণানে গোল হইতে দেখা যায়।

(৷৵০) খাঁটী বাংলা শব্দে কখন কখন সংস্কৃত প্রত্যয় লাগাইয়া দোআঁশলা পদ নির্ম্মাণ করা হয়। যথা, ছোটত্ব, বড়ত্ব, হিন্দুত্ব, একঘেয়েত্ব; এরূপ উদাহরণ খুব কম।

ক্ত্বা প্রত্যয়।

অবস্তৃদ	ম	দেখাদেখি	নর্ম্মস্যা
আবহমান	র	,,	প্রবহমাণ
রোরুদ্যমান	র	,,	রুদ্যমান
অবলম্বয়	র	,,	লজ্জাম্ব
পোষ্য	র	,,	চোষ্য (চুষ্য)
গৃহীত	র	,,	গৃহীতা (গ্রহীতা)
নন্দিত	য	,,	মন্দিত (ণিচ্ করিলে হয়)
পূর্ণিত	র	,,	পুর্ণিত
উদ্গীরমান	র	,,	অস্তমান (অস্তমান ব্রীহি ?)

'উদ্গীরমান' অনেকে ভুল বলেন। কিন্তু উৎ+গৃ দিবাদিগণীয় (গত্যর্থক) আত্মনেপদী আছে, অতএব ইহা শুদ্ধ।

(৷০) অনট্ প্রত্যয়।

(১) সৃজন (সর্জ্জন) অক্ষয়কুমার দত্ত চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও দেখা যায়। বিসর্জ্জনে তাল ঠিক আছে।

(২) সিঞ্চন (সেচন) বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও নাকি আছে।

(৩) বিস্তীরণ (বিকিরণ) বিকীর্ণর দেখাদেখি ? কিরণে তাল ঠিক আছে।

(৪) উদ্গীরণ (উদ্গিরণ) উদ্গীর্ণর দেখাদেখি ?

(৫) লিখন, মিলন, দেখন, মেলন } দুইই ঠিক।

(৶০) ক্ত প্রত্যয়।

আহরিত (আহৃত) নিজন্ত করিলে আহারিত

উচ্ছন্ন (উৎসন্ন) প্রাকৃতের নিয়মে এরূপ সন্ধি।

সিঞ্চিত (সিক্ত, নিজন্ত সেচিত) 'সঞ্চিত'র দেখাদেখি ?

গ্রন্থিত (গ্রথিত)

সৃজিত (সৃষ্ট, নিজন্ত করিলে সর্জ্জিত)

বিসর্জ্জিত (বিসৃষ্ট, নিজন্ত করিলে বিসর্জ্জিত)

খনিত (খাত)

চয়িত (চিত)

বপিত (উপ্ত)

শায়িত (শয়িত, নিজন্ত করিলে শায়িত)

বরিত (বৃত) বিবরিত (বিবৃত)

কর্ত্তিত (কৃত্ত, নিজন্ত করিলে কর্ত্তিত)

নিমজ্জিত (নিমগ্ন, নিজন্ত করিলে নিমজ্জিত)

জানিত (জ্ঞাত; খাঁটী বাংলা 'জানা' ধাতু)

প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত, উচ্চারণদোষ, যেমন মৃত বর্ত্ত।)

পক্ক (পক্ক)

ইষ্টিভূত (ইষ্ট)

স্পর্শিত (স্পৃষ্ট নিষ্পন্ন করিলে স্পর্শিত)

প্রহারিত (প্রহৃত, নিষ্পন্ন করিলে প্রহারিত)

অনুবাদিত (অনূদিত)

অবিসংবাদিত (অবিসংবাদী লেখাই সুবিধা)

কেহ কেহ 'তারকাদিভ্য ইতচ্' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সাধনলাইতে চাহেন, কিন্তু এগুলি ঐ সূত্রের স্থল কি না, তাহা বিচার্য্য।

(৶০), ণক প্রত্যয়।

কুবক (কুবক)
পর্য্যাটক (পর্য্যাটক) } খুব চলিত।

'ণক', প্রত্যয় না করিয়া অন্যপ্রকারে নাকি 'কুবক' 'পর্য্যাটক' সাধা যায়।

(।০) শানচ্ প্রত্যয়।

পূর্য্যমান (পূর্য্যমান)

কল্পমান (কল্পনান, তদ্ধিত হইলে কল্পবান্

(।৵০)) শতৃ প্রত্যয়।

'অমানত', ধরিলাম শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, মাসাযাম অজস্র হইয়াছে। 'প্রাগড' 'করত', 'হওত' এ গুলি কি ?

(।৶০) ভব্য, অনীয়, য।

(১) বর্ণিতব্য (বর্ণয়িতব্য)
(২) পরিভাব্য (পরিত্যাজ্য)
(৩) দোষণীয় (দূষণীয়)
(৪) সহ্যনীয় (সহনীয়) } এ তিনটীস্থলে
(৫) গ্রাহ্যণীয় (গ্রহণীয়) } "অনীয়" "য"
(৬) মান্যনীয় (মাননীয়) } দুইই হইয়াছে।
(৭) দুষ্পাচ্য, দুষ্পাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য সুযোশ্য, প্রভৃতি নাকি 'য' প্রত্যয়ের স্থল নহে; দুষ্পচ ইত্যাদি হইবে।

পণ্ডিত জনের মুখে শুনি, 'হত্যা' এযা বিসি বা পূর্ব্বপদ হইলে, যথা হত্যাকারী, হত্যাকাণ্ড 'ন' প্রত্যয় হয় না। পরপদ হইলে ওই প্রয়োগ,—জীবহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা।

চপলিত, প্রফুল্লিত, ব্যাকুলিত, নিমেষিত, বিস্ফোলিত, উদ্বেলিত এ কয়টি স্থলে 'ক্ত' বা ইতচ্ (তদ্ধিত) উভয়ই অযুক্ত; একত্রিত আরও অযুক্ত, কিন্তু খুব চলিত; প্রথম কয়েকটি স্থলে নামধাতু করা চলে কি ? 'ব্যাকুলিত' পঞ্চতন্ত্রে দুই এক স্থলে আছে।

জ্ঞাতার্থে, তদ্দৃষ্টে, বয়ঃপ্রাপ্তে (পদ্মিনী উপাখ্যান), সমন্বিত, সভীত, সচকিত, সচেষ্টিত প্রভৃতি স্থলে 'ভাবে ক্ত' করিলে চলে না কি ? সংস্কৃত ভাষায় 'চেষ্টিত' প্রভৃতি পদ ভাবে ক্ত করিয়া প্রায়ই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

'আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম' এখানে জ্ঞাত শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবে ? এখানে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় ধরিতে হইবে কি ?

(।৶০) বিবিধ।

(১) নিন্দুক (নিন্দক)
(২) জাগরূক (জাগরূক)
(৩) সমুদায়, সমুদয় দুইই ঠিক।
৪) সম্ উপসর্গযুক্ত সম্মান, সম্মতি, সম্ভব সম্মিলন, সম্মুখ, অনেকে সম্মান, সম্মতি ইত্যাদি বাণান (ও উচ্চারণ) করেন। সৎ শব্দের সঙ্গে সন্ধি করিলে এরূপ হইতে পারে।

(৬) বিশেষ্য-বিশেষণে গোলযোগ।

১। কতকগুলি বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা, 'আবশ্যক' (ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই), 'ভদ্রস্থ' (এখানে ভদ্রস্থ নাই), 'অগ্রাহ্য' (তিনি এ কথাটা অগ্রাহ্যের সুরে বলিলেন), 'মতিচ্ছন্ন' (তোমার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে), 'মান্য' (তোমার মান্য বাড়িয়া গিয়াছে), সাক্ষী=সাক্ষ্য (সে সাক্ষী দিবে), সাধ্য (আমার সাধ্য নাই, 'সাধ্য নহে' ঠিক), চেতন পাইয়া, 'সাবকাশ' (আমার সাবকাশ নাই), 'সৌরভ' অর্থে 'সুরভি'। সম্ভ্রান্তশালী, সহ্যাতীত, সাধ্যাতীত, আয়ত্তাধীন, অধীনস্থ, খ্যাতাপন্ন, এ সকল স্থলে সম্ভ্রান্ত, সহ্য, সাধ্য, আয়ত্ত, অধীন, খ্যাত, এগুলিকে বিশেষ্য ধরা হয় নাই কি ?

২। পক্ষান্তরে, কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় 'হওয়া বা করা,' দিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'হওয়া' দিয়া যে সব ক্রিয়াপদ হইয়াছে, সেইগুলিতেই এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। যথা, স্থূল বদ্ধ হইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গে 'বদ্ধ' হইয়াছে বলে, সেইটাই শুদ্ধ), এক্ষণে বিদায় হই, তিনি আরোগ্য হইয়াছেন, এ কথায় বড় সন্তোষ বা পরিতোষ হইলাম, ইহা বেশ উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি নির্বিঘ্নে প্রসব হইয়াছেন, সে ঘোর উন্মাদ হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রতিপালন হইতেছি, তাঁহার নাম লোপ হইবে ('নামলোপ' সমাস করিলে আর গোল নাই , তিনি মৌন রহিলেন, দেবতা অন্তর্ধান হইলেন, কি কথায় কি কথা উৎপত্তি হইল, তুমি অপমান হইবে (অপ-মান বহু-ব্রীহি চলে ?), চৈতন্য হইয়া দেখিলাম (কমলাকান্ত)।

৩। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি একটু স্বতন্ত্র। তাঁহাকে বড় বিমর্ষ দেখিলাম, ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্থানটি ধ্বংসপ্রায়, সে নিশ্চয় আসিবে, ইহা অতীব প্রয়োজন, সম্মুখে সমূহ বিপদ। 'অভিশয়' ও 'বিশেষ' প্রায়ই বিশেষণ-রূপে বসে। 'কল্যাণবর' এখানে কল্যাণ বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় এই তিনটি শব্দ বিশেষণও হয়। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে অনেকে বিশেষণ করিয়া বসেন (রক্তিমা রক্তিম হইয়া যায়, নীলিমা নীলিম হইয়া যায়)।

(৭) পুনরুক্তিদোষ (Tautology) ও অবাচকতা-দোষ।

পুনরুক্তি।

১। সহ শব্দ যোগে। সকাতরে, সকুতুক-হৃদয়ে, সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-

পূর্ব্বক, সক্ষম, সঠিক, সচকন, সচেতিত, সচকিত, সভীত, সশঙ্কিত। এ সকল স্থলে, বিশেষণের সঙ্গে সহ যোগ করা হইয়াছে। 'সচেতন' 'সকরুণ' 'সপ্রমাণ' ভুল নহে, কেন না 'প্রমাণ' 'চেতনা' 'করুণা', ভাবার্থক বিশেষ্যপদ আছে; 'ক্ষমা' শব্দেরও যদি ক্ষমতা অর্থে চল থাকিত, তাহা হইলে 'সক্ষম'ও ঠিক হইত। 'চকিত', 'চেষ্টিত' 'ভীত' 'শঙ্কিত' প্রভৃতি স্থলে যদি ভাববাচো ক্ত ধরা যায়, তাহা হইলে সচকিত ইত্যাদি রাখা চলে। সংস্কৃতে এরূপ 'ভাবে ক্ত' র উদাহরণ অনেক আছে। ভাবে ক্ত করিলে 'তদ্দৃষ্টে' ও 'জ্ঞাতার্থে' ও 'খ্যাতাপন্ন'ও রাখা যায়। বাঙ্গালায় ভাবে 'ক্ত' নাই কি? 'ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে'। এখানে ভাবে 'ক্ত' নহে কি?

২। ভাবার্থক প্রত্যয় দুইবার লাগান। ঐক্যতা, সখ্যতা, মৈত্রতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি চলিত শব্দ আধিক্যিতা?) হ্রাসতা, রক্ষিমতা, লাঘবতা, উৎকর্ষতা, বিমর্ষতা, প্রসারতা ঔৎকর্ষ, শমতা, শীলতা, ইত্যাদি। 'অনবধান' 'সুগন্ধ,' যখন বিশেষ্য হইতে পারে, তখন 'অনবধানতা' ও 'সৌগন্ধ' নিষ্প্রয়োজন। 'অজ্ঞানতা' সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে সংস্কৃতেও শব্দ দুইটি আছে। নৈরাশ, নৈরাকার ও বৈমুখ বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হওয়া ভুল।

৩। যেখানে বহুব্রীহি হইতে পারিত, সেখানে কর্ম্মধারয় বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া অস্ত্যর্থক প্রত্যয়যোগ। যথা, অতিবুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যবান্ (চৈতন্যভাগবতে), সাবধানী, নির্দ্দোষী, অরোগী, সুলচর্ম্মী, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, পশুধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সুগন্ধী নীরোগী, নির্ধনী, বহুরূপী, মহারথী, মহাপাপী খুব চলিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নাকি ইন্ প্রত্যয় দিয়া দুই এক স্থলে বহুব্রীহি হয়।

'ইনী' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার না করিলে, নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি (ইন্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ধরিলে) এই শ্রেণীতে পড়ে। যথা অনাথিনী, নির্দ্দোষিনী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী গৌরাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী, রুদ্ররূপিণী।

৪। আবশ্যকীয়, মাননীয়, এ দুইটি স্থলে বিশেষণের উত্তর আবার

বিশেষণবাচক প্রত্যয় করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মান্যনীয়, গণ্যনীয়, গ্রাহ্যণীয়, সহ্যনীয়, এ সকল স্থলে 'য' ও 'অনীয়' উভয় প্রত্যয়ই করা হইয়াছে।

৫। শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দুইবার করা হইয়াছে।

৬। বিবিধ। পরমকল্যাণবর, বিবিধপ্রকার, কিরূপপ্রকার, এবংপ্রকারে, যদ্যপিও, তথাপিও, (বাঙ্গালা 'ও' 'অপি র অপভ্রংশ, সংস্কৃত 'অপি' বাঙ্গালীর মুখে 'ওপি') যদ্যপিস্যাৎ, কেবলমাত্র, সমতুল্য (সমতুল ঠিক)।

'ঊর্দ্ধোন্মুখ' 'সমতুল্য' প্রভৃতির মত পুনরুক্তিদোষদুষ্ট। 'বিকচোন্মুখ' 'প্রফুল্লোন্মুখ', 'স্খলিতোন্মুখ' এ গুলি কি?

'যোগাযোগ' 'মতামত' 'পারাপার' 'ভরাভর' বোধ হয় বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; (যথা, টপাটপ, গবাগব ইত্যাদি) এস্থলগুলিতে দ্বিতীয়পদে নঞর্থ সূচিত হইতেছে কি?

অবাচকতা-দোষ।

আগত কল্য, কিঞ্চিৎ বুঝাইতে কথঞ্চিৎ, বর্ত্তমান অর্থে বক্ষ্যমাণ, অত্র স্থান, চক্ষুঃ মুদ্রিত অর্থে মুদিত, পঠদ্দশা অর্থে পাঠাবস্থা। এ প্রয়োগগুলি অদ্ভুত। 'সশরীরে উপস্থিত' প্রায়ই দেখা যায়। অশরীরেও উপস্থিত হওয়া যায় নাকি? তীর্থ দর্শন করা, অর্থে "তীর্থ করা" ও গয়ায় পিণ্ড দেওয়া অর্থে 'গয়া করা', চলিত ভাষায় শুনা যায়। এটা কি লক্ষণা?

(৮) সমাসপ্রকরণ।

১। 'সমস্ত' পদ এক সঙ্গে না রাখিয়া অনেক মুদ্রিত পুস্তকে পদগুলির মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রাখা হয়। 'বাঘ' একদিকে থাকিল আর তা'র 'ছাল' আর এক দিকে থাকিল; 'মাথা' এক পাড়ায় 'ব্যথা' আর এক পাড়ায়; 'একবাক্যে' একবাক্যত্ব-রক্ষা হইল না; 'উভয় তীরস্থ,' 'সরোবর তীরে' ইত্যাদি স্থলে দুইটি পদের মধ্যে যেন এক একটি নদীর ব্যবধান! এইরূপ ব্যবস্থায় কবি উমাপতিধর 'ধর' উপাধিধর বলিয়া অবধারিত হইয়া পড়েন! ভীমসেন কোন্ দিন বা বৈশ্য জাতির মধ্যে পড়িবেন! এই দোষ অবশ্য কম্পোজিটরের অজ্ঞতায় ও প্রুফরীডারের শিথিলতায় ঘটে। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা লেখকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয়। নাম লেখার সময়, বংশগত উপাধি

স্বতন্ত্র লিখিলে বাঙ্গালায় চলিতে পারে, কিন্তু নামের পদদ্বয় (কোথাও কোথাও পদত্রয়) একত্র লেখা উচিত; কেন না তাহারা 'সমস্ত' পদ। ইংরাজী কায়দায় L. K. Banerjee লেখাও সঙ্গত নহে, কেন না F. J. Rowe আমে যেমন দুইটি স্বতন্ত্র Christian name, হিন্দুর নামে সেরূপ নহে। L. Banerjeeই সঙ্গত, অথচ সেইটাকেই অনেকে সাহেবী মনে করেন।

২। কেহ কেহ আসক্তি-চিহ্ন (hyphen) দিয়া পদগুলির সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীর (compound word এর) নকলে এরূপ করা হয়; তবে ইংরাজীতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ সকল compound word এর বেলায়) এ ব্যবস্থা নাই। হিসাবমত ধরিতে গেলে এ ব্যবস্থা সমাস-মূলে ঠিক নহে, কেন না যখন 'একপদীকরণং সমাসঃ' তখন পদগুলি একেবারে যুড়িয়া যাওয়াই ঠিক। দীর্ঘসমাসস্থলে বা যেখানে অর্থগ্রহে খট্‌কা লাগিতে পারে (ambiguity) সে সকল স্থলে অর্থগ্রহের সুবিধার জন্য আসক্তিচিহ্ন দেওয়া মন্দ নহে।

৩। চলিত বাঙ্গালা শব্দে বা আরবী পার্শী ইংরাজী শব্দে ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দে সমাস হইতে দেখা যায়। এরূপ দোআঁশলা পদ এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু অনেকগুলি এতই চলিত যে সেগুলিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসন করা বড় সহজ নহে। যথা কমল আঁখি (প্রাচীন কবিতায়, এখানে সন্ধি হয় নাই), জগৎভরা (এখানেও সন্ধি হয় নাই), সজোরে, সজাগ, সঠিক, নির্ভুল, মাথাব্যথা, মা'রমূর্ত্তি, কাযকর্ম্ম, বিস্তপসার (এই কথাটি বরিশালে শুনিয়াছি), পসারপ্রতিপত্তি, করযোড়ে, কোণঠেসা, আত্মহারা, আপনা-বিস্মৃত, পতিহারা, মুখচোরা, মুখপোড়া, বানরমুখো, একচোখো, নাড়ীছেঁড়া, এলোকেশী, ডাকযোগে; সবুট, কোটপ্যাণ্টধারী, কোয়েটাপ্রবাসী, য়ুরোপপ্রবাসী, ইংলণ্ডেশ্বরী, লিষ্টিভুক্ত, স্কুলভবন, আফিস-গৃহ, তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত, শ্যামাশ্রেণীভুক্ত, অকুণ্ডল, বিলাতপ্রত্যাগত, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গ্যাসালোকিত, হীরামণিখচিত, আলোরক্ষা, গোগাড়ী কেমন কেমন শুনায়। 'শকুন্তলাতত্ত্বে' 'ফোটনোন্মুখ, 'ফুল ও ফলে' 'ফোটনোন্মুখী', এই জাতীয় উদাহরণ না ছাপার ভুল?

৪। নিম্নলিখিত 'সমস্ত' পদগুলিতে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'বাক্য বা প্রবন্ধরচনায়,' 'শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ,' 'সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক-ভেদে', 'শকুনি গৃধিনী ও শিবাকুল,' 'ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত,' 'দুঃখ ও শোক-

পরিপূর্ণ', 'অর্থ ও সময় অভাবে,' 'আমিষ ও নিরামিষ আহার,' 'পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটাপ্রবাসী,' ইত্যাদি। এ সকল স্থলে বীজগণিতের নিয়মে শেষ পদটি উভয় অংশের সাধারণ সম্পত্তি (common factor) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে কি? "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" ব্যাকরণের এইরূপ কোন সূত্রে ইহার মীমাংসা হয় কি? [বাঙ্গালায় একরূপ প্রয়োগরীতি আছে, যথা, নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত, ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে; এ সকল স্থলে শেষ পদে বিভক্তি দিলেই চলে। উপরি-নির্দ্দিষ্ট সমাসগুলির বেলায়ও কি সমাসের শেষ পদটি বিভক্তির মত সাধারণ সম্পত্তি (common factor]?

৫। সমাসে প্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ের অংশবিশেষের লোপ, বিভক্তিলোপ, আদেশ, আগম, প্রত্যয় প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে ঘটে, বাঙ্গালায় অনেকস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। [পক্ষান্তরে, বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি আগম, আদেশ প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে নেণে না; যথা নিশিদিন, এই স্থলে নিশা বা নিশ্ স্থানে নিশি আদেশ (অলুক্ সমাসের স্থল নহে), হৃদিবৃন্দাবন, এখানে হৃদ্ স্থানে হৃদি আদেশ (এখানেও অলুক্ সমাসের স্থল নহে), সমভূম, মানভূম, বীরভূম, সিংহভূম এই চারিটি স্থলে ভূমি স্থানে ভূম আদেশ; মরুভূম, বঙ্গভূম রঙ্গভূমও দেখিয়াছি। বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র 'নিশি' 'হৃদি' ও ভূম' শব্দ কল্পনা করিতে হইবে কি?] উদাহরণ দিতেছি।—

(৵৹). পূর্ব্বপদ ঋকারান্ত। বিধাতাপুরুষ, পিতারূপী, দুহিতানির্ব্বিশেষে, ভ্রাতাদ্বয়, দুহিতামঙ্গল, পিতাস্বরূপ, ভ্রাতা অর্থে, শাসনকর্ত্তারূপে, বিধাতা-নির্ম্মিত, সবিতাদেব, শ্রোতাগণ, ক্রেতাগণ, বক্তাগণ; স্বসাসুখ (হেমচন্দ্র)। পরপদ ঋকারান্ত, সভ্রাতা।

(৵৹) পূর্ব্বপদ অন্‌ভাগান্ত বা ইন্‌ভাগান্ত। যুবাপুরুষ, আত্মাপুরুষ, পরমাত্মারূপে, রাজাভ্রমে, রাজাপ্রজাসম্বন্ধে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, ব্রহ্মাকমণ্ডলে (হেমচন্দ্র), মহাত্মাগণ, দুরাত্মাগণ, মহিমারঞ্জন, মহিমাধ্বজা, মহিমাহার (হেম-চন্দ্র) মহিমানাথ, মহিমাপ্রচার, মহিমাকিরণে (হেমচন্দ্র), গরিমাবৃদ্ধি (মহিমা বা গরিমার পর একটা 'আ' উপসর্গ ধরিব?), হস্তীপৃষ্ঠে, তপস্বীবেশে, পক্ষীশাবক, শিখীপুচ্ছ, নিখীসহ, বাজীপৃষ্ঠে, বনকরীযুথ, অশ্বারোহীদ্বয়, অধিবাসীবর্গ, স্বামী-

গৃহে, স্বামীপুত্র স্বামীরত্ন, রোগীচর্য্যা, পরীক্ষার্থীমাত্রেই, প্রাণীশূন্য, শশীরশ্মি (হেমচন্দ্র), শশীভূষণ, গুণীগণ, গুণীবিশারদ (হেমচন্দ্র, সাক্ষীস্বরূপ, ধনীদরিদ্র, সন্ন্যাসীদত্ত, শাস্ত্রীবিরচিত, শর্ম্মাকর্ত্তৃক, বৈরীপদধূলি, কারাবন্দীসম, প্রাণীহাহাকার, কেশরীনাদ, প্রাণীবৃন্দ, রাঘবশর্ম্মাসমভিব্যাহারে, মহাত্মাদ্বয়, রক্তিমাবর্ণ, উত্তরাধিকারীবিরহিতা।

(৶০) পূর্ব্বপদ বৎ, মৎ, শতৃ, স্যতৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (তান্ত)। ভগবান্‌চন্দ্র, হনুমান্‌প্রসাদ, ভগবান্‌প্রদত্ত, কীর্ত্তিমান্‌গণ। জগবন্ধু, জগমোহন এই দুইটিস্থলে 'ৎ' র লোপ প্রাকৃতেও আছে। হসন্তবর্ণকে অজন্তভ্রমে—জগত-জীবন, জগত-মাতা, বিদ্যুতাগ্নি, বিদ্যুত-অনলে, তড়িত-কিরণ। (সব কয়টি হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে আছে)।

(।০) পূর্ব্বপদ অস্‌ভাগান্ত বা বিসর্গান্ত। বিসর্গবিসর্জ্জনে এই পদগুলি হইয়াছে। কুযশকাহিনী (ভারতচন্দ্র), চক্ষুকর্ণের, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুপীড়া, চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, দীর্ঘায়ুলাভ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন, শমদণ্ডে (হেমচন্দ্র), জ্যোতীন্দ্র, তেজস্বী, তেজস্সম্পন্ন, শিরশোভা, সদ্যোত্থিন্ন, শরদ্বণিরশোভিনী, তেজেন্দ্র, তেজেশ, রক্ষেন্দ্র, স্রোত মুখে, স্রোতমধ্যে, স্রোতশীলা, স্রোতবেগে, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোমুক্ত, সদাবিধবা, অপগণ্ড, বয়ক্রম, বক্ষোপরি, বক্ষবসন, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালোচনা, মনমত, মনচোরা, মনমরা, মনহর, মনসাধ, মনপ্রাণ, মনমোহন, মনমোহিনী, মনকল্পিত, মনাগুন, মনান্তর, মনচিত্রে (হেমচন্দ্র), যশ-পিপাসা (হেমচন্দ্র), চন্দ্রমাকিরণে। পরপদ অস্‌ভাগান্ত। সতেজ, নিস্তেজ (কৃত্তিবাস ঠিক, কেননা বস্ত্র অর্থে 'বাস' শব্দ আছে), প্রফুল্লমন (বহুব্রীহি), অন্যমনা, দৃঢ়চেতা, অহরহ (বিসর্গবিসর্জ্জন)। অস্‌ভাগান্ত শব্দকে অজন্ত করিয়া লইয়া 'বয়সোচিত' হইয়াছে, অপ্সরস্ শব্দের প্রথমার একবচনের পদ 'অপ্সরাঃ' কল্পিত করিয়া লইয়া তাহার বিসর্গবিসর্জ্জনে অপ্সরা হইয়া অপ্সরাগণ (ভারতচন্দ্র) হইয়াছে? অপ্সরা আকৃতি (হেমচন্দ্র); সংস্কৃতে নাকি আকারান্ত অপ্সরা শব্দ আছে। অপ্সর শব্দও বাঙ্গালায় দেখি।

(।৶০) বিবিধ। মহারাজা (মহারাজ; আগে সমাস না করিলে মহারাজ্ঞী চলে, তবে মহারাজের স্ত্রীলিঙ্গ নহে), উভচর (উভয়চর, বিদ্যাসাগর মহাশয় চালাইয়াছেন), নিরাশা (নিরাশ, নিরাশা স্ত্রীলিঙ্গে চলে) মহদুপকার মহদাশয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষে চলে, কর্ম্মধারয়ের সঙ্গে অর্থভেদ যথেষ্ট),

পিতামাতা (মাতাপিতা), পিতৃমাতৃহীন (মাতাপিতৃহীন), পিতৃমাতৃঅঙ্কে (মাতাপিত্রঙ্কে), সত্যসখা (বহুব্রীহি সমাস হইলে চলে), প্রিয়সখা, সখা-ভাবে (সখিভাবে), স্ফুরন্তযৌবনা (স্ফুরদ্‌যৌবনা) সখারূপে (সখিরূপে), বিদ্বান্‌সমাজ (বিদ্বৎসমাজ)।

সুগন্ধী [সুগন্ধি, 'সুগন্ধ' শব্দে ইন্‌ প্রত্যয় ধরিলে পুনরুক্তি (tautology) হয়], অতিমাত্রা (অতিমাত্র), পন্থানুসরণ (পথ্যানুসরণ) অসৎপন্থাচারিণী (অসৎপথচারিণী) খ্রীষ্টপন্থা (খ্রীষ্টপথ)। নানকপন্থী কবীরপন্থী কি ব্যাকরণ-পরিপন্থী নহে? পথশ্রম, পথরোধ, পথ-দর্শক (পথিন্‌ শব্দ হইলে পথি হইবে, সংস্কৃতে নাকি 'পথ' শব্দও আছে), অহোরাত্রি, দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, অহর্নিশি, দিবানিশি, দিবসনিশায় (হেমচন্দ্র) (অহোরাত্র, দিবারাত্র, দিনরাত্র, অহর্নিশ, দিবানিশ)।

সমর্থনের যুক্তি।

কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত পুংলিঙ্গের (ঋকারান্ত শব্দের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গেরও) প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে এ সমস্ত সমাসের সমর্থন চলে। যথা বাঙ্গালায় পিতৃ শব্দ নহে পিতা শব্দ, মাতৃশব্দ নহে মাতাশব্দ, সখিশব্দ নহে সখা শব্দ, আত্মন্‌ শব্দ নহে আত্মা শব্দ, স্বামিন্‌ শব্দ নহে স্বামী শব্দ, হনুমৎ শব্দ নহে হনূমান্‌ শব্দ। এইরূপ বণিক্‌, সম্রাট্‌, বিদ্বান্‌, মহিমা, যুবা। বাস্তবিকও ত প্রথমান্ত শব্দগুলিতেই বাঙ্গালায় বিভক্তি লাগান হয়, যথা পিতার (পিতৃর নহে) স্বামীকে (স্বামিন্‌কে নহে)। পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃ অঙ্কে এ দুইটি স্থলে সমাসে কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা মহতের লিখি, মহানের লিখি না। এস্থলেও ব্যতিক্রম। এইরূপ বাঙ্গালায় মহৎ, মহান্‌, মহা * শব্দত্রয়, পন্থাঃ, পন্থা, পথ শব্দত্রয়, চক্ষুঃ চক্ষু চক্ষ শব্দত্রয়, দিক্‌ দিশ দিশা দিশি শব্দচতুষ্টয়, নিশা নিশি শব্দদ্বয়, হৃৎ হৃদি শব্দদ্বয়, ভূমি, ভূম শব্দদ্বয় উপরি উপর শব্দদ্বয়, বলবান্‌ বলবৎ বলবন্ত ইত্যাদি ধরণের শব্দত্রয়, আছে বলিলে প্রশ্নটি অনেক সরল হয়। গণ, সমূহ, বৃন্দ, কুল, চয়, বর্গ শব্দগুলিকে বহুবচনের চিহ্ন, (বিভক্তি), 'দ্বারা' 'কর্তৃক' 'সহ' 'সমভিব্যাহারে'কে করণকারকের চিহ্ন (বিভক্তি) ধরিয়া লইলেও সুবিধা হয়।

[বিসর্গান্ত শব্দকে বিকল্পে অকারান্ত ধরিবার সংস্কৃতেও নাকি নজীর আছে। 'পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে' এইরূপ একটা শিষ্ট প্রয়োগ থাকাতে 'শির' শব্দও আছে, কেহ কেহ বলেন।]

* নতুবা 'সহা আনন্দ' 'মহা আস্ফালন' হয় না।

পূর্ব্বপ্রদত্ত যুক্তির খণ্ডন।

ইহার উত্তরে অপর পক্ষ বলেন, যখন সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত শব্দে সন্ধিসমাস হইবে, তখন সংস্কৃতের ধাতটা ঠিক বজায় রাখাই সুযুক্তি। যখন 'রা' দিগ' 'দিগের' প্রভৃতি খাঁটি বাংলা বিভক্তি দিয়া বহুবচন করিতেছ, তখন খাঁটি বাংলার নিয়মে কর। কিন্তু সংস্কৃত-শব্দযোজনাকালে সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম বাহাল রাখাই কর্ত্তব্য। লেখকদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিত দেখা যায়।

সাবধানী, নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোগী, অরোগী, নীরোগী, নিরপরাধী, কৃতাপরাধী (বঙ্কিমচন্দ্র), নির্ধনী, মহারণী, মহাপাপী, বহুরূপী, সুগন্ধী, বিধর্ম্মী, পশুধর্ম্মী, স্থূলচর্ম্মী, অতিবুদ্ধিমান, মহাভাগ্যবান, সুকেশিনী, অনাথিনী, নির্দ্দোষিনী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, শ্যামাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, গৌরাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, রুদ্ররূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিনী।

এ গুলির বিষয় পুনরুক্তিদোষ-প্রকরণে বলিয়াছি। সংস্কৃতব্যাকরণে, ইন্ প্রত্যয় দিয়া বহুব্রীহি দুই এক স্থলে হয়।

(৯) সন্ধি।

১। সমাসস্থলে সন্ধি অপরিহার্য্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক পক্ষ বলেন, বাঙ্গালায় এ সকল স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটুদোষ হয়। প্রতিপক্ষ বলেন; "সংস্কৃতভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর ভাষা জগতে অতি অল্পই আছে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধি করিলে শ্রুতি-মধুরতা নষ্ট হয় না, আর বাঙ্গালার বেলায় হয়? তবে কি বুঝিব, বাঙ্গালা লেখকদিগের মাধুর্য্যবোধশক্তি কালিদাস-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষ-জয়দেব অপেক্ষাও অধিক?" ইহারও একটা জবাব সম্প্রতি মিলিয়াছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন, প্রাকৃত ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতি-মধুর ও 'গউড়বহো' এবং কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই মতের পোষক প্রমাণও দিয়াছেন। ('সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব', প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৭)। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তার ভাষায় সন্ধি না করার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। আমরা শত অন্ন বলি শতান্ন বলিনা, শাক অন্ন বলি শাকান্ন বলিনা, ষোড়শ উপচারে পূজা বলি ষোড়শোপচারে বলি না, রক্ত আমাশয় বলি রক্তামাশয় বলি না, জ্বর অতিসার বলি জ্বরাতিসার বলি না। বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র সন্ধির প্রযত্নটুকু

করিতে নারাজ। তবে "কথাবার্ত্তার এই বিশেষত্বটুকু লিখিত ভাষায়ও থাকা উচিত কিনা, তাহা বিচার্য্য।

২। এ সকল স্থলে সমাস করি নাই বলিয়া পার পাইবার যো নাই। কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় না হয় এ কথা বলিলেন; কেননা বাঙ্গালায় যখন বিশেষণে বচনকারক বুঝাইতে বিভক্তি দেওয়ার নিয়ম নাই, স্ত্রীলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইলেও চলে, তখন কোন একটা স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। তবে অবশ্য অসমস্ত পদ হইলে ব্যবধান থাকা উচিত। [সমাস করিলে অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত অস্‌ভাগান্ত প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বপদ হইলে সে গুলির প্রথমার একবচন কিন্তু 'সমস্ত' চলিবে না।] কিন্তু দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ (বহুব্রীহির ত কথাই নাই) সমাসের বেলায় সমাস না করিলে কিরূপে অর্থপ্রকাশ হইবে এবং কি করিয়াই বা অন্বয় হইবে? দ্বন্দ্ব সমাসেও না হয় বলা যাইতে পারে, উভয়পদের মধ্যে 'ও' বা 'এবং' উহ্য আছে; বাঙ্গালার প্রয়োগ-রীতিতে যখন তিন চারিটি এককারকের পদের বেলায় শেষ পদটির পূর্ব্বে 'ও' 'বা' 'এবং' দিলে চলে (যথা—রাম সত্য ও হরিকে ডাক) তখন এরূপও চলিতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষের বেলায় কি উপায়? 'কার্য্য উদ্ধার করা' এখানে না হয় উদ্ধারকে ক্রিয়াপদের অংশ ধরিলাম, ষষ্ঠী তৎ-পুরুষের প্রয়োজন হইল না; কিন্তু, কার্য্য উদ্ধারকল্পে, এখানে কি হইবে? 'বঙ্গমাতা উদ্ধারের'ই বা কি উপায়? বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতিকে যেমন বিভক্তি-চিহ্ন (বা postposition) ধরিয়া লওয়া হয়, 'অনুসারে' 'অনুযায়ী' 'অবলম্বনে' 'উপলক্ষে' 'কল্পে' প্রভৃতিকে সেইরূপ ধরা চলে কি? আকর্ষণ প্রভৃতির (verbal nounএর) ক্রিয়াপদের ন্যায় কর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধরিলে 'ভক্তিআকর্ষণের' প্রভৃতিস্থলে সমাস হয় নাই, বলা চলে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কৃদন্ত পদের কর্ম্ম থাকে, যথা 'অন্ন আহার',.এ সব স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।)

পদ্যে এইরূপ উদাহরণ খুব বেশী। হেম বাবুর কবিতাবলীতে প্রায় প্রতি পত্রে উদাহরণ পাইয়াছি। ছন্দের খাতিরে এরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া সমর্থন করা চলে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় ছন্দের জন্য ত এতদূর শিথিলতা আসে না।

উদাহরণমালা।

(১) দ্বন্দ্বসমাসে সন্ধির অভাব।

স্বরসন্ধি—সমার্থ বা বিপরীতার্থ বা সমপর্য্যায় শব্দযুগ্মকে সমাস।

(/০) সমার্থ—* আরাম আনন্দে, আদর আপ্যায়নে, উদ্যোগ আয়োজন, অর্চ্চনা আরাধনা, আমোদ আহ্লাদ, রত্ন-আভরণ, ধন-ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি।

(৵০) বিপরীতার্থ—ক্ষমতা অক্ষমতা, মান অপমান, ন্যায় অন্যায়, শুদ্ধ অশুদ্ধ, পক্ক অপক্ক ইত্যাদি।

(৶০) সমপর্য্যায়—অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা, নিদ্রিত-অচেতন, অভাব-অভিযোগ, রথ-অশ্বের, অনাদর অত্যাচার, দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথির, সত্য অহিংসাদি, ধর্ম্মঅর্থসুখমোক্ষদায়িকে, কুণ্ঠা-উৎকণ্ঠা, বন-উপবন, বেদ-উপনিষদ্, হুহুঙ্কার-উত্তেজনায়, কলিঙ্গ-উৎকলের, অজ-ইন্দুমতী, পুরাণ-ইতিহাস, বিষ্ণুইন্দ্র, আকৃতি-অবয়ব, ইত্যাদি।

(২) তৎপুরুষ ও অন্যান্যসমাসে সন্ধির অভাব।

(/০) স্বরসন্ধি—পুলক-আলোকে, সংযম অভ্যাস, সময়-অভাবে, বিদ্যা-বিনয়-অলঙ্কৃত, যবনিকা-অন্তরালে, প্রতিমা-অর্চ্চনা, দেব-আরাধনা, আত্ম-অভিমান, আত্ম-উপকার, বিষয়-অধিকারী, রামায়ণ-মহাভারত-অবলম্বনে, জীবন-আদর্শ, বজ্র-আঘাতে (বাজ পড়া অর্থে) ছায়া-অবলম্বনে, আদেশ-অপেক্ষায়, ধৈর্য্য-আশঙ্কায়, স্নেহ-আহ্বান, প্রেম-আহুতি, কীট-আকারে, দেব-আকাঙ্ক্ষিত, মঙ্গল-আলয়, চির-অকীর্ত্তিকর, রচনা-অংশে; স্বইচ্ছায়, অরুণ-উদয়ে (পদ্মিনী উপাখ্যান), কার্য্যউদ্ধার, দীন-উপহার, ভারতউদ্ধার কাব্য, সুরথউদ্ধারযাত্রা, শুভউপনয়নউপলক্ষে, চিরউল্লসিত, চিরউন্মুক্ত, বিজয়উল্লাস, আনন্দ-উজ্জ্বল, আনন্দ-উৎফুল্ল, চিকিৎসা-উপযোগী, মৃগয়া উপলক্ষে, বিদ্যাউপার্জ্জন, ভাষাউদ্ভাবনের, কল্পনাউৎস, সুউন্মুক্তনীল, অর্দ্ধেন্দুউজ্জ্বল, উপরিউক্ত, শান্তিঅন্বেষী, ভ্রান্তিঅপনোদনের, প্রকৃতি-অনুমোদিত, পদ্ধতিঅনুসারে, ভক্তি আকর্ষণের, প্রণালী-অবলম্বনের, নারী-অধিকারের, ভারতী-অর্চ্চনা, করি-অরি, দেবী-অংশে, পদ্মিনী আখ্যান,

* দ্বন্দ্বসমাসে সমার্থ শব্দব্যবহার, বাঙ্গালার একটা বিশেষত্ব। কখন দুইটি শব্দই সংস্কৃত কখন একটি সংস্কৃত অপরটি চলিত শব্দ, কখন একটি সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ, অপরটি পার্শী বা আরবী। যথা, ভ্রমপ্রমাদ, পসারপ্রতিপত্তি, ভুলভ্রান্তি, বাদবিচার, ঝগড়াবিবাদ, কাজিয়া-কলহ। ইহাকে নিরর্থকতাদোষ বলিয়া আলঙ্কারিকের নির্দ্দেশ করেন।

স্ত্রীআচার, স্ত্রীঅত্যাচার। স্বরাদিনামের পূর্ব্বে শ্রী যথা শ্রীঅগ্নিনিমাইচরিত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র, শ্রীঅঙ্গে; শক্তিউপাসক, ভক্তিউচ্ছ্বাসের, ভীতিউৎপাদক, স্মৃতিউৎসব; তনুঅঙ্গে, তরুঅন্তরালবর্ত্তী, গুরুআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা, পিতৃআদেশ, মাতৃঅভিষেক, মাতৃউদরে, নিদ্রাউত্থিত, বহু-অশ্ব-পদ-সঞ্চারিত।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—বাক্‌দত্তা, বাক্‌দান, বাক্‌বিতণ্ডা, দিক্‌বলয়, তির্য্যক্‌ভাবে, সম্যক্‌ভাবে, ঋত্বিক্‌গণের, চতুর্দ্দিকস্থ (অকারান্ত দিক শব্দ ধরা হইয়াছে), জগৎআনন্দ, জগৎগুরু, জগৎলক্ষ্মী, শরৎচন্দ্র, জগৎব্যাপী, ভগবৎমূর্ত্তিত্রয়, মরুৎমণ্ডল, কিঞ্চিৎমাত্র, প্রকৃতত্ত্ববিৎগণ, জগৎমঙ্গলকার, সুহৃৎ রঞ্জন (হেমচন্দ্র), বিদ্যুৎলতা (হেমচন্দ্র), জগৎ-বিখ্যাত (হেমচন্দ্র) যোষিদ্‌গণ্ডলী, সাহিত্যপরিষৎমন্দির। জলছবি, স্নানছলে, অঞ্চলছায়ায়, আলোকছটায়, অরুছায়া; হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে—অনলছবি, মহিমা-ছটাতে, রাহুগ্রহছায়া, দেবছটা, শশীতনুছটা, ভানুছটা।

(৶০) বিসর্গসন্ধি—ধনুঃধারী (হেমচন্দ্র), শিরঃচূড়ামণি (মাইকেল) চক্ষুঃজল।

(৩) ভুল সন্ধি।

(৵০) স্বরসন্ধি—আয়ুর্ব্বিদ্যান, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি, অধ্যায়ন, ভূম্যাধিকারী, অনুমত্যানুসারে, পশ্বাধম, খ্যাতাপন্ন (খ্যাত্যাপন্ন), উপরোক্ত (বাঙ্গালায় 'উপর' শব্দ ধরিব?), জনৈক (জনেক দুজন) দিনেক, বারেক, ক্ষণেক, বৎসরেক, তিলেক। অনার্টন, দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট এই দলে ফেলা যায়। কেহ কেহ 'অনা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোটাইয়া অনাটন রাখিতে চান। 'দুরা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে নাকি? তিনটি স্থলেই 'আ' উপসর্গ ধরিলে রাখা চলে।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—মহদ্দেচ্ছা, সুহৃদোত্তম, বিদ্যুতালোক, মরুদ্ভাদি (হসন্ত শব্দকে অজন্তভ্রমে), বড়বিধ; পৃথগান্ন, আরও বাড়াবাড়ি। হৃদ্‌পদ্ম, চতুর্দ্দিগ্‌স্থিত, বাগ্‌নিষ্পত্তি।

(৶০) বিসর্গসন্ধি—মনোকষ্ট, মনোসাধ, মনোক্ষেত্রে, মনোসুখে (হেমচন্দ্র), মনোতুলিকা, মনোচৌর, কায়মনোচিত্তে, নভোতলে, ইতোপূর্ব্বে, বয়োপ্রাপ্ত, শিরোশোভা, সদ্যোপ্রস্ফুটিত, সদ্যোচয়িত, জ্যোতি-উপবীত (হেমচন্দ্র)।

কলিকাতাভিমুখে'র বেলায় সন্ধি, 'বারাণসী অভিমুখে' ও 'দিল্লী অভিমুখে'র বেলায় সন্ধির অভাব। বোধ হয় শ্রুতিকটুদোষ-পরিহারার্থে এই প্রভেদ। তিনি ভারতের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছেন 'আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি,' 'ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়' আর কি আছে?' 'আপনাপনি' 'আপনাপন,' এসবস্থলে সন্ধি বাঙ্গালার ধাতের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু অনেককে করিতে দেখি। মহেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অদ্ভুত সন্ধির পদ মাঝে মাঝে দেখা যায়। (হরিশ্চন্দ্রের দেখাদেখি?)

(১০) শব্দের অর্থব্যতিক্রম।

অনেকগুলি শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইংরাজীতেও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অর্থব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।] সংস্কৃত ভাষায় এরূপ অর্থে শব্দগুলির ক্বচিৎ কুত্রচিৎ প্রয়োগ আছে কি না তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন, কেন না এই ভাষায় গ্রন্থাদি ভূরিপরিমাণ এবং আমার বিদ্যা নিতান্ত অল্প। তবে যতদূর জানি, এই অর্থগুলি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। এগুলি অপপ্রয়োগ বলিয়া ধরিতে হইবে, কি ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে যখন এরূপ অর্থব্যতিক্রম হইয়াছে, তখন তাহা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির ফলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

আকিঞ্চন=দৈন্যের ভাবে প্রকাশিত ইচ্ছা (সংস্কৃত দৈন্য অর্থ হইতে লক্ষণা?)

আক্ষেপ=বিলাপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন (সংস্কৃতে নিন্দা বা অঙ্গবিক্ষেপ। বিলাপকালে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটে অথবা অদৃষ্টের নিন্দা করা হয়, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে কি?)

আচ্ছন্ন=অজ্ঞান অভিভূত। জ্বররোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের ঘোরে জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে?

আদ্যোপান্ত=আদ্যন্ত (শেষটুকু পঠিত হয় না, এইরূপ একটা শাস্ত্রবচন আছে। সেইজন্য কি এই অর্থ?)

আরাম=সোয়াস্তি, ফুরফুরে হাওয়ায় বড় আরাম (বিশ্রাম অর্থ হইতে লক্ষণা?)

আশ্চর্য্য=বিস্ময়াপন্ন (সংস্কৃতে বিস্ময় ও বিস্ময়জনক এই দুই অর্থ আছে।)

উপন্যাস=নভেল। সংস্কৃতে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' থাকিতে সংস্কৃত শব্দের অপপ্রয়োগ কেন?

উপায়=রোজগার, দশ টাকা উপায় করিতেছে। সংস্কৃত সাধন অর্থের লক্ষণা?

এবং=ও, and. সংস্কৃত "এইরূপ" অর্থ হইতে পরিবর্ত্তন অতি সহজ।

কথা=শব্দ, word। কল্য=আগামী দিন বা বিগত দিন (সংস্কৃতে 'প্রত্যূষ' অর্থ)।

জীবনী=জীবন-চরিত। তত্ত্ব=কুটুম্ববাড়ী প্রেরিত মিষ্টান্ন (সংস্কৃত বার্ত্তা অর্থ হইতে লক্ষণা? সন্দেশ দেখুন)।

নিরাকরণ=নিরূপণ। (সংস্কৃতে নিবারণ)। পরশ্ব (পরশ্বঃ)=বিগত দিনের পূর্ব্বদিন।

প্রজাপতি=পতঙ্গবিশেষ। প্রশস্ত=চওড়া broad।

ভাস্যমান=যাহা ভাসিতেছে floating (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

ভাসুর=স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভাস্কর=প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা।

মন্বন্তরা (মন্বন্তর)=দুর্ভিক্ষ। যথা—আমিও বৈষ্ণব হ'লাম, দেশেও মন্বন্তরা লাগ্‌ল।

মর্ম্মর=মারবেল পাথর marble। মলয়=দক্ষিণ বায়ু (মলয় পর্ব্বত হইতে লক্ষণা?)

রহস্য=ঠাট্টা (সংস্কৃতে গোপনীয়)। রাগ=কোপ rage (ক্রোধে মুখেচোখে রক্তিমা আসে।)

রাষ্ট্র=জানাজানি। ব্যঙ্গ=ঠাট্টা (ব্যঞ্জনার প্রকার ভেদ?)

বাধিত=উপকৃত, obliged, indebted। ব্যাপার=ঘটনা। ব্যামোহ=রোগ।

বিমান=আকাশ (সংস্কৃতে আকাশগামী রথ)। বিষয়=জমীদারী (সংস্কৃতে 'দেশ' বা 'সম্পত্তি' অর্থ হইতে লক্ষণা?)

বেদনা=ব্যথা (সংস্কৃতে অনুভূতি, সঙ্কীর্ণার্থে কষ্টানুভূতি; ইংরাজী pensive শব্দেও কতকটা এইরূপ হইয়াছে।) বেলা॥ পক্ষে, 'আমার বেলায়

শুশ্রূষা=রোগীর সেবা (সংস্কৃতে 'সেবা'; সঙ্কীর্ণার্থে রোগীর সেবা।)

শ্লেষ=ঠাট্টা। (সংস্কৃত অর্থ হইতে লক্ষণা আসে কি?)

সংবাদ=খবর, news (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

সন্দেশ=মিষ্টান্ন। (সংস্কৃতে বার্ত্তা, খবর; কুটুম্ববাড়ী খোঁজখবর লইতে বা পাঠাইতে হইলে লোক মারফত মিষ্টান্ন পাঠান রীতি। এইরূপে অর্থ-ব্যতিক্রম হয় নাই কি? 'তত্ত্ব' শব্দ এখনও দুই অর্থেই চলে, (১) আমাদের তত্ত্ব লওনা (২) কি তত্ত্ব এল?

সমারোহ=জাঁকজমক (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে এ অর্থ নাই।*)

সুতরাং=তজ্জন্য, therefore (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

সেনানী=সৈনিক বা সৈন্য (সংস্কৃতে 'সেনানায়ক' অর্থ); এটা তাঁহার ভুল, অথচ দুইজন প্রসিদ্ধ জীবিত লেখক ভুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

* আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ ১৩১৭, পুরাতন প্রসঙ্গ।

উপসংহার।

পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ হইল। আমার সংস্কৃতজ্ঞানের অল্পতাবশতঃ, যদি কোন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এড়াইয়া গিয়া থাকে অথবা প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুধীগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। 'সাহিত্যে' এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আমি পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছি। সুযোগ্য 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ও এই আহ্বানে যোগদান করিতেছেন। এরূপ কার্য্য অনেকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে আমার নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিবার যদি অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই কথা বলিব—বাঙ্গালার ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতের ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। অতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথাবার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ-পদ-মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। তবে যেখানে নাটক নভেলে কথাবার্ত্তার ভাষাই যথাযথ দিতে হইবে, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইংরাজীতেও এই নিয়ম দেখিতে পাই

প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া যে কতকগুলি অপপ্রয়োগ মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহারও কোন যুক্তি দেখি না। যেমন সামাজিক কুপ্রথা উঠানর চেষ্টা আবশ্যক, সেইরূপ মামুলি ভুলগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। আধুনিক লেখকদিগের খেয়ালবশতঃ যে সব অপপ্রয়োগ সাহিত্যে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধিপ্রিয় ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

"মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য, এবং শব্দপ্রয়োগেবিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।" "আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে যাইয়া একটুকু ভক্তির ভাব দেখাইব না, ইহা কেমন কথা? হাতে কলম লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া যাইব, শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, ইহা বড়ই অসঙ্গত।" "যা'র যেমন শক্তি, মাকে তেমনই অলঙ্কার দাও, কিন্তু এমন অলঙ্কার কখনই দিও না, যাহাতে মায়ের অঙ্গ বিকৃত দেখায়।"

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিতৃদ্রোহী।

বাইশ বৎসর বয়সে সে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাহার উন্নতি সম্বন্ধে ততটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। পাঠ্য পুস্তকের প্রত্যেক ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ সে নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিত; পরীক্ষার সময় তাহার প্রশ্নপত্রের উত্তরে একটিমাত্র ভ্রমও দেখা যাইত না; কিন্তু লোকের সহিত আলাপ ব্যবহারে সে নিতান্ত 'ভালমানুষে'র মত ছিল। কাহারও সহিত সাহস করিয়া সে কখনও কোনও তর্ক করে নাই। জোর করিয়া কোনও বিষয়ে মত-প্রকাশের শক্তিই যেন তাহার ছিল না! গুরুজনদিগের কথা দূরে থাকুক, সহপাঠীদিগের নিকটেও উমাকান্ত কোনও বিষয়ে কখনও মতামত প্রকাশ করে নাই।

ছাত্রাবাসের সকলেই এক এক জন গ্লাডষ্টোন, টলষ্টয়, চাণক্য, অথবা বেদব্যাস। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কবিতা, উপন্যাস, সকল বিষয়েই ছাত্রদিগের অপ্রতিহত অধিকার! কলেজ হইতে 'মেসে' ফিরিয়া, অথবা ছুটীর দিন প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে পাঠার্থীদিগের মধ্যে

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের গভীর আলোচনা হইত। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চীৎকার, বাহ্বাস্ফোট ও প্রচণ্ড করতালির গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইত। সে কি বিপুল উৎসাহ! মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—(বিহারীলালের নাম বোধ হয় নব্যশিক্ষিতদিগের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই!) ইঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কবি, কাহার আসন কত উর্দ্ধে, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুনরভিনয়ের সম্ভাবনা প্রায়ই দেখা যাইত। কেহ মাইকেলকে কবির রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া অন্যান্য কবিকে তাঁহার চামর-ব্যজনে নিযুক্ত করিত! কেহ বা রবীন্দ্রনাথকে সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী করিয়া, গ্রহ উপগ্রহের স্থানে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগের আসননির্দ্দেশ করিত। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিও হীনপ্রভ নক্ষত্রের ন্যায় সৌরগ্রহের বহু দূরে অধিষ্ঠিত হইতেন! ছাত্রদিগের ভীষণ কোলাহলে ও গর্জ্জনে পুরাতন 'মেসের' জীর্ণ কড়ি বরগাগুলি যে খসিয়া পড়িত না, তাহা গৃহস্বামীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল বলিতে হইবে!

কিন্তু এত উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যেও উমাকান্ত পরম শিষ্ট বালকের ন্যায় গৃহের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কোনও তর্ক-যুদ্ধে সে কখনও যোগ দিত না। সে শুধু স্বপ্নময় কোমল নয়নযুগল তুলিয়া তার্কিক-দিগের অঙ্গসঞ্চালন লক্ষ্য করিত।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "বল না উমাকান্ত, এ বিষয়ে তোমার মত কি?" উত্তরে সে মৃদু হাস্য করিত, এবং হাতের বইখানি খুলিয়া পাতা উল্টাইতে থাকিত। সুতরাং বন্ধুবর্গ তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সে দিন রবিবার। কলেজ বন্ধ। আষাঢ়ের আকাশ মেঘমেদুর। মধ্যাহ্ন হইতেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাতাসের বেগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। দিনের আলো মেঘান্ধকারে ম্লান হইয়া গেল। ভরা-বর্ষায় 'মেসে'র ছাত্রগণ প্রচুরপরিমাণে কাঁঠালের বীচি ও চিঁড়াভাজার আয়োজন করিয়াছিল। কাঁঠালের বীচি ও চিঁড়া ভাজার প্রভাব অসাধারণ! শুনা যায়, ইহাতে তর্ক-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; বিশেষতঃ বাদলার দিনে চিঁড়াভাজা কল্পনা-শক্তিকে প্রখর ও উর্ব্বর করিয়া তুলে!

রমেশচন্দ্র ও বিমানবিহারী কয়েক দিবস পূর্ব্বে বহরমপুরে "কায়স্থ-কন্-

ফারেন্সে" বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছে। দেশহিতৈষণা-বৃত্তি বক্তৃতার উত্তাপে 'বয়লিং পয়েন্টে' পঁহুছিয়াছিল। রমেশ বলিল, "সভাপতির অভিভাষণটি মন্দ হয় নাই। সমাজ-সংস্কার করিতে গেলে আগে সমাজ-রক্ষার বন্দোবস্ত আবশ্যক।"

বিমান তখন কাঁঠালের বীচি চিবাইতেছিল। সে বলিল, "আলবৎ! এই ধর না—বিবাহপণ-প্রথা!—সেটা রহিত হইলে দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত বহু গরীব ভদ্র-পরিবার রক্ষা পায়।"

সুশীলকুমার পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। সে বলিল, "কথাটা ঠিক্। তবে কি জান? টাকার মায়া, গোলাকারের তীব্র আকর্ষণ—ভাই, হঠাৎ লোভ-সংবরণ করা ভার। বিশেষতঃ, যাদের দু' লাখ দশ লাখ আছে, তাদের পক্ষে। বরং গরীব লোক একদিন টাকার মায়া ছাড়িতে পারে; কিন্তু ধনকুবেরগণ কিছুতেই নয়! তাদের কামড় আরও বেশী!"

রমেশ বলিল, "ওকে আর কেন এর মধ্যে টেনে আনো, ভাই। জানাই ত, সাত চড়ে কথা কয় না। উমাকান্ত! আইন নিয়ে তুমি ভাল কর নাই। এত 'মুখচোরা' লোকে ওকালতী করিতে পারে না।"

সুশীল রেকাব হইতে অবশিষ্ট চিঁড়াভাজাগুলি মুখে ফেলিয়া বলিল, "ওকে ত আর আমার মত চাকরী করে' দিন গুজরাণ করতে হবে না। বাপের অগাধ টাকা, জমীদার মানুষ। ওর বিদ্যা অর্থকরী নয়, অনেকটা সখের পড়া!"

উমাকান্ত মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমাদের বিরাট তর্ক-সাগর পার হইবার শক্তি আমার মত ক্ষীণজীবীর আছে কি ভাই?"

সুশীল বলিল, "তা ঠিক বটে; সকল বিষয়ে উদাসীনের মত থাকাটা ঠিক সঙ্গত নয়। লেখা পড়া শিখিয়াও যদি জড়ের মত থাকিতে হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?"

উমাকান্ত নীরবে টেনিসনের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

২

পূজার বন্ধে উমাকান্ত দেশে ফিরিয়াছিল। সে ধনবান পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মীর প্রসাদের সহিত সরস্বতীর নির্ম্মাল্য লাভ করিলেও উমাকান্ত এ পর্য্যন্ত প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত ছিল। পিতা রামহরি রায় মহাশয় বৃদ্ধ ও সেকেলে লোক বটেন; কিন্তু বিদ্যার্জ্জন-কালে বিবাহ দিয়া পুত্রের

জ্ঞান-লাভের পথ রুদ্ধ করেন নাই। নষ্টমতি দুষ্ট লোকে বলিত, বিলাসপুরের জমীদার ঘোষ মহাশয়ের লৌহসিন্দুক ও তাঁহার একমাত্র সুন্দরী কন্যার প্রতি বৃদ্ধের না কি লোলুপ দৃষ্টি আছে!

এবার বাড়ী আসিয়াই উমাকান্ত জানিতে পারিল, শীঘ্রই তাহার কৌমার্য্যের অবসান হইবে। আগামী অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিলাসপুরের জমীদার-নন্দিনী তাহার গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবে।

সংবাদটা অবশ্যই শুভ। এতকাল কাব্য ও উপন্যাসের ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারে সে মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছিল; এখন সত্যই কোনও অনির্দ্দিষ্ট সুন্দরী তাহার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে। তাহাকে আর কল্পনার ধ্যানে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে না।

আহারাদির পর কুমারসম্ভবখানি লইয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া সে চক্ষু নিমীলিত করিল। উমাকান্ত কি ভাবিতেছিল?

"দাদা, ঘুমুচ্ছো?"

ভগ্নীর সস্নেহ আহ্বানে উমাকান্ত উঠিয়া বসিল।

সুষমা টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার এ দিক ও দিক চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা, একটা জিনিস দেখ্‌বে? কিন্তু আমায় কি দেবে আগে বল, তবে দেখাব।"

উমাকান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোর জিনিস কেই বা দেখ্‌তে চাচ্ছে যে, বকশিস চাস্?"

"তা হ'লে তুমি দেখ্‌বে না? শেষে কিন্তু আমায় দোষ দিও না।"

সুষমা হাসিতে হাসিতে বস্ত্রান্তরাল হইতে কাগজে বাঁধা বহির মত কি একটা বাহির করিল।

উমাকান্ত বলিল, "আচ্ছা, বকশিস্ দিব, দেখি?"

সুষমা একখানি ফটো বাহির করিয়া দাদার হাতে দিল। বলিল, "দেখ দেখি—চমৎকার নয়?"

উমাকান্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ কার ছবি? তুই কোথায় পেলি?"

"তোমার পছন্দ হয়েছে ত? বিলাসপুরের নাম শুনেছ? যেখানে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে গো, এ সেই মেয়ের ফটো। খাসা মেয়ে, না দাদা? আবার বিশ হাজার টাকা ও একখানি তালুক। যাই, আমি মাকে বলিগে, দাদার পছন্দ হয়েছে।"

উমাকান্তের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভগিনীর হাতে ছবিখানি ফিরাইয়া দিয়া আবার সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

উমাকান্ত কি মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল? পিতার ব্যবস্থা অথবা পছন্দের অনুকূল অথবা প্রতিকূলে সে কোনও কথাই কহিতে চাহে না। তিনি যেরূপ ঘরে যেরূপ পাত্রীর সহিত তাহার সম্বন্ধ করিবেন, তাহা সে নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করিবে। উমাকান্ত সে বিষয়ে কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। সেরূপ শিক্ষা সে কখনও পায় নাই। কিন্তু বিবাহের আবার একটা চুক্তি-পত্র কি? নিকৃষ্ট ক্রয়-বিক্রয়ের সম্বন্ধ কি এই পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানে থাকা কর্ত্তব্য? সে কি বিক্রেয় পদার্থ? কি লজ্জা ও পরিতাপের কথা!

উমাকান্ত শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

আহারান্তে জননী পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। মধ্যাহ্ন-আহারের পর মাতা-পুত্রে সংসারের নানা বিষয়ে আলোচনা হইত।

উমাকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, একটা কথা বলিব, রাগ করিবে না?"

"তোর উপর আবার রাগ করিব কিরে? কি কথা বাবা?"

"কাজটা কি ভাল হচ্ছে, মা?"

"কি কাজ উমু?"

"এই টাকা লওয়া। আমাদের কিসের অভাব মা?"

"ওঃ, তোর বিয়ের কথা? পণের টাকার কথা বলছিস্?"

উমাকান্ত নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

মাতা বলিলেন, "উনি বলেন, কেন লইব না? আমার ছেলে এত লেখাপড়া শিখেছে, তার কি কোনও মূল্য নাই? আর মেয়ের বাপের যখন অগাধ টাকা, বিষয় সম্পত্তি আছে, একটিমাত্র মেয়ে, তখন টাকা না দেবেনই বা কেন?"

উমাকান্তের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু মা, টাকা লইলে আমি মনে বড়ই ব্যথা পাইব। তুমি বাবাকে বুঝাইয়া বলিও, তাঁর মত অবস্থাপন্ন লোকের টাকা লওয়া সঙ্গত নয়। যদি টাকা লওয়া হয়, আমার কিন্তু মনে সুখ হইবে না।"

জননী সবিস্ময়ে পুত্রের পানে চাহিলেন। এতগুলি কথা উমাকান্ত জন্মে কখনও এক সঙ্গে বলে নাই! পুত্রের প্রকৃতি জননীর অগোচর ছিল না। তিনি মনে মনে সন্তানের ব্যথা বুঝিলেন। প্রকাশ্যে স্নেহভরে বলিলেন, "আচ্ছা, কর্ত্তাকে আমি বুঝাইয়া বলিব।"

৩

কিন্তু কোনও ফল হইল না। রায় মহাশয় গৃহিণীর সকল যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "সে সব আমি বুঝিব। ওঃ! ছেলের মনে ব্যথা লাগ্‌বে! ও সব আমি ঢের দেখেছি। টাকা পেলে নাকি মন খারাপ হয়!"

তিনি গৃহিণীকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, পুত্রের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ বিচারের ভার তাঁহার উপর। গৃহিণীর সে জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি গৃহিণীর কর্ত্তব্য লইয়া থাকুন। বৈষয়িক অথবা সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা, ব্যবস্থা, পুরুষের কর্ত্তব্য; তিনি নিজেই যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহাই করিবেন। স্ত্রী অথবা বালকের নিকট হইতে পরামর্শ কিংবা উপদেশ লইয়া তাঁহার বংশের কেহ কখনও কোনও কাজ করেন নাই।

জননীর নিকট হইতে পুত্র পিতার অভিপ্রায় অবগত হইল। সে আর কোনও কথা বলিল না। নীরবে বহির পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ক্রমে শুভদিন ঘনাইয়া আসিল। পুষ্প-পল্লবে জমীদার-বাটী চিত্রিত আলেখ্যের মত শোভাধারণ করিল। নহবতের বিচিত্র মধুর রাগিণী প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। উৎসবের আয়োজনও যথেষ্ট হইয়াছিল। উমাকান্ত শান্ত বালকের মত সমুদয় অনুষ্ঠানে যোগ দিল।

তাহার সতীর্থগণ বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। নানাবিধ হাস্য-কৌতুক, বিদ্রূপ, পরিহাসে উমাকান্তের নির্জ্জনতা-প্রিয়, শান্তিপিপাসী হৃদয়েও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

বিলাসপুর দুই ক্রোশ দূরে। বেলা থাকিতেই বরযাত্রিগণ মহাসমারোহে বর লইয়া বাহির হইল।

সন্ধ্যার আকাশে নবমীর চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। শোভাযাত্রার আলোক-মালাও প্রজ্বলিত হইল। কন্যার বাটীও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। উমাকান্ত চতুর্দ্দোলে চড়িয়া যাইতেছিল। পল্লী-রমণীদিগের সকৌতূহল দৃষ্টি, আলোকপ্রবাহের চঞ্চল তরঙ্গহিল্লোল, পুষ্পবাহুল্যের ঘন সুগন্ধ ও বিবাহ

বাদ্যধ্বনির মধ্যেও এক একবার উমাকান্তের হৃদয় আকস্মিক যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল কেন? সে ভাবিতেছিল, কি ভয়ানক প্রহসন! এই আনন্দ ও পবিত্র শুভ উৎসবের মধ্যে একটা জঘন্য কেনা-বেচার সম্বন্ধ অটল প্রাচীরের মত ব্যবধা তুলিয়া রহিয়াছে। বন্ধুবর্গের উৎসাহসূচক আনন্দ-ধ্বনি মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণের মধ্যে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মানসিক গ্লানি যেন তাহাতে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

আলোক-প্রদীপ্ত, পুষ্পমাল্য-বিচিত্র অট্টালিকার তোরণ অতিক্রম করিয়া চতুর্দোল বিবাহ-সভায় পঁহুছিল। উমাকান্ত বরাসনে উপবিষ্ট হইল। বন্ধুবর্গ তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। ভাবী অনাগত নবজীবন সম্বন্ধে বন্ধুগণ অস্ফুটস্বরে কত কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। উমাকান্ত অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

বর সম্প্রদান-স্থলে নীত হইল। বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া নানাবিধ বহুমূল্য বরসজ্জা স্তরে স্তরে সজ্জিত। বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উমাকান্তের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। সে দেখিল, একখানি বৃহৎ রৌপ্যপাত্রে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা। সহস্র চক্ষু মেলিয়া তাহারা যেন সকৌতুকে বিদ্রূপভরে উমাকান্তের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। উমাকান্তের আত্মসম্মানবুদ্ধি, নিষ্কলঙ্ক বংশগরিমা ও মনুষ্যত্ব সে দৃশ্যে যেন আহত ও ব্যথিত হইল। মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়-মধ্যে তুমুল ঝটিকা বহিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন সকলে তাহার এই দৈন্য-দর্শনে নীরবে হাস্য করিতেছে। উমাকান্ত মুখ ফিরাইয়া লইল।

কন্যাকর্ত্তা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "বেহাই, এই লউন পণের টাকা। গণিয়া দেখুন। আর এই লউন মুকুন্দপুর তালুকের রেজিষ্টারী দানপত্র।"

রায় মহাশয় বিরল দন্ত-পংক্তি বিকাশ করিয়া সাগ্রহে স্বর্ণমুদ্রাগুলি গণিতে লাগিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও উমাকান্তের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। উৎসবের দীপমালা যেন তাহার চোখে নিবিয়া আসিতেছিল।

যন্ত্র-চালিতবৎ সে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া গেল।

৪

রমেশ বলিল, "বউ কেমন? পছন্দ হইয়াছে?"

বিমান পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "না হবে কেন? বান্ধবীর যেমন রঙ্গ, তেমনই গড়ন। এতকাল পরে বন্ধুবরের মানসী প্রতিমা সত্যই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।"

উমাকান্ত নীরবে বন্ধুবর্গের সমালোচনা শুনিতেছিল।

শরৎ বলিল, "উমাকান্ত ঠিক্ মহাদেবের মত,—অবিচল, অকম্পিত। নূতন জীবন, নূতন উদ্যম, কিন্তু দেখ, উমাকান্তের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।"

অপরাহ্ণ সমাগত। কনিষ্ঠ আসিয়া বলিল, "বেলা পড়িয়া আসিল, দুই ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। শীঘ্র যাত্রা না করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছান যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বধূ-পরিচয় হওয়া চাই। আজ কাল-রাত্রি।"

বন্ধুবর্গ বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা বটে। এস উমাকান্ত, তোমায় সাজাইয়া দিই!"

বাড়ীর মধ্যে পূর্ব্বেই সংবাদ গিয়াছিল। বর-কন্যা-বিদায়ের আয়োজন চলিতেছিল।

বিমান বলিল, "আজ আমি উমাকান্তকে সাজাইব। ওঠ ভাই।"

উমাকান্ত কোনও উত্তর করিল না। সে বরণাঙ্গুরীয়টি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল।

"দাদা! আর দেরী করিলে চলিবে না।"

উমাকান্ত তখনও নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

বিমান উমাকান্তের হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল, "উঠ।"

গম্ভীরভাবে সে বলিল, "কোথায় যাইব?"

রমেশ বিদ্রূপভরে বলিল, "স্বপ্ন দেখিতেছ না কি? বাড়ী যেতে হবে না?"

"বাড়ী?—সেখানে যাইবার আমার কোনও অধিকার নাই ত!"

বন্ধুবর্গ উমাকান্তের দৃঢ়গম্ভীর মুখশ্রী ও অভিনব ব্যবহারে চমৎকৃত হইল।

বিনোদ বলিল, "তোমার আজ কি হয়েছে?"

উমাকান্ত পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কিছুই হয় নাই, আমি বাড়ী যাইতে পারিব না, সে অধিকারে আমি বঞ্চিত।"

বরযাত্রিগণ বিস্মিত হইল। উমাকান্তের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল না

কি? কনিষ্ঠ বলিল, "দাদা উঠুন; আর দেরী করিলে আজ রাত্রিতে ভিন্ন বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

পাংশুবর্ণমুখে উমাকান্ত ধীরে ধীরে বলিল, "বাবাকে বলিও, কল্য রাত্রি হইতে আমার বাড়ী ফিরিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। তিনি আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার আমার নাই।"

বরযাত্রিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই প্রমাদ গণিল। চারি দিকে একটা বড় গোল উঠিল। অন্তঃপুরেও কথাটা প্রচারিত হইল। কন্যাকর্ত্তা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। ঘোষ মহাশয় উমাকান্তকে স্নেহ-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবাজী, কাজটা ভাল হইতেছে না। বেহাই এ সব কথা শুনিয়া আমাদের উপরেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন। তুমি যাও বাবা। ছিঃ, বাপের উপর কি অভিমান করিতে আছে?"

উমাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "আপনি যদি এখানে আশ্রয় না দেন, আমি অন্যত্র যাইতেছি। আপনারা আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, এখন যদি রাখিতে আপত্তি করেন, আমি এখনই চলিয়া যাইব; কিন্তু পিতৃগৃহে আর ফিরিয়া যাইবার অধিকার আমার নাই।"

শ্বশুর মহাশয় গতিক ভাল নয় দেখিয়া আর বাক্যব্যয় করিলেন না।

বন্ধুবর্গ অনেক বুঝাইল, বিস্তর অনুনয় করিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাদার চরণে ধরিয়া বহু সাধ্যসাধনা করিল। কিন্তু উমাকান্তের সংকল্প টলিল না। সে অবিচলিতভাবে, রক্তশূন্যমুখে বসিয়া রহিল।

৫

রায় মহাশয় পুত্রের ব্যবহারে স্তম্ভিত, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। পুনঃ-পুনঃ মাতুল, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু উমাকান্তকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মিতভাষী, নিরীহ উমাকান্তের প্রতিজ্ঞা টলিল না। সে মাতুল মহাশয়কে বলিল, "কেন আপনারা বৃথা চেষ্টা করিতেছেন? বাবা আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, এখন আমি অন্যের সম্পত্তি। বিক্রীত পদার্থে কি আর পূর্ব্বের স্বত্ব বজায় থাকে?"

পরিণয়-উৎসব উপলক্ষে যাত্রার দল বায়না পাইয়াছিল। তাহারা আসরে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নিমন্ত্রিতগণ সন্ধ্যার পরেই উপস্থিত হইবেন। ভোজের অপর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এখন

কুলাঙ্গার পুত্রের ব্যবহারে সমস্তই পণ্ড হয়! রায় মহাশয়ের দেশযোড়া নামে এ কি দুরপনেয় কলঙ্ক! তাঁহার উন্নত মস্তক আজ দেশের দশের সম্মুখে লজ্জায় অপমানে নত হইতেছে! বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। হাটে মাঠে, ঘাটে বাটে, গৃহে বাহিরে, সর্ব্বত্র এই একই বিষয়ের জল্পনা। কেহ হাসিতেছে, কেহ বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ টিট্‌কারী দিতেছে। গৃহিণী কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের জুড়াইবার আর স্থান নাই। উৎসব-মুখরিত, আনন্দ-ভবন সহসা ঘোর শোকে ম্রিয়মাণ। কাহারও মুখে হাসি নাই। কি লজ্জা, কি পরিতাপ, কি যন্ত্রণা!

লোকের পর লোক ফিরিয়া আসিতে লাগিল। উমাকান্ত আসিবে না।

বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অপরাহ্ন ঘনাইয়া আসিতেছে! কোনও ক্রমেই কি পুত্রকে ফিরাইয়া আনা যায় না? কনিষ্ঠ পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "সে হতভাগা কি চায়? যদি বিশ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিলে সে ফিরিয়া আসে, তাহাই কর্। এই নে টাকার তোড়া, আর এই নে দানপত্র। যা, তাকে যে কোনও রকমে ফিরাইয়া আন্। আর অপমান সহ্য করিতে পারি না।"

বৃদ্ধ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

* * * * * *

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উমাকান্ত সস্ত্রীক গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার উৎফুল্ল মুখে অপূর্ব্ব প্রসন্নতা! নহবৎ দ্বিগুণ উৎসাহে গৌরী রাগিণী আলাপ করিতেছিল। পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া সে নতমস্তকে দাঁড়াইল। পিতা বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে? পূর্ব্বে বলিলেই পারিতে, তাহা হইলে আমায় এমন লাঞ্ছিত হইতে হইত না।"

"ক্ষমা করুন, বাবা, সন্তানের অপরাধ লইবেন না। আজ আপনার মহত্ত্বে ও অনুগ্রহে আমাদের নির্ম্মল বংশের শুভ্র যশোরাশি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। আপনার দয়ায় আমি মহাপাতক হইতে রক্ষা পাইয়াছি। বাবা, সন্তানের অভিমানে আজ পিতার মান সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে। আপনি এ অনুগ্রহ না করিলে আমি চিরদিন যন্ত্রণায় পুড়িয়া মরিতাম। আমাকে ক্ষমা করুন।"

পুত্রের আননে আনন্দ-কিরণ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মাতা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন,

ঘন ঘন তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। চারি দিকে মহোৎসাহে শঙ্খধ্বনি হইল। পুরকামিনীরা হুলুধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

নহবতের বেহাগ রাগিণীতে তখন আগমনীর করুণ সুর বাজিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দুইটি গান।

ধন্য।

ঝিঁঝিট।

সকলে দিয়াছে মোরে দূরেতে তাড়ায়ে ;
তুমি লইয়াছ কোলে দু' হাত বাড়ায়ে।
তোমারে লইতে দেখি' সকলেই এসে
আদর করিছে সুখে অতি ভালবেসে ;
যখন করিত সবে অতি তুচ্ছ ঘৃণা,
তখন আসিয়া তুমি শুনাইলে বীণা।
ঝঙ্কারিয়া সুমধুর ; সে বীণার স্বরে
শুনি যবে মুগ্ধ চিত, তবে হাত ধরে'
লয়ে গেলে তব গৃহে, বসাইলে পাশে ;
পতিতেরে কৃপাবশে করেছ পাবন ;
প্রেমের বন্যায় হৃদি হইল প্লাবন ;
জগতে আছিনু আমি মলিন জঘন্য—
আমারে করিলে তুমি চির ধন্য ধন্য।

অভিসারী।

ঝিঁঝিট।

মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী !
মরম-নিকুঞ্জ-মাঝে রাজে পরম বিহারী ;
সেই সুধা মাঝে নিত্য
বিভোর রয়েছে চিত্ত,
আঁধার যমুনা-পারে দেখি প্রেম-বংশীধারী।
সে কি মূরতি সুন্দর !
অমূর্ত্ত যে পরাৎপর—
দেখি তাঁরে সে অবধি হইয়াছি অভিসারী।
মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী !

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

জাপানের রাজনীতিক উন্মেষ।

১৮৬৭-১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীযুত জর্জ্জ এট্ সুজিরো ওয়েহারা কর্ত্তৃক লিখিত। এই পুস্তকখানির প্রচারে বিলাতের বিদ্বৎ-সমাজে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। জাপান-বিষয়ক এমন পুস্তক ইংরেজী ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে জাপানের আদিম সামাজিক ইতিহাসের কথা আলোচিত হইয়াছে। যে সমাজ-বন্ধনকে অবলম্বন করিয়া জাপান আড়াই হাজার বৎসর কাল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারিয়াছিল, তাহারই বিশ্লেষণ প্রথম ভাগে লিখিত আছে। কি কারণে এই আদিম সমাজ-শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া জাপান নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা দ্বিতীয় ভাগে আছে। জাপানের নবজীবনের উদ্বোধন গত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান মিকাডোর সিংহাসনারোহণের কাল হইতে জাপান নূতন ভাবে প্রমত্ত হইয়াছে, জাপান ইউরোপ বিজয় করিবার যোগ্যতা ধারণ করিবার অধিকারী হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এক জন জাপানী খৃষ্টান, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তাঁহার লিখিত এই পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, বিলাতের অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের বুধগণ ইহাকে পরীর উপকথার ন্যায় মনোরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বক্‌ল্, লেকী, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বিলাতের সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সমাজদেহের উন্মেষ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সর্ব্বজনমান্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, জাপান জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে সেই সকল স্বতঃসিদ্ধের যেন কতকটা অপত্নব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইউরোপের নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজের অঙ্গে বিসর্পিত হইয়া 'সোসিয়ালিজম' বা সমাজ-সমন্বয়ের উন্মেষ ঘটাইতেছে। মানুষ স্বীয় প্রভাবে নিজে বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে বড় করিয়াছে। তাই ইউরোপে রাজাই জাতির ও সমাজের প্রতিভূ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেন; রাজা স্বেচ্ছাময় ও শক্তিময় ছিলেন। এখন সেই রাজশক্তি প্রজাসাধারণের

মধ্যে বিস্তারিত হইয়া প্রজাতন্ত্রের প্রভাবকে পুষ্ট করিতেছে। ইউরোপে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের বা 'ইণ্ডিভিড়ুয়ালিজমে'র শেষ দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। জর্ম্মণ দেশে এই ব্যক্তিগত প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া জর্ম্মণ জাতি ইউরোপের শিরোমণি হইয়া আছে।

কিন্তু এখন ইউরোপ প্রজাশক্তির উন্মেষ ও বিস্তার কার্য্যে বিব্রত হইয়াছে। তাই 'সোসিয়ালিজম্' 'কমিউনিজম্' প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে। পরন্তু শক্তি কেন্দ্রীকৃত না হইলে তাহার প্রভাব অনুভব করা যায় না। বিসর্পণে শক্তির অপচয় ঘটে। এই হেতু ইউরোপের বহু সমাজ-তত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, সোসিয়ালিজমের প্রভাব বাড়িলে ইউরোপের জগজ্জিগীষার সামর্থ্যও কমিয়া যাইবে; হয় ত বা তাহা একেবারেই থাকিবে না। জাপানের ইতিহাস-কথা পাঠ করিলে ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তগুলিই জানিতে পারা যায়। গত আড়াই হাজার বৎসর জাপানে 'বোরোক্রাটিক সোসিয়ালিজম্' বা রাজশক্তি-সমন্বিত সমাজ-সামঞ্জস্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজা বা মিকাডো দেবতার স্বরূপ, জগৎপাতার প্রতিনিধির স্বরূপ; তিনি সমাজের শিরোমণি, এবং সর্ব্বজনপূজ্য। এই মিকাডোই জাপ-সমাজের এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ, বা ব্যষ্টি। অবশিষ্ট সকলে সমষ্টির হিসাবে গণ্য;—সমাজের অঙ্গবিশেষ বলিয়া নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া স্ব-কর্ত্তব্য পালন করে বলিয়া মান্য। মনুষ্যদেহের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন দেহ নহে, অথচ দেহের অপরিহার্য্য অংশবিশেষ, তেমনই জাপ-সমাজে অন্য ব্যক্তির বা ব্যষ্টির স্থান নাই; সকলেই সমাজ-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র, এবং সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যাহা কার্য্য, তাহাই তাহাদের করণীয়, অন্য কিছু নহে। আমার যেমন নরমুণ্ডই নরদেহের বিশিষ্টতার জ্ঞাপক, তেমনই মিকাডো সমাজদেহের মুণ্ডস্বরূপ হইয়া জাপানী সমাজদেহকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছেন।

এই সমাজ-সমন্বয়ের প্রথা জাপানে আড়াই হাজার বৎসর কাল প্রচলিত ছিল। এতদিন জাপানে আইন আদালত তেমন ছিল না, নালিশ ফরিয়াদ ছিল না। কেহ কাহারও নামে নালিশ করিলে তাহাকে একঘরিয়া হইতে হইত। লোকে সানন্দে রাজকর দিত। জাপানে রাজশক্তির বিকট বিকাশ কখনও হয় নাই। সমাজদেহ পূর্ণ ও পুষ্ট ছিল বলিয়াই, সমাজে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অবসর ছিল না। সহসা গত ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে শোগন কৈকা মনে করিলেন যে, তিনি ঠিকমত রাষ্ট্রশাসন করিতে পারিতেছেন না; তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই সন্ন্যাসের পর বর্ত্তমান মিকাডো সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারই পাঁচ সাত বৎসর পরে জাপানের অভিজাতবর্গ তাঁহাদের অধিকৃত ভূমি সম্পত্তি ও আড়াই হাজার বৎসরের সঞ্চিত প্রত্যেক পরিবারের ধনৈশ্বর্য্য—যথাসর্ব্বস্ব, জাতির মঙ্গলকামী হইয়া, ত্যাগ করিলেন। কেবল এইটুকুই নহে, তাঁহাদের সমাজগত ও বংশগত মান মর্য্যাদাও

তাঁহারা ত্যাগ করিলেন। মিকাডো বলিলেন যে, এমন সন্ন্যাসের প্রতিদান করিতে হইবে, জাপানীদিগকে ইউরোপীয়দিগের তুল্য ধনী ও তেজস্বী হইতে হইবে। ইউরোপের নিকট তাহার সকল বিদ্যা ও চাতুরী আয়ত্ত করিয়া, তাহাদের বিদ্যার সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে। জাপানের অভিজাতবর্গের দত্ত এই ধনসম্পত্তির সাহায্যে জাপ জাতিকে ইউরোপীয় বিদ্যায় অপরাজেয় পণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র জাপান মিকাডোর কথায় তথাস্তু বলিল।

গত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দলে দলে জাপ যুবকগণ ইউরোপে যাইয়া ইউরোপীয় বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিল। টোগো, আইটো, ইয়ামাগাটো, কামিমিউরা, নোজু প্রভৃতি জাপ বীরগণ এই সময়ে ইউরোপে যাইয়া বিদ্যার্থীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই জাপান রুস-বিজয়ী হইয়াছে। ইহাই জাপানের আত্মকাহিনী। ইহাই ওয়েহারার গীত গাথা। বিলাতী বুধগণ এই পুস্তকের সমালোচনায় বলিতেছেন যে, জাপানীগণ যে স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছে, জাতি-সমবায়ে এমন ত্যাগের পরিচয় ইদানীং পৃথিবীর কোনও জাতিই দিতে পারে নাই। তাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?' যে মিকাডো ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জাপ জাতিকে পরিচালন করিতেছেন, তিনি জীবিত থাকিতে 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'র ভাবনা ইউরোপকে ভাবিতেই হইবে। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে অমন আর একটি মিকাডো জাপান পাইবে কি? যদি না পায়, তবে কি ফরাসী জাতির মত জাপ জাতিরও অবনতি ঘটিবে? ওয়েহারা উত্তরে বলিয়াছেন যে, যে সর্ব্বত্যাগের প্রভাবে জাপান রুস-বিজয়ী ও এসিয়ার প্রধান জাতি হইয়াছে, সেই সর্ব্বত্যাগ ও সাধনার একনিষ্ঠাই জাপ জাতির বিশিষ্টতা। উহাই জাপ জাতির ধর্ম্ম। উহা সহজে যাইবার নহে।

মহারণ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব।

শ্রীযুত হ্যারল্ড ওয়াট 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রে লিখিয়াছেন,—মহারণ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঈশ্বরাভীষ্টশুভফলপ্রদ। যে জাতি যখন শান্তিপিপাসু, বিলাসী ও ভোগায় তন ও দেহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সেই জাতির অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছে। গ্রীক, রোমক, স্পানিয়ার্ড, সারাসেন, পাঠান, মোগল, ফরাসী—সকল জাতিই বিলাসী, অর্থলোলুপ হইয়াই অধঃপাতে গিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপ শান্তির জন্য বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছে। হেগ কন্‌ফারেন্স, জাতীয় মধ্যস্থতা প্রভৃতি নানা উপায়ে সমরের হাত এড়াইবার জন্য ইউরোপের মহাজাতি সকল চেষ্টা করিতেছে। অতিবিলাস ও স্বার্থপরতার পরিণাম অবিশ্বাস ও পরশ্রীকাতরতা; তাই ইউরোপের মহাজনগণ সামরিক উদ্‌যোগের ত্রুটী করিতেছেন না। ইউরোপ যেন একটা বিরাট

সমরোদ্যোগের স্কন্ধাবারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পাছে কাঁহারও কাছে সমরে হারিলে জাতির বিলাস-সুখ নষ্ট হয়, ধনৈশ্বর্য্য খর্ব্ব হয়, ব্যবসায় বাণিজ্যের হ্রাস হয়, সেই ভয়ে কেহ কাহারও সঙ্গে সমর বাধাইতে পারিতেছে না।

পক্ষান্তরে, জাপান "বলং বলং বাহুবলম্" এই মহাবাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া বাহুবলের উন্নতি ঘটাইতেছে। জাপান এখনও মরিতে ভয় পায় না; মরিতে জানে ও পারে; তাই অন্যকে মারিতেও পারিতেছে। রুস-বিজয়ী হইয়া জাপান চিরস্থবির চীনের কর্ণে সঞ্জীবন মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। এসিয়ার অতিকায় মহাপুরুষ চীন, সেই মন্ত্র-প্রভাবে ধীরে ধীরে সজীব ও সজাগ্র হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে, জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ড জর্ম্মণীর আক্রমণ-সম্ভাবনায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারি ধারে তাঁহার অক্ষয় রণতরীর বহর রক্ষা করিতেছেন। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে ইংলণ্ডের রণতরীর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে মার্কিন জাপানের অতিবৃদ্ধির প্রতি যেন দৃষ্টিপাত করিয়াও দৃষ্টি স্থির রাখিতেছে না। মার্কিন অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত, বিলাস-উপভোগেই প্রমত্ত। আর জাপান যেন চুপি চুপি, অথচ জোর করিয়া, মার্কিন দেশের প্রশান্তসাগরের উপকূলে ও মেক্সিকো দেশে সহস্র সহস্র জাপবীরের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন। ইহারা প্রত্যেকেই যোদ্ধা—মহাবীর; মরিতে তিলমাত্র ভয় করে না, জীবনটাকে খেলার সামিল করিতে পারে। আর মার্কিণগণ বিলাসী, যুদ্ধবিদ্যায় অপটু। ইংলণ্ডেও এবংবিধ বিলাসের আধিক্য ঘটিয়াছে। ওয়াট বলেন,—ইহাই পীতাতঙ্ক; ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভীষণ। ইহার প্রভাবে কালে ইউরোপকে বিধ্বস্ত হইতেই হইবে। জাপান ইচ্ছা করিয়াছে যে, এসিয়ার জলপথে সে অদ্বিতীয় হইবে।—অনেকটা হইয়াছেও। এই সঙ্গে চীন যদি সঙ্কল্প করে যে, আমি এসিয়ার স্থলপথে অপরাজেয় সম্রাট হইব, তাহা হইলে ইউরোপকে নিশ্চিহ্ন হইয়া এসিয়া হইতে উঠিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, ইউরোপও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিবে না। রোমক সাম্রাজ্যের অবঃপতনের সময়ে আটিলা যেমন হূণদিগকে লইয়া ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিল, আবার তেমনই আর এক আটিলা পীত জাতি সকলকে লইয়া ইউরোপে অভিযান করিবেই। যে জাতি হেলায় দেহত্যাগ করিতে পারে, সে জাতি জগজ্জয়ী হইবেই।

ওয়াটের এই প্রবন্ধ লইয়া বিলাতে খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ফর্টেস্কু সর্ব্বাগ্রে পীতাতঙ্কের কথা তোলেন। তাহার পর হইতে ইংলণ্ডে, জর্ম্মনীতে ও রুসিয়ায় এই পীতাতঙ্কের আলোচনা চলিতেছে। রুস ত এই আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া জাপানের সহিত যুদ্ধই বাধাইয়া দিল; তাহার ফলে চূর্ণ হইয়া গেল। এখন এই পীতাতঙ্ক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। জাপানে

ওই প্রজাবৃদ্ধি ঘটিতেছে যে, মার্কিন উপকূলে লক্ষ লক্ষ জাপ যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, ফিলিপাইন দ্বীপেও জাপ যাইয়া বাস করিতেছে। চীনেও প্রজাবৃদ্ধির অনুপাত কম নহে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে প্রজাবৃদ্ধির হ্রাস হইতেছে! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ওয়াট বলেন যে, "মরিতেছ ত—রোগে শোকে দারিদ্র্যে কোটী কোটী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, তামসা মরিতেছে ত। লড়াই করিয়া মর না! সর্ব্বদা যুযুৎসু হইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটিবে, পুরুষকার বৃদ্ধি পাইবে, জাতির মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হইবে।" এই প্রশ্নের উত্তর ইউরোপ এখনও দেয় নাই। ওয়াটের আশা আছে যে, শীঘ্রই ইউরোপ ও এসিয়া ব্যাপিয়া মহাসমরানল জ্বলিয়া উঠিবে, এবং সেই কুরুক্ষেত্রে ইউরোপ এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। ইউরোপীয় সমাজে একটা খণ্ডপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

'পার্টী সিষ্টেম্'।

নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বেনক, শ্রীযুক্ত চেষ্টারটন ও শ্রীযুক্ত স্লুটে প্রণীত। বিলাতে স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল, এই দুই রাজনীতিক সম্প্রদায় লইয়া শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহারই অনেক গুপ্ত কথা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, 'বিলাতী দলাদলির ব্যাপার আগাগোড়াই জুয়াচুরি-পূর্ণ'। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতৃবর্গই সকল ক্ষমতা ও অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন; যেমন অভিরুচি, তেমনই ব্যবস্থা করেন। পার্লামেণ্টের অন্য অপরিচিত সদস্যগণের কোনও অধিকারই নাই। তাঁহারা কেবল দল-বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া নিজদলের পক্ষে আবশ্যকমত ভোট দিয়া থাকেন। ইহার উপর উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ, যখন যাঁহারা প্রধান থাকেন, স্বীয় আত্মীয় স্বজনগণকে বড় বড় পদে বসাইয়া কুপোষ্য প্রতিপালন করেন। লর্ড সল্‌সবরী যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি কুপোষ্য-পালন-পদ্ধতি মন্ত্রিসমাজে প্রচলিত করিয়া যান। তাই তাঁহার মন্ত্রিসমাজকে লোকে 'হোটেল সিসিল' বলিত। তদবধি যিনিই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন, তিনিই এই প্রথা অবলম্বন করিতেছেন। পার্লামেণ্টে সদস্যনির্ব্বাচনের জন্য যাহারা ভোট দিবার অধিকারী, তাহাদের কোনও ক্ষমতাই নাই। তাহারা অন্ধের ন্যায় ভোট দিয়া থাকে। বড় বড় ঘরের মহিলাগণ ভোট সংগ্রহ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাচন ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অর্থের জোরেই সকল কাজ সফল হয়।

এই পুস্তকে বর্ত্তমান বিলাতী সমাজের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয়, সুসভ্য বিলাতী সমাজে বুঝি বা ধর্ম্ম নাই, সত্যের আদর নাই, পরকালের ভাবনা নাই। আছে কেবল অর্থের আরাধনা, আত্মম্ভরিতার আহরণ!

গুঞ্জন।

বিলাতের রসালোচকগণ এই পুস্তক-গত ঘটনা সকলকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গ্রন্থকারত্রয়কে অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট করিলেও, তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন নাই। ফলে এই পুস্তকখানি লইয়া বিলাতী সমাজে খুব আন্দোলন চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন যে, মলার্দলির পলিটিকা উঠাইয়া দিতে হইবে; কেহ বলিতেছেন, এই হেতু মান্যবর ব্যাল্‌ফোর 'কেলারেনডম্' বা লোকবুদ্ধির বিচার-পদ্ধতিকে প্রশস্ততর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কেহ বলিতেছেন, রাজনীতিকগণের মধ্যে এমন দুষ্ট ভাব প্রবল থাকিলে এক দিন না এক দিন ইংলণ্ডকে বিপদে পড়িতেই হইবে; লণ্ডনের বিশপ, ক্যাণ্টারবরীর আর্কবিশপ প্রভৃতি বড় বড় পাদরীগণ জাতির নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া নানা উপদেশ দিতেছেন। ফলে, শ্রীযুত বেনক প্রভৃতি এই পুস্তক প্রচার করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, বিলাতী সমাজ-সংস্কারের পথটা একটু প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতের এখনকার সাহিত্য সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম লইয়া যেন কতকটা বিব্রত হইয়া আছে; তাই সাহিত্যে সুকুমার ভাবের বিকাশ কমিয়া গিয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা।—প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা। ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে; সম্পাদক আত্মপ্রকাশ করেন নাই।—পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। সেকালের 'বান্ধব' ও 'রামধনু'র স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবে। 'বান্ধবে'র পুনরুজ্জীবনচেষ্টা বিফল হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য অনুযোগ করিয়া কোনও ফল নাই। জগতে শ্মশানের পার্শ্বেই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'প্রতিভা', 'সম্মিলন', 'ভারত-মহিলা' ও 'সোপান' প্রভৃতি 'বান্ধবে'র ভস্মপূর্ণ শ্মশানে নব মাতৃমন্দিরের ভিত্তি-গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের এই শুভ সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে। এই মন্দিরে মার পূজা করিয়া বঙ্গবাসী কৃতার্থ হইতে পারিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতার দুই এক জন মদদৃপ্ত কূপমণ্ডূক সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রকাশিত দুই একখানি মাসিকপত্রের সমালোচনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাব পরিচয় দিয়াছেন। নব-প্রকাশিত মাসিকে একেবারে ঘৃত-বস্ত্রাবরণের আশা করা যায় না। অন্যান্যভদ্বেষ উন্নতির প্রতিবন্ধী। বিদ্বেষের ফল,—বিচ্ছেদ ও উচ্ছেদ। কিন্তু শনিকে বুঝাইয়া বলিলেও তিনি গণেশের কম-দেহে দৃষ্টি দিতে ছাড়িতেন না। সেকালে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘোর কলিযুগে সৌভাগ্যক্রমে সে সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।—স্থান-মাহাত্ম্যের মোহে দূরবর্ত্তী সাধকগণের সাধনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া যদি আমরা আত্মস্ত-

রিতার পরিচয় দি, তাহা হইলে, সেই শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতার বীজ হইতে কালে বিষবৃক্ষের উদ্ভব হইতে পারে।—'হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ'—সুতরাং আমরা সর্ব্বদা মন্তব্যে প্রীতিপ্রদ হইতে না পারিলেও, সহযোগীদিগের পুণ্যব্রতের মহত্ত্বকে কখনও লঘু করিবার চেষ্টা করিব না। আমরা সাদরে নবীন সহযোগীদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। —'প্রতিভা'র প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুত যশোদালাল বণিকের 'প্রতিভা' উল্লেখ-যোগ্য। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে। তাঁহার রচনা রহস্য-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন নহে। 'করুণার অশ্রু তব পদ্মনেত্রে ঝরে' দূরান্বয় দোষে দুষ্ট। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'উদ্বোধনে' কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-তীর্থ ও শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার 'রাজতরঙ্গিণী'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'মঙ্গলাচরণে'র অনুবাদ তত বিশদ হয় নাই। সমস্ত মিলাইয়া দেখিবার অবকাশ নাই। বর্ণাশুদ্ধির অত্যন্ত বাহুল্য। সংস্কৃতের অনুবাদে কালীপ্রসন্নের দেশে 'বক্ষদেশ' শোভা পায় না। আশা করি, অনুবাদকগণ আরও অবহিত হইবেন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'কন্যার প্রতি' ছন্দে গ্রথিত বটে, কিন্তু কবিতা নহে। 'সবি প্রবঞ্চনাকারিণী', 'হৃদয়ের মাঝে আসে না', 'অলীকত্ব-জ্ঞান থাকে না' প্রভৃতি নিতান্ত গদ্য। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাহিত্য সমাজ' প্রবন্ধে ভাষাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া কত স্ফীত করা যায়, তাহার নমুনা দিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন,—'ছায়া-নিবিড় তরুতলে আর পান্থ আসিয়া পথ পায় না।' তরুতলে ছায়া ও বিশ্রামের আশা করা যায়, যোগেন্দ্র বাবু 'ছায়া-নিবিড় তরুতলে' পথ খুঁজিতে গেলেন কেন? আবার,—'কেবলি হা হুতাশের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাহি না।' এরূপ বাঙ্গলা মিসি-বাবা ও আহেলে-বিলাতী মিশনরীদের মুখে মিষ্ট লাগে। বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এইরূপ ইঙ্গ-ভাষার আবর্জ্জনা দূর না করিলে, অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারিবে না। 'আত্মার প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ' অত্যন্ত উদ্ভট; ইহা বিদেশী বিজ্ঞাপনের 'গাঢ় দুগ্ধকে ব্যবহারে আনো'র গৌরবও খর্ব্ব করিয়াছে। লেখক বাক্যের প্রথমে 'অতীত ইতিহাসের পুণ্য দূর করিয়া দিয়া বর্ত্তমানের সহিত যুদ্ধ করিতে' বলিয়াছেন; আবার পর মুহূর্ত্তেই 'সেই আদর্শেই হৃদয়কে গড়িয়া তুলিয়া সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ' দিয়াছেন। অনেক স্থলেই লেখকের 'লজিক' এইরূপ! এখন 'বল মা তারা! দাঁড়াই কোথা?' আমরা শঙ্খের মন্দ্র শুনিয়াছি, কিন্তু যোগেন বাবু পাঠককে 'শঙ্খের বজ্র-নির্ঘোষ' শুনাইয়াছেন! ইহা অত্যুক্তি ও কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা। কণ্ঠ চিরকাল গাহিয়া আসিতেছে. কিন্তু যোগেন বাবুর 'কণ্ঠ লীলায় লীলায় নাচিয়া উঠিয়াছিল!' যোগেন বাবু ঢাকায় স্বতন্ত্র সাহিত্য সমাজের সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতায় 'সাহিত্য-সভা'

ও 'সাহিত্য-পরিষৎ' আছে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহা বিরোধের ফল। আশা করা যায়, কালে এই বিচ্ছেদের চিহ্নকে আমরা কল্যাণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিতে পারিব। কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য নহে। ঢাকার 'সাহিত্য সমাজে'র এই নবোদ্গত অঙ্কুর বিশাল বনস্পতির রূপে পরিণত ও ফলে ফুলে উপচিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু এই উপচয়-লাভের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার ভাসুর-ভাদ্রবধূ-সম্পর্ক যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রঙ্গপুরের শাখা-পরিষৎ মূল পরিষদকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, মূল পরিষদের অন্তর্গত শাখা-সভাও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে, ঢাকায় স্বতন্ত্র সাহিত্য-সমাজের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। স্বর্গের বিনিময়েও আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা এক ও অদ্বিতীয়, বাঙ্গালী এক ও অদ্বিতীয়; অখণ্ড বঙ্গে এক ভাষা, এক জাতি। 'ভেদ নাই, ভেদ নাই।' এই জন্য বলি,—বাঙ্গালায় এক মূল পরিষদ থাকুক, এবং সমগ্র বঙ্গে তাহার শাখা প্রসৃত ও বিস্তৃত হউক। ইহাতে কোনও প্রদেশের সম্মান-বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। যোগেন বাবুর ভাষায় 'সলিল-সিঞ্চন' দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—'সাহিত্যের নিমিত্ত রাজপুরুষগণের কৃপাও আমরা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিব। * * * "সাহিত্য-পরিষদ"ও এইরূপ ভাবেই সর্ব্বাগ্রে আপনার পথ করিয়া লইয়া পরিশেষে নিজ-পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।' মিথ্যা কথা। 'সাহিত্য-পরিষৎ' 'রাজপুরুষগণের কৃপা'য় সৃষ্ট, বর্দ্ধিত, বা পুষ্ট হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান,—দেশের শক্তিই এত দিন তাহাকে হৃদয়ের অমৃতে পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। যোগেন বাবু 'সাহিত্য-পরিষদে'র সম্বন্ধে এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সমাজকে অপথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যোগেন বাবু উপসংহারে অভিযোগ করিয়াছেন,—'নবীন লেখকগণের রচনা কলিকাতার বিখ্যাত পত্র-সম্পাদকগণ স্বভাবতঃই প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন।' যোগেন বাবু দুই এক বৎসর পূর্ব্বেও 'নবীন' ছিলেন, এখন 'প্রবীণ' হইয়া থাকিবেন। যখন নবীন ছিলেন, তখন তাঁহার রচনা কলিকাতার একাধিক মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। যোগেন বাবু কলিকাতার মাসিক ঘাঁটিলেই দেখিতেই পাইবেন, নবীন লেখকগণের সাহায্যেই বহু মাসিক চলিতেছে। 'তবে নবীন' বলিয়াই 'সাত খুন মাপ' করা যায় না।—যোগেন বাবুর ন্যায় প্রবীণ হইয়াও 'উন্মত্তে'র পরিবর্ত্তে যাঁহারা 'উন্মাদ' লেখেন, তাঁহাদের রচনা সহসা প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের যোগেন বাবুরা বুঝিতে পারেন না যে, লিখিলেই লেখক হওয়া যায় না; সে জন্যও সাধনা করিতে হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' দুর্ল্লভ। 'যল্লিখিতং তচ্ছাপিতং' করিলে কেহ

যে উঁচাড় থাকে বটে, কিন্তু তাহা কোনও কাজে লাগে না। দাঁত দেখিয়া ঘোড়া কিনিতে হয় বটে, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে দন্তবিচার অনাবশ্যক। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'পদার্থ-বিদ্যা', শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেপ্‌পুকু', শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বাগছির 'পুষ্করণীতে মৎস্যের চাষ' প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'ঢাকা কলেজের সন্নিহিত প্রাচীন স্থানসমূহ' প্রবন্ধটি বিষয়-গুণে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু অতিবিস্তৃতি দোষে দুষ্ট। ভট্টশালীর ভাষায় 'ভারতকে বিক্রোড়িত', 'অতলগর্ভে শ্রান্ত-শয়ান', 'ঊর্দ্ধনাশিক রাজস্বসচিব', 'মৃত্তিকার আকাশ', 'আত্ম-সম্বরণ' 'সম্মুখে' প্রভৃতি ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার ও অপপ্রয়োগের সংখ্যা করা যায় না। ভট্টশালী লিখিয়াছেন, 'এই পরিবর্ত্তন স্বরশাস্ত্রসঙ্গত।' স্বরশাস্ত্র কি, তাহা জানিলে ভট্টশালী 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে' দিতেন না! 'ভালবাসার ফল'—মন্দ নহে।

স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না।

চিত্র-শালা।

ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিত্রকর হার্ব্বার্ট ড্রেপার 'দিবস ও শুকতারা' নামক চিত্রে কবির—

> To faint in the light of the sun she loves,
> To faint in his light and to die"

এই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। নিপুণ চিত্রকর উদয়াচল-শিখরে দিবস ও শুকতারার মিলনে প্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের ছবি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। চির-বাঞ্ছিত দিবসের সহিত মিলনের শুভ-মুহূর্ত্তে শুক-তারার সকল কামনা ও সকল বাসনা, এমন কি, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতেছে। প্রেমের আলোকে মধুর মৃত্যুকে বরণ করিবার সাধ প্রেমিকার হৃদয়ে কেমন জাগিয়া উঠিতেছে! ইহাই চিত্রকরের প্রতিপাদ্য।

ইংলণ্ডের অন্যতম চিত্রকর মার্কস্ ষ্টোনের অঙ্কিত 'গুঞ্জন' নামক চিত্রে নিভৃতে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর প্রেম-গুঞ্জনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'গুঞ্জন' নিত্য-ঘটনার চিত্র। হার্ব্বার্ট ড্রেপারের পৌরাণিক রূপক চিত্রে যে মহনীয় ভাবের অভিব্যক্তি আছে, মার্কস ষ্টোনের পার্থিব 'গুঞ্জনে' অবশ্য তাহার অবকাশ নাই। যাঁহারা গার্হস্থ্য-চিত্রের অনুরাগী, আশা করা যায়, 'গুঞ্জন' তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

প্রসাধন ।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

একাদশ অধ্যায়।

তিব্বতে প্রবেশ করিতে হইলে দুই অথবা তিনটি গিরিদুর্গ অতিক্রম করিতে হয়। আমি যে পথে তিব্বত হইতে বাহির হইতেছি, সেই পথে দুইটি গিরিদুর্গ। একটির নাম জলুখোগা, অন্যটির নাম নীলং। এই নীলং পাস উল্লঙ্ঘন করিয়া বেসার রাজ্যের লোক ও টীরি রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তিব্বতে প্রবেশ করে। নীলংএ টীরির একটি থানা আছে। এই নীলং পাস অতিক্রম করিয়া যাহারা টীরি রাজ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে ছোট ভেড়া ও ছাগলের দরুণ এক আনা মাশুল দিতে হইবে। বড় ভেড়া ও ছাগলে দুই আনা, খচ্চরে চারি আনা, চামর ও ঘোড়াতে আট আনা করিয়া মাশুল দিতে হইবে। ইহার পর মালের মাশুল আছে। মালের প্রতি মণে দশ আনা মাশুল। মনুষ্যের মাশুল নাই। টীরি রাজ্যের থানাদারে এই সব মাশুল আদায় করিয়া থাকে। এবার টীরি রাজ্যের থানাদার,—গঙ্গোত্রীর প্রধান পাণ্ডা ব্রহ্মদত্ত।

বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নীলং পাস খোলা থাকে। নীলং গ্রামের প্রজারা অর্দ্ধেক কর তিব্বতকে দিয়া থাকে। অপরার্দ্ধ বেসার ও টীরি সমভাগে ভাগ করিয়া লন। কিন্তু প্রজাদের উপর প্রভুত্ব টীরি রাজেরই। তাহার জন্যে টীরি রাজ এখানে থানা বসাইয়াছেন। নীলং একটি গণ্ড গ্রাম; যথেষ্ট সমভূমি আছে। নীলংএর নিম্নে শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাবের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নীলংএর অধিবাসীরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল তিব্বতে ব্যবসায়ের জন্যে যাইয়া থাকে। পরে দুই এক মাস কাল নীলংএ বাস করে। আর যখন খুব বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন গঙ্গোত্রীর নীচে সমস্ত টীরি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এখন তিব্বতে বরফপাত আরম্ভ হইয়াছে; নীলংএর অধিবাসীরা নীলংএ ফিরিয়া আসিতেছে। এ দিকে ধান পাকিয়াছে, যব পাকিয়াছে; নীলংএর অধিবাসীরা ধানকে সব্জ জ্ঞান করিতেছে! আজ আমি নীলংএর অতিথি।

আমি নীলংএ প্রবেশ করিয়াই থানাদার পাণ্ডার কাছে উপস্থিত হই। পাণ্ডা আমার পূর্ব্বপরিচিত। আমাকে দেখিয়াই সে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার আনন্দের কারণ, আমি মানস সরোবর, কৈলাস ও তিব্বতের অপরাপর স্থান নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া নীলংএ আসিতে সক্ষম হইয়াছি। বরফপাতের ভয় এক প্রকার গিয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা আমাকে স্থান দিতে পারিল না; কারণ, তাহার থাকিবার স্থান অতি অল্প। সুতরাং আমি অন্য গৃহস্থের একটি প্রশস্ত গৃহে আশ্রয় লইলাম।

অদ্যকার আহারীয় পাণ্ডাই যোগাইল; আর নীলংএর গৃহস্থেরা মূলা, শাক, দুধ প্রভৃতি দিল। আজ এই গ্রামে বড়ই আনন্দ। অধিবাসীরা খুব মদ খাইয়াছে। আজ তিব্বতযাত্রী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া দলে দলে পশুপাল লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছে; যাহারা গ্রামে ছিল, তাহারা অনিমেষনয়নে তাহাদিগকে দেখিতেছে। পশুপালকে ভার হইতে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; পশুপালও আপনার পুরাতন গৃহ পাইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেছে। বৃদ্ধ মা বাপ অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া সস্নেহে কাছে বসাইয়াছে, আহারীয় দিতেছে ও তিব্বতের রাস্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। স্ত্রী স্বামীকে পাইয়া প্রফুল্লমনে রন্ধন করিতে বসিয়াছে, আর এক এক বার স্বামীর কাছে আসিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আজ আর বাপকে ছাড়িতেছে না; বাপ যেখানে যাইতেছে, ছেলে মেয়েরা কাপড় ধরিয়া সেইখানেই যাইতেছে। এই দেশে অবরোধ-প্রথা নাই, সুতরাং যুবতী ও বৃদ্ধারা ব্যস্ততার সহিত এ বাড়ী ও বাড়ী ছুটা-ছুটী করিতেছে, এবং তিব্বত-প্রত্যাগতদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। এই উৎসব দেখিয়া আমার মন খুব আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটু নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণু সিং আসিয়া খবর দিল, আমাদিগের আহারীয় নাই সব, ফুরাইয়া গিয়াছে; এখান হইতে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত আর লোকালয় নাই। এই স্থান হইতে তিন চারি দিবসের আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এখন আমার সঙ্গে পাঁচ জন লোক। এত লোকের আহারীয় কোথায় পাওয়া যাইবে?

এই কথা শুনিয়া এক জন গ্রামবাসী বলিল, "সম্মুখস্থ পর্ব্বতে এক জন লামা আছেন, সেই লামার নিকট যথেষ্ট আহারীয় আছে; আপনি তথায় গেলে উচিত মূল্যে আহারীয় পাইতে পারেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু

সিংহ ও পূর্ণানন্দকে সঙ্গে লইয়া লামার গৃহে গমন করিলাম। লামার গৃহ লোকে লোকারণ্য; কিন্তু সকলেই মাতাল। পূর্ণানন্দ এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে পালাইল। বিষ্ণু সিংহের দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে সাহস হইল না। কিন্তু আমার অন্নচিন্তা চমৎকার, বাধ্য হইয়া আমাকে লামার কাছে যাইতে হইল। লামা আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন; কারণ, তিনি কিছু প্রকৃতিস্থ ছিলেন। লামার অনুচরেরা আদর করিল বটে, কিন্তু সে মাতলামী আদর। সেই আদরের চোটে প্রাণ বাঁচান ভার। সে যাহা হউক, আমি লামার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইলে, লামা আমার আহারের জন্য চাল, আটা, ছাতু ও যথেষ্টপরিমাণ মাখম দিলেন; মূল্য লইলেন না; ও বলিলেন, "ইহাতে যদি আপনার যথেষ্ট না হয়, আরও দিব।" বিষ্ণু সিং বলিল, "আর বোঝা বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই; ইহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইবে।" আমি আমার স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, এই গ্রামে দুই চারি দিন বাস করিয়া যাই। কিন্তু বিষ্ণু সিংহ বলিল, "তাহা হইবে না। কারণ, চারি দিকের উচ্চ পর্ব্বতে বরফ পড়িয়াছে। এখানেও পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বরফ পড়িবে। বরফ পড়িলে আর গঙ্গোত্রী যাইতে পারিব না।" এখন আমরা গঙ্গোত্রীর অনেক উচ্চে আছি। বিষ্ণু সিংহের কথা কার্য্যেতে পরিণত হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা নীলং পরিত্যাগ করিলাম। নীলং হইতে গঙ্গোত্রীর রাস্তা বড়ই ক্লেশকর। এই রাস্তা এত দুর চড়াই যে, ছাগ ও মেষ ভিন্ন অন্য জন্তু বোঝা লইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। এখন আমার ভারবাহী ছয়টি ছাগ। আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র ছাগে বোঝাই করিয়া নীলং পরিত্যাগ করিলাম। নীলংএর পরই টীরি রাজ্য। এখন টীরি-রাজ্যে আসিলাম। সমস্ত বিপদ আপদ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে শান্তি নাই। কবে বরফ পড়িবে, কবে স্বদলে বরফ-চাপা পড়িব, এই ভয়। এই ভয়েই ভীত, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইল না। আমাদের মনে মরণভয়ে অদম্য উৎসাহ আসিল। প্রাণপণে গঙ্গোত্রীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু নীলং হইতে গঙ্গোত্রীর রাস্তাটি এত জটিল ও সঙ্কীর্ণ যে, দ্রুতবেগে যাওয়া অসম্ভব। আমাদের সঙ্গী ও ভারবাহী ছাগ আহার করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। আমাদের চলিবার

ইচ্ছা অদম্য বটে, কিন্তু রাস্তার জটিলতা সেই অদম্য ইচ্ছাকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে মনে ক্লেশের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু এই স্থানের মনোহর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া মোহাবিষ্ট পথিকের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। নীলং হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই ভৈরবঘাটীর নদী। এই নদীটি শতদ্রু হইতে বাহির হইয়া ভৈরবঘাটীর সেতুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এতদিন শ্যামল তৃণ বা গভীর অরণ্য দেখি নাই; কেবল হিমালয়ের শুভ্র তুষার রূপ শোভা সাগরেই ডুবিয়া ছিলাম। অদ্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হিমালয়ের শোভা-সাগরের কূলে আসিয়া উঠিলাম। দূর হইতে সমুদ্র দর্শন করিলে মনে কোনও প্রকার বিভীষিকা আসে না। অনন্ত গাম্ভীর্য্যের বিচিত্রতাতে মনকে অব্যক্ত ও সাঁতারভোলা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়; কিন্তু সমুদ্র-বিহারী অর্ণবপোতে আরোহণ করিলে আরোহীর প্রাণ লইয়া টানাটানি, সর্ব্বদা ভয়, সর্ব্বদা অস্থিরতা, সর্ব্বদাই জীবন লইয়া টানাটানি। যদি একটু বাতাস উঠে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। ভীষণ বীচি-মালার আঘাত ও প্রত্যাঘাতে তরী দুলিতে থাকে; সমুদ্রের ঘন গভীর গর্জ্জনে কর্ণদ্বয় বধির হইয়া যায়, ও মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই অবস্থাতে আরোহীকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। সমুদ্র মহাতীর্থ; মরিলে উদ্ধার, কূল পাইলেই শান্তি। ভগবান পুণ্য-সাগর মন্থন পূর্ব্বক পুণ্যের সার-ভাগ দ্বারায় চিরতুষারাবৃত কৈলাস শিখর ও অন্যান্য চিরতুষারাবৃত হিম-শিখর নির্ম্মাণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখানে হিমের উৎপাতে অস্থির, ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ কণ্ঠাগত, ডাকাত ও বরফের উৎপাতে জীবন যায় যায়।

অদ্য শান্তি পাইলাম। ভৈরবঘাটীর নদীর তীরে তীরে চলিতে লাগিলাম। এই নদীর তীরভাগ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত, চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দেবদারু ও চীর বৃক্ষ ঘনপল্লবে আবৃত হইয়া আকাশ ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। এই সব বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশে বন্য মৃগ বিচরণ করিতেছে। এই দুই প্রহর রৌদ্রের সময়ও আলো ভিন্ন সূর্য্যের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। আমরা চলিয়া যাইতেছি; আমাদের পদশব্দে অরণ্যচারী মৃগসমূহ ত্রাসে এ দিক ও দিক ছুটাছুটী করিতেছে, কিন্তু পলাইতে পারিতেছে না। কারণ, চতুর্দ্দিকই পর্ব্বত-প্রাকারে বেষ্টিত, নিম্নে খরস্রোতা নদী। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে বরফ পড়াতে নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গমগণ এখ

স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এক দিকে এই সব বিহঙ্গমগণের সুললিত মধুর ধ্বনি, অপর দিকে নদীর গভীর গর্জ্জনে স্থানটিকে অধিকতর মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে আবার চীর দেবদারু বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশে সূর্য্য-তেজ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র সন্ধ্যা আলোকের ন্যায় প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে ভ্রমণকারীর মন কত দূর শান্ত হইতে পারে, তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। আমরা এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নে করচা নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি বড়ই মনোহর। নদীতট শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত। ঊর্দ্ধে পর্ব্বত ও অরণ্য। এই পর্ব্বতে দুই তিনটি গুহা আছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষতলে, কেহ বা গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশাযাপন করিলেন। এখানেও বড় শীত। এই স্থানও হিমালয়ই বটে, কিন্তু বরফপাতের উৎপাত নাই। বৃক্ষচ্ছায়া ও গিরিগহ্বর সুলভ। এখানে আমাদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া নিশাযাপন করিতে হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গুরলা নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এখানে গুহা নাই। এক প্রকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষতলে আমরা স্বদলে আশ্রয় করিয়া সেই নিশা তথায়ই যাপন করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষেই আড্ডা পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, অদ্য আমাদিগকে অনেক দূর যাইতে হইবে। রাস্তা ত একেবারেই নাই। মনুষ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে আবার এত চড়াই ও উৎরাই যে, তাহা মনে হইলে এখনও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে।

নিম্নে ভৈরবঘাটীর নদী। সেই নদীর জলভাগ হইতে পর্ব্বত ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া পথ। কখনও পর্ব্বতশিখরে উঠিতে হইতেছে; কখনও বা পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া চলিতে হইতেছে; কখনও বা একেবারেই পর্ব্বতের মূলে অবরোহণ করিতে হইতেছে। এই রাস্তার কোনও স্থানেই জল নাই। যখন পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি, তখন নদীর শব্দ শ্রবণ করিয়াই পিপাসা দূর করিতে হইতেছে; যখন সানুদেশে অবতরণ করিতেছি, তখন নদীর জল দেখিতেছি বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে; যখন নিম্নে অবতরণ করিতে যাইতেছি, তখন জল নিকটে বটে, কিন্তু নদীতে অবতরণ করিবার রাস্তা নাই। আমরা প্রাতঃকালে রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা বারোটার পর এই পুল পার হইয়া জলের

নিকট আসিলাম। এই পুলের নাম গুরলার পুল। এখানে একটি প্রস্রবণ আছে, তাই জল পাইলাম। এই রাস্তাটার অধিকাংশই প্রায় আমরা শাখা-মৃগের গতি অনুসরণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছি। এই পুলের উত্তর দিকে একটি গুহা আছে। এক জন ভূটিয়া আমাদিগের অগ্রেই আসিয়া গুহা অধিকার করিয়াছে, সুতরাং আমরা আর বিশ্রামের স্থান পাইলাম না। প্রস্রবণের সমীপে কিছু জলপান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম।

কি বিপদ! আবার চলিতে হইবে। পা আর উঠে না, কিন্তু না গেলেও নয়। রাস্তাটিও অবস্থার উপযোগী! নিম্নে নদী। নদীর সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে সামান্য রাস্তা। এই রাস্তার নিম্নভাগ নদীর দিকে ঢালু; একবার অসতর্কতার সহিত পাদবিক্ষেপ করিলে একবারে সহস্র হাত নিম্নে ভৈরব-ঘাটীর নদীতে গাইয়া পড়িতে হইবে। একবার পড়িলে আর নিস্তার নাই। লোকমুখে শুনিলাম, এই রাস্তা হইতে পদস্খলিত হইয়া প্রতি বৎসর অনেক মেষ, ছাগ ও মনুষ্য জীবন হারায়। আমি অতি সাবধানে প্রস্তর অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই রূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম।

এই স্থান হইতে ভৈরবঘাটীর সেতু দেখা যায়। সেতুটি বড়ই সুন্দর। দূর হইতে মনে হয়, সেতুর উপর দুইটি ক্ষুদ্র শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। সেতুটি দৈর্ঘ্যে তিন শত হস্ত, প্রস্থে চারি পাঁচ হস্ত। দুইটি পর্ব্বতে দুইটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া সেতুটি ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই সেতুর উপর হইতে নিম্ন তিন শত ষাটি হস্ত। এইরূপ বৃহৎ জিনিস এত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। ভৈরবঘাটীর উচ্চতা একাদশ সহস্র ফিট। এই একাদশ সহস্র ফিট স্থিত বস্তুকে এত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে! ইহাতে অনুমান করুন, আমি যে পর্ব্বত-শৃঙ্গে বিশ্রাম করিতেছি, তাহা কত দূর উচ্চ। আমি পূর্ব্বে ভৈরবঘাটীর পুল দেখিয়াছিলাম। তাহাতেই অনুমান করিয়া লইলাম, ঐ শূন্যে দোদুল্যমান বস্তুটি শৃঙ্খল নহে, ভৈরবঘাটীর পুল। এই উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভাগীরথীর জল দেখা যায়। সেই দৃশ্য অতি সুন্দর। আমার মনে হইতে লাগিল, একটি পারদ-রেখা দর্শন দিয়া জঙ্গলে লুকাইতেছে, আবার দর্শন দিয়া আমার মন প্রাণ হরণ পূর্ব্বক অরণ্যে লুকাইতেছে, আবার দর্শন দিতেছে, আবার লুকাইতেছে। আবার দেখিব দেখিব বলিয়া মনে করিতেছি, আর দেখিতে পাইলাম না; ভাগীরথী পর্ব্বতমধ্যে লুকাইয়া গেলেন।

এই রূপ দর্শন করিতে করিতে আমার শ্রান্তি দূর হইল। অনেক দিন ভাল পথে চলি নাই, জঙ্গল ও পর্ব্বতেই আমার পথ ছিল। নিম্নে ভৈরবঘাটীর রাস্তা। আজ বড়ই আকর্ষণের বস্তু। আজ সিধা হইয়া সিধা পথে চলিব, বড়ই আনন্দ। লৌহ-যানে চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি আছে কি না। কিন্তু আমি দেখিলাম, গঙ্গোত্রীর ও গঙ্গোত্রীর রাস্তার আকর্ষণ-শক্তিতে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। শরীরে বল নাই, উদরে অন্ন নাই, চলিবার শক্তিও নাই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাইতেই হইবে। আর বিশ্রামের সময় নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের আরোহণ ও অবরোহণ উভয়ই ক্লেশকর, কিন্তু আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণ অধিকতর কষ্টকর ও ভয়জনক। অবরোহণে ধীরে ধীরে চলিবার উপায় নাই, দ্রুতবেগে নামিতে হয়। আমরা এখন অতি দ্রুতবেগে নামিতে লাগিলাম। এমন কি, কখনও কখনও দৌড়িতেও হইল। অদ্য পাঁচ মাস পরে ভাল রাস্তায় চলিব। বহু লোকের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিব। হিন্দুর মুখ দেখিব। গৃহে বাস করিব। ডাল ও ভাত খাইব। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী দর্শন করিব, এবং গঙ্গা-জল পান করিয়া পবিত্র হইব। পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত, যোশী মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া গিরি-গহ্বর, বৃক্ষমূল, পর্ব্বতশৃঙ্গই আমার রাত্রিবাসের প্রধান স্থান ছিল। কখনও কখনও গৃহ মিলিত বটে, কিন্তু তাহাও গহ্বর-সদৃশ। ছাতু ও মাখম ছিল প্রধান আহারীয়; দোভাষীর সঙ্গে আধ-হিন্দিয়া আধ-ভূটিয়া কথাই ছিল বাক্যালাপ। অপথই ছিল পথ; পার্ব্বতীয় নদীজল ছিল পানীয় জল। অদ্য এই সব দুঃখ যাইবে, এই ভাবিয়া একান্ত উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম।

নিম্নেই কোপাং। আর অল্প অগ্রসর হইলেই কোপাং পঁহুছিব। মন্দাকিনী ও গঙ্গোত্রীর রাস্তা পাইব। কথিত আছে, নারদ ভীমসেনের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মানস সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে যান। উক্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নারদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; তিনি সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইয়া প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত হন, এবং কৌপীন পরিত্যাগ করেন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হয়; সুতরাং পুনর্ব্বার কৌপীন পরিধান করেন। সেই অবধি সেই স্থানের নাম কোপাং হইয়াছে। আমি অল্প ক্ষণের মধ্যেই কোপাং পঁহুছিলাম। কোপাং ভূটিয়া ও পাহাড়ীদের

একটি প্রধান আড্ডা। তিব্বত হইতে নীলং পাস হইয়া যাহারা নিম্ন দেশে যায়, তাহারা কোপাংএ আসিয়া বিশ্রাম করে। আর যাহারা নিম্ন হইতে নীলং পাস হইয়া তিব্বতে যায়, তাহারাও এই কোপাংএ আসিয়া বিশ্রাম করে। কিন্তু এখানে কোনও প্রকার আশ্রয় গৃহ, বা দোকান নাই। কারণ, এই পথে যাহারা যাতায়াত করে, তাহারা খাদ্যসামগ্রী সঙ্গেই রাখিয়া থাকে। আর তিব্বতীয় অথবা পাহাড়ীয় জাতিরা যেখানে জল ও কাষ্ঠ আছে, সেই স্থানই পছন্দ করে; কোনও প্রকার আশ্রয় থাক আর না থাক, ইহারা শূন্য ময়দানে পড়িয়া থাকে। গিরিগুহা, বৃক্ষতল ও পর্ব্বতের অন্তরাল ইহাদিগের বড়ই প্রিয়; সুতরাং দোকানাদি এখানে কিছুই নাই।

আমি কোপাংএ আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আমার ইচ্ছা, ভৈরবঘাটীতে যাই। আমার ভৃত্যদের ইচ্ছা, এই স্থানেই বাস করে। আজকার অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহারাও ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। আমাদিগের সঙ্গে যাহা কিছু আহারীয় আছে, তাহা ভৃত্যদিগের পক্ষে যথেষ্ট। আমি উক্ত আহারীয় ভৃত্যদিগকে প্রদান করিয়া ভৈরবঘাটী যাত্রা করিলাম। ভৃত্যেরা এইখানেই রহিল।

এখান হইতে ভৈরবঘাটী এক মাইল। ভৈরবঘাটীর সেতু অর্দ্ধ মাইলের উপর। আমি ভৈরবঘাটীর সেতু অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি দোকান ছিল। আসিয়া দেখি, দোকান বন্ধ। দোকানদার গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও অনাহারে আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এই ধর্ম্মশালায় আরও ১৪।১৫ জন তীর্থযাত্রী ছিল। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আমার আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিল! আমি অনেক দিনের পর অভিলষিত ডাল ভাত খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইহা বলা বাহুল্য যে, অদ্যকার নিশা ভৈরবঘাটীতেই অতিবাহিত হইল।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য।

সংস্কৃত স্মৃতি ও পুরাণাদি গ্রন্থে বহুদিন হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তের কথা পড়িয়া আসিতেছি; সেই অবধি ব্রহ্মাবর্ত্ত কোথায়, এই প্রশ্ন মনে জাগরূক হইয়া আছে। আউধ্ রোহিলখণ্ড রেলের হর্দয় ষ্টেশনে কোনও বিশিষ্ট আত্মীয়ের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আছি. এমন সময় লোকমুখে শুনিলাম, হর্দয় হইতে কিছু দূরে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে এক তীর্থ আছে। ইহা শুনিয়া আমি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে গৃহস্বামী আয়োজনের কোনও ত্রুটী করিলেন না। পরদিন প্রাতে রথে করিয়া আমরা ব্রহ্মাবর্ত্তের অভিমুখে চলিলাম। এখানকার রথ চার চাকার গাড়ী, গোরুতে টানে। রথগুলা দেখিতে সুন্দর, ক্রেহাম গাড়ীর মাথায় মন্দিরের চূড়া বসাইয়া দিলে অনেকটা রথের মত দেখিতে হয়। পূর্ব্বরাত্রে তাঁবু প্রভৃতি সমস্ত সরঞ্জাম পাঠান হইয়াছে। আমরা যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা হর্দয় ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আসিয়া দেখি, সব ঠিকঠাক। তাঁবু 'গাড়া' হইয়াছে অতি মনোরম স্থানে—বিশাল অশ্বত্থ বট ও সহকার প্রভৃতির নিবিড় ছায়ার মধ্যে। এই স্থানটিই ব্রহ্মাবর্ত্ত—সেই আদিযুগের ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই স্থানে দাঁড়াইয়া মানসপটে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল! এইখানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, উহার চতুর্দ্দিকে ঘাট বাঁধান। যাত্রীরা বহু দূর হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের এই আবর্ত্ত-মধ্যে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। দেখিলাম, এই পুষ্করিণীতে শৃঙ্গী প্রভৃতি মৎস্যেরা সুখে বিচরণ করিতেছে; যাত্রীরা ডাকিলে তাহারা তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের খাবারের জন্য যাত্রীরা খই প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা বলিল যে, এই পুষ্করিণীর সর্পেরাও নাকি এইরূপ পোষ মানিয়াছে। আমরাও জলে তুড়ি দিয়া ডাকিতে থাকিলে মৎস্যকুল কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন খই ছড়াইয়া দিলে তাহারা তৃপ্তি-সুখে খাইতে লাগিল।

আজ মাঘীপূর্ণিমা, তাই দলে দলে নব নব পরিচ্ছদে ভূষিত বহু যাত্রী আসিয়া উপস্থিত। সেই আবর্ত্তে স্নান করিয়া সকলেই পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যস্ত! ছোটখাট মেলা বসিয়াছে, আট দশ জন বিক্রেতা নানা দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত রাখিয়াছে। আমরা যা কিছু এ দেশের প্রস্তুত নূতন জিনিস দেখিলাম,

তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্তের চিহ্নরূপে ক্রয় করিলাম। (১) সম্মুখে শিবের মন্দির। বৎসর ত্রিশ হইল, এখানকার রাজা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই মন্দিরের আকার প্রকার প্রাচীনত্ব ধারণ করিয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ, এবং তৎপার্শ্বে একটি শ্বেতপ্রস্তরের বৃহদাকার কৃষ্ণ, এবং কয়েকটি তপস্বীর মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের চারি পার্শ্বে সুবিশাল অশ্বত্থ, বট, সহকার ও নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ছায়াদান করিতেছে; ইহারা এখনও যেন বৈদিক ঋষিদিগের তপোবনের স্বপ্ন-সমীর অনুভব করিতেছে। এক পার্শ্বে যজ্ঞবেদী। মন্দিরসংলগ্ন একটি অশ্বত্থের তলে বহুকাল হইতে একটি অন্তঃসলিলা জলধারা প্রবাহিত হইত। আজ চার পাঁচ বৎসর হইল, এক সন্ন্যাসী, যাহাতে জলধারা আরও প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাবিয়া সেই উৎস-মুখ অধিক খনন করিয়া দিলেন, ফলে সেই ধারা-নির্গমনের পথ এক্ষণে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই ব্রহ্মাবর্ত্তের কমনীয়তা বাড়াইয়াছে বিখ্যাত 'শাণ্ডি' ঝিল, বা শাণ্ডি হ্রদ। এই হ্রদাকার বৃহৎ ঝিল বা তড়াগ লম্বে প্রায় ১৷৷০ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের শোভা বিস্তার করিয়াছে। (২) এককালে গঙ্গার শাখা গর্হা নদীর সহিত ইহার যোগ ছিল। শুনিলাম, অল্পদিন হইল, এখানকার জমীদার বাঁধ বাঁধিয়া তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (৩) শাণ্ডি হ্রদের নিকটেই প্রাচীন শাণ্ডি গ্রাম। ব্রহ্মাবর্ত্তের এই হ্রদে সহস্র প্রকারের হংস সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। এই কারণেই বোধ হয় ব্রহ্মার বাহন হংস, পুরাণে কথিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ হংস পদ্ম-পত্রের ন্যায় ঝিলটি আচ্ছন্ন করিয়া আছে—কি রমণীয় দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব শোভা! রাজহংস, কারণ্ডব, রক্তহংস (Flamingo), চক্রবাক,

(১) এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের রৌপ্য অলঙ্কার ও সুন্দর গালিচা (দাড়) প্রস্তুত হয়।

(২) এই হৃদ্য প্রদেশ হ্রদবহুল বলিয়াই 'হ্রদ' হইতে হৃদয় নাম আসিয়া থাকিবে।

(৩) The largest lake in the district is the famous Danar at Sendi a wide sheet of deep water partly covered with long grass, about two and a half miles long and three quarters of a mile broad; its banks are steep and clothed with groves, the whole aspect of the lake being most picturesque.—*Gazetteer Hardoi District by H. R. Nevil* I. C. S,

বালহাঁস প্রভৃতি কত জাতীয় হংস যে এখানে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের মধ্যে মধ্যে কুশগুচ্ছ যেন অঙ্গুলির ইসারা করিয়া হংসদলকে আহ্বান করিতেছে। হংসেরা কেহ বা ভাসিতেছে, কেহ বা ডুব দিতেছে, কেহ বা সাঁতার দিতেছে, কেহ বা কলকণ্ঠে তড়াগ নিনাদিত করিয়া তুলিতেছে। কখনও কখনও রাজহংস ও রক্তহংসেরা দলে দলে মালাকারে ঝিলের এধার হইতে ওধারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। রক্তহংসের (Flamingo) দল যখন ঝিলের এ দিক হইতে ও দিকে গিয়া বসে, তখন মনে হয়, যেন সন্ধ্যাকাশের লাল মেঘখণ্ড বুঝি বা খসিয়া পড়িল, কিংবা যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা খেলিয়া গেল। যোগীরা বলেন, হৃদয়-কোষের ব্রহ্মাবর্ত্তে অজপা হংসজপ দ্বারা সর্ব্বক্ষণই ব্রহ্মনাম উত্থিত হয়। আর এই হৃদয় প্রদেশস্থিত (হর্দয় জেলা) ব্রহ্মাবর্ত্তে অনুক্ষণ হংসধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেন ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। এ দৃশ্য কি সুন্দর! কি চমৎকার! সবই যেন ছবির মত। এই শাণ্ডি তড়াগ প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিপূর্ণ ছিল। অল্পকাল হইল, এখানে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইলে লোকেরা পদ্মের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করায় এই শাণ্ডি আজ পদ্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পীরা দেবী সরস্বতীর যেরূপ ছবি আঁকিয়া থাকেন, বিশাল সরসীর মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মবনে সরস্বতী সমাসীনা, নিকটে হংসীদল খেলা করিতেছে—এই বুঝি সেই সরস্বতীর স্থান! এক কালে এই সকল স্থানে ঋষিদিগের সামগানে বন উপবন প্রতিধ্বনিত হইত, এবং সেই সঙ্গে ঋষিকন্যারা পদ্মবনে সমাসীনা হইয়া বীণাবাদন করিতেন। ইহা কবিকল্পিত নহে—এ চিত্র এখানে আসিলে প্রত্যক্ষ দেখিবে।

শাণ্ডি তড়াগের চারি দিকে গোধূম ও যবের ক্ষেত্র যেন কুশাসন বিছাইয়া দিয়াছে। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও বা হরিণ হরিণী নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা সারস সারসী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সহকার, অশ্বত্থ, বিল্ব, বট প্রভৃতি মিলিত ছায়া-তরুসমূহে কে যেন এক একটি সুন্দর স্তবক রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে হরিত পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের অসংখ্য শুক-সারিকা বসিয়া চারি দিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রিতে দৈবাৎ রথের ঘর্ঘর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া ময়ূর ময়ূরীরা দলে দলে মেঘের গর্জ্জন ভ্রমে কেকাকণ্ঠে সকলকে

আকুল করিয়া তুলিতেছে। এখানে আসিয়া কত প্রাচীন কালের ভাব মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কি সুন্দর স্থান ঋষিরা তপস্যা ধ্যান ধারণার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

এইবারে ব্রহ্মাবর্ত্তের অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে আসা যাউক। বস্তুতঃ যখন আর্য্যেরা হিমাদ্রির উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতে করিতে ভারতের নিম্নপ্রদেশসমূহে আসিয়া বসবাস করিলেন, তখন এই সকল প্রদেশে তাঁহাদের চক্ষুতে আবর্ত্ত অর্থাৎ জলা বা গর্ত্তের তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাই হিমালয়ের পাদদেশসমূহকে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত করিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে এইরূপ বহু আবর্ত্তের উল্লেখ আছে। যথা, ব্রহ্মাবর্ত্ত, রুদ্রাবর্ত্ত, শক্রাবর্ত্ত, রথাবর্ত্ত ইত্যাদি। (৪) কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, মনুসংহিতাই তাহার কারণ। মহর্ষি মনু ব্রহ্মাবর্ত্তকে অতি উচ্চ স্থান দিয়া বলিয়াছেন—

সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ (৫)
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, সেই দেবনির্ম্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ঐ দেশে বর্ণচতুষ্টয়ের এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও মথুরা, এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে—এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। এই সমুদয় দেশে সম্ভূত

(৪) "রুদ্রাবর্ত্তং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।"
অন্যত্র—ব্রহ্মাবর্ত্তং ততো গচ্ছেৎ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ইত্যাদি ॥
মহাভারত ; বনপর্ব্ব ; ৮৪ অধ্যায়।

(৫) বামনপুরাণ মনুসংহিতার এই শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত।" (৬)

বস্তুতঃ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অন্তরস্থিত প্রদেশ সেই পুরাকালে লোক-শিক্ষক ব্রহ্মর্ষিদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া মনু উহাকে এত সম্মান দিয়াছেন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদীদ্বয়ের নাম অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদেও ইহাদের উল্লেখ আছে। যথা, "হে অগ্নি, তুমি দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও।" (৭) মনুসংহিতা যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীকে ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহাভারত আবার সেই দুই নদীকে কুরুক্ষেত্রের সীমানারূপে উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে॥ (৮)

অর্থাৎ, সরস্বতীর দক্ষিণে ও দৃষদ্বতীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন। এই সঙ্গে মহাভারত কুরুক্ষেত্রকে ব্রহ্মক্ষেত্র নামেও অভিহিত করিয়াছেন।—

ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্তি ভারত। (৯)

লেখক এককালে কুরুক্ষেত্র প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন; কুশসমাচ্ছন্ন ভদ্রবসনা সরস্বতী এখনও সেখানে প্রবাহিতা। দৃষদ্বতী কিন্তু এক্ষণে লুপ্ত-প্রায়, স্থানে স্থানে পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রামের অতি-বৃদ্ধ লোকেরা, যাঁহারা পরম্পরাক্রমে দৃষদ্বতীর কথা অবগত আছেন, তাঁহারা ঐগুলিকে দৃষদ্বতীর চিহ্নরূপে প্রদর্শন করেন।

দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা তথা হিরণ্বতী নদী।
বর্ষাকালবহাঃ সর্ব্বাঃ বর্জ্জয়িত্বা সরস্বতীং॥
এতাসামুদকং পুণ্যং প্রাবৃটকালে প্রকীর্ত্তিতম্।
—বামনপুরাণ, ৩৩ অধ্যায়।

---

(৬) মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।
(৭) ঋগ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৩য় অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ২৩ সূক্ত।
(৮) মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়।
(৯) বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্ত ইহারা একই প্রদেশের দুই অঙ্গমাত্র—পরস্পর সংলগ্ন। মহাভারতে কুরুকুলের কথাই সবিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে ব্রহ্মাবর্ত্তের কথা চাপা পড়িয়া কুরুক্ষেত্রের কথাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেই প্রাচীনকালেই যখন দৃষদ্বতী 'বর্ষাকালবহা' ছিল, তখন যে আজ যুগযুগান্তর পরে সেই নদী লুপ্তপ্রায় হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

এই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত অতি পুণ্যস্থান। তাই পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিতঃ।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রাণান্ মুঞ্চতি চেচ্ছয়া॥

"ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিলে লোকে নিঃসংশয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ও তাহার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইয়া থাকে।" এই ব্রহ্মর্ষি-সেবিত প্রদেশে পদার্পণ করিলে সহজেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহা মহা মুনিগণের কথা মনে উদিত হয়। যে ঋষিগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম ব্রহ্মনাম ধ্বনিত করেন, যাঁহাদের যজ্ঞধূমে এই সকল দেশের অপবিত্রতা প্রথম দূরীভূত হয়, সেই ঋষিগণের সহিত এই প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত না হইয়া যাইতে পারে না। সেই আদি যুগের ঋষিদিগের মধ্যে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নাম কে না জানে? ইনি যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্য হইতে কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়—

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাক্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ॥ (১০)

"ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও অনপেক্ষ। এই আমার হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা ব্রহ্ম। আমি এই লোকে মৃত্যুর পরে এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব। যিনি এইরূপে জানেন, তাঁহার সত্যই এই ব্রহ্মকে লাভ হয়। শাণ্ডিল্য ঋষি ইহা বলিয়াছেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।" আশ্চর্য্য এই যে, এই প্রদেশ এখনও সেই অতীত যুগের ব্রহ্মবাদী মহর্ষি শাণ্ডিল্যের পুণ্য নাম বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ। বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ঋষির নাম কাহার অবিদিত আছে? ভট্ট-নারায়ণ প্রমুখ যে কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণকে রাজা আদিশূর যজ্ঞার্থ বাঙ্গালায় আনয়ন করেন, তাঁহাদেরই অন্যতম মূল বা গোত্রপ্রবর্ত্তক আদিপুরুষ মহর্ষি শাণ্ডিল্য।—বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণমাত্রেরই আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য। এই হর্দ্দয় প্রদেশের চারি দিকে শাণ্ডিল্য নাম ধ্বনিত।

(১০) ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৩য় অধ্যায়।

এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন শাণ্ডিল্য, এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ডি—ইহা শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকারমাত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে এই হর্দ্দয় প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই। (১১). তাই মনে হয়, এই হর্দ্দয় প্রদেশ, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ বৈদিক ঋষি শাণ্ডিল্যের স্থান ছিল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে; তাই যুগযুগান্তর পরে এখনও এই স্থানের শাণ্ডিল্য নাম স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই যে শাণ্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহাভারতের শল্যপর্ব্বোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।—বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া একটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে আশ্রমটি কাহার, বলরাম সেই স্থানের ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন—

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥
বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী॥ (১২)

"এই স্থানে কৌমারব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী যোগযুক্তা ও তপঃসিদ্ধা হইয়া সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের শ্রীমতী সাধ্বী দুহিতা ধৃতব্রতা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।" আমি ইহা বলিতেছি না যে, মহাভারতোক্ত এই আশ্রমই হর্দ্দয় প্রদেশের অন্তর্গত শাণ্ডিল্য-স্থানের অন্তর্গত; তবে এই আখ্যান হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, এককালে সমগ্র কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে শাণ্ডিল্য নাম বড় অল্প ধ্বনিত ছিল না।

কিন্তু হায়! বিদেশীয়েরা হিন্দুর ইতিহাস গণনার মধ্যেই আনয়ন করেন না। তাই এই হর্দ্দয় প্রদেশস্থিত শাণ্ডিল্য ভূভাগের 'শাণ্ডিল্য' এই নামের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া মুসলমানেরা কত না মাথা ঘামাইয়াছেন। হিন্দুর সুপ্রাচীন ইতিহাস-কথা চাপা দিয়া মুসলমানেরা ইতিহাস-প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ

(১১) Almost all the Brahmins of the district belong to the Kanoujia division.—*Hardoi Gazetteer.*

(১২) শল্য পর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়।

করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। তবে ইহা যে ঘোর কল্পনা-প্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণার্থ নিম্নে শাণ্ডিল্যের উৎপত্তি বিষয়ে মুসলমানদিগের কথা উদ্ধৃত করিলাম।—এককালে সৈয়দ মকদুম আলাউদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের সনদ লইয়া এই প্রদেশে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বরই তাঁহার সনদ; এই ভাবিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের সনদ যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। ঈশ্বরই সনদ (সনদ—আল্লা) এই বলিয়া যেহেতু তিনি এই স্থান জয় করিলেন, তাই ইহার নাম 'সনদ—আল্লা' হইতে শাণ্ডিল্য হইয়াছে। হর্দ্দয়ের গেজেটীয়ার-প্রণেতাও ইহাতে সবিশেষ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ১৩) কিন্তু এই শাণ্ডিল্য নাম যে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নাম হইতে উৎপন্ন, তাহা বিদেশীয় ইংরাজ লেখকের মস্তিষ্কে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিবে? তাই তিনি সে বিষয়ের কোনও উল্লেখই করেন নাই। 'শাণ্ডি'রও এইরূপ এক ব্যুৎপত্তি ইংরাজ লেখক লোকমুখে শ্রুত হইয়া 'গেজেটীয়রে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সোমবংশীয় সন্তন রাজার নাম হইতে 'শাণ্ডি' আসিয়াছে; —'সন্তন খোরা'র অপভ্রংশ হইয়া শাণ্ডি হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ইংরাজ গেজেটীয়র-প্রণেতা হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ ব্রহ্মাবর্ত্তের বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি, হর্দ্দয় জেলার গেজেটীয়র-ভুক্ত মানচিত্রেও ব্রহ্মাবর্ত্তের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আদমপুরের স্থান হইয়াছে; তথাপি ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থান পায় নাই! মুসলমানেরা ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মাবর্ত্ত হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ দেখিয়া মুসলমানেরা ঠিক ব্রহ্মাবর্ত্তের পাশাপাশি আদমপুর নামে গ্রাম স্থাপন না করিয়া যাইতে পারেন নাই। হিন্দুর ব্রহ্মাও যিনি, মুসলমানের আদমও তিনি। মুসলমানেরাও যখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম আদমপুর দিয়াছেন, তখন মনে হয়, ইহা প্রকৃতই ব্রহ্মাবর্ত্ত।

(১৩) 'The inventive piety of the Muhammadan dispenses with the traditional clue to the derivation of the name, and asserts that it is traceable to an exclamation of Syid Makhdum Alauddin, who when on his way thither from Delhi cast into the Jumna the grant or charter received by him from his Imperial master, saying 'Sanad-Allah' (God be my charter). Accordingly he named his first conquest Sanad-illa or Sandilla.—*Hardoi Gazetteer.*

বসুমতীর

সুলভ প্রচারের নব অনুষ্ঠান !

বিশ্বের প্রধান আদিকবির আদিকাব্য

বাল্মীকি-রামায়ণ ।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ন্যায় ভাবসম্পদপূর্ণ মধুর, গম্ভীর, প্রাঞ্জল, সরল ভাষায় মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোকাঙ্ক ধরিয়া অনুবাদিত ।

সমগ্র—সটীক—সপ্তকাণ্ড, নানা-শাস্ত্রোক্ত টীকা, ভবিষ্যৎ, পাঠান্তর, সুরঞ্জিত চিত্রাবলী-সহ সুললিত গদ্যানুবাদ ।

কাগজ—টাইপ, ছাপা সুন্দর; অক্ষর বড় ।

প্রকাণ্ড দুই ভলুমে সম্পূর্ণ ।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ডিজাইনের মত,—

অয়েল-পেন্টিংএর অনুরূপ,

২০ খানি সুরঞ্জিত চিত্রে চিত্রময় !

ভারতীয় শিল্প চিত্রকলার চরম নিদর্শন—সহস্র সহস্র মুদ্রাঙ্কনে প্রথিতনাম্না শিল্পীগণের প্রতিযোগিতার ফল । বিকৃত চিত্র নহে,—ভক্তিভাবোদ্দীপক পৌরাণিক চিত্র ।

ধর্ম্ম-গৃহ-লাইব্রেরীর শোভা—পবিত্র, পূজিত গ্রন্থের অলঙ্কার ! প্রভাতে দর্শনীয়—হিন্দুর নমস্য ।

ভলুমে সুন্দর

বিরাট রামায়ণের মূল্য ২৲ টাকা ।

সুন্দর বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা ।

বসুমতী পুস্তক বিভাগ ।

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ছদ্মবেশে রাবণের সীতা-সমীপে আগমন।

[বসুমতীর প্রকাশিত রামায়ণের চিত্র হইতে।

ব্রহ্মাবর্ত্তের চারি দিকে হিন্দুর অনেক অনেক প্রাচীন তীর্থস্থানসমূহের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র; নৈমিষারণ্য ইহার পূর্ব্বসীমার সংলগ্ন; গোমতী বেশী দূরে নহে; সরযূতীরবর্ত্তিনী অযোধ্যা ইহার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই সকল তীর্থস্থানসমূহ মানসনেত্রে প্রাচীন কালের ছায়া আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে।

কত রাজা ভারতে আসিলেন, আবার চলিয়া গেলেন। এই রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনে কত ইতিহাস যে লোপ পাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। হিন্দুর তীর্থসমূহ কেবল হিন্দু ইতিহাসকে জাজ্বল্যমান রাখিয়াছে—লুপ্ত হইতে দেয় নাই। আজ অযোধ্যা যদি তীর্থে পরিণত না হইত, তাহা হইলে রামরাজ্যের কি কোনও চিহ্নমাত্র থাকিত? এইরূপ কাশী, গয়া প্রভৃতি ভারতের তীর্থস্থানগুলি হিন্দু ইতিহাসের যেন এক এক অধ্যায়মাত্র। এই তীর্থভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য নামের সহিত কত যুগযুগান্তরের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত বিজড়িত, তাহার কি ঠিক আছে? বঙ্গবাসিগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণসেবিত এই সকল প্রদেশে আসিয়া দেখিয়া যাও, সাধনার তপস্যার কি অনুকূল স্থান। এই সকল দেশে পুনরায় তোমরা তপোবন ও পুণ্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মনামে ও সুগম্ভীর বেদগানে গগন আবার ধ্বনিত হউক।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ-পর্য্যটন।

১

কালধর্ম্মে মন উচাটন হইয়াছে, পর্য্যটনটা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দরকার হইলে কেহ কেহ হাওয়া বদলাইতে দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকেন, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে অনেকেই সঙ্কুচিত হন। অস্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে অনেক দেখিবার উপযুক্ত জিনিস আছে। যেমন নেপাল তেরাই ও রাজমহলের পাহাড়, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের পুরাতন দীঘি, জাহানাবাদের গড় মান্দারণ, পূর্ণিয়ায় নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপ, আলিপুর দুয়ারের (ভূটানের নিকট) জঙ্গল ইত্যাদি।

অল্প পয়সায়, নিকটে একটা আনন্দ-পর্য্যটন করিবার অভিলাষী হইয়া

আমরা তিনটি বন্ধু ও দুইটি পাড়াপ্রতিবাসী শনিবার প্রাতঃকালে ঘাটালের ষ্টীমারে উঠিলাম। একটি বাবু প্রাণিতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, এবং একটি দার্শনিক ও ডাক্তার। প্রথমের নাম হরিশ্চন্দ্র, দ্বিতীয়ের নাম জগবন্ধু। প্রতিবাসিদ্বয়ের মধ্যে একটি গায়ক ও অন্যটি তবলা-বাদক। উভয়েরই কসরৎ অতি সুন্দর। আমার নিজের সঙ্গে একটি হারমোনিয়ম ও বেহালা, এবং দুইগাছি ছিপ। বলা বাহুল্য যে, আমি মৎস্যশিকারে অতিশয় দড়।

ছুরি, কাঁচি, আরসী, তৈল, পাঁউরুটী প্রভৃতি যথারীতি সংগ্রহপূর্ব্বক আমরা পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে চলিলাম। কোথায় যাইব, স্থিরতা নাই। নদীকূলে যে জায়গাটা পছন্দ হইবে, সেখানেই তীরস্থ হওয়াই মনঃস্থ করা গেল।

সঙ্গে খুদীরাম তৈল ও তামাকের ভার লইয়া চলিল। গেঁওখালির সম্মুখে রূপনারায়ণ নদে পড়িয়াই আমরা ডেকে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম।

২

ষ্টীমারখানি হোরমিলার কোম্পানীর। প্রকাণ্ড ডেক; প্রায় পাঁচ শত লোক বসিতে পারে। নানাজাতীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহাতে বসিয়া। কেহ ক্ষীণ, কেহ সবল, কেহ একাকী, কেহ সস্ত্রীক। সকলেরই জীবন একটা বিশেষ ইতিহাস-বিশিষ্ট, তবে এখনও কেহ মরে নাই বলিয়া ইতিহাসটা কেহ বলিতে চাহে না। (এ কথাটা দার্শনিক বন্ধু আমার কানে কানে বলিলেন)। পরীক্ষাস্থলে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়ের নিবাস কোথায়?' উত্তর, 'বিষ্ণুপুর।' প্রশ্ন, 'আপনি কি তামাক বেচিয়া থাকেন?' লোকটা চটিয়া গেল। তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল।

'মহাশয়ের নাম?'

আমি। হারাধন। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

ভদ্রলোকটি বলিল, 'আপনি অসভ্য।' আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। 'আমি পূর্ব্বে কখনও ভদ্রলোক দেখি নাই। উত্তর, 'কি দুরদৃষ্ট! আমাকে দেখুন।' অনেকে বলিল, 'আমাকে দেখুন।' এইরূপে অনেক লোক জুটিয়া গেল। সকলেই ভদ্রতার দাবী করিয়া বসিল। আমি পরম আপ্যায়িত হইয়া প্রতিবাসিদ্বয়কে বলিলাম, 'দাদা, গান জুড়িয়া দাও।' তৎক্ষণাৎ সুমধুর কণ্ঠ ও তবলার চাঁটী ডেকে নিনাদিত হইয়া

জায়গাটাকে বিষ্ণুপুরের মত করিয়া তুলিল। বিষ্ণুপুর একটি বহুকালকার গানের আখড়া। নব-পরিচিত লোক গদ্গদস্বরে (নয়নাশ্রু মুছিয়া) বলিতে লাগিলেন, 'ভায়া, অনেক দিন বাঁচিয়া থাক। এমন গান হরেকৃষ্ণ গোঁসাই মরিবার পর আর শুনি নাই। হরেকৃষ্ণ গোঁসাই, যদুভট্ট ওস্তাদের শ্যালক।'

৩

গেঁওখালিতে অনেক যাত্রী নামিয়া গেল। নবপরিচিত বন্ধুও যাইবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। নমস্কারাদি শেষ হইবার পর তিনি বলিলেন, 'আমার নাম দীনু কৈবর্ত্ত, তবে ঠিক আপনাদের মত মাহিষ্য নহি, কিন্তু মহিষাদলের নিকট ভেটকী মাছের ব্যবসা করি।' আরও বলিলেন, 'যদি একদিনের জন্য আমার কুটীরে পদার্পণ করেন, তবে কৃতার্থ হইব।' আমরা সকলেই সাগ্রহে বলিলাম, 'অতিশয় প্রীতিসহকারে'। আমাদিগের টাট্‌কা ভেট্‌কী মৎস্যের ডাল্‌না খাইবার দুরন্ত ইচ্ছা বলবতী হইয়া রসনায় প্রচুর লালার সঞ্চার করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভেট্‌কী মাছ ছিপে খায়?' দীনুবাবু বলিলেন, 'না, কিন্তু আমার জমীদারী তেরোপেক্যা নামক স্থানে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; সেখানে খালের কণ্ট্রাক্টর বাবু মধ্যে মধ্যে রোহিত মৎস্য ধরিয়া থাকেন। কোনওটা দশ সেরের কম নয়। স্থানটি রমণীয়। হলদী নদীর ধারে। হাওয়া খাইবার অমন স্থান নাই, এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া ২।৩ ক্রোশ গেলেই নন্দীগ্রাম। শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের মাতুলালয়। বিস্তীর্ণ গোগৃহ, দুগ্ধ ছানা অপর্য্যাপ্ত, কাঁকড়া ও গলদা চিংড়ী ও তপ্‌সে মাছের ত কথাই নাই। হজম করিতে পারিলে হয়।'

কি সুন্দর ভবিষ্যৎ! আমরা সকলেই উদরে হস্ত দিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এখন সমগ্র নন্দীগ্রামের সন্দেশ হজম করিবার অবস্থা। বন্ধুপ্রবর দীনু বাবু বড় খুসী হইয়া আমাদিগকে সাদরে সঙ্গে লইলেন। তৈল মাখিয়া জেটীতেই স্নান করিলাম। কারণ, সেখানে হাঙ্গরের প্রাদুর্ভাব। ইহাদিগের উদরের উপরই লক্ষ্য, কিন্তু উদর রক্ষা না করিলে পর্য্যটন বৃথা।

৪

বেলা তিন প্রহর অতীত হইলে তেরোপেক্যা গ্রামে নৌকাযানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গেঁওখালি হইতে একটি খাল রূপনারায়ণ ও হলদী নদীকে যুক্ত করিয়াছে। নৌকা করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক নদীর মুখে একটি

করিয়া 'লক্'। পূর্ব্বে এই খালে ষ্টীমার যাতায়াত করিত। হলুদী নদী পার হইয়া ও আর একটি খালে পড়িয়া উড়িষ্যার যাত্রিগণ জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইত। এখন পুরী পর্য্যন্ত রেল হওয়ায় ষ্টীমার উঠিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় আমরা মহিষাদল পার হইয়া চলিয়া গেলাম।

এই খালের নাম 'হিজলী খাল'। খালে জল অতি অল্প। মৎস্যাদি বড় নাই। একপ্রকার জলজন্তু আছে; তাহা মৎস্যের মত, কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট, ক্ষুদ্রকায়। দেখিতে টিকটিকীর মত। তীরস্থ কর্দ্দমে থাকে, এবং টক্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। বন্ধুবর হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, প্রাণিতত্ত্বে ইহাদিগের একটি রহস্যজনক স্থান আছে। অনেকের মতে, হস্তপদ ও ল্যাজ খসিয়া গেলে ইহারা মৎস্য হইয়া যায়। অনেকে বলেন যে, ইহাদের হস্ত পদ দৃঢ় হইলে টিকটিকী হয়। ইহাদিগের নাম অজ্ঞাত। দার্শনিক বন্ধু বলিলেন যে, টিকটিকী হইলেও ইহারা জলে থাকে, এবং পরে ভবিষ্যৎযুগে কুম্ভীর হইয়া পড়ে। সরীসৃপের মধ্যে গোসাপ ও কুম্ভীর খল। টিকটিকী ধর্ম্মপরায়ণ। যাহা হউক, এই অজ্ঞাত প্রাণিবর্গকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

৫

কেরোপেক্যা গ্রামটি দ্বাপর যুগের বলিয়া বোধ হইল। কোনও রোগ শোক নাই। তবে কখনও কখনও বিসূচিকা হয়। গ্রামের বিশেষত্ব এই যে, সেটা মাঠের মধ্যে, এবং মাঠের বিশেষত্ব এই যে, সেটা গ্রামের মধ্যে। উভয়ে উভয়,—হরিহরাত্মা। মানুষ মাঠে চরিয়া বেড়ায়, এবং গাভীগণ সবৎস গ্রামে চরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। স্ত্রীলোকগণের চুল ছোট ও পুরুষগণের দীর্ঘ।

দীনু বাবুর কাছারী-বাটী পঁহুছিয়া আমরা একটি বৃহৎ আট্‌চালা অধিকার করিলাম। কাছারী-বাটীর নিকটেই একটি পুষ্করিণী; কিন্তু সেটা নূতন কাটান হইয়াছে। মাছ নাই। জল অতিশয় সুমিষ্ট। পূর্ব্বে সেখানে চিনির আড়ত ছিল।

কাছারী-বাটীর মধ্যেই একটা মাঠ, এবং মাঠের পরেই দীনু বাবুর বসত-বাটী। দীনুবাবুর পরিবারবর্গ মহিষাদলের নিকট থাকেন। এখানে কেবল একটি বৃদ্ধা মাতুলানী, খঞ্জ ভৃত্য ও দুটি রাখাল-বালক থাকে।

নিকটেই মিষ্টান্নের দোকান। তাহাতে একই প্রকার মিষ্টান্ন। সেটাকে

সন্দেশ, কিংবা মনোহরা, কিংবা রসকরা, অথবা তিলের নাড়ু বলিতে পারেন। একাধারে বহু মুখরোচক পদার্থ সন্নিবিষ্ট ও সুচারুভাবে মিশ্রিত। প্রত্যহ একই ভার, একই ওজনে প্রস্তুত হয়, এবং প্রত্যহ একই লোকে খায়। খাদ্য ও খাদকের এই চিরন্তন পরিচয় ও স্নেহ-সম্বন্ধ অটুট ভাবে কলের ন্যায় চলিতেছে। কেবল আমাদিগের সমাগমে অর্দ্ধ সের বাড়িয়াছিল।

৬

কণ্ট্রাক্টর বাবু খর্ব্বাকৃতি, শান্তশিষ্ট ও বিজ্ঞ লোক। তিনি দুই বৎসর মৎস্য ধরিতে শিখিয়াছেন। সরঞ্জাম মন্দ নয়। তবে আমার সরঞ্জাম—'অপ্-টু-ডেট্'—অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক রকমের হুইল, সুতা ও বঁড়শী। কলিকাতা হইতে মৎস্য ধরিতে আসিলে একটা তোলপাড় হয়, অনেক লোক জুটিয়া যায়। আমাদের সঙ্গে প্রায় বত্রিশ জন লোক জুটিয়া গেল। তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক, ধোপা ও কৈবর্ত্ত। ধোপার সঙ্গে গোটা কতক গাধা, এবং কৈবর্ত্তের সঙ্গে গোটাকতক ছাগল জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন হইলাম।

গায়ক ও বাদক বন্ধুদ্বয় যন্ত্র তন্ত্র সুসভিব্যাহারে পুষ্করিণীর নিকটস্থ আম্র-কাননে দিব্য সতরঞ্চি বিস্তার পূর্ব্বক আখড়া জমাইতে বসিলেন। দীনুবাবু জমীদারীর হিসাবপত্র-পরিদর্শনের জন্য, আমাদিগের জন্য টাট্‌কা ভেট্‌কীর যোগাড়ের জন্য বাসায় রহিয়া গেলেন। আমাদের পুষ্করিণী দেখাইবার জন্য খঞ্জ ভৃত্য স্বভাবসিদ্ধ অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক হাঁটিয়া আসিল। কণ্ট্রাক্টর বাবু ও আমি একত্র ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ হরিশ্চন্দ্র ও দার্শনিক জগবন্ধু ডাক্তার পশ্চাতে। এই রকম একটা বৃহৎ জনতা করিয়া আমরা পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। খুদীরাম তামাকের বাক্স ও হুঁকা ইত্যাদি লইয়া ঘাটে গিয়া জলস্পর্শ করিল। দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে-ছিলেন।

৭

এই সময় প্রকৃতি-বর্ণনাটা না করিলে শিকারী পুরুষদিগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। স্থানটা বালুকাময়, তাহার উপর খোলা মাঠ, তাহার উপর বৃক্ষহীন, তাহার উপর দিবাকরের প্রখর কিরণ। অর্থাৎ, বালুকার উপর মাঠ, মাঠের উপর বৃক্ষহীনতা, এবং তদুপরি দিবাকর, এইরূপ উপর্য্যু-

পরি একমেটে দক্ষ তপ্ত রঙ্গ, তাহাতে নয়ন ঝলসিয়া যাইবার কথা। আম্র-কাননটা অনেক দূরে। তবে রক্ষা এই যে, পুষ্করিণীর পাড়ে একটা আম্র-বৃক্ষ ছিল। বোধ হয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বাগান হইতে আম্র পাড়িয়া পাড়ে বসিয়া খাইয়াছিল; তাহারই আঁঠির সারভাগ আমাদিগের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির গুণে এখন বৃহৎ বৃক্ষ-রূপে দণ্ডায়মান। আমি বৃক্ষের পার্শ্বেই চার করিলাম। কণ্ট্রাক্টর বাবু রৌদ্রসহিষ্ণু ও চালাক, চটান্ স্থানে রোহিত মৎস্যের চার করিলেন।

আমার সুন্দর চাকচিক্যশালী ছিপ দেখিয়া অনেক রাখাল-বালক ও বালিকাগণ চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া বসিল। একটি আপাদমস্তক স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষ আমার কিয়দ্দূরে উপবেশন করিয়া 'চার্' ও 'টোপ' সম্বন্ধে নানাবিধ পরামর্শ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিল। একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার বালিকা লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আম্রবৃক্ষের ছায়াতে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা হইয়া সভয়ে চাহিতেছিল।

আমি বলিলাম; 'তোমরা সকলে গোল করিও না, কিন্তু নীরবে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। গর্দ্দভ ও ছাগলগুলাকে পশ্চাতে রাখ, নচেৎ টোপ খাইয়া ফেলিবে। আমার দক্ষিণ দিকে কেহ থাকিও না; কেন না, টান্ মারিলে বঁড়শী গায়ে বিঁধিতে পারে।' অতএব পশুগণকে দক্ষিণে রাখিয়া, সকলে বামভাগে আসিয়া, সৌৎসুক্যে শিকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৮

প্রথম আসরে কণ্ট্রাক্টর বাবু জয়ী হইতে লাগিলেন। তিনি তিন ঘণ্টার মধ্যে চারি পাঁচ সের ওজনের দুই তিনটা রোহিত মৎস্য শিকার করিয়া সহাস্যমুখে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমার স্বপক্ষের দর্শকগণ বলিলেন, 'মহাশয় ও দিকে চলুন, ওখানে মাছ শীঘ্র খায়।'

আমি কিঞ্চিৎ চটিয়া গেলাম। 'আমি ছোট মাছ ধরি না। দশ বার সের ওজনের কম হইলে আমার বঁড়শীতে বিঁধিবে না। তোমাদের ভাল না লাগে, ঐ দিকে গিয়া দেখ।'

প্রায় সকল লোকই চলিয়া গেল। কেবল বৃহৎকায়া বালিকা ও আপাদমস্তক স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষ বসিয়া রহিল।

সংসার কি অকৃতজ্ঞ! ভৃত্য খুদীরাম বেগতিক দেখিয়া আম্রকাননে বন্ধুবর্গের নিকট গৌড়সারঙ্গ রাগিণীর তান শুনিতে গেল। তামাক সাজিবার

লোক নাই। আমি সতৃষ্ণনয়নে দীর্ঘকেশ পুরুষ ও বৃহৎকায়া বালিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা তামাক সাজিতে জানেন?'

উভয়ে আগ্রহসহকারে আমার হুঁকার জল বদলাইয়া বেশ এক ছিলিম তামাক প্রস্তুত করিয়া দিল। ক্রমে তাহাদের সহৃদয়তা দেখিয়া আমি বাক্যালাপে রত হইলাম।

দীর্ঘকেশ বন্ধু বলিলেন, 'মহাশয়! ঐ যে কণ্ট্রাক্টর বাবুটি, উনি লোক ভাল নয়। সকলকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। একে প্রজাগণ গরীব, তাহাতে মজুরী খাটিয়া উঁহার নিকট দৈনিক এক আনা মাত্র পয়সা পায়।

আমার শরীর প্রথমে রৌদ্রতাপে জ্বলিয়াছিল, এখন পরদুঃখে আরও জ্বলিয়া উঠিল।

৯

কণ্ট্রাক্টর বাবুকে কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত করিবার নিমিত্ত একটা কল্পনা আঁটিলাম। সেটা অতিশয় সরল ও সহজ উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক ও আধুনিক উভয় যুগে বহু সেনানায়ক যুদ্ধে অল্প আয়াসেই জয়ী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, আমি কসিয়া ছিপে একটা ফাঁকা টান মারিলাম। সুতা ও বঁড়শী ঊর্দ্ধস্থিত আম্রবৃক্ষের ডাল স্পর্শ করিয়া অবশেষে অধঃস্থিত শ্যামল তৃণোপরি শয়ান একটি গর্দ্দভের লাঙ্গুলে বাধিয়া গেল।

বিশ্রামপরায়ণ গর্দ্দভ হঠাৎ বঁড়শীবিদ্ধ লাঙ্গুলের তীব্রব্যথা অনুভব করিয়া সত্রাসে ও সজোরে পলায়ন-পরায়ণ হইল। দ্রুতবেগে এ পাড় হইতে ও পাড়ে দৌড় দিয়া চলিয়া গেল। কণ্ট্রাক্টর বাবুর হুঁকা, চার, টোপ প্রভৃতি পদাঘাতে জলে ফেলিয়া দিল। গ্রহবৈগুণ্য দেখিয়া তিনি জলে লাফাইয়া পড়িলেন। আমি ক্রমাগত হুইলে সুতা ছাড়িতেছিলাম। হুইলের সুমধুর নিক্কণ রাখাল-বালকদিগের হাস্যের সহিত মিশিয়া অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপাদন করিতেছিল।

কণ্ট্রাক্টর বাবু জলে পড়িয়া গেলে আমি গর্দ্দভকে সুতা টানিয়া কিঞ্চিৎ সংবরণ করিতে গেলাম। ফলে গর্দ্দভও জলে পড়িয়া গেল। গর্দ্দভের মালিক ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া লগুড়হস্তে আমার প্রতি সরোষে কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'মহাশয় কচ্ছেন কি? সুতা ঢিল দিন, নচেৎ গর্দ্দভের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া যাইবে'। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিকে সনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করি নাই। অদ্য দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল।

গর্দ্দভের লাঙ্গূল অতিশয় ক্ষীণ, এবং নির্লিপ্তভাবে পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবিষ্ট। টানাটানিসহিষ্ণু বলিয়া মোটেই বোধ হইল না।

১০

গর্দ্দভ কাতরভাবে অদৃষ্টের ক্লেরাফের চিন্তা করিতেছিল। ভাবটা,—'মহাশয়, আমার শরীরের অন্য স্থান লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করুন, কেবল লাঙ্গূলটা ছাড়িয়া দিন।' ইতিমধ্যে আর একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। আম-ডালে একটা প্রকাণ্ড মৌমাছির চাক্ ছিল। তাহা কেহই জানিত না। মদীয় বিরাট টানের সময় চাকের অর্দ্ধ খণ্ড ডাল হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রোধোন্মত্ত মৌমাছিগণ দলে দলে রণস্থলে উড়িয়া, যাহাকে পাইল, কামড়াইতে লাগিল। বুদ্ধিহীনতাবশতই হউক, কিংবা জনতা লক্ষ্য করিয়াই হউক, তাহারা আমার স্বপক্ষীয়গণকে ত্যাগ করিয়া জলময় গর্দ্দভ ও অনাবৃতমস্তক কণ্ট্রাক্টর বাবুর নিকটে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় আমার অন্যান্য বন্ধুগণ নিকটে আসিয়া পড়িলেন। জগবন্ধু ডাক্তার মহাশয় অবস্থা দেখিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, 'সিগারেটের কিংবা কড়া তামাকুর ধোঁয়া দাও, মৌমাছি উড়িয়া যাইবে।' কথাটা সকলের মনঃপূত হওয়াতে আমরা প্রত্যেকে একটা করিয়া সিগারেট ধরাইয়া কসিয়া টানিতে লাগিলাম। ইহাতে মধুমক্ষিকার দল বিরক্তিসহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। কচিৎ দুই একটা বৃহৎ মক্ষিকা হয় ত নেশার লোভে নিকটে থাকিয়া গেল। কণ্ট্রাক্টর বাবু অবগাহমান-অবস্থাতেই সিগারেট টানিতে প্রারম্ভ করিলেন। কেবল গর্দ্দভপ্রবর হতাশভাবে তাকাইতে লাগিল। ভাবটা,—"আমি সিগারেট টানিতে পারিব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'শীঘ্র সুতা কাটিয়া দাও। লাঙ্গুল স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে থাকুক। যাহারা সিগারেট খাইতে পারে না, তাহাদিগের লাঙ্গুল-সঞ্চালন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'

১১

প্রাণিতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, 'ঠিক তাহাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লামার্ক ও লবক্ প্রভৃতির মতে, স্তন্যপায়ী জীব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, 'সম্মুখ-সমরশালী'; চতুষ্পদ জন্তু পশ্চাতের পদদ্বয় মৃত্তিকাতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করে। আঁচড়াইয়া দেয় (যেমন বিড়াল); বিকট ফাবা মারে; যেমন সিংহ ব্যাঘ্রাদি। পশ্চাদ্ভাগ-সংগ্রামরত জন্তু লাথাড়ি মারে,

যেমন অশ্ব, গর্দ্দভ, গাভী প্রভৃতি। ইহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের ন্যায়। ব্যাঘ্রাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

কণ্ট্রাক্টর বাবু বক্তৃতা শুনিয়া বিলক্ষণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক্যানো?'

দার্শনিক বন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার বুঝাইতে লাগিলেন। 'যাহার শরীরের যে ভাগ মূল্যবান, সে স্বভাবতঃ তাহার সম্বন্ধে বিশেষ রক্ষণশীল। গাভী, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর হৃদয় ও মস্তক মূল্যবান, অর্থাৎ, ইহারা ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমার্গে উঠিতে থাকে। সুতরাং সেটা সম্মুখে রাখিয়া ইহারা পশ্চাদ্ভাগ যুদ্ধকার্য্যে ন্যস্ত করে। কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি রাখে না। ইহাদিগের লাঙ্গুল কিন্তু মূল্যবান নহে। বানর, ব্যাঘ্রাদির লাঙ্গুল অতিশয় মূল্যবান। লাঙ্গুলবলে তাহারা লম্ফ ঝম্প দম্ভ প্রভৃতির বিকাশ করিয়া থাকে।' প্রাণিতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, 'ক্রমে মনুষ্যের আকারে পরিণত হইলে সম্মুখ পশ্চাতের তারতম্য অনেকটা অদৃশ্য হইয়া যায়। লাঙ্গুলের পরিবর্ত্তে তাহারা হাত মুখের বিস্তারিত ব্যবহার আরম্ভ করে। আপনারা বোধ হয় বাগ্মি-প্রবরগণের বক্তৃতাকালে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। একবার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ও অন্যবার পশ্চাৎ ও সম্মুখ—মহব্বরের সীপরের ন্যায় ক্রমাগত সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে বক্তৃতা মনোরঞ্জক হয় না। ইহা স্বভাবের নিয়ম। ক্রমবিকাশের চিহ্ন। ক্রমে শীর্ষস্থানে উঠিলে জ্ঞানী মনুষ্য আদিম কীটের ন্যায় বন্ বন্ করিয়া কেবল ঘুরিতে থাকিবে।'

দার্শনিক বন্ধু তাহার মূলতত্ত্ববিস্তার-পরাঙ্মুখ হইয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'অধ্যাপক ক্রুক্স ও স্যর্ কেলভিনের মতে, পরমাণুবর্গ নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া অহরহ এই প্রকার ঘুরিতেছে। না ঘুরিলে জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন হয় না। বিশ্বে মূর্ত্ত পদার্থ এইরূপ ক্রমান্বয়ে ঘুরিলে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিবে। মস্তক ঘুরিবে, শরীর ঘুরিবে। স্বেচ্ছায় ঘুরিতে না পারিলে, নেশা করিয়া, কিংবা কাল্পনিক আহ্লাদে মত্ত হইয়া ঘুরিবে। দেশ বিদেশে ঘুরিবে। ক্রমে এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে চলিয়া যাইবে। কেবল সুখে নহে, দুঃখ পাইলেও ঘুরিবে।'

গর্দ্দভ তখন লাঙ্গুলের ক্ষতজনিত ব্যথায় ঘুরিতেছিল। আমি বলিলাম, 'ঐ দেখ।' কণ্ট্রাক্টর বাবু ডাক্তারের ধী-শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

'তাই ত, জগতে সকলেই নানাবিধ দুঃখে, এবং নানাবিধ সুখে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি পূর্ব্বে এক জন বর্দ্ধিষ্ণু জমীদার ছিলাম। ক্রমে মামলা মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। এখন নিতান্ত পরিশ্রান্ত।' অমনই—

'এসেছি প্রভু তব দুয়ারে,
তুলে লও ক্রোড়ে, নিবিড় আঁধারে—
দেখিতে না পাই নয়নে।'

ইত্যাকার একটা গান শ্রুত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিলাম, সুকণ্ঠ-নিঃসৃত রাগে আম্রকানন প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাদিগের গায়ক বন্ধু দীনু বাবুর সহিত সানন্দে অগ্রসর হইতেছেন।

কন্ট্রাক্টরের পূর্ব্বকথা শুনিয়া আমি করুণরসে পরিপ্লুত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। বলিলাম, 'ভাই, দেখিতেছ ত? দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন করিও না। যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে সেইরূপ মজুরী দিও। আর কি বলিব?'

উভয়ের চক্ষু অশ্রুভারে শ্রাবণ মাসের খড়ের আটচালার মত বিন্দুবর্ষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রামধনুর ন্যায় দৈবী জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া মানবজন্মের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিল।

দীনু বাবু অতি সুন্দর আশাপূর্ণ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, বড় বড় দুইটা ভেট্‌কী মৎস্যের কিনারা হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমরা বাসায় ফিরিলে তিনি কৃতার্থ হইয়া রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিবেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। এ সময় প্রকৃতির শেষ বর্ণনাটা করিয়া লওয়া ভাল। গগনমণ্ডল হতাশ, মলিন, পাণ্ডুবর্ণ। আর জীবনের আশা নাই। তমিস্র-বসনা—জ্যোতিহীন অজ্ঞাত প্রদেশের অভিমুখে লীনা। ঝিল্লীরবাশ্রিত কণ্ঠ-শ্বাস। হস্তপদ শীতল। প্রকাণ্ড তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় সীমন্তে ঈষৎ সিন্দূরাভা, বিকট-তারকাদশনা, চতুর্দ্দিক-পরিব্যাপ্ত হস্তপদশূন্য মৃত্তিকাস্পর্শী পরিধি।

এই যে বিরাট বিশ্ব, তাহার মধ্যে সন্ধ্যা একটা মন্দ ছবি নয়। তবে সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে ভয় হয়। এমন সময় হৃদয়স্পর্শী স্বরে কে বলিল, 'আপনি কি ব্রাহ্মণ?' চাহিয়া দেখিলাম, সেই বৃহদাকারা বালিকা। বালিকার মুখখানি অতিশয় সুন্দর। পূর্ব্বে অমন মুখ দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

আমি লজ্জিত হইলাম। সমস্ত দিন তামাকু সাজিয়া দরিদ্রা বালিকা একটি পয়সা পায় নাই। আমি তৎক্ষণাৎ মণীব্যাগ হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া তাহাকে দিলাম।

বালিকা অবাক হইয়া রহিল! বোধ হয় কাঁদিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিতে না পারিয়া হাসিল। কি সুন্দর হাসি! লজ্জায় ও অভিমানে কাঁদিতে গিয়াছিল, কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখিয়া হাসিয়া পলাইল। যাইবার সময় বোধ হয় চুরি করিয়া, এমন কি, ডাকাতি করিয়া চাহিয়াছিল। সে জমীদার দীনুবাবুর একমাত্র কন্যা সুভদ্রা। আমারা উভয়েই কৈবর্ত্তসন্তান ও যত দূর দেখা গেল—একপ্রাণ! ভবিষ্যতের কথা পাঠক ভাবিয়া লউন।

স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি?

সে অনেকদিনের কথা। গেটের বাহিরে ভাঙ্গা রেলিঙ্গের পাশে একটা কুল গাছের নীচে দাদার সঙ্গে খেলিতেছিলাম। বাহিরে দুই চারিটি লোক অদূরে কথোপকথন করিতেছিল। হঠাৎ মনে হইল, চারি দিকের এ সবই যেন আমি বহু পূর্ব্বে কোথাও কখনও দেখিয়াছি। আর যে কথাগুলি শুনিতেছিলাম—মনে হইতেছিল—তা যেন সব বহুপূর্ব্বের শোনা কথা। এমন কি, কথাগুলি স্পষ্টভাবে কানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবিকল আবছায়া মনে উঠিতেছিল। যেন কথাগুলি স্পষ্ট ভাবে কানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের বহুদূরস্থ অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমার মনে প্রতিফলিত হইতেছিল। এ কি কাণ্ড! এই যে পূর্ব্ব-স্মৃতির আভাস, এই যে একটা অস্পষ্ট ছায়াময়ী স্মৃতির একটা কোমল রেখা, এ কি তবে বহুপূর্ব্বদৃষ্ট বিস্মৃত স্বপ্নের অনুভূতি? বড় খট্‌কা লাগিয়া গেল। পরবর্ত্তী এমন সামান্য ঘটনাও কি তবে এমনই ভাবে এত পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট হইয়া স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া যায়? বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এ যে অলৌকিক ব্যাপার! অলৌকিক ব্যাপারে অবিশ্বাসটা কি তবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়? অল্প বয়সেই অলৌকিক ব্যাপারে বড় একটা অনাস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব বুজরুকদিগের ভৌতিক ও অনৈসর্গিক কার্য্যকলাপগুলির ধূর্ত্ততা বাহির করিয়া গ্রামিক লোকদের কুসংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার অক্ষম ও অজ্ঞান

সন্তান আমরা নিজেদের কোনও বুদ্ধিকৌশল না থাকিলেও, অনৈসর্গিক ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস পোষণ করিতাম। কাজেই স্বপ্নের এইরূপ অলৌকিক প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সহজে প্রবৃত্তি হইল না। অল্পবিস্তর ব্যবধানে আরও দুই চার বার এরূপ হওয়ায় বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল—নিজের মনে প্রবোধ না পাইয়া, কোনওরূপ মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া দাদাকে সব বলিলাম। তিনিও কখনও কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করিয়াছেন, বলিলেন। কেন এরূপ ঘটে, তাহার কোনও মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তবে একটা অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। যদি পরবর্ত্তী ঘটনার কোনও একটি অবস্থা স্বপ্নে পূর্ব্বে কখনও কখনও আভাস পাওয়া যাইতে পারে, তবে বিশেষ অভ্যাসে সবগুলিই পূর্ব্বে না জানা যাইবে কেন? অপরিণতবয়স্ক বালক পূর্ব্ব-দৃষ্টির এইরূপ আভাস পাইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইবার লোভে সময় সময় লোলুপ হইয়া উঠিতে লাগিল! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমরা বড় পাড়াগেঁয়ে—কলিকাতা হইতে বহু দূরে আমাদের বাস। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম রাজধানীতে আসিলাম। মটস্ লেনের একটা ত্রিতল বাড়ীতে আমাদের বাসা হইল। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবুও এ দিক সে দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। দোতালার একটি সুন্দর ঘরে যেমন প্রবেশ করিতেছি—ঘরের এক কোণে একটা চাকর একটা তোরঙ্গ খুলিতেছিল—অমনই হঠাৎ মনে পড়িতে লাগিল, সেই চিত্রিত ঘর, সেই তোরঙ্গ, আর সেই চাকর—চাকরের নিকট দুই একটি আপনার জন ছিলেন, সব পূর্ব্বদৃষ্ট; আর তাঁহারা যাহা বলিতেছিলেন, সবই আমার পূর্ব্বশ্রুত কথোপকথন! আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আর কত দিন পূর্ব্বে এই অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার সময় নিরূপণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে এই পূর্ব্ব চেতনা যেন অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি, বিস্ময়কর ঘটনা! যে স্থানে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই, যাহার অবস্থিতি, আকৃতি, বা অবস্থান সম্বন্ধে কখনও পূর্ব্বে কোনও সংস্কার ছিল না, সেই স্থানে হঠাৎ কবে কখন আসিয়া কি একটা নগণ্য কাজে ব্যাপৃত থাকার বিবরণ সেই দূর দেশে বহু পূর্ব্বে হুবহু ক্রম-পরম্পরায় স্বপ্ন দেখিয়া রাখিয়াছি! ইহাই যদি স্বপ্নের প্রকৃতি হয়, তবে আর মনো-রাজ্যে অসম্ভব রহিল কি?

হঠাৎ পড়ার চাপ পড়িয়া গেল। এ সব খাম-খেয়ালী কথা লইয়া আর ব্যস্ত হইবার অবসর হইল না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে এরূপ অঘটন আর বড় একটা ঘটিল না। ক্রমে সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। তার পর অনেক দিন দেশে বিদেশে ঘুরিতে হইল—কদাচিৎ কখনও পূর্ব্ববর্ণিত-রূপ ভাবাবেশ হইলেও, অন্তরঙ্গ কেহ নিকটে না থাকায়, তাহা আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পাইতাম না। মনের কথা মনেই লয় পাইয়া স্মৃতির অতীত হইয়া যাইতে লাগিল। নিয়তি-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনে বন্ধুসহযোগে একবার প্রভুপাদ * * * গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হইল। শিষ্যবেষ্টিত মহাত্মা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদের সঙ্গে মনোরাজ্যের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণনা করিতেন। শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। অল্পবুদ্ধি, কাজেই কোনও কথাই দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিতাম না বলিয়া উপদেশে কোনও ফল ফলিল না। তবে তাঁহার সেই রহস্যময়ী প্রহেলিকা—তাঁহার গয়াস্থিত "পূর্ব্বজন্মে"র বাড়ীর প্রসঙ্গটা বোধ হয় তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর অপেক্ষা একটু বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম। কথাটা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কোনও মাসিকপত্রেও তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় একবার পর্য্যটনোপলক্ষে গয়ায় গিয়াছিলেন। গয়ার সন্নিহিত এক অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে প্রথম প্রবেশেই তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এ তাঁহার পূর্ব্ব-দৃষ্ট গৃহ!—প্রত্যেক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সব জিনিসপত্রের সন্নিবেশ, দ্বার জানালা, সবই তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি জাতিস্মর হইয়াছেন, মনে করিলেন, এবং সিদ্ধান্ত করিলেন, সেই গৃহই তাঁহার পূর্ব্বজন্মের গৃহ। গোস্বামী মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটা আমি অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি পুনঃপুনঃ যে অস্পষ্ট ছায়া অনুভব করিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় বুঝি তাহাই একবার সেই গৃহে দৃঢ়রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা কি স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি? কে ইহার মীমাংসা করিবে? দর্শন, না বিজ্ঞান? যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, না ঘোর অবিশ্বাসী বিজ্ঞানবিৎ? এ সকল সমস্যায় মানব অনেকটা অবস্থার দাসমাত্র। গৃহশিক্ষকের অনুগ্রহে অল্প বয়সেই বিজ্ঞানে অপরিসীম শ্রদ্ধা হইয়াছিল। আমাদের জন্মের পূর্ব্বে পিতৃদেব নানারূপ ইলেকট্রিক ও ম্যাগ্‌নেটিক যন্ত্র লইয়া নিজ গ্রামে বসিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিতেন। অতি অল্প বয়সে আমরা পিতৃহীন হইয়াছিলাম; সাক্ষাৎভাবে তাঁহার কোনও

উপদেশলাভে সক্ষম না হইলেও, সেই ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপীকৃত যন্ত্ররাশির উপর কেমন একটা অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতঃ বিজ্ঞানকেই সর্ব্ববিধ সমস্যার শ্রেষ্ঠ মীমাংসক বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত হৃত জ্ঞানের পুনরুন্মেষের লোভ তত সহজে মনে বসিল না। আমি যে ছাই মাটী খেলা ধূলার মধ্যে একটা পূর্ব্বচ্ছায়া দেখিতাম, গোস্বামী মহাশয়ের সেইরূপ অবস্থায় ঐরূপ জাতিস্মরত্বের ভাব আসিয়াছিল, তাহাই মনে হইতে লাগিল, এবং একটা যুক্তিমূলক মীমাংসার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম।

একটু একটু করিয়া বিজ্ঞানের "ক—খ" পাঠে অধিক আকৃষ্ট হইলাম। গন্তব্যপথে চলিতে গিয়া যে সব উপদেষ্টারা স্বয়ং বিধিলিপি-পাঠে আপনাদের চিন্তা ও শক্তিকে সর্ব্বথা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চরণতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দূরদেশের পাঠাগারে বসিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের উপদেশ শুনিতে শুনিতে আবার সেই পূর্ব্বাভাসের অবস্থা ঘটিল। ভক্তি-ভাজন অধ্যাপক অতি বিশদভাবে কতকগুলি জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। প্রবেশ-প্রয়াসী হইতে যাইয়া কথাগুলি অস্পষ্টভাবে পূর্ব্বশ্রুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সেই সময়ে জীববিজ্ঞানের উপদেষ্টা মস্তিষ্কের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট এইরূপ পূর্ব্বাভাসের হেতু-নির্ণয়ার্থ প্রশ্ন উঠিল। তিনি জলের মত সব বুঝাইয়া দিয়া অনেক দিনের মানসিক দ্বন্দ্বের শান্তিবিধান করিলেন। তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম; এবং বুঝিয়াছিলাম, নিজের কথায় নিম্নে তাহাই বলিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি সকলে তাহা জলের মতন না বুঝেন, তাহা হইলে সপ্রমাণ হইবে, অধ্যাপকের নিকট যেমনটি বুঝিয়াছিলাম, তেমন করিয়া আর প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

মানবের মস্তিষ্ক একটি দ্বিত্বসমবায়ে যুগ্ম স্নায়ুকোষমণ্ডলী;—মোটামুটি বলিতে গেলে পাশাপাশি ভাবে একভাবাপন্ন দুইটি মস্তিষ্ক বহু স্নায়ু-রজ্জু দ্বারা যুক্ত ও বেষ্টিত হইয়া একটি মস্তিষ্ক-রূপে করোটীর মধ্যভাগে অবস্থিত। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে মধ্য-রেখার দক্ষিণ ও বামভাগে—দক্ষিণভাগস্থ মস্তিষ্ক ও বামভাগস্থ মস্তিষ্ক রূপে দুইটি মস্তিষ্ক বিরাজিত। উভয় মস্তিষ্ক সর্ব্বথা একভাবাপন্ন ও একধর্ম্মাক্রান্ত। বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাত উভয় মস্তিষ্কে একই সময়ে বহির্ভাগস্থ একটি পদার্থ বা কার্য্যের দুইটি প্রতিরূপ

যুগৎপৎ প্রতিফলিত হয়। এই দুইটি প্রতিরূপ সর্ব্বরূপে একনিষ্ঠ হইয়া ঠিক একই সময়ে উদ্ভূত হওয়ায়, মানব চৈতন্যে তাহাদের বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না—এবং সেই জন্য এই উভয় প্রতিরূপ এককালীন সমব্যাপক কার্য্য, চিন্তা, বা ধারণা বলিয়া ঠিক একটিমাত্র কার্য্য, চিন্তা, বা ধারণার ভাবে আমাদের চৈতন্যে উপলব্ধ হয়। দুইটি মস্তিষ্কের দুইটি কার্য্য এইরূপ এককালিক ও সমব্যাপ্ত হইবার প্রধান কারণ—উভয় মস্তিষ্কের কার্য্যের মূল হেতু সমান রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া। শরীরের সব কার্য্য রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; মস্তিষ্কের প্রত্যেক কার্য্য রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া-মূলক। রক্তসঞ্চারের কার্য্যে অতি সামান্য বিপর্য্যয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ু-পদার্থের কার্য্যের বিপর্য্যয় সর্ব্বথা সংঘটিত হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, যদি ঠিক সেইরূপ খুলিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কোনও কারণে এই দ্বিত্ব মস্তিষ্কে যদি রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, তবে এই দুই মস্তিষ্কের দুই প্রতিবিম্ব, ধারণা, বা ধ্বনি, ঠিক সমব্যাপক ও সমকালীন না হইতেও পারে। যদি কখনও এমনটি ঘটে, তবে একই কার্য্যের, একই দৃশ্যের, বা একই ধ্বনির দুই মস্তিষ্কে পূর্ব্বাপর যতই কম প্রভেদ হউক, একই আকৃতি ও একই প্রকৃতি বিশিষ্ট দুইটি কার্য্য, দুইটি প্রতিবিম্ব, দুইটি ধ্বনি আমাদের চৈতন্যে অনুভূত হইবে। এই একই আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট—পূর্ব্বাপরসম্বন্ধযুক্ত দুইটি মানসিক কার্য্যের ব্যবধানের সময়-জ্ঞানের কোনও উপায় নাই। তবে প্রথমটি অস্পষ্ট ও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট অনুভূত হয় বলিয়া, এবং মানসিক কার্য্যের ব্যবধানের সময়গণনার কোনও ভূয়োদর্শন নাই বলিয়া, আমরা অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট বা পূর্ব্বানুভূতটিকে স্বপ্ন, জন্মান্তর, এবং পরানুভূতটিকে বর্ত্তমান বলিয়া ধরিয়া লইয়া, পূর্ব্বটিকে বহুপূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্ন বলিয়া ধরিয়া লই। মনোরাজ্যের এই রহস্য অবশ্যই জটিল, কিন্তু একবার ধারণা করিয়া উঠিতে পারিলে, ইহাতে প্রবেশ করা তত কঠিন নহে। তবে দাঁড়াইতেছে এই যে, কোনও কারণে—দ্বিত্বমস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। ইহা স্বপ্ন, বা পূর্ব্বস্মৃত কোনও ঘটনার পুনরভিনয় নহে; কিংবা জন্মান্তরের স্মৃতিরও স্বপ্রকাশও নহে। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার দুর্ব্বলতাই ইহার জনক। এ যে স্বপ্নও নয়, পূর্ব্বস্মৃতিও নয়। কেবল মস্তিষ্কের —দুর্ব্বলতা। অহিফেন ও মদিরাদির অভ্যাসে এইরূপ

দুর্ব্বলতার আরও বৃদ্ধি হয়। গোঁসাই মহাশয়ের গয়াতে পূর্ব্বজন্মের বাসগৃহদর্শনের সংস্কার তাঁহার ব্যাধিমূলক অতিরিক্ত মর্ফিয়াব্যবহারের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইতেছে।

দশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন ইহা পত্রস্থ হয় নাই। সম্প্রতি একখানি ইংরাজী সচিত্র মাসিকপত্রে এই কথাটি লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, প্রায় ঠিক সেই-রূপেই সেই লেখক এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি ডিকেন্সের ডেভিড্-কপারফীল্ড, স্কটের গাইমেনর হইতে, এবং রোসেটি, কোল্‌রিজ, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সকল মনস্বীদের জীবনেও এবংবিধ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। কাজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কেবল যে দুর্ব্বলচিত্ত, রুগ্ন-মস্তিষ্ক, অহিফেন-মর্ফিয়া-সেবীদেরই এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা নহে। প্রতিভাশালী মনস্বীদের জীবনেও এইরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে, এবং হইতে পারে। কথাটা একটু ব্যক্তিগতভাবে আশাপ্রদ। প্রবন্ধলেখকের জীবনে এইরূপ ঘটনা পুনঃপুনঃ হইয়া থাকিলেও, তিনি নিরবচ্ছিন্নরূপে অহিফেনসেবী বা দুর্ব্বল-মস্তিষ্কদের দলে পড়িতেছেন না! আশার কথা বটে।

শ্রীবনয়ারীলাল চৌধুরী।

বাণান-সমস্যা।*

[ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র পরিশিষ্ট।]

আজকাল বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা একটা বিষম কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আইনের ভয় ত আছেই, তাহার উপর আবার ঘরের বিভীষণদের তাড়া, গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ। সমস্যা অনেক। কোন্ হরপে লিখিব, কোন্ রীতি (style) ধরিব, কোন্ শ্রেণীর শব্দ লইব, কোন্ ব্যাকরণ মানিব, কোন্ পথে

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তদশ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

রাজপরিবার।

বসুমতী প্রেস।

সাহিত্য-রথ চালাইবে, ইহা দেখি [illegible] প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। উভয়দিকেই উভয়-সঙ্কট। বাঙ্গালা ভাষা দেখিতেছি ইংরাজি সংস্কৃত ল্যাটিন গ্রীক অপেক্ষাও কঠিন। ঐই জন্যই কি এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পঠন-পাঠন বন্ধ ছিল? এবং এখনও বিষয়ের গুরুত্ববোধে, এ ভাষায় লেকচার দায় দিলেও চলে, এইরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে?

প্রথমে হরপের বাঙ্গালার কথাই তুলি। ব্রাহ্মী খরোষ্ঠীর দিন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জড় মরে নাই। কেহ প্রচলিত বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কারসাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নবাবিষ্কৃত হরপ ঢালাই পালাই করিতেছেন, পুরাতন হরপের কাটছাঁট করিতেছেন, অক্ষরসংখ্যা বাড়াইয়া কমাইয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরের স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করিতেছেন, উদ্যোগ-পর্ব্বের ব্যাপারে পুস্তক-প্রকাশ আপাততঃ স্থগিত। কেহ কেহ বা চলন-[illegible] অহিঙ্কারনীতির আশ্রয় লইয়াছেন ও প্রচলিত বাঙ্গালা অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া (ভারতীয় black letter) কাঁকড়া অক্ষর চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি, সমগ্র ভারতে যখন এক [illegible] তখন এক লিপি এক ভাষা এক ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া উচিত। সেই সত্যযুগ, সেই স্বপ্নের রাজ্য, [illegible] divine event to which the whole [illegible] জানিনা। যাহাইউক, এটা নূতন [illegible] বাড়াবাড়ি করিয়া তুলে নাই।

বুনোনীতির ক্ষেত্রে [illegible] লোকসমাগম চলিতেছে, সভাবক্তৃতা [illegible] লইয়া দলাদলি চলিতেছে [illegible] বাংলা অক্ষর [illegible] ইহা লইয়াও [illegible] মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে [illegible], কেহ [illegible] ব্যতীত [illegible]; কেহ প্রত্নতত্ত্ব [illegible] দ্বারা [illegible] শরণ [illegible] উদ্ভেজিত [illegible]

ও তরল উপন্যাস এবং চটুল রঙ্গরস একদম বন্ধ না করিলে সাহিত্যের উন্নতি হইবে না।

গত বর্ষে বর্ণমালা লইয়া দুটা কথা বলিয়াছি। এবার বাণান লইয়া দুটা কথা বলিব। গত বর্ষে যখন বর্ত্তমান লেখকের দৌড় বর্ণমালা পর্য্যন্ত ছিল, তখন এক বৎসরে এক লম্ফে রচনারীতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি বড় বড় অঙ্গে দখল হইবার কথা নহে। এবৎসর বাণান পর্য্যন্তই সীমামুড়া হওয়া উচিত। শনৈঃ পন্থাঃ। এইরূপ ক্রমিক অভিব্যক্তিই বিজ্ঞানসম্মত।

বাণানের কথা তুলিতে গেলেও বৈজ্ঞানিকের হাত এড়াইবার যো নাই। এখানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। না হইবেই বা কেন? সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যসম্মিলনের একাধিক সভাপতি বৈজ্ঞানিক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার। আমাদের মত নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিকের অনধিকারপ্রবেশ। বৈজ্ঞানিক বলেন, বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের সংস্কার আবশ্যক, নতুবা বিশুদ্ধ উচ্চারণ আসিবে না; নূতন হরপ উদ্ভাবন আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত বাণান হইবে না। যতদিন এই দুইটি সংস্কার না হইতেছে ততদিন বাণান-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অতএব মোকদ্দমা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (sine die) মুলতুবী থাকুক।

অনেকে কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। 'স্বল্পঞ্চ আয়ুঃ' বলিয়া উপস্থিত যাহা আছে তাহা লইয়াই কায চালাইতেছেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান, ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান, অজন্ত-হসন্ত-জ্ঞান, 'স্বরের' ন্যায় 'অন্তঃস্থ য় রিভেদ, ঋক্ষ বিভেদ, অন্তঃস্থ ব বর্গ্য ব বিভেদ, র ড় বিভেদ, ঋ রি বিভেদ, ইত্যাদি লইয়া নানান হাঙ্গামা। ইহা ছাড়া চন্দ্রবিন্দুর ভেজাল জুটিয়াছে, বিসর্গ বাহাল বরতরফ হইতেছে, ইত্যাদি অনেক গোলযোগ। বাণান-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। সমস্যা-পূরণ করিতে না পারি এই প্রবন্ধে সমস্যার কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

(১) হসন্ত-মহোৎসব।

১। সংস্কৃত ভাষায় যেগুলি হসন্ত শব্দ (বা পদ), বাঙ্গালায় লিখিবার সময় অনেকে সেগুলির হসন্ত-চিহ্ন দেন না। বোধ হয় ছাপাখানার হাঙ্গামা ও লেখার পরিশ্রম কমাইবার জন্য এরূপ করা হয়। হয়ত হসন্ত-চিহ্নে

অসুন্দর দেখায়, সেই জন্য এরূপ করা হয়। কিন্তু ইহার দরুণ একটা অনর্থ ঘটে। ইহাতে ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের বিঘ্ন জন্মে। এ রকম ছাপা দেখিতে দেখিতে অল্পশিক্ষিত লোকে ভুল শিখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ব্যাধি সংক্রামক হইয়া অসাবধান লেখকদিগকে পর্যন্ত ধরিয়া বসে। বেদ ও উপনিষদ্, পারিষদ ও পরিষদ্, পদ আস্পদ ও আপদ্ বিপদ্ সম্পদ্, শীত ও শরৎ, ভারত ও জগৎ, নিদ্রিত ও জাগ্রৎ, ভূত ও ভবিষ্যৎ, ভাগবত ও ভগবৎ, বঞ্চিত ও কিঞ্চিৎ, বয়স ও বয়স্, রাক্ষস ও রক্ষস্, অনুমান ও হনূমান্, বর্ত্তমান বিদ্যমান দেদীপ্যমান রোরুদ্যমান ও শ্রীমান্ মূর্ত্তিমান্ বুদ্ধিমান্, পঞ্চবাণ ও বলবান্, ধিক ও অধিক, এইরূপ অজন্ত ও হসন্ত দুই শ্রেণীর শব্দ একরূপ লিখিলে তাহার জের অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। ইহার ফলে, 'নিবাপদেব' পাঠ পত্রে চলিয়াছে, 'সততা' এই উদ্ভট শব্দ অভিধানে উঠিয়াছে, মহানতা (মহান্ তা, মহৎ+তা) সাহিত্য-গ্রন্থে উঠিয়াছে, 'মহদেচ্ছা', 'সুহৃদোত্তম', 'বয়সোচিত' 'জাগ্রতাবস্থা' 'পৃথকান্ন', বিদ্যুতাগ্নি', প্রভৃতি সন্ধি হইতেছে, শতৃ-প্রত্যয়ান্ত 'জাগ্রৎ' জাগ্রত হইয়াছে ও স্ত্রীলিঙ্গে (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত জাগরিত শব্দের সঙ্গে গোল হইয়া?) 'জাগ্রতা' হইয়া বসিয়াছে। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় উদাহরণ-সংগ্রহ ও বিচার করিয়াছি।

কখন কখন উল্টা উৎপত্তি হইতেও দেখা যায়। 'দেদীপ্যমান' প্রভৃতি শানচ্ প্রত্যয়ান্ত পদে 'হসন্ত 'ন্' দেখিয়াছি। 'ত' 'ৎ' দুইটি পৃথক্ পৃথক্ হরপ সত্ত্বেও, উচিত, অদ্ধিত, কুৎসিত, উৎপাত, সঞ্চিত, খদ্যোত প্রভৃতি শব্দের শেষের 'ত' 'ৎ' ছাপা হইতে দেখিয়াছি। এ সব স্থলে হয় ত কম্পোজিটারের দোষে এরূপ ঘটে। তাহারা না বুঝিয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া বসে।

২। বাঙ্গালায় অনেক সময়েই 'অ'কার অনুচ্চারিত। উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য এ সকল স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইলে প্রায় প্রত্যেক শব্দেই এক বা একাধিক হসন্ত-চিহ্ন লাগাইতে হয়। কিন্তু সেরূপ করিলে লেখক ও কম্পোজিটারের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, পরন্তু অতি বিশ্রী দেখাইবে। সংস্কৃত হসন্ত শব্দের সঙ্গে একটা গোলমালও ঘটিবে। এরূপ হসন্ত-চিহ্নের ছড়াছড়ি উচ্চারণানুযায়ী বাণানের (Phonetic spelling) বাড়াবাড়ি বই আর কিছুই নহে। পাঠকগণের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। শিশু ভিন্ন

অন্য কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে শিশুপাঠ্য পুস্তকে শিশুর সহজজ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হইবে, ইহা একটা বিচার্য্য বিষয়। যে সকল স্থলে বয়স্ক পাঠকেরও অর্থগ্রহের গোল হইতে পারে, সে সকল স্থলে হসন্তচিহ্ন দেওয়াই সঙ্গত। যথা, কখন কখন, কোন কোন, কর (ক্রিয়া) কর (অবজ্ঞায়); (কর=হস্ত, এখানে বাঙ্গালায় হসন্ত উচ্চারণ হইলেও হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।) ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় লিখিয়া যখন তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবশ্য সুবিধার জন্য হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত।

(২) বিসর্গবিসর্জ্জন।

বিভক্তির বিসর্গ (যথা, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ, শকাব্দাঃ, বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ), প্রত্যয়ের বিসর্গ (যথা স্বতঃ পরতঃ, ইত্যাদি), এমন কি, শব্দের স্বাভাবিক বিসর্গও বাঙ্গলায় অনেকে বাদ দিয়া বসেন। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ত দেখিতে পাই, 'ক্রমশঃ, ফলতঃ, বস্তুতঃ, বিশেষতঃ' প্রভৃতি স্থলে বিসর্গের পাট একদম উঠিয়া গিয়াছে। অনুস্বার, বিসর্গ দিলেই সংস্কৃত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় এরূপ করা হয় কি না, জানি না।

অনেক সময় (False analogy) অলীক সাদৃশ্যের দরুণ বা অনুপ্রাসের খাতিরে বিসর্গবিসর্জ্জন ঘটিয়াছে। অনেকেরই বোধ হয়, 'বনমাঝে কি মনমাঝে' বাঁশীর গান রহিয়া রহিয়া বাজে। 'যক্ষ'র দেখাদেখি রক্ষঃ (যথা, 'যক্ষরক্ষনরক্রাস'), 'কক্ষ'র দেখাদেখি বক্ষঃ (যথা, 'কক্ষে বক্ষে ভালে কলঙ্ক-লিখন') 'প্রাণ'এর দেখাদেখি মনঃ, 'বায়ু'র দেখাদেখি আয়ুঃ, 'ছেদ'এর দেখাদেখি মেদঃ, 'সুখ'এর দেখাদেখি দুঃখ, 'যতি'র দেখাদেখি জ্যোতিঃ, 'অদ্য'র দেখাদেখি সদ্যঃ, 'কন্থা'র দেখাদেখি পন্থাঃ, 'প্রভাত'এর দেখাদেখি প্রাতঃ, 'যম'এর দেখাদেখি তমঃ, 'ব্রজ'র দেখাদেখি রজঃ, 'ইক্ষু'র দেখাদেখি চক্ষুঃ, 'লয়' 'ব্যয়'এর দেখাদেখি পয়ঃ বয়ঃ, 'পয়' 'বর'র দেখাদেখি সরঃ, 'কুহু'র দেখাদেখি মুহুঃ, 'শ্বেত'র দেখাদেখি রেতঃ, 'মন্দ'র দেখাদেখি ছন্দঃ, 'ধেনু'র দেখাদেখি ধনুঃ, 'শিরা'র দেখাদেখি শিরঃ[১] 'জপ'এর দেখাদেখি তপঃ, 'রিপু'র দেখাদেখি বপুঃ, বিসর্গ

১। সংস্কৃত 'ছন্দ' শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অন্য অর্থ। সংস্কৃত অভিধানে 'শির' ও 'ধনু' শব্দ দেখিয়াছি। পিঙ্গং [illegible] 'শরশিরে,' 'অর্ত্তং বদ্যাৎ শিরোপরি' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনও

হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রচলিত আরও কতকগুলি শব্দের বা পদের এই দশা ঘটিয়াছে। যথা অন্তঃ, বহিঃ, অধঃ, পুনঃ, উচ্চৈঃ, শনৈঃ, স্বঃ, ভূয়ঃ, পরঃ, চন্দ্রমাঃ, শকাব্দাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ, বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, মুহুর্মুহুঃ, অহরহঃ, মাভৈঃ, তস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, চশস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে হসন্তের দৌরাত্ম্যের কথা বলিয়াছি, বিসর্গান্ত শব্দের (বা পদের) বেলায়ও তাহার জের আসিয়াছে। * বিসর্গের উচ্চারণ প্রযত্নসাধ্য বলিয়া আলস্যবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহার পরের (stage) অবস্থায় যে স্বরে বিসর্গ ছিল, সেটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে, ফলে হসন্ত উচ্চারণ হইয়াছে। যথা, স্রোতঃ, তেজঃ, মনঃ, পয়ঃ, যশঃ, নেদঃ, শিরঃ, রজঃ, রেতঃ। [দুঃখের বিষয়, দুঃখের মাঝে পড়িয়া বেচারা বিসর্গ সাধারণ উচ্চারণে লুপ্ত]। 'চক্ষুঃ'র অবস্থা আরও শোচনীয়; চক্ষুঃ হইতে চক্ষু, তাহা হইতে চক্ষ, পর্য্যন্ত হইল; তবুও যখন হসন্ত উচ্চারণ করা গেল না, তখন অপভ্রংশে 'চোখ' করিয়া আকারের উচ্চারণ খসান হইল। ধন্য অধ্যবসায়!

সমাস ও সন্ধির স্থলে এই বিসর্গবিসর্জ্জনের ফল শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মনচোরা, মনমোহন, মনন্ত, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুদান প্রভৃতি 'সমস্ত' পদ, ছন্দৈশ্বর্য্য, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোত্তিন্ন, মনাগুন, মনান্তর প্রভৃতি সন্ধি-সমাস-গ্রথিত পদ, জ্যোতীন্দ্র, তেজেন্দ্র, তেজেশ প্রভৃতি নাম আসিয়া যোটে, 'ব্যাকরণবিভীষিকা'র সমাস ও সন্ধি প্রকরণে উদাহরণমালা-সংগ্রহণ ও এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছি। অবশ্য, বিসর্গান্ত শব্দে বাঙ্গালায় বিভক্তি যুড়িবার সময় বিসর্গলোপ অবশ্যম্ভাবী। 'মনে' 'বক্ষে' 'প্রাণে' না লিখিয়া কিছু আর 'মনেঃ' 'বক্ষেঃ' 'প্রাণেঃ' লিখিব না। এ অবস্থায় আনন্দমনে, আনন্দসরে (সরঃ শব্দ), বিশালবক্ষে, পয়ারছন্দে, নদীস্রোতে, দীপাবলিতেজে প্রভৃতি প্রয়োগে দোষ দেখা যায় না। দিব্যচক্ষে,

---

আছে। সংস্কৃত অভিধানে 'অপ্সরা' শব্দ আছে, বাঙ্গালায় অপ্সরা ত দেখিয়াছি, অপ্সর অপ্সরীও দেখিয়াছি।

*। দুই এক স্থলে বিসর্গ=স্, অকারান্ত [illegible]। যথা বয়ঃ=বয়স্=বয়স। তমসাবৃত তমসাচ্ছন্ন প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়ার পদ [illegible] হইয়াছে, অতএব এগুলি ভুল নহে, পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। [illegible] স্থানেও দেখিয়াছি

চর্ম্মচক্ষে, মানসচক্ষে, একটু স্বতন্ত্ররকমের, তবে এগুলিরও খুব চল, বাঙ্গালায় একটা 'চক্ষ' শব্দ না ধরিলে উপায় নাই।

পক্ষান্তরে, (আপাততঃ এ দেখাদেখি ?) প্রত্যুত, সতত, হয় ত প্রভৃতি-তেও কেহ কেহ বিসর্গ দিয়া বসেন। 'করত'র বিসর্গ আসে কোথা হইতে ?

(৩) আকারগ্রহণ।

অকারের উচ্চারণ লইয়া বাঙ্গালায় একটা বিষম সমস্যা। যেমন অনেক স্থলে ইহা অনুচ্চারিত, তেমনি অনেক স্থলে আবার 'অ'কার 'আ'কার হইয়াছে। এই উচ্চারণানুযায়ী বাণানও চলিয়াছে। আকারের ব্যাপারে সাধুভাষার শব্দের কি দশা ঘটিয়াছে তাহা 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় ভোলফেরা শব্দের উদাহরণমালায় দেখাইয়াছি। সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশের বেলায় তো ইহার পূর্ণ প্রকোপ। যথা পদান্তে। মোয়া (মোদক) ঘোড়া (ঘোটক), যোড়া (যুগ্ম), লোহা (লৌহ), রূপা (রৌপ্য), তামা (তাম্র), সীসা (সীসক), সোণা (স্বর্ণ), কাঁসা (কাংস্য), গোরা (গৌর), কলিকাতায় ঘট্‌কা (ঘটক) ও বাম্‌না (বামুন) শুনিয়াছি। পদমধ্যে। হাত (হস্ত), চাক (চক্র), পাঁক (পঙ্ক), চাঁদ (চন্দ্র), ষাঁড় (ষণ্ড), শাঁখ (শঙ্খ), রাশ (রশ্মি), বান (বন্যা), চাম (চর্ম্ম), ঘাম (ঘর্ম্ম), কাম (কর্ম্ম), ছাঁদ (ছন্দঃ)। উভয়ত্র শাঁখা (শঙ্খ), যাঁতা (যন্ত্র), হাত (হস্ত), চাকা (চক্র), চাঁপা (চম্পক), কাণা (কর্দ্দম), ছাতা (ছত্র), পাখা (পক্ষ), মাথা (মস্তক), চাঁদা (চন্দ্র), কাঁপা (কম্প), বাঁকা (বঙ্ক), বাছা (বৎস)। পদের আদিতে। আন (অন্য), কাণ (কর্ণ)।

অবশ্য এ সব খাঁটী বাংলা শব্দের 'আ'কার কেহ উঠাইতে পারিবে না। সাধুভাষার শব্দগুলিতেও 'আ'কার এরূপ মৌরসী পাট্টা করিয়া লইয়াছে যে, তাহা আর এখন উঠান অসম্ভব। সাধুভাষার শব্দের বেলায়, শেষে 'আ'কার আসিয়াছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যত্রও এরূপ ঘটিয়াছে, যথা আমাবস্যা, দশহারা (সাধারণ উচ্চারণ) অনুপাম্ (প্রাচীন কাব্যে)। *

* পক্ষান্তরে, কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত শব্দের 'আ'কার অপভ্রংশে 'অ'কার হইয়াছে। যথা,—শিলা 'শিল' হইয়াছে, নিরা 'শির' হইয়াছে, ধারা 'ধার' হইয়াছে, শালা 'শাল' হইয়াছে (যথা ঢেঁকীশাল হাড়িশাল), চূড়া 'চুড়' হইয়াছে, 'শাখার 'শখ' উচ্চারণ স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়।

উচ্চারণের এই ঢেউ সন্ধিস্থলে পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। 'পৃথগান্ন,' 'ভয়াঙ্কার', 'অনাটন', দুরাবস্থা', 'দুরাদৃষ্ট', ইহারই ফল নহে কি? কেহ কেহ, অনাটন'কে খাঁটী বাংলা প্রমাণ করিতে 'অনা' উপসর্গ যোটান; 'দুরা' উপসর্গও খাঁটী বাংলায় আছে না কি? এ স্থলে 'আ' উপসর্গ ধরিলে রাখা যায়। 'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'য'ফলা উচ্চারণের দোষ, এই উভয়ের সমবায়ে অধ্যায়ন, অনুমত্যানুসারে, ভূম্যাধিকারী, আয়ুর্দ্ব্যান্ন, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি প্রভৃতি বাণানের উদ্ভব নহে কি? [ব্যয়, ব্যক্তি, ব্যঞ্জন, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যতীত, ব্যবসায়, ব্যসন, ব্যভিচার, ব্যতিরিক্ত, ব্যতিক্রম প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা বিকৃত উচ্চারণ সকলেই জানেন। এই বিকৃত উচ্চারণ শুনিয়া শুনিয়া লোকে যদি 'ব্যায়' 'ব্যেক্তি' প্রভৃতি ভুল বাণান লিখিয়া ফেলে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।]

'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'ব'ফলা উচ্চারণের দোষ এই উভয়ের সমবায়ে 'পশ্বাধম' হওয়া সম্ভব। ['ব' এর প্রকৃত উচ্চারণ না করাতে বশম্বদ, এবম্বিধ, কিম্বা, অপরম্বা, সম্বরণ, বারম্বার, কিম্বদন্তী, স্বয়ম্বরা, ইত্যাদি অশুদ্ধ বাণান 'বশংবদ' প্রভৃতির স্থলে চলিত হইয়াছে।]

(৪) চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়।

বাঙ্গালায় যেমন বিসর্গের বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার চন্দ্রবিন্দুর উদ্ভব হইয়াছে। বাস্তবিক, চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়ে বাঙ্গালা ভাষা-বারিধি দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বৃহস্পতির উপগ্রহের ন্যায় বাঙ্গালা বর্ণমালার এই উপগ্রহের আবিষ্কারের জন্য কে ধন্যবাদার্হ, জানি না। সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর উৎপাত দুই একটা সন্ধিস্থলে ভিন্ন বড় একটা ছিল না। রাঢ় দেশের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু একটা বিশেষত্ব; ক্রিয়াপদে পর্য্যন্ত গিঁয়েছে, খেঁয়েছে ইত্যাদি উচ্চারণ আসে। কতকগুলি বিশেষ্যপদ রাঢ় বাগড়ী উভয় অঞ্চলেই চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারিত হয়; তবে সব স্থানের উচ্চারণ এক নহে;-আমাদের জেলায় (নদীয়ায়) ঘোঁড়া, (গাছের) গোঁড়া, চাঁট, চাঁটা, হাঁই, ইত্যাদি উচ্চারণ হয়, কলিকাতায় হয় না। আবার কলিকাতা অঞ্চলে মোঁশা, চিঁড়ে, প্যাঁকাটি, কোঁড়া (ফোটক), প্যাঁড়া ইত্যাদি উচ্চারণ। পূর্ব্ববঙ্গ চন্দ্রবিন্দুবর্জ্জিত বলিয়া আমরা টিটকারী দিই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণই হিসাবমত ধরিতে গেলে শুদ্ধ।

চন্দ্রবিন্দু সাধুভাষার শব্দকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। পূঁষ (পূষ), তুঁষ (তুষ), কাঁচ (কাচ), শাঁপ (শাপ), পাঁচন (পাচন), এই পাঁচটি শব্দের উচ্চারণে, এবং কখন কখন বাণানে ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ হইয়াছে, এ কথা ব্যাকরণ-বিভীষিকায় ভোলকেরা শব্দের বিচারে বলিয়াছি। অপভ্রংশের বেলায় ত চন্দ্রবিন্দুর পূর্ণ প্রকোপ। এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা অনুস্বারের (অর্থাৎ অনুনাসিক বর্ণের) বিলোপ ঘটিলে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সেই বর্ণের মৃত্যুচিহ্ন জ্ঞাপন করে। উদাহরণ, যথা—

ঙ পাঁক (পঙ্ক), আঁক (অঙ্ক), বাঁকা (বঙ্ক), শাঁখ ও শাঁখা (শঙ্খ)। আঙুলের বেলায় কিন্তু অনুনাসিক বর্ণও থাকিয়া গিয়াছে, অথচ চন্দ্রবিন্দুও আসিয়া যুটিয়াছে।

ঞ আঁচল বা আঁচলা (অঞ্চল), আঁজুল বা আঁজলা (অঞ্জলি); পাঁচ (পঞ্চ), কুঁচ (গুঞ্জা), খোঁড়া (খঞ্জ), পাঁজি (পঞ্জিকা), গাঁজা (গঞ্জিকা), ছেঁচা (সিঞ্চ্), মোঁছা (মুঞ্চ্), কোঁচা (কুঞ্চ্)।

ণ ষাঁড় (ষণ্ড), ভাঁড় (ভাণ্ড), ঢোঁড়া (ডুণ্ডুভ), খাঁড় (খণ্ড), দাঁড়ান (দণ্ডায়), পিঁয়াজ (পলাণ্ডু), কাঁঠী (কণ্ঠী), কাঁটা (কণ্টক), কাঁটাল (কণ্টকী ফল), বাঁটা (বণ্টন করিয়া, ভাগ করিয়া দেওয়া), ঘাঁটা (ঘণ্ট), শিঁড়ি (শ্রয়ণী, শ্রেণী)।

ন ইহার উদাহরণ সব চেয়ে বেশী। কয়েকটিমাত্র দিলাম—চাঁদ (চন্দ্র), দাঁত (দন্ত), যাঁতা (যন্ত্র), গাঁট বা গিঁট (গ্রন্থি), খোঁড়া (খনন), আঁত (অন্ত্র), বাঁঝা (বন্ধ্যা), আঁধলা (অন্ধ), বঁধু (বন্ধু), বাঁধা (বন্ধন, বন্ধক), রাঁধা (রন্ধন), ঠাঁই (স্থান), সাঁঝ (সন্ধ্যা), গাঁথা (গ্রন্থন), কাঁদা (ক্রন্দ্), সাঁতার (সন্তরণ), তেঁতুল (তিন্তিড়ী), সিঁধ (সন্ধি), সিঁদুর (সিন্দূর), কাঁধ (স্কন্ধ), আঁধার (অন্ধকার), বোঁটা (বৃন্ত), ইঁদুর (উন্দুর), তাঁত (তন্ত্র), কাঁথা (কন্থা), ছুঁচা (ছুছুন্দরী), ছাঁদ (ছন্দঃ), বাঁদর (বানর)।

ম ভুঁই (ভূমি), ধোঁয়া (ধূম), রোঁয়া (রোম), গোঁসাই (গোস্বামী, এককালে গোসাঞী ছিল), কাঁপা (কম্প), গোঁফ (শুম্ফ), চাঁপা (চম্পক), গোঁয়ান (গমি ধাতু হইতে), আঁষ (আমিষ), সীঁথা (সীমন্ত, এখানে 'ম' 'ন' উভয়ই গেল), আঁব (আম

কলিকাতায়) বাঁশ (বংশ), বাঁশী (বংশী), পাঁশ (পাংশু), ডাঁশ (দংশ), সাঁড়াশী (সন্দংশ), ('ং' 'ন' উভয়ই গেল) আঁশ (অংশু, পাটের আঁশ), কাঁসা (কাংস্য), হাঁস (হংস)।

[হাঁসের দেখাদেখি হাঁসপাতাল!]

এই নিয়মের ব্যভিচারও কিন্তু দেখা যায়। অর্থাৎ, অনুনাসিক বর্ণ গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দু আসে নাই। যথা—

ঙ. শিকল (শৃঙ্খল), টাকা (তঙ্কা)।

ঞ মাজন (মঞ্জন), কিছু (কিঞ্চিৎ)।

ণ লুঠ (লুণ্ঠন), ম্যারাপ (মণ্ডপ?), মোড়ল (মণ্ডল), সেকরা (স্বর্ণকার)।

ন মাদুর (মন্দুরা)।

ম লাফ (লম্ফ), রাশ ও রশি (রশ্মি)।

ং দাড়া (দংষ্ট্রা), বিশ (বিংশ), ত্রিশ (ত্রিংশ), মাস (মাংস)।

কিন্তু কতকগুলি স্থলে, যেখানে অনুনাসিকের নাম গন্ধ নাই, সেখানেও চন্দ্রবিন্দু উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছে যথা,—আঁখি (অক্ষি), কাঁখ (কক্ষ), ঢেঁকি (ধক্ক), হাঁসি (হাস), পুঁথি (পুস্তক), পুঁতুল (পুত্তলিকা), খাঁড়া (খড়্গ), ঘোঁড়া (ঘোটক), প্যাঁড়া (পেটক), ফোঁড়া (স্ফোটক, ও ছিদ্র করা অর্থে), পোঁতা (প্রোথ), ইঁট (ইষ্টক), ফোঁটা (স্ফোট), চাঁটি চাঁটি (চপেট), যূঁই (যূথী), জোঁক (জলৌকা), চিঁড়ে (চিপিটক), কুঁজো (কুব্জ), পুঁই (পূতিকা), ছুঁচ (সূচি), সাঁচা (সত্য), জিঁত (জি ধাতু হইতে), উঁচু (উচ্চ), ছাঁদা (ছিদ্র), চেঁচান (চীৎকার), শাঁস (শস্য), ঠোঁট (ওষ্ঠ), পেঁচা (পেচক), পাঁকাটি (পাট কাঠী), কাঁকুড় (কর্কটিকা), কাঁকড়া (কর্কট), বাঁকী (বক্রী?), ফাঁকি (ফক্কিকা), পীঁড়ি (পীঠ)। ভ্রম বুঝাইতে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার। এ সকল স্থলে চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব কেন হয়? রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা থলিতে কি আছে জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থক অনুনাসিক প্রয়োগ করিয়া 'হাঁতী' বলিয়াছিল। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে আমরা ত সকলেই কাবুলীওয়ালা! অপভ্রংশগুলির কোনও কোনটিতে কখনও কখনও (যথা, পুথি, পুতুল, হাসি, ইট), ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দু থাকে না দেখি। বাকীগুলির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য? এ সকল স্থলে নিজের নিজের অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে লিখিলে ত মুস্কিল হইবে। কতকগুলি স্থলে চন্দ্রবিন্দুর মৌরসী

স্বত্ব জন্মিয়াছে, লোপ করা কাহারও সাধ্য নহে, যথা সম্ভ্রমার্থে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার (এনম্?)।

এই প্রসঙ্গে 'খোকার দপ্তর', 'শিশুতোষ', 'মোহনভোগ' প্রভৃতি মনোহর শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয়ের পেটকাটা 'ব'র উড়িষ্যাযাত্রা' নামক সুন্দর ব্যঙ্গকবিতার একাংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চন্দ্রবিন্দুরূপে হসন্ত মকার ছাইয়া ফেলিল ভাষা।
যত আম ছিল হয়ে গেল আঁব, আখিগুলি হল আঁখি,
কাচগুলি সব হয়ে গেল কাঁচ ফক্কিকা হ'লেন ফাঁকি।
আমাকে ধরিল তাঁবাক চেহারা অবাক্ দেখিয়া সবে।
হাসিকে শুনিয়া হাঁসিতে, দেশটা ফাটিল হাসির রবে।

স্কোটকেরে "কোঁড়া" পোটলী "পুঁটুলী" দেখে হয় অনুমান,
মাসীর উপর ডাকিয়া গিয়াছে চন্দ্রবিন্দুর বান।
হায় সে অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া সকলে পাইল ভয়—
বিনাযুদ্ধে রাজ্য রাণী—শূর্পণখা কখন করিল জয়?

ময়মনসিংহের সুরসিক কবির এই বিদ্রূপবাণীর উত্তরে আমাদের (দক্ষিণবাঙ্গালীবাসীদিগের) কি বলিবার আছে? ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র।

[G. De Lafontaর ফরাসী হইতে।]

যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সেই সাদাসিধা মৌলিক সূত্রগুলির মধ্যে আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি প্রায় শাক্যসিংহের সমসাময়িক। কেন না, শাক্যসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, যে প্রথম ধর্ম্ম-পরিষদের অধিবেশন হয়, সেই পরিষদে এই সূত্রগুলি বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় পরিষদেও এইগুলি অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের ধর্ম্ম-মত সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত

---

* ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫।

হইতে বিলম্ব হয় নাই, এবং অশোক রাজার রাজত্বকালে, ধর্ম্ম-প্রচারের সুব্যবস্থা হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভূত বিস্তার লাভ করে। Lassen ও Schlaginweitএর মতে, ২১৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চীনদেশে, এবং ১৩৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; পরে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল ও জাপানে প্রবেশ করে, এবং মধ্য এসিয়ার বৈকাল হ্রদ ও ককেসিয়স্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হয়।

চতুর্থ শতাব্দীতে, ল্যাসেনের মতে, চীন ভিক্ষুগণের দ্বারা, মেক্সিকোয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এবং তাহাদিগের কতকগুলি শিষ্য ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেখানে ছিল। তাহার পর এইরূপ অবগত হওয়া যায়, Atzequeরা * তাহাদিগকে উচ্ছেদ করে। আধুনিক যুগের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধদিগের প্রতিও উৎপীড়ন হয়, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম স্বকীয় জন্মভূমি হইতে একেবারেই বিদূরিত হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পর, তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নানা তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত হইবে, তাহা বুদ্ধ অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনতিবিলম্বেই কার্য্যে পরিণত হয়। তাহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে বহুল মতভেদ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মমতগুলি রূপান্তরিত হইয়া তাহা হইতে বিবিধ সম্প্রদায় সমুত্থিত হইল। যে যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে, সেই সেই দেশের অধিবাসীদিগের রীতিনীতি ও মানসিক প্রকৃতি অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক সূত্রগুলি পরিবর্দ্ধিত হইল, তন্ত্রগ্রন্থাদির আবির্ভাব হইল।

এই সকল গ্রন্থ, মৌলিক সূত্রগুলির পরে রচিত হয়। বুদ্ধদেবের আদিম ধর্ম্মমত উহার মধ্যে নাই। বস্তুতঃ প্রজ্ঞাপারমিতার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবের বহুশতাব্দী পরে আবির্ভূত হয়। উহা তৃতীয় ধর্ম্ম-পরিষদের সময়কার রচনা; উহার মধ্যে, কোনও কোনও সূত্রগ্রন্থে আদিবুদ্ধের কথা আছে (ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; ইঁহার সমস্ত স্বরূপলক্ষণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের ন্যায়), এবং আদিবুদ্ধের পূজার কথা আছে। কিন্তু মূল-সূত্রগ্রন্থে এই সকল কথার চিহ্ন মাত্র নাই।

* বিজ্ঞান শিল্পাদিতে কৃতোৎকর্ষ প্রাচীন আমেরিকার এক সভ্যজাতি। আমেরিকা আবিষ্কারের ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, এই জাতি উত্তর হইতে আসিয়া মেক্সিকোর উপত্যকা-প্রদেশে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থ অপেক্ষা তন্ত্রগ্রন্থগুলি আরও আধুনিক; ঐ সকল গ্রন্থে, বুদ্ধদেবের সাদাসিধা ধর্ম্মসাধন-পদ্ধতির স্থানে, উদ্ভট ধরণের বহু দেবদেবীর আরাধনা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল দেবদেবীর কথা সিংহলে অজ্ঞাত। তন্ত্রগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে Burnouf যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দিতেছি।

এই সকল তন্ত্রগ্রন্থে—একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মের সহিত, এবং উত্তরস্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত অন্যান্য নূতন মতের সহিত, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে উক্ত দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে, কিরূপে চক্র ও মন্ত্রপূত রেখাচিত্রগুলির ব্যবহার করিতে হইবে, কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, কিরূপ স্তবস্তুতি করিতে হইবে, কিরূপ বলি উৎসর্গ করিতে হইবে, তন্ত্রগ্রন্থে উহারই নিয়ম ও উপদেশ আছে। বিশেষতঃ, উহাতে "ধারণী" নামক রক্ষা-মন্ত্রের কথা আছে। ঐ মন্ত্র যে জানে, সে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

আদিম সূত্রগ্রন্থে যেরূপ উপদেশ আছে, তদনুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের কোনও প্রকার ধর্ম্মসাধন করিতে হয় না। আভিচারিক নক্সাগুলি আঁকিতে পারিলেই, কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে পারিলেই, তাহাদের মোক্ষলাভ হয়। এক কথায়, তন্ত্রগুলি সকল প্রকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণ; কেন না, উহাতে আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন-স্বরূপ শাক্যমুনির নাম আছে, পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থাদির চিহ্ন-স্বরূপ স্বর্গীয় বুদ্ধদিগের নাম আছে, একেশ্বরবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের চিহ্ন-স্বরূপ আদিবুদ্ধের নাম আছে, প্রজ্ঞা-পারমিতা-প্রতিপাদিত দার্শনিক শূন্যবাদের কথা আছে; এবং এই সমস্ত মতের মিশ্রণের সহিত, শৈব সম্প্রদায়ের বিকট কীভৎস অনুষ্ঠানগুলিও সংযোজিত হইয়াছে। Burnouf, Humboldt ও Schmit বলেন, উত্তর প্রদেশের শৈবধর্ম্মমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্মের ভক্তেরা স্বকীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক মত বজায় রাখিয়া, শৈব ধর্ম্মের কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল অনুষ্ঠানে ঐহিক সুখসম্পদ লাভ হয়; এবং এই সকল অনুষ্ঠানের প্রামাণিকতা স্থাপন করিবার জন্য তাহারা বলে, বুদ্ধদেব হইতেই উহাদের উৎপত্তি।

তাই, অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধেরা শৈব ধর্ম্মের অশ্লীল ও হাস্যজনক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে না; পরন্তু

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

বসুমতী প্রেস।

শৈব দেবতারা এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন, যদি কেহ অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করে, কিংবা বুদ্ধকে বলি উৎসর্গ করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে তাঁহাদের অভিচার-মন্ত্রাদি দিবেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। এই সকল তন্ত্রগ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের কথা আছে,—যাহা শৈব ধর্ম্মের নিকট অপরিচিত। সুতরাং তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের নিকট এই সকল শৈব দেবতা বুদ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে নেপাল ও তিব্বতে প্রচলিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথালাপ।

[ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহোদয় বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই "কথালাপ" লিখিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"২৫ অগষ্ট, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃঃ, সন্ধ্যাকাল। 'প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন', এই বলিয়া আগ্রহ করাতে। মসুরি পর্ব্বত—The Priary." সেই পাণ্ডুলিপি যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে।]

"সিমলা পর্ব্বতে একদিন রাত্রে শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সকাল বেলা বেড়াতে বের হলেম, মনে করলেম, যুধি ইদিক উদিক দেখে শুনে বেড়ালে মন ঠাণ্ডা হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের হলেম, কিছুই হয় না। পেয়ারী বাঁড়ুয্যে—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। এ কথা ও কথা, কই, সে ধড়ফড়ানি কিছুতেই যায় না। তার পরে ঘরে ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বল্লুম, আচ্ছা, বাগান নিয়ে এস দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে বলতে ধড়ফড়ানি কমে যাচ্চে। তেমনি দেখছি, এখন হয়েছে; এখন বাড়ী যাবার মন হয়েছে, এতকাল পর্য্যন্ত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল বাড়ী বাড়ী মনে হয়। যখন ঐ রকম কথা কই, তখনই মনটা ঠাণ্ডা হয়, আর কোনও কথাতে ঠাণ্ডা হয় না। আমি এখন একটা খুব কথা পেয়েছি—

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণ আবেশ্য সম্যক্ সত্যং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

এই প্রয়াণকালে 'ভ্রুবোর্মধ্যে' সেই একটি বিন্দুতে প্রাণকে স্থির রাখচি, অন্য কথায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে 'ওঁ সত্যনারায়ণ ব্রহ্ম' কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় নিয়ে যায়, তোমরা আমাকে তেমনি এখন আমার এই বিষয়ে সাহায্য করবে।

অক্ষয় বাবু প্রভৃতির কাছে আমার উদাস ভাবের সায় পাওয়া, তা পাইনি। Brown, Stewart প্রভৃতি ইংরাজি philosorhy, তা পড়েছিলেম, কিন্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবদ্ধ—মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় না। মনকে শ্রেণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার শিক্ষার মতন শিক্ষা দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে একটা Fichte পাঠাইয়া দেন, রাজনারাণ বাবুর সে বই * * নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে লেখা ছিল,—"My friend, philosopher and guide"। সে বই শ্যামাপুকুরের সিদ্ধেশ্বর ঘোষ আর তার ভাই রামচন্দ্র ঘোষ নিয়ে গিয়েছে। এক আলমারী philosophyর বই ছিল; তারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়তে এসে ক্রমে ক্রমে সব নিয়ে গেল। মাঝে সেই রামচন্দ্র ঘোষ কি বই টই ছাপিয়ে এখানে আমার কাছে ৯০০৲ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি মনে করলুম, ৯০০৲ টাকা চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে ১০০৲ টাকা দিই। বোলে শাস্ত্রীকে টাকা দিতে বলে দিলুম। তার পর মনে পড়লো, শ্যামাপুকুরের সেই রামচন্দ্র ঘোষ। দুই প্রহর তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ Fichte নিয়ে পড়লুম, সে যেন আমাকে মর্ত্ত্যলোক হ'তে আর একটা রাজ্যে নিয়ে গেল; তার পরে Kant যখন পেলুম, তখন আমি ব্যাকরণ বুঝলুম।

আমি অনেক দিন বিদেশে থাকলেম, এখন স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, তেমনি মনে হচ্চে, অনেকদিন হ'ল—এখানে আছি। আমি এখন সব পুরাণ গল্প ভুলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, ভাল মনে পড়ে না। কথায় কথায় মন থেকে আপনাআপনি যা বের হবে, তাই বলব। বর্ত্তমান ভাব জলজল করচে, তাই বলতে পারি।

২৭ আগষ্ট, রবিবার, বৈকাল ৫টা।

সিমলা বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল কাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়। গঙ্গার উপরে সে বাগান, তোমরা দেখেছ। ভিতরে

মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেলা রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী সব বাগানে বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল না, হাঁসে খারাপ করে দিয়েছিল; তবুও আমি তাতে সাঁতার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুঝি সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে পূজার সময় এলে হয়, খুব এক চোট বেরিয়ে পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস এল। কিশোরীকে দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত boat ভাড়া করলেম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বোধ হয়। mutinyর এক বৎসর আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য এসেছি। সেই রাত্রে ৭।৮ টার সময় আমার শিষ্য প্রতাপ বাবু বিশ্বম্ভর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত। কাল সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে ওঁরা সব এলেন। বিশ্বম্ভর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন প্রধান লোক; আমার আবার সেই দুর্ময় চোখের ব্যামো। আলো দেখবার যো নেই, ঘর অন্ধকার কোরে বোসে আছি, চোখে সবুজ টুলি দেওয়া, অথচ আলো দেখতে হবে। এই বিভ্রাট। সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া তোয়ের করা, বিছানাপত্রের হাঙ্গাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত।

পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে এক জন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, লেঠেল, সেই চাকর। বাঁশবেড়েতে গিয়ে মনে হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি 'হাঁঃ' কোরে উঠলো। তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে যাব, তা না, এখেনে এসে মনে হয়ে গেল। আমাদের বোটওয়ালা এমনি যে, গঙ্গায় নেবে একদিন স্নান করচি, আর দেখি বোট চোলে গিয়েচে! আমাদের সাঁতার টাতার দিতে একটু গৌণ হয়েছে। আমাদের জমীদারীর বোট—কালাচাঁদ মাঝি—হাজার ধমকধামক কর, নড়েও না, চড়েও না। এ কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কি না! ১০টা ১১টা রাত্রি অবধি টেনে যাচ্চে, খারাপ যায়গা টায়গা কিছুই মানে না! আমি খুব খুসী হলুম। তখন adventurous spirit, উদাসীনের মতন চলেছি! মাঝে আবার একটা দাঁড়ী মরে গেল। মোসলমানের কাণ্ড। তার ব্যামো হোতে তাকে বোটের সামনে খোলের ভিতর রাখত। আবার তাতে চট্ টট্ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বাতাস

লাগতে দেবে না। আমি বল্লুম; অমন কোরে রাখলে ও যে মোরে যাবে? তা তারা শুনবে না। আর একদিন দেখলেম যে, তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে। তার পরে দেখি, সে সত্যি সত্যি মরেই গেল। আবার পুলিসে খবর দিলে। কেমন কোরে মরলো, কি হোয়ে মরলো। তার পরে তাকে গোর দিলে। এই কোরে এক মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম।

এর আগেও একবার কাশী দেখেছিলুম। সেবার ১৪ দিনে তাকে গিয়েছিলুম। নৌকা যেই কাশীর পারে লাগিল, অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি। আর ওদের নৌকায় যাব না; বাড়ীও নেই, কিছুই নেই, হুহু কোরে দৌড়চ্ছি। কিশোরী সঙ্গে চলতে পারছে না। যে দিকে রাস্তা পেলেম, চল্লেম। এই কোরে সিক্রোলের উদিকে গিয়ে দেখলেম, একটা খালি বাগানের মতন পড়ে রয়েছে, তাতে মিস্ত্রীরা একটা বাড়ী তোয়ের করছে; এখনো দরজা টরজা বসানো হয়নি। কার বাড়ী, কি বৃত্তান্ত!—এখানেই থাকব—নিয়ে আয় জিনিস—সেই ঘরেই উঠলেম—কার ঘর ঠিক নেই! সেই উড়ে বামুন খিচুড়ী রাঁধলে। সে কেমন খিচুড়ী রাঁধতো, সব সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত। বসে আছি, একদিন গেল, দু'দিন গেল, কিছু নেই, খোলা ঘর মেরামত করছে। কেউ নেই; কে আসবে? আমিই যাই,—তাই কম্বল টম্বল দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাসা পড়া নেই, কার বাড়ীতে আছি। যাদের বাড়ী, তারা শুনতে পেয়েছে যে, কে এসে বাড়ী দখল কোরে নিলে। তারা কেমন কোরে আমার নাম টের পেয়েছে। আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে এসে বল্লে, "মশায়! এখানে এত কষ্ট নিচ্চেন, আমাকে বল্লেন না কেন? পরদা দিতেম তোএর কোরে।" "আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী?" দৈবাৎ যার বাড়ীতে ছিলেম, সে আমার পরিচিতের মধ্যে হয়ে গেল। সে সব পরদা টরদা দিয়ে ভাল কোরে দিলে। কিশোরীকে বল্লুম, যাও এখান থেকে, যাও এখান থেকে। আমাদের সব জানতে পেরেছে, তবে বিস্তর দিন থাকা হবে না। আমাদের জানলে টানলে বোলে আমরা চলে গেলুম। সব সুদ্ধ ১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই গুরুদাস মিত্রের বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র। তার সঙ্গে এর আগেরবার যখন কাশীতে যাই, তখন দেখা হয়েছিল।

দিদি।

১

হরিশপুরের প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য কাঁচা পাকা মাথা লইয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যখন দ্বিতীয় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন, তখন গ্রামের লোক দু' দণ্ড সময় কাটাইবার একটা উপলক্ষ পাইল; স্বদেশী আন্দোলন-তরঙ্গ পুলিসের গুঁতায় অদৃশ্য হইলে, হুজুগের অভাবে গ্রামস্থ ভদ্র-সমাজের পরিপাক কার্য্যের বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, সুতরাং 'নূতন কিছু পাইয়া' সহসা গ্রামে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভূত হইল; নব বর্ষার অবিরল ধারা-পাতে আতটপূর্ণ ভড়াগ যেমন ভেকের অশ্রান্ত মকধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র হরিশপুর গ্রামও কতকটা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কয়েক দিন বেশ উৎসাহেই অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা গুড়ুকখোরের সময় কাটিল।

গৃহে পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা বর্ত্তমানেও পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ো বাপ গোঁফে কলপ ও মাথায় সোলার টোপর দিয়া দ্বিতীয় সংসার আনিতে যান, হিন্দু পরিবারে এরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল নহে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এত বড় সৎসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া গ্রামের লোক কেন যে এত কলরব আরম্ভ করিল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে, বোধ হয় হাড়ে কোনও কাজ না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে! প্রাণবল্লভ পণ্ডিত লোক, তিনি "হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য" নামক একটি সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়া সনাতনপুরের ব্রহ্মচর্য্যসভা হইতে সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া "ভারত-গৌরব" নামক মাসিকপত্রে "হায় কি সর্ব্বনাশ!" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক গঙ্গাচরণ বাপাস্তবাগীশ সেই প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম প্রকাশিত হইবার পর, এরূপ হৃদয়বিদারক মর্ম্মোচ্ছ্বাস বঙ্গ-সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে আর কখনও কাহারও লেখনী-মুখে প্রকাশিত হয় নাই।" কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পত্নী-বিয়োগের পর তিন মাস না যাইতেই ভট্টাচার্য্যের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল! ফুলকুমারী প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় তাঁহার অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিল।

বন্ধু দুর্গাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া হে! এ তোমার কেমন

প্রবৃত্তি? ঘরে তোমার দুধের মেয়ে বিধবা, একাদশীর দিন এক বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করে; আর তুমি কোন্ আক্কেলে এই 'বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম্ম' করলে? ছিঃ!"

প্রাণবল্লভ কলপ-কপিশ গোঁফে অঙ্গুলীচালনা করিয়া একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "'প্রবৃত্তিরেষা তূতানাং'—কি করি বল? যখন যেমন, তখন তেমন। ঘরে তিন বৎসরের মা-মরা কাঁচা ছেলে, কে তাকে কোলে পিঠে নিয়ে মানুষ করে, আর কেই বা অসময়ে আমার সেবা শুশ্রূষা করে? বিশেষতঃ বিধবা মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণেরও ত একটা লোক চাই। সংসার ছেড়ে যখন বনে যেতে পারচিনে, তখন বুঝ্‌তে পারচো কি না, আর শাস্ত্রেও ত এ ব্যবস্থা আছে—'মাতা যস্য গৃহে নাস্তি'—।"

দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "'অরণ্যং তেন গন্তব্যং'—তোমার বনে যাওয়াই উচিত ছিল।"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "ভার্য্যা যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়, তবে সেই ব্যবস্থাই বটে, কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষের এই ব্রাহ্মণীটির কথাগুলি অমৃততুল্য।"

বন্ধু বলিলেন, "অমৃতং বাল-ভাষিতম্।"

২

পরহিতব্রত প্রাণবল্লভ হরিশপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুলতলা গ্রামের ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী নামক একটি কন্যাদারগ্রস্ত নিরুপায় বৃদ্ধকে কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাল চেলী পরিয়া ও অলঙ্কৃষিত সোলার টোপর মাথায় দিয়া শ্রাবণের ঘনঘটাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে যে দিন শুভযাত্রা করেন, সে দিন অভ্যাগতা রমণীগণ মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনিতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিধবা কন্যা মাতৃহীনা নিরুপমা সে দিন কোনও মতে অশ্রু-রোধ করিতে পারিল না। নিরুপমা তাহার তিন বৎসরের ভাই সুধীর-কুমারকে কোলে লইয়া অন্দরের বাগানে একটি পল্লববহুল পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; পাছে কেহ তাহাকে এই শুভদিনে 'চোখের জল' ফেলিতে দেখিয়া তিরস্কার করে, এই ভয়ে সে লুকাইয়া কাঁদিল। এই পেয়ারা গাছটি তাহার মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন সেই গাছ শাখা-পত্রে ফুলে-ফলে পূর্ণ; বর্ষাসুলভ রাশি রাশি সুপক্ক পেয়ারা পক্ষি-চঞ্চুবিদ্ধ হইয়া অযত্নে বৃক্ষ-মূলে পড়িয়া আছে; মা সেই গাছের পেয়ারা পাড়িয়া কতদিন

নিরুপমাকে খাইতে দিয়াছেন, মাতৃ-হস্ত-রোপিত বৃক্ষটি সেইখানেই আছে, পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারও রাশি রাশি ফলের ভারে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু আজ সেই স্নেহময়ী জননী কোথায়? সমস্ত জীবনটাই তাহার নিকট স্বপ্ন মনে হইতে লাগিল। নিরুপমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল; সে কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমাকে তুমি ফেলে গেলে কেন? আমাকে কোলে নিয়ে যাও।" নিরুপমা ভাইটিকে বুকে লইয়া পেয়ারা-তলায় বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার উপর পেয়ারা গাছের শাখায় শাখায় ছাতারে ও বুলবুলের দল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুধীরের বয়স তিন বৎসর মাত্র, সংসারে সে মা ভিন্ন আর কাহাকেও চিনিত না, মাকে হারাইয়া তাহার কি কষ্ট, তাহা সে ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? এই তিন মাসের মধ্যেই তাহার আকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাহার মা যদি দৈব-বলে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, তবে নিজের ছেলেকে তিনিও চিনিতে পারিতেন না। সুধীরের মুখে হাসি নাই, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশুর হৃদয় জননীর স্তন্যপানের জন্য নিরন্তর হাহাকার করিতেছে, তাহার বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চুলগুলি রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গে ময়লা পড়িয়াছে। সংসারে নিরুপমা ভিন্ন তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুশয্যা হইতে নিরুপমা যেদিন তাহার ভাইটিকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে তাহার মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু সংসারে মায়ের অভাব কে পূর্ণ করিতে পারে?

৩

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় সংসার ফুলকুমারী তাঁহার গৃহে আসিয়া নিজের অধিকার বুঝিয়া লইল। সে দরিদ্রের কন্যা, অল্প বয়সেই গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, সে এই সংসারের কর্ত্রী, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে নিরুপমার সকল কাজেই খুঁত ধরিতে লাগিল। নিরুপমা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার গৃহে অধিক দিন বাস করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু সংসারে তাহার আর স্থান কোথায়? ছোট ভাইটিকে লইয়া সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? নিরুপমা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।

ফুলকুমারীর পিতৃগৃহে অশন-বসনের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে কোনও প্রকারে দেহ ও লজ্জা রক্ষিত হইত; সে স্বামিগৃহে আসিয়া দেখিল, সংসারে বাজে খরচ বিস্তর। প্রথম বাজে খরচ, দুগ্ধ। নিস্তারিণী ঘোষাণী সুধীরের জন্য দুই সের দুধের যোগান দিত; দুই সেরে তিন পোয়া দুগ্ধ ও পাঁচ পোয়া জল থাকিত। প্রাণবল্লভও তাহা জানিতেন, কিন্তু তিনি নিস্তারিণীর যোগান বন্ধ করিতে পারিতেন না; কারণ, সে আশ্বিন মাসের প্রাপ্য টাকা চৈত্র মাসে না পাইলেও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। প্রাণবল্লভ যদি কোনও দিন বলিতেন,—"নিস্তারিণী, তোর দুধ যে দিন দিন জলের চেয়েও পাতলা হচ্ছে!" তাহা হইলে নিস্তারিণী নথ নাড়িয়া জবাব দিত, "ও কথা বল্‌বেন না দাদা ঠাকুর, দেনা ক'রে দুধের ব্যবসা চালাচ্ছি, সুদের টাকা কি ঘর থেকে দেব?"

যাহা হউক, এই বাজে খরচটা কিরূপে বন্ধ করা যায়, ফুলকুমারী দিনকত তাহাই ভাবিল; কিন্তু কি করিয়া কথাটা পাড়িবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে একটা সুবিধা হইল। সুধীরের একদিন পেটের অসুখ হইল। ফুলকুমারী প্রাণবল্লভকে বলিল, "ছেলেটার সর্ব্বদা ব্যামো লেগে থাকে কেন, তা বুঝি টের পাও না? ঐটুকু ছেলে দু সের দুধ খায়! এত দুধ ওর পেটে হজম হবে কেন? আমি নিস্তারিণীকে বলে' দেব, এখন থেকে সে যেন এক সের দুধ দেয়। এত বড় ধেড়ে ছেলে, একটা ভাত মুখে দেবে না! ভাত না খেলে কি ছেলেপুলের ধাত পুষ্ট হয়?"

দ্বিতীয় পক্ষ তাঁহার প্রথম পক্ষের পর্ভজাত সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এতখানি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া প্রাণবল্লভের প্রাণে অনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রাণবল্লভের দরিদ্রা প্রতিবেশিনী ও বিনামূল্যে উপদেশদাত্রী সর্ব্বাণী ঠাকুরাণী সুযোগ বুঝিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "নূতন বৌ কালে পাকা গিন্নী হবে; কেমন মায়ের মেয়ে!"

সুধীরের পেটের অসুখ সারিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুধের বরাদ্দ বাড়িল না। সুধীরের দুধের যোগান কমিয়া গেল দেখিয়া নিরুপমার মনে কষ্টের সীমা রহিল না। তাহার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। মায়ের কথা মনে করিয়া সে কত কাঁদিল। নূতন মায়ের আদেশে পিতা দুধের ছেলের দুধ কমাইলেন? মা বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কি ছেলের দুধ কমাইতে

পারিতেন? নিরুপমা অভিমান করিয়া দুই দিন পিতাকে কোনও কথা বলিল না।—তৃতীয় দিন প্রাণবল্লভ পাশার আড্ডা হইতে বাড়ী আসিলে নিরুপমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে বলিল, "বাবা, দুধের ছেলে সুধীর, তার দুধের রোজ কমাইলে? মায়ের দুধ পায় না, এক সের জলো দুধে কি তার পেট ভরে?"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "তোর তো ভারি বুদ্ধি! ঐটুকু ছেলে, এক সেরের বেশী দুধ কি ওর পেটে সহ্য হয়? তোর মা মনে করতো, কতকগুলো দুধ গিলোলেই ছেলে মোটা হয়, তুইও বুঝি সেই রকম মনে করিস্?"

নিরুপমা বিনাপ্রতিবাদে প্রস্থান করিল। পরদিন তাহার একটি অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে এক সের করিয়া দুধ কিনিয়া সে সুধীরকে খাওয়াইতে লাগিল।

দুই তিন দিন পরে প্রাণবল্লভ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বিধবা কন্যার ভোগ-লিপ্সা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; সে গহনা বিক্রয় করিয়া দুধ খাইতেছে! ইহার পর হয় ত লুকাইয়া মাছ খাইতে আরম্ভ করিবে। তাহার পর কি কি বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এই দুশ্চিন্তায় রাত্রে প্রাণবল্লভের নিদ্রা হইল না। গীতার প্রতি প্রাণবল্লভের বড় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বাসনা হইতে ভ্রান্তি ও ভ্রান্তি হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিরুপমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে, কবে তাহার পতন হইবে, কে বলিতে পারে? প্রাণবল্লভ নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরুপমার নারিকেল তেল মাখা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন দ্বিতীয় পক্ষের মনোরঞ্জনের জন্য উৎকৃষ্ট ফুলেল তেল আসিল।

দুই তিন দিন পরে প্রাণবল্লভ তাঁহার বৈবাহিক—নিরুপমার শ্বশুর আদ্যনাথ বাবুকে লিখিলেন, "আপনি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার পুত্রবধূকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে সে সময় তাহাকে পাঠাইবার মত করিতে পারি নাই, এবং সে মাতৃশোকে বড় কাতর ছিল বলিয়া তখন তাহাকে পাঠানও সঙ্গত মনে করি নাই।—বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সধবা হউক, বিধবা হউক, পতিগৃহই হিন্দু নারীর একমাত্র আশ্রয়। আপনি একটি দিন দেখাইয়া শ্রীমতীকে এখান হইতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

৪

নিরুপমা যে দিন শুনিতে পাইল, তাহার পিতা তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই দিন সে বুঝিতে পারিল, ইহাও তাহার নূতন মায়ের কীর্ত্তি, পিতৃগৃহে আর তাহার স্থান নাই! সে ছোট ভাইটিকে বুকে লইয়া অশ্রান্তভাবে রোদন করিল। তাহার মনের কষ্ট সে কাহার নিকট প্রকাশ করিবে? তেমন লোক সংসারে কেহই ছিল না। অন্য দিন সে দিনান্তে একবার ভাতের কাছে বসিত, সে দিন সে ভাতের কাছেও বসিল না। সে ভাবিতে লাগিল, সুধীরকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে সে কি করিয়া বাস করিবে? সে চলিয়া গেলে কে সুধীরের মুখের দিকে চাহিবে? কে তাহাকে ক্ষুধার সময় খাইতে দিবে? অসুখ বিসুখ হইলে কে তাহার শুশ্রূষা করিবে? মা সুধীরকে তাহার হস্তে সঁপিয়া গিয়াছেন, মায়ের ধন সে কাহাকে দিয়া যাইবে?—মায়ের শোক তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছিল, ছোট ভাইটিকে কোলে না পাইলে এই শোক সে সহ্য করিতে পারিত না। সুধীর তাহার একমাত্র অবলম্বন, বাল-বিধবার জীবনের একমাত্র বন্ধন। সে সুধীরকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। সে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, গাছতলায় বাস করিবে, এবং সুধীর যদি দিনান্তেও একবার তাহার কোলে উঠিয়া তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে, তবে এ সকল কষ্ট সে প্রসন্নমনে সহ্য করিবে।

নিরুপমা অবশেষে এক দিন সাহস করিয়া পিতাকে বলিল, "আমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী যাবি নে কি রে! আমি আর ক' দিন আছি, তোকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? আমার অবাধ্য হ'তে চাস্, তোর এত সাহস?"

নিরুপমা অতিকষ্টে অশ্রু রুদ্ধ করিয়া বলিল, "সুধীর একটু বড় সড় না হ'লে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য—মানুষ। রাগ হইলে তাঁহার কাছা খুলিয়া যাইত, এবং কথা বাধিত। তিনি কাছা আঁটিতে আঁটিতে সক্রোধে বলিলেন, "তো-তো-তোর বাবা যাবে, তুই যাবিনে বল্লেই কি আমি শুন্‌বো! আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত—থাকি, তু-তু-তুই একটা কে-কে-কেলেঙ্কারী না ক'রে আর ছাড়বিনে

দেখ্‌চি!-সু সু-সুধীরের ভাবনা তো-তো-তোকে ভাবতে হবে না। এই বৈশাখ দিন হয়েছে, যে-সে-সেই দিন তোকে আলবৎ যে-যে-যেতে হবে।"

নিরুপমা আর কোনও কথা না কহিয়া ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। দিদিকে নীরবে রোদন করিতে দেখিয়া সুধীর অনেকক্ষণ কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, তুই কান্‌তিস্‌ যে!"

নিরুপমা অশ্রু মুছিয়া বলিল, "আমি আর এখানে থাক্‌বো না সুধী।"

সুধীর এমন অসম্ভব কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের এই বাড়ীটুকু ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও যে তাহার দিদির যাইবার স্থান আছে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত; সে নির্নিমেষনেত্রে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুতায় যাবি দিদি?"

নিরুপমা বলিল, "শ্বশুরবাড়ী।"

এতক্ষণ পরে সুধীরের মনে পড়িল, শ্বশুরবাড়ী নামক একটি স্থানের কথা সে মায়ের ও দিদির মুখে শুনিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দিদিকেও যে সেখানে যাইতে হয়—এ ধারণা তাহার ছিল না। সে অত্যন্ত কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে দিদির গলা সজোরে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর বলিল, "দিদি, আমি তোল্‌ সঙ্গে দাব। আমি একানে কাল কাতে থাক্‌বো?"

নিরুপমার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কেন, নূতন মার কাছে থাক্‌বে।"

সুধীর বলিল, "না, নূতন মা বালো বাসে না, আমি তোল সঙ্গে দাব দিদি।"

নিরুপমা বলিল, "বাবা তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন কেন ধন? আমি চলে গেলে আমাকে ভুলে যাবে না ত?"

সুধীর দিদির পিঠে কিল মারিয়া বলিল, "তুই আমাকে বালো বাসি নে, আমি আল দুদ কাবো না।"

নিরুপমা সুধীরকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। তাহার অশ্রু সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

সুধীর অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "দিদি কাঁদিস নে, আমি দুদ কাবো।"

৫

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। নিরুপমা পিতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে পাল্কীতে উঠিতে গেল। এমন সময় সুধীর তাহার নীলাম্বরী কাপড়খানি ও কাঠের ঘোড়াটা লইয়া ধূলি-ধূসরিত-দেহে ছুটিয়া আসিল; কাপড় ও ঘোড়া দিদির পাল্কীর ভিতর রাখিয়া দিদির উভয় জানু জড়াইয়া ধরিল, "দিদি, আমি তোর সঙ্গে যাবো, আমাকে কোলে নে।"—দিদির মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সে তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "আয় রে সুধীর, বিকেলে তোকে আমবাগানে নিয়ে যাব; বাগানে আম পেকেচে, খুব মিষ্টি আম, অনেক করে' পেড়ে দিব।"

সুধীর সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল, দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আম চাইনে; দিদি বালো, আমি দিদির শশুল-বালি দাবো।"

বেহারারা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু সুধীর নিরুপমার কোল হইতে নামিল না।—প্রাণবল্লভ অবশেষে বলপূর্ব্বক সুধীরকে কন্যার ক্রোড় হইতে নামাইয়া লইলেন।

সুধীর হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপমা কোনও দিকে না চাহিয়া বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পাল্কীতে উঠিল। বেহারারা পাল্কী তুলিল।

সুধীর নিষ্ফল ক্রন্দনে গৃহ-প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "দিদি, আমাকে নিয়ে দা! ও দিদি, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে দা, আমি তোকে ফেলে থাক্‌তে পার্‌বো না।"

প্রাণবল্লভ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ কর দুষ্টু ছেলে, যত বয়স হচ্ছে, তত দুষ্টুমী বাড়চে! দিদি ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকবে, শ্বশুরবাড়ী যাবে না।"

সুধীর পিতার তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া "দিদি গো, ও দিদি গো!" শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—কিন্তু তাহার উচ্ছলিত ক্রন্দনধ্বনি দিদির কর্ণে প্রবেশ করিল না। বেহারারা উচ্চ কলরব করিতে করিতে পাল্কী লইয়া তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। নিরুপমা পাল্কীতে বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "সুধী, ভাই রে, আবার তোকে কত দিনে দেখ্‌তে পাব?—তোকে

ছেড়ে কি নিয়ে সেখানে থাকবো?" কেহ তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বেহারারা গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাল্কী কাঁধে লইয়া মেঠো পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। পথের পার্শ্বে চষা জমী, ধানের ক্ষেত। বৈশাখী অপরাহ্ণের উত্তপ্ত সমীরণ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া হু হু শব্দে বহিয়া নিরুপমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রাম্য কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে সমস্বরে গাহিতে লাগিল,—

"কি কোরে ছেড়ে তোরে থাকবো রে বাপ্ নীলমণি,
ও তোর ক্ষুধা পেলে মুখে তুলে কে আর দেবে ক্ষীর ননী!"

নিরুপমার মনে হইল, কৃষকের সেই গীতোচ্ছ্বাসে—তাহারই মনের বাসনা ও রোদন ধ্বনিত হইতেছে।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। বৈশাখ মাস, বসন্তের অবসানে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পল্লী-প্রকৃতি অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। রাখাল বালকেরা গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে মুক্ত প্রান্তর-পথে বাড়ী ফিরিতেছে; গোধূলি-ধূলি ম্লানচন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত ধূসর নভস্তল আচ্ছন্ন করিতেছে, এবং উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে গ্রাম্যপথের প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী হইতে জামের মুকুল ও নিমমঞ্জরীর সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাইতেছে।

৬

নিরুপমার পাল্কী অদৃশ্য হইলে সুধীর অনেকক্ষণ ঘরের রোয়াকে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রমণ্ডলে সে যেন মায়ের স্নেহানুরঞ্জিত মুখখানি দেখিতে পাইল। তাহার মনে পড়িল, দিদি তাহাকে বলিয়াছিল, "ঐ খানে মা আছে।"—তিনি একবার সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন না?—মা গিয়াছেন, দিদিও চলিয়া গেল! সে এখন কাহার কাছে থাকিবে?

রাত্রে পিতার শয্যাপ্রান্তে শয়ন করিয়া সুধীর দিদির জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুমাইয়াও সে দিদিকে ভুলিল না, স্বপ্নঘোরে বলিল, "দিদি, তোল পায়ে পলি, আমাকে তোলে নে, আমাল ভয় করচে।"

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষ বিরক্তিভরে বলিলেন, "না, ছোঁড়াটা দেখ্‌চি আজ রাত্রে ঘুমোতে দেবে না! কেবল—দিদি, দিদি! এমন আবদেরে ছেলেও ত কখনও দেখিনি।"

ঠিক সেই সময়ে নিরুপমা তাহার শ্বশুরালয়ের একটি নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া মুক্ত বাতায়নপথে জ্যোৎস্নালোকিত বহিঃপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া কাতরস্বরে বলিল, "সুধীর, ভাই রে, এখন তুই কোথায়? তোর মুখখানি দেখ্‌তে না পেয়ে আমার বুক যে ফেটে গেল।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কালিদাস ও ভবভূতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কবিত্ব।

'কবিত্ব' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। বিভিন্ন কোষকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ বুঝেন। Webster বলেন,—

Poetry is the embodiment in appropriate language of beautiful or high thought, imagination or emotion, the language being rhythmical, usually metrical, and characterised by harmonic and emotional qualities which appeal to and arouse the feeling and imagination.

Chambers বলেন,—

Poetry is the art of expressing in melodious word the thought which are the creations of feeling and imagination.

এখানে high 'thought'এর কথা নাই।

সমালোচকদিগের মধ্যে Mathew Arnoldএর স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলেন,—

Poetry is at bottom a criticism of life. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. * * * Poetry is nothing less than the most perfect speech of man in which he comes nearest to being able to utter the truth.

Mathew Arnoldএর সংজ্ঞা শুদ্ধ অতি উচ্চ কবিদের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর কবিরাও ত কবি।

Alfred Lyall বলেন,—

Poetry is the most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of the age.

এখানে criticism of lifeএর কথা নাই।

'কবি কে', ইহা লইয়া স্বয়ং কবিগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Bailey বলেন,—

Poets are all who love, who feel great truths,
And tell them ; and the truth of truth is love.

Shakespeare ত কবিদিগকে উন্মত্তের দলে ফেলিয়াছেন।

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.

কবির কাজ কি?—

The poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shape, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

Milton বলেন,—

A poet soaring in the high realm of his fancies with his garland and singing robes about him.

অপিচ,

Poetry ought to be simple, sensuous and impassioned.
We poets in our youth begin in gladness
But thereof, come in the end despondancy and sadness.

কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ।

সংস্কৃতে আছে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' রস নয় প্রকার। বাক্য সেই রসসংযুক্ত হইলেই কাব্য হইল।—অত্যন্ত সহজ।

উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বোধ হয় না যে, কোষকার, কবি ও সমালোচকগণ ইহার একই অর্থ বুঝিয়াছেন।

কবিত্ব কাহাকে বলে, ঠিক বোঝানো শক্ত। ইহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে, একটি বাক্যে ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানাদি হইতে পৃথক্ করিয়া,—ইহা কি, তাহা না বলিয়া, ইহা কি নহে, তাহা বলিয়া, ইহাকে এক রকম বোঝানো যাইতে পারে।

বিজ্ঞান হইতে কবিতা পৃথক্। বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি; কবিতার ভিত্তি

অনুভূতি। বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি হৃদয়। বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য।

কবিকুল-চূড়ামণি Wordsworth কবিতার রাজ্যকে, এমন কি, একটি পবিত্র তীর্থস্থানস্বরূপ জ্ঞান করেন—যাহাতে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার Poets' Epitaph নামক কবিতায় এই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—

who would botanise
over his mother's grave.

কার্লাইল বলেন, poets are seers বা prophets. বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যে শৃঙ্খলা দেখেন, কবিগণ অনুভূতি দ্বারা সেই শৃঙ্খলা অনুভব করেন। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্যই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ না থাকিলে সন্তান বাঁচিত না; কারণ, সন্তান দুর্ব্বল, নিঃসহায়—এক পিতা মাতার যত্নের উপরই শিশুর জীবন নির্ভর করিতেছে; সেই জন্য মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে ঘুম পাড়ান, নিজের বক্ষের পীযূষ দিয়া সন্তানকে লালন করেন, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠিত করেন। এই নিয়মে সংসার চলিতেছে। নহিলে সংসার অচিরে লুপ্ত হইত। কবি তর্ক করেন না। তিনি দেখান, মাতার স্নেহ কি সুন্দর,—ঈশ্বরের রাজ্যে কি চমৎকার শৃঙ্খলা! বিজ্ঞানের যুক্তি শুনিয়া সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য বুঝি। কবিতা পড়িয়া এই বাৎসল্যের প্রতি ভক্তি হয়। বৈজ্ঞানিক ও কবি, ইঁহাদের মধ্যে জগতের উপকার কে বেশী করেন, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সৃষ্টির শৃঙ্খলার প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা।

কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাব্যের বিষয় হয় না। প্রাকৃতিক সত্য হইলেই তাহা সুন্দর হয় না। জগতে অনেক জিনিস আছে—যাহা কুৎসিত। বিজ্ঞান তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তাহা স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্য অদ্যাবধি কোনও মহাকবি আহারাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি কাব্যে দেখান নাই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও নাটকে তাহা দেখানো সম্বন্ধে দস্তুরমত নিষেধ আছে। কোনও সুকুমার কলাই কুৎসিত দেখাইতে বসে না। যাহা মিষ্ট, যাহা

সুন্দর, যাহা হৃদয়ে সুখকর অনুভূতির সঞ্চার করে, অথচ আমাদের পাশব প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে না, তাহার বর্ণনা করা সুকুমার কলার একটি উদ্দেশ্য।

এখন অন্যান্য সুকুমার কলা হইতে কবিতাকে পৃথক্ করিতে হইবে। সুকুমার কলা সাধারণতঃ পাঁচটি;—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কবিতা। ভাস্করের কাজ প্রস্তরমূর্ত্তি দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা। চিত্রকর বর্ণ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেন। স্থপতি ও সঙ্গীতবিৎ প্রকৃতির অনুকরণ করেন না, নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন—স্থপতি মৃৎপ্রস্তরে, ও সঙ্গীত—স্বরে। কবি মনোহর ছন্দোবন্ধে প্রকৃতির অনুকরণও করেন, নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাটকে কবিত্ব থাকা চাই। কিন্তু শুদ্ধ কবিত্ব থাকিলেই কাব্য নাটক হয় না। নাটকের অন্যান্য অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য! নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন, মানবচরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিকই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিকটাও দেখানোর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ, নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক্ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সুন্দর দিক্ দেখানো শক্ত। সেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানবচরিত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনই পিতৃবিদ্বেষ ও ক্রূরতা—স্বেচ্ছাচারিত্ব আছে। তাঁহার Hamletএ এক দিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপর দিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othelloতে যেমন সারল্য ও পাতিব্রত্য আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসূয়া আছে। Julius Ceasarএ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দম্ভ আছে। Mac-bethএ যেমন রাজভক্তি ও সৌজন্য আছে, তেমনই রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে।

কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ করিয়া অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ—যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। Schiller তাঁহার Robbers নামক নাটকে ডাকাতি ব্যাপারটিকে মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন বলিয়া তিনি সমালোচকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

আবার কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়াই যদি নাটক ক্ষান্ত থাকে ত (সে কুৎসিত ব্যাপারের প্রতি পাঠকের বিদ্বেষ হইলেও) সে নাটক উচ্চ

অঙ্গের নাটক নহে। নাটকেও বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশী ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কি, নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্যও পরিহার্য্য। সেক্সপীয়রেরই Titius Andronicus কেবল বীভৎস ব্যাপারে পূর্ণ বলিয়াই ইহা অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহা যে সেক্সপীয়রের রচনা, সেক্সপীয়রের উপাসকগণ তাহা স্বীকারই করিতে চাহেন না।

কালিদাস বা ভবভূতি ও দিকেই ঘেঁসেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা যাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সৌন্দর্য্য হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। অতএব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেও নির্দ্দোষ। এই স্থানে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি হইতে এই দুইখানি নাটকের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বহির্জগতেও আছে, অন্তর্জগতেও আছে। যে কবিগণ কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কবিরা মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা মহত্তর কবি! অবশ্য, বাহিরের সৌন্দর্য্য ও অন্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, বহিঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য ত ইতর জীব-জন্তুও উপভোগ করে। কুক্কুর পূর্ণচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকে, মেঘ দেখিয়া ময়ূর পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া নৃত্য করে, কেতকীগন্ধে সর্প আকৃষ্ট হয়, বেণুধ্বনি শুনিয়া হরিণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে এই বাহিরের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাহিরের মাধুর্য্য মানুষের হৃদয়কে গঠিত করে। আমার বিশ্বাস যে, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উৎপত্তিও—ঐ বাহিরের সৌন্দর্য্যবোধে। প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া স্নেহ বিকশিত হয়, সূর্য্য দেখিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, নীল আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘোচে, মৃদু-সঙ্গীত-শ্রবণে বিদ্বেষ দূর হয়।

তথাপি বাহিরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় কবির সমধিক কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের

সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির, নিষ্প্রাণ, অপরিবর্ত্তনীয়। আকাশ চিরকাল সে নীল, সেই নীল, যদিও মাঝে মাঝে তাহা ধূসর হয়, বা মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সমুদ্র ও নদী তরঙ্গসঙ্কুল হইলেও তাহার সাধারণ আকার একই রূপ থাকে। পর্ব্বত, বন, প্রান্তর, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি আকার পরিবর্ত্তন করে না বলিলেও চলে। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্ত্তন যিনি দেখাইতে পারেন, তিনি অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিয়াছেন; মানসিক প্রহেলিকাগুলি তাঁহার কাছে আপনিই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তম জটিল সমস্যা তাঁহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে নূতন নূতন মোহিনী মানসী-প্রতিমা মূর্ত্তিধারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। তাঁহার ইঙ্গিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। তাঁহার যাদুদণ্ড-স্পর্শে নির্জ্জীব সজীব হয়। তাঁহার কবিত্ব-রাজ্য দিগন্তপ্রসারিত অন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় রহস্যময়।

তদুপরি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে কি বাহিরের সৌন্দর্য্য লাগে! কোন্ নারীর রূপবর্ণনা পাঠকের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহাইতে পারে, যেমন উদ্ধত সামান্য কাঠুরিয়ার কৃতজ্ঞতার ছবিতে চক্ষে জল আসে। কবি দূরে যাক্, Michael Angeloর কোন্ মূর্ত্তি, Raphaelএর কোন চিত্রফলক চোখে জল আনিতে পারে!

আর এক কথা—বহিঃসৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রকৃত উপায়,—ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। Turnerএর চিত্র এক মুহূর্ত্তে মিশ্র প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়, এক শত পৃষ্ঠায় ছন্দোবদ্ধ তাহার শতাংশ দেখাইতে পারে না। কিন্তু কবিতা অন্তর্জগৎ যেরূপ স্পষ্ট সজীব ভাবে দেখাইতে পারে, অন্য কোনও শিল্পকলা সেরূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। চিত্রকলা নারীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিতে পারে না!—মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ-কবি।

তাই বলিয়া বহির্জগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্য্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে বহিঃসৌন্দর্য্যের 'পাটে

বসাইলে কাব্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। সেক্সপীয়র এই হিসাবেই Lear-এর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার back-groundএ আঁকিয়া এক অপূর্ব্ব চিত্রের রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি, উভয়েই সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই দেখাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক্, কে কিরূপ আঁকিয়াছেন।

বহির্জ্জগতের সুন্দর বস্তুর মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা সাধারণ কবিদিগের অত্যন্ত প্রিয়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণ রমণীর মুখ ও অবয়ব বর্ণনা করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ, আমাদের দেশে আবহমানকাল এই বর্ণনায় কৃতিত্ব কবিত্বের মানদণ্ডস্বরূপ গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যে এই বিষয়ে যত অত্যুক্তি করিতে পারে, সে তত বড় কবি—এইরূপ বিবেচিত হইত।

এক জন কবি বলিলেন,—

শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ অন্তরে কালিমা।

ভারতচন্দ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিলেন,—

কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা? বিনোদিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

অনর্ঘরাঘবে কবি সীতার রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা সীতাকে সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র ও সীতার মুখ নিক্তিতে চড়াইলেন। সৌন্দর্য্য হিসাবে সীতার মুখ সমধিক সারবান্, অতএব ভারী হইল, সেই জন্য সীতা ভূতলে নামিয়া আসিলেন, এবং চন্দ্র লঘু হওয়ার দরুণ আকাশে উঠিলেন।

এই সব বর্ণনার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আশমানীর রূপ-বর্ণনা কোনও অংশে হীন নহে।

কালিদাস তাঁহার নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥

অথবা কামমনুপমরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্ ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করিতেছেন,—

চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগ্যান্ রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

আবার,—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈরনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

তৃতীয় অঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলার বর্ণনা,—

স্তনন্যস্তশ্বেতপ্রতিবিলমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাধাং তদপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমন্তাপং কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

পঞ্চম অঙ্কে সভায় আগতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

কেয়ময়গুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রার্পিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন,—

দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাস্মিতেনাঞ্চিতং
দন্তানাংপরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্নাবিলিপ্তাধরম্।
কর্ণোদ্ভ্রান্তিপাটলৈরলকৈরন্তর্গতং তদ্ভাবতো
দেতন্মুখং চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমসংপ্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্॥

আবার,—

অস্যাস্তন্বঙ্গি স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা দৃশ্যন্তে বিষমে-মতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সখায়ানপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং প্রেম্না মনুষ্যীষদীক্ষত ইব স্রেরা চ বন্তীব মাম্॥

সর্ব্বশেষে সপ্তম অঙ্কে রাজা শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতে তিনি দুইবারমাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারই সীতার মুখখানিমাত্র আঁকিয়াছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

প্রতনুরিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুণ্ডলৈর্দশনমুকুলৈর্মুক্তালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্ভোগ্যৈরঙ্গপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈরনুগতমধুরৈরাত্মানং মে কুতূহলনগ্নকৈঃ॥

রাম ভাবিতেছেন সীতার মুখখানি, আর তাহাও এই হিসাবে ভাবিতেছেন যে, এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আর একবার ভবভূতি বিরহিণী সীতার বর্ণনা করিতেছেন,—

পরিপাণ্ডুরগণ্ডলোলচুম্বিস্ফুরদ্ধবতী বিলোলকবরীকলাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা পরাধিনী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

আবার সেই মুখখানিমাত্র! তাঁহাও আঁকিয়াছেন তাঁহার বিচ্ছেদদুঃখ বর্ণনা করিবার জন্য। অন্য সর্ব্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভাবিতেছেন! তিনি একটি শ্লোকে সীতার যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাহা বহু শ্লোকেও বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥

রাম ভাবিতেছেন, সীতা তাঁহার গৃহলক্ষ্মী। আর আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সীতার বিরহে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কি না? তাঁহার কি সীতার বাহ্যিক-রূপের দিকে লক্ষ্য আছে! যাঁহার—

স্নানস্য শ্লীবকুঙ্কুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

তাঁহার রূপ রাম বর্ণনা করিবেন কিরূপে?

যাঁহার কাছে থাকিয়া রাম

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

তাঁহার রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার স্পর্শ—

প্রচ্যোতনং মু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে সঞ্জীবনৌষধিরুতো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥

আবার,—

প্রসাদ ইব মূর্দ্ধন্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অন্যাপ্যেবার্দ্রয়তি মাং ধৃং পুনঃ স্বাসি নন্দিনি॥

তাঁহার সৌন্দর্য্য-বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে কি? যাঁহাকে রাম বিবেচনা করেন,—

উৎপত্তিপরিশুদ্ধায়াঃ কিমন্যৈঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নাস্যাঃ শুদ্ধিমতঃ॥

তাঁহার আর অন্য বর্ণনা কি হইতে পারে?

রাম "কালিন্দীতটবট" ভুলিতে পারেন না কেন? না সেইখানে—

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদাদশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥

বাস্তবিক, সীতার বাহিরের রূপ দেখিবার অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার গুণে মুগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত পবিত্র, এত উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখিতেন। মাতার আবার রূপ কি,—তিনি সর্ব্বাঙ্গে, অন্তরে বাহিরে, কথায় ভাবভঙ্গিমায় এক মাতা, আর কিছু নয়।

ক্রমশঃ।

বিদেশী গল্প।

অদৃষ্ট।

সংসারে এমন অনেক দুঃখকষ্ট আছে যে, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে তাহার তীব্রতা অনুভব করিতে সমর্থ নহে। যে কখনও বেদনা পায় নাই, ব্যথিতের যন্ত্রণায় সে কি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতেছি।

আমার স্নেহময় পিতা,—ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন,—আমাকে সুশিক্ষিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফললাভ হয় নাই। পাঠে আমার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল সত্য, অল্প চেষ্টাতেই আমি পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিতাম, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আমার জীবনটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

লোকে বলিত,"ম্যাক্স ষ্টোল প্রায়ান্ লোকটি মন্দ নয়; কিন্তু জগতের কাহারও কোনও কাজে লাগিল না।"

কেন বলিতে পার?

অতি শৈশব হইতেই আমি নিদারুণ লজ্জাশীলতা রোগগ্রস্ত হইয়াছিলাম। জনপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে আমি মহা বিপন্ন হইতাম। কোনও ক্রমেই তথায় যাইতাম না। আমার শিক্ষার দোষ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার এই মহৎ দোষ বিন্দুমাত্রও সংশোধিত হয় নাই। কোন আগন্তুককে দেখিলে আমি গৃহকোণে অথবা কোনও দ্রব্যের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। যদি সাক্ষাৎকার এড়াইবার কোনও উপায় না থাকিত, তাহা হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অহম্মুখের মত নির্ব্বাকভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে পা নাড়িতাম, নয় ত প্রয়োজনানুসারে আমার মুখমণ্ডল কখনও আরক্ত, কখনও বা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপে ক্রমশঃ আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

নবীন যুবকদিগের মধ্যে এই দোষটা যেন সংক্রামক ব্যাধির মত প্রবল। শিক্ষামন্দির হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত বহু নব্য যুবকের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আমি বুঝিয়াছি, আগন্তুকের সহিত বাক্যালাপকালে তাহারা বহু চেষ্টাতেও আস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিতে পারে না। পা দুইখানি কি ভাবে

রাখিতে হয়, তাহাও যেন তাহারা অবগত নয়। কেহ হস্তযুগল লইয়া এত বিপন্ন হয় যে, গৃহের তাকের উপর যদি কাগজে মুড়িয়া রাখিবার হইত, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে করযুগল বাড়ীতে রাখিয়া আসিত।

তাহারা প্রথমতঃ ওয়েষ্টকোটের পকেটে করপল্লব ঢাকিবার চেষ্টা করে, নয় ত পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয়। তার পর অকস্মাৎ প্যাণ্টালুনের পকেটে হাত রাখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার কোনও অলীক পতঙ্গের সন্ধানে শরীরের এই ভাগ্যহীন অংশকে স্কন্ধদেশের অভিমুখে চালনা করিতে থাকে।

এবম্প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হতভাগ্যের অবিগতির জন্যই আমার এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। আমি লজ্জাশীলতা ও ঘোরতর অশিষ্টতা রূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের বহু সৌভাগ্য, সুখ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমার পিতৃব্যপুত্র স্পারহ্যাভেন কোনও উইল সম্পাদন না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমি তাঁহার নিকট আত্মীয়, সুতরাং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ আমার অধিকারে আসিল। তখন আমার বয়স চব্বিশ বৎসর। আত্মীয়ের অনুগ্রহে যথেষ্ট সম্পত্তি ও পর্য্যাপ্ত অর্থ পাইয়াছিলাম। তখন আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গ পরামর্শ দিলেন, বিবাহ করিয়া এখন তোমার গৃহী হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকের কন্যা অগ্রজা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। যাহাদিগের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল, তন্মধ্যে একটি নীলনয়না, ক্ষুদ্রকায়া সুন্দরী আমার চিত্ত হরণ করিলেন। যখন শুনিলাম, এই যুবতী গৃহধর্ম্মপালনে সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণসম্পন্না ও ঐশ্বর্য্যবতী, তখন ভাবিলাম, শুভ অবসর পাইলেই আমি গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিব। এই অভিপ্রায়ে আমি যুবতীর খুল্লতাতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

অপরিচিত অথবা আগন্তুকের সহিত আলাপ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় আমি পূর্ব্বে বড় একটা কোথাও নিমন্ত্রণ যাইতাম না। কিন্তু এ যাত্রা সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কারণ, আমার ভাবী পত্নী বার্ব্বেটীও—ইতিমধ্যেই আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পত্নীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম—নিশ্চয় এই নিমন্ত্রণসভায়

উপস্থিত থাকিবেন। এই রমণীরত্নকে লাভ করিবার নিমিত্ত কি কিছু সাহস প্রকাশ করা সঙ্গত নয়?

ক্রমে সেই স্মরণীয়, ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ শুভদিন সমাগত হইল। সে দিন রবিবার। আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। ঈষৎ-পীতবর্ণাভ কোটে মুক্তার বোতাম পরাইলাম। তুষারশুভ্র প্যাণ্টালুন ও মোজা পরিধান করিয়া উৎফুল্লহৃদয়ে দৃঢ়চিত্তে গৃহ হইতে বাহির হইলাম। আজ আমার সহিত প্রতিযোগিতায় কেহ জয় লাভ করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! যে মুহূর্ত্তে নিমন্ত্রণবাটী আমার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল, অমনই আমার সমস্ত সাহস ও দৃঢ়তা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। ভাবিলাম, না জানি আজ কত লোকই আসিয়াছে। নিমন্ত্রণটা গ্রহণ না করিলেই ভাল ছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, পলায়ন করি। কিন্তু তখন ফিরিবার আর উপায় ছিল না। গৃহদ্বারে পৌঁছিয়াই ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। সুবেশধারী পদাতিক আসিয়া আমাকে ধূমপানাগারে লইয়া গেল। গৃহস্বামী তখন একাকী বসিয়া ব্যস্তভাবে কি দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র তাঁহাকে এখনই লিখিতে হইবে; আজিকার ডাকেই পাঠান চাই; এ জন্য তিনি ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন। শিষ্টতা-প্রকাশের জন্য আমিও ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু আমার সম্বল মৌনহাস্য, অভিবাদন ও মুহুর্মুহু করে কর-ঘর্ষণ ব্যতীত শিষ্টাচারের অন্য কোনও নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সময়োপযোগী কয়েকটি কথা বলিবারও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঠিক কথাগুলি আদৌ যোগাইল না। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সমবেত নিমন্ত্রিতদিগের কলহাস্য ও গল্প গুঞ্জন আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষায় কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, সেই চিন্তাতেই আমি কাতর হইলাম।

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী পত্র লেখা সমাপ্ত করিলেন। কাগজের কালী শুখাইবার অভিপ্রায়ে বালুকাধারের জন্য তিনি চারি দিকে চাহিতেছিলেন। আমি যদি তাঁহার কাজে লাগিতে পারি, এই আশায় ক্ষিপ্রহস্তে বালুকাধারটি তুলিয়া লইলাম। কিন্তু ভ্রমক্রমেই হউক, অথবা তাড়াতাড়িতেই হউক, বালুকাধারের পরিবর্ত্তে আমি কালীভরা দোয়াতটি তুলিয়া লইয়াছিলাম। দোয়াতটি উপুড় করিয়া সযত্ন-লিখিত পত্রের উপর ঢালিয়া দিলাম! কি

দুর্দ্দৈব! লজ্জায় ঘৃণায় আমি মরমে মরিয়া গেলাম। মনে হইল, হে ধরণী, তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি! আত্মকৃত অবিমৃষ্য-কারিতার কথঞ্চিৎ প্রতিবিধানের অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে শুভ্র রুমালখানি টানিয়া লইয়া কালী মুছিতে উদ্যত হইলাম।

কিন্তু বিপুলহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিতে করিতে গৃহস্বামী আমায় সরাইয়া দিলেন। অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তিনি কালী মুছিয়া ফেলিলেন। তখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। আমিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। আমার শরীর বেতস-পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। শুভ্র মোজার উপর প্রকাণ্ড মসীচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। আমার উত্তেজিত হৃদয় তখনও শান্ত হয় নাই।

ভোজনাগারের সম্মুখে আসিয়া গৃহস্বামী একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন; আমাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

আমি দক্ষিণে ও বামে অভিবাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। ইহাতে লোকের মনে আমার সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা জন্মিবে না? আমার পশ্চাতে জনৈক পরিচারিকা পাত্রপূর্ণ মোরোব্বা লইয়া আসিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। আমার কনুইয়ের ধাক্কা লাগিয়া পাত্র ভূমিতলে পড়িয়া গেল; পরিচারিকাও ধূল্যবগুণ্ঠিত হইল।

এখন লোক আমায় কি ভাবিবে? অগ্নিবর্ষণোদ্যত শত্রুর সম্মুখে তিরস্কৃত, অকর্ম্মণ্য সৈনিকের যে দুর্দ্দশা হয়, আমার তখনকার অবস্থা সেইরূপ।

দ্বিতীয়বার এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়িল বটে, কিন্তু তখনও করে কর-ঘর্ষণ ও মুহুর্মুহু অভিবাদনে আমি বিরত হই নাই। ভূমিতলে ইতস্ততঃ মোরোব্বা ছড়াইয়া ছিল, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। অল্প দূর অগ্রসর হইয়াছি, অকস্মাৎ পিচ্ছিল মোরব্বার উপর পা পড়িল। অমনই পদস্খলন হইল। তাল সামলাইতে না পারিয়া আমি সশব্দে ভূমি-তলে পতিত হইলাম। তখন চারি দিক হইতে ঘোর রবে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

এ বিপদ আমার একার নহে। কারণ, আমি ভূপতিত হইবার সময় সম্মুখবর্ত্তী দুইখানি চেয়ারে আমার পা বাধিয়া গিয়াছিল। পতনবেগে চেয়ার দুইটিও উলটাইয়া গেল। দুই জন রমণী উহাতে উপবিষ্ট ছিলেন।

তাঁহারাও সেই সঙ্গে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিলেন। কি দুর্দ্দৈব! তন্মধ্যে এক জন আমার ভাবী প্রণয়িনী বার্ব্বেটী স্বয়ং!

অকস্মাৎ ভূমিকম্পে কি এমন হইল? চারি দিক হইতে আশঙ্কাসূচক ধ্বনি শুনিয়া এবং সকলেরই আননে ভীতির চিহ্ন দেখিয়া আমি ভাবিলাম, তবে যথার্থই ভূমিকম্প হইতেছে। তখন আমিও তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম! অপরে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। ভূমিতলে পিষ্ট মোরব্বা-দর্শনে সমস্ত ব্যাপারটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন আমার লাঞ্ছনার হেতুভূত মোরব্বাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম।

সকলে টেবিলের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। গৃহস্বামী এই ঘটনা তুচ্ছ ভাবিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন সত্য, কিন্তু লজ্জায় ক্ষোভে ক্রোধে আমার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল। পাছে কাহারও কৌতুকপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার নয়নে মিলিত হয়, এই আশঙ্কায় আমি নিজের ভোজ্যপাত্রে দৃষ্টি সন্নদ্ধ রাখিলাম।

তখন সুগন্ধি সুরুয়া পরিবেষিত হইতেছিল। বার্ব্বেটী আমারই পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়াছিলেন। তিনি একপাত্র সুরুয়া আমাকে দিতে চাহিলেন। আমি লইব বলিয়া হাত বাড়াইয়াছি, সহসা দেখিলাম, তিনি তখনও 'সুরুয়া' পান নাই। অগ্রে তিনি না পাইলে আমি কোনও দ্রব্য লইতে পারি না। সুতরাং সবিনয়ে বলিলাম যে, পাত্রটির তিনিই সদ্ব্যবহার করুন।

বার্ব্বেটী আমার অনুরোধপালনে সম্মত হইলেন না। আমি দেখিলাম, পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও যদি আমি এখন পাত্রটি না লই, তাহা হইলে বার্ব্বেটী ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। তথাপি আমি আর একবার তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। বোধ হয়, পাত্রটি যথাযোগ্যভাবে আমি ধরিয়া রাখি নাই, অথবা সে দিকে আমার ততটা খেয়ালও ছিল না। হাত কাঁপিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণে হউক, আমার হস্তধৃত পাত্র হইতে সুরুয়া উছলিয়া বার্ব্বেটীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও আমার 'আনকোরা' নূতন ট্রাউজারের উপর পড়িয়া গেল।

ধূমায়মান সুরুয়া আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীর মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর দিয়া স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে—এ দৃশ্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমার চিত্তপটে মুদ্রিত থাকিবে! বার্ব্বেটী বস্ত্রপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি অধোমুখের ন্যায় বসিয়া বসিয়া অস্ফুটস্বরে নিজের ত্রুটী স্বীকার

করিতে লাগিলাম। আমার পরিচ্ছদ হইতে তখনও উষ্ণ সুরুয়ার ধূম নির্গত হইতেছিল। আর একপাত্র সুরুয়া আমি পাইলাম। সকলে বাহ্যতঃ ঘটনাটাকে উড়াইয়া দিলেন।

আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। ভ্রমক্রমে যে আমি টেবিলের আচ্ছাদনবস্ত্রের প্রান্তভাগকে রুমাল ভাবিয়া আমার ওয়েষ্ট-কোটের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। অন্যমনস্কভাবে আমি সুরুয়া পান করিতে লাগিলাম।

অল্পকাল পরেই বার্ব্বেটী ভোজনাগারে ফিরিয়া আসিলেন।—আমি আবার অস্ফুটস্বরে বিজড়িতকণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি সমস্ত ঘটনাটাই সরহস্য ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন যে, দোষ তাঁহারই অধিক। বার্ব্বেটী প্রফুল্লভাবে গল্প করিতে লাগিলেন। আমার বক্ষ হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। ভাবিলাম, এখন সম্ভবতঃ আমার কুগ্রহের অবসান হইয়াছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রুমালখানি যে ধূমপানাগারে সকরুণ বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল, সে কথাটা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। রুমালের কালী আমার মুখমণ্ডলে আলিপনা দিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মুখ তুলিবামাত্র প্রচণ্ড হাস্যধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল। তার পর অনেকের মুখে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। নির্নিমেষনয়নে অভ্যাগত নরনারীগণ আমার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নূতন উত্তেজনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমিও প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত হাস্যে যোগদান করিলাম। ভাবিলাম, নিশ্চয়ই কোনও মজার কথা হইতেছিল, আমি শুনিতে পাই নাই। কিন্তু সকলের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মুখ নত করিলাম;—অমনই মসীলিপ্ত রুমালখানি দেখিতে পাইলাম!

ত্বরিতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রন্ধনাগারে গিয়া দয়াবতী পরিচারিকার নিকট হইতে সাবান লইয়া মুখমণ্ডল ধৌত করিতে হইবে, এই চিন্তাই তখন প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু যেমন আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি,

অমনই প্রচণ্ড আকর্ষণে আমার ওয়েষ্টকোটে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ টেবিলের আচ্ছাদনবস্ত্রও সরিয়া আসিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে টেবিলের উপরিস্থিত দ্রব্যাদি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। ছুরী, কাঁটা, চামচ ও নানাবিধ ভোজ্যপূর্ণ পাত্রনিচয় যেন আমার অনুসরণ করিতেছিল! নিমন্ত্রিতগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। রসনা-তৃপ্তিকর অনাস্বাদিত নানাবিধ আহার্য্য তাঁহাদের সম্মুখে হইতে অপসৃত হইয়া কার্পেটমণ্ডিত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

কি ঘটিতেছে, তাহা ধারণা করিবার শক্তিই আমার ছিল না। শৈশবে শ্রুত ইন্দ্রজালপূর্ণ কাহিনীর চিত্র আমার মনে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গৃহস্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি টেবিলের উপর পা রাখিয়া আচ্ছাদনবস্ত্র চাপিয়া ধরিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য রক্ষা পাইল। আচ্ছাদনবস্ত্রও আমার ওয়েষ্টকোটের বন্ধন হইতে সশব্দে ছিন্ন হইয়া গেল।

আমি আর দাঁড়াইলাম না। দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কিন্তু আমার গতি রন্ধনাগারের দিকে নহে। একনিশ্বাসে রাজপথ অতিক্রম করিয়া সোজা নিজ গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

এক মাসের মধ্যে আমি আর গৃহের বাহির হই নাই। এই ঘটনার পর বহুকাল আমি আর কোনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য।

জর্ম্মনীর এক জন ভাষাতত্ত্ববিদ্ সাহিত্যামোদী পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগের ইউরোপের তিনটি প্রধান দেশের সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার ভয়েট ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মন দেশের বর্ত্তমান কালের সাহিত্যের অবনতির নিদান স্থির করিয়া এক সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। মার্কিন দেশের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রে এই প্রবন্ধের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। হার্ভার্ড পত্রিকায় ডাক্তার ভয়েটের

* হেনরিচ্ ধোকাই রচিত কোনও জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

প্রবন্ধের যতটুকু ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সারাংশ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

অধঃপতন কেন হইল ?

ডাক্তার ভয়েক বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে, নানা বিবাদবিসংবাদে জাতির উন্নতির মুখে বাধা বিঘ্ন না ঘটিলে, কোনও কলাবিদ্যারই উন্নতি ঘটে না। যখন যে দেশে বড় বড় কবি, বড় বড় চিত্রকর ও ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশে অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। শান্তি ও বিলাসের স্থবিরতায় কোনও জাতির মনীষা বা প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর নহে। সুখের উপভোগকালে চিন্তার ও ভাবের প্রসারবৃদ্ধি হয় না। যে মানসিক চেষ্টার জন্য মানুষ জিগীষাপরায়ণ হইয়া নানাদেশ ও ভিন্ন রাজ্য জয় করিতে উদ্যত হয়, সেই চেষ্টা জন্যই ভাবময় কবির, চিত্রকরের ও ভাস্করের উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের প্রয়াসী; যত দিন মানুষ ঈপ্সিত বিলাস ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিবার অবসর না পায়, তত দিন এই চেষ্টা জন্য জাতিবিশেষের মনীষার ও প্রতিভার নানাবিধ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণী তাহাদের ঈপ্সিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। ধনে, মানে, গৌরবে ও সুখ-উপভোগে এই তিন জাতিই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশেষতঃ, ইংরাজ বা ব্রিটিশ জাতি ধনৈশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে। ফলে, এই তিন দেশের ও তিন জাতির মধ্যে কলাবিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছে। সাহিত্যের সে সৌকুমার্য্য ও ভাবৈশ্বর্য্য আর নাই বলিলেও চলে। ডাক্তার ভয়েক বলেন যে, ইংলণ্ডে আর মিল্টন, সেক্‌স্‌পীয়র জন্ম গ্রহণ করিবে না, ফ্রান্সে র‍্যাসাইন বা আল্‌ফায়েরী, লামার্টিন বা মোলোয়ার জন্মগ্রহণ করিবে না, জর্ম্মণ দেশে আর দ্বিতীয় গেটে হইবে না।

সাহিত্যের দোষ।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা হেতু 'সায়ান্সে'র প্রাবল্য ঘটায়,বর্ত্তমান যুগের ইউরোপের সাহিত্যে ভাব-প্রগাঢ়তা নাই, কল্পনার লীলাবিকাশ নাই। আছে উপযোগিতামাত্র। ভাষায় উপযোগিতা প্রবেশ করিলে ভাবমাধুর্য্য ও কল্পনাবৈচিত্র্য থাকেই না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর বর্ত্তমান যুগের লেখক গণের মধ্যে লামার্টিনের ভাষাপ্রাচুর্য্য, মিল্টনের ভাবগাম্ভীর্য্য, গেটের কল্পনার খেলা, সেক্‌স্‌পীয়রের সর্ব্বদিক্‌প্রসারিণী প্রতিভার লীলা তিলমাত্রও

নাই। ফলে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের গদ্যে সে প্রগাঢ়তা ও মধুমাধুরী নাই, ফ্রান্সের গদ্যে 'সাঁয়াসে'র শব্দের প্রাচুর্য্য ঘটায় সে লালিত্য আর নাই, জর্ম্মণীর গদ্যের সে গাম্ভীর্য্যও নাই। লোকে এখন অল্প কথার মধ্যে, অল্প সময়ের মধ্যে আসল কথাটা জানিয়া লইতে চাহে। কবির কাব্য-বিন্যাসের ভঙ্গী, সুলেখকের শব্দচাতুরীর মহিমা বসিয়া বসিয়া উপভোগ করিবার অবসর কাহারও নাই। কাজেই লেখকগণ আর রচনা-চাতুর্য্য-বিস্তারের জন্য, রসোদ্গার সিদ্ধ করিবার জন্য অণুমাত্র প্রয়াস পান না। মনে হয়, সে সামর্থ্যও আধুনিক লেখকগণের নাই।

পদ্যেরও গদ্যের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পদ্যে আর তেমন ভাবের বিমল অভিব্যঞ্জনা একেবারেই নাই। ভাবগুলা যেন আকাশের মেঘের মত ধূম্রাকারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; উহাদের আকার নাই, অবয়ব নাই, যোজনাসঙ্গতিও নাই। কেবল শব্দের ঝঙ্কার, আর বিলাসের ও উপভোগের ইঙ্গিত আছে। আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য যেন কেবলই রক্তমাংস লইয়া বিব্রত, উপভোগের খোস্ খেয়ালে বিভোর। ফ্রান্সের কাব্য ও নাটকও এখন কেবল অশ্লীলতায় ও উপভোগের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। ফ্রান্সের দোষ ইংলণ্ডেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের নাটক প্রহসনের ভাবভঙ্গী পিতাপুত্রে একত্র দেখিতে পারে না। আর জর্ম্মণী যেন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণ জাতি এখন টাকা রোজগারের ব্যাপারে যেন উন্মত্ত—কেবল রসায়নের চর্চ্চা, কেবল শিল্পচাতুরীর নকল-নবীশীর উৎকট প্রয়াস। ফলে, এখন আর জর্ম্মণীতে দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় চর্চ্চা নাই, দার্শনিক ভাবের অনুভূতির জন্য সুখবোধও নাই। ফলে, জর্ম্মণ ভাষা যেন দিনে দিনে কঠোরতর ও শুষ্কতম হইয়া পড়িতেছে। উল্লেখযোগ্য একটা কবিও জর্ম্মণ দেশে নাই। সুরসিক ও ভাবুক জর্ম্মণীতে বিরল।

সুখ ও দুঃখ।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার ভয়েক একটা বড় কথার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মানবতায় দেবভাবের উন্মেষ দুঃখজন্য;—অতি কঠোর, অতি অসহ্য দুঃখ ভোগ না করিলে মনুষ্য-হৃদয় হইতে দেবতার আবির্ভাব হয় না। সুখ বা বিলাসের উপভোগকালে, মানুষের মধ্যে যেটুকু পশুত্ব আছে, তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, পশুও আছে;

দুঃখে ও দৈন্যে, উৎপীড়ন ও উপদ্রবের কালে দেবভার আবির্ভাব হয়। যখন দেবভা ফুটিয়া উঠেন, তখনই সাহিত্যে সদ্ভাবের বিকাশ হয়, সুকবি জন্মগ্রহণ করেন, কল্পনা স্বর্গের পথে মাধুর্য্যের বল্লরী লইয়া খেলা করে। আর যখন মানুষ ধনকুবের হইয়া সুখবিলাসী হয়, তখন পশুত্বের উন্মেষ হয়; তখন ভোগবিলাস ছাড়া মানুষ আর কিছু চাহে না, আর কিছুর ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর থাকে না। ইংলণ্ডের এখন সেই সুখের দশা। ফ্রান্সে তাহার প্রবীণতা ঘটিয়াছে। জর্ম্মণীতে সে সুখলিপ্সার উন্মেষ হইতেছে মাত্র। তাই ইংলণ্ডে লর্ড মর্লী ও লর্ড রোজবেরী ছাড়া গদ্য-লেখক নাই। ফ্রান্সে গদ্যের পূর্ণ অবনতি ঘটিয়াছে। জর্ম্মণীর গদ্য শুষ্ক বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। পদ্য বা কাব্য টেনিসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে লোপ পাইয়াছে। ফরাসী দেশে এখন পদ্য বা কাব্য বলিলে লোকে অশ্লীল ভাবেরই কল্পনা করে। জর্ম্মণীর পদ্য বা কাব্য 'সায়াসে'র ছড়া বলিলেও চলে। দৈন্য-ভুক্তা ভারতী, ইউরোপে দৈন্যের অভাব দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আছেন কোথায়?

ডাক্তার ভয়েল্ক বলেন, যদি ইউরোপে কোথাও সুকুমার সাহিত্যের ও কাব্যবিনোদিনীর পদাঙ্ক দেখিতে চাও, তবে হিস্পানী দেশে ও হঙ্গেরীতে সে পদাঙ্কের অন্বেষণ কর—পাইলেও পাইতে পারিবে। হঙ্গেরীর প্রাদেশিক ভাষায় যে অপূর্ব্ব ও অভিনব গাথা বাহির হইতেছে, তাহার অনুরূপ মধ্য-যুগে ইটালীতে একবার ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইউরোপের আর কোনও প্রদেশে কখনও তেমনটি হয় নাই। হিস্পানী ও পর্ত্তুগীজ সাহিত্যেও অনেক নূতন নূতন কাব্য ও নাটক রচিত হইতেছে। হেতু এই,—হঙ্গেরীতে ও হিস্পানী দেশে, ফিন্‌ল্যাণ্ডে ও আলবানিয়ায় দুঃখের মহিমা এখনও প্রকট রহিয়াছে, তাই দেবী ভারতীও তথায় বিদ্যমানা। দুঃখ বলিলে কেবল দেহজ দুঃখ বুঝিও না, কেবল ভাত কাপড়ের দুঃখ বুঝিও না। দুঃখ বলিলে বুঝিতে হইবে, কল্পনার আকাঙ্ক্ষাজাত মনীষার যে অভাব-বোধ; ভাতকাপড়ের অভাব দূর হইলেও যে বোধের তৃপ্তি বা পর্য্যবসান ঘটে না। যাহা ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টির প্রতিকূল-বেদনীয় ভাব, তাহাই দুঃখ। এ দুঃখ ইংলণ্ডে নাই, ফ্রান্সে নাই, জর্ম্মণীতেও বড়ই বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুঃখের আসনেই ভারতীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। যে দেশে 'মেটিরিয়ালিজমে'র প্রভাব

যতটা প্রবল হইয়াছে, সেই দেশে এই স্বর্গের দুঃখ অপসৃত হইয়াছে। কেবল দেহটাকে লইয়া বিব্রত থাকিলে এ দুঃখের স্বর্গীয় দ্যুতি মনুষ্য-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণী এখন ভোগায়তন দেহটা লইয়াই বিব্রত, তাই অশরীরী সাহিত্যের অধঃপতন এই তিন দেশেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম থাকিলে, ধর্ম্মজন্য পারলৌকিক চিন্তার উদ্বেগ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবল থাকিলে, তবে প্রকৃত কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা একটা জাতির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে। ইউরোপে ধর্ম্ম নাই, উপভোগ আছে, ইউরোপের সভ্য ও প্রবল জাতি সকলের সাহিত্যও তাই ভোগের ক্লেদে কলঙ্কিত।

শেষ কথা।

হার্ভার্ড পত্রিকার সমালোচক এই প্রবন্ধের সারাংশ দিয়া শেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—সমালোচক-প্রবর বলেন যে, ডাক্তার ভয়েক্তের যুক্তিজালবিস্তার ঠিক হইলেও, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ঠিক নহে। বিলাসে জাতির এক একটা পর্দ্দা বিগড়িয়া যায় বটে, কিন্তু নিম্নস্তরগুলি ভাল থাকে। সে স্তরের লোক দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে নবজীবন লাভ করিতে পারে, নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে। ইউরোপ যে স্থবিরতায় নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে, মার্কিণে সে স্থবিরতা নাই। মার্কিণে ইংরাজি, ফরাসী ও জর্ম্মণ, এই তিন সাহিত্যের অভিনব উদ্গম হইবেই। জর্ম্মণ ডাক্তার মার্কিণের ভাবনা না ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করায় আংশিক প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

সমালোচকের মন্তব্যটি হাস্যজনক বটে। উহার মূলে জাতিপ্রীতি ও জাতিগত স্পর্দ্ধার ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্পর্দ্ধাই এখন ইউরোপ ও আমেরিকার অদ্বৈত যষ্টির স্বরূপ।

অভিষেকে ভাবোন্মেষ।

"ডেলী মেলে"র প্রসিদ্ধ লেখক ম্যাক্সওয়েল একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসবে ইংরেজী-ভাষী জাতিসমূহের মধ্যে যে ভাবোন্মেষ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে একটা ভাবসমতা ফুটিয়া উঠিবে। এই জাতিগত সমতা হইলে সাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে। ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবসাদারীর ভাব ঢুকিলে সাহিত্যের সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। টেনিসনের

পর হইতে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবসাদারীর ভাব ঢুকিয়াছিল। এই নবীন রাজভক্তির ভাবোন্মেষে সে ব্যবসাদারীর ভঙ্গীটা নষ্ট হইতে পারে। লণ্ডনের বিশপ মহোদয় একটি 'সন্দর্ভে' ম্যাক্সওয়েলের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাবই মনুষ্য-সমাজে এক অপূর্ব্ব সুষমা ঢালিয়া দেয়। সমাজে কেবল আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রবল থাকিলে, ভাবের মাধুরী নষ্ট হয়। ভাবের জন্যেই মানুষ আত্মত্যাগ করিতে পারে; সংযম ও সন্ন্যাসে ব্রতী হইতে পারে। দেশহিতৈষণা, জাতি-প্রীতি, ধর্ম্ম প্রাণতা—এ সকলই ভাবজন্য। এই ভাবটুকু, জীবনের এই কার্য্যটুকু অটুট থাকিলে সংসার সুখময় হয়, জাতির সাহিত্য পুষ্ট ও পূর্ণাকার ধারণ করে। বিশপ মহোদয় বলেন যে, বিলাতে টাকার প্রাধান্য হওয়াতেই জীবনের এই ভাবমাধুরীটুকু নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই সাহিত্যেরও অধোগতি হইতেছে। বিশপের এই অভিভাষণ ও ম্যাক্সওয়েলের প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে বিতরিত হইতেছে। বিষয়টা লইয়া বিলাতের বুধমণ্ডলীর মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবিনী।

তোমার মদির গন্ধ সুমন্দ পবনে
কোথা হ'তে আসে ভাসি' না জানি সন্ধান,
মত্ত ভৃঙ্গ সম ধায় অধীর এ প্রাণ
দিকে দিকে দিশাহারা ব্যর্থ অন্বেষণে।
ওগো আলেয়ার আলো, কত না ঘুরা'লে
পথভ্রান্ত পান্থ জনে, প্রান্তরের মাঝে
আঁধারে একেলা ফেলি' লুকালে আড়ালে,
দেখা নাহি দিলে আর। কভু কানে বাজে
মঞ্জীরের মধুরব, বলয়-শিঞ্জিত,
শুনি মৃদু পদধ্বনি স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
আঁধার নিয়রে মোর; কোমল কম্পিত
হিমস্নিগ্ধ করতল রাখ মোর হাতে।
যেমনি বাঁধিতে যাই আলিঙ্গন-পাশে
বাহু বক্ষ শূন্য করি' মিলাও বাতাসে।

শ্রীসুরেশর শর্ম্মা।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

ললিতা।

"ললিতা" সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধার হইতে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। ঝড়ের বর্ণনা "ললিতা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

গভীর জলদ-নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলা ভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

এই 'শুষ্ক বনে অন্ধকারে' বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড় বৃষ্টির ভয় নয়,—ভূতের ভয়। তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একটু ভীত হইতেও দেখিয়াছি। এই ভয় বাল্যকালে কিছু বেশী থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির যে ভাব চারিদিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ "ললিতা"য় অঙ্কিত করিয়াছেন। "ললিতা" কাব্যটিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকা মনোমধ্যে সঞ্জাত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাত্রবিশেষে কার্য্য-কারণের ফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে, জীবহত্যা-দর্শনে কত লোকের হৃদয় কাঁদিয়া আসিতেছে; কিন্তু কয় জনের শোকমথিত হৃদয় হইতে গুরুগম্ভীর রবে ধ্বনিত হইয়াছে,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

পৃথিবীতে আবহমান কাল হইতে কত আপেল, কত আম্র প্রভৃতি ফল বৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কয় জন লোক নিউটনের মত তাহার 'তত্ত্ব'

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন? বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু কয় জনের ভয়কম্পিত চিত্ত হইতে "ললিতা"র সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু কয় জন কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছেন?

"ললিতা"য় স্থানে স্থানে বিদেশী ভাব দেখা যায়। "মানসে" তা' নাই; আছে শুধু সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জ্জন। অপ্রকাশিত কাব্যগুলি খাঁটী দেশী, সৌন্দর্য্যময়, ভাবপূর্ণ। কিন্তু ভাষার জন্য, শব্দের জন্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে আকুলি-বিকুলি করিতে হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আর এক কথা; বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবকবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কবিতা লিখিতে শিখিয়াও কখনও তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে একাকী দূরে বসিয়া, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া, কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

হুগলী কলেজে শেষ কয়েক বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে এক জন বিশিষ্ট শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশস্বী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যশ, তাঁহাদের কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কলেজে থাকিয়া যে দুই জন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশান বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন ভট্টপল্লীনিবাসী কোনও পণ্ডিতের নিকট। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ষোড়শ বৎসর বয়সের পর হইতে "প্রভাকরে" পদ্য বা প্রবন্ধ লিখিতে দেখি নাই। আমি শুনিয়াছি, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে

একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

গুপ্ত কবির এ উপদেশ কোন্ সময়ে দিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। যে সময়েই দিয়া থাকুন, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত কবির নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ একবার জন্মের মতন দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে—সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার কাঁচড়াপাড়ায় গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনবৃত্ত লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত!

প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। হুগলী কলেজে Senior Scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বৃত্তি কত টাকার, তাহা জানি না। তিনি এই বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন।

যাদবচন্দ্র তখন চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টারণ্ বেঙ্গল্ রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলী ঘুরিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতা পিতা ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া একাকী থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক। সঞ্জীবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় থাকিতেন।

তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারি দিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন স্রোতোমুখে জীর্ণ-তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, কলিকাতার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হালিডে আলিপুর ছাড়িয়া

কলিকাতায় আসিয়াছেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলণ্টিয়ার দল চারি দিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত; যে যেখানে পারিতেছে, পলাইতেছে।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যা-শিক্ষার্থ আসিলেন। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। বঙ্কিমচন্দ্র স্থির জানিতেন, ইংরাজদের কেহ তাড়াইতে পারিবে না; মুসলমান ও হিন্দুরা দুই দিনের জন্য উপদ্রব করিতেছে মাত্র। তিনি ইংরাজি যেমন পড়িয়া যাইতেছিলেন, তেমনই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ওকালতী করিবার জন্য যেমন আইন শিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষক Montrionকে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি এক দিনের জন্যও ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে, তাহা হইলে তোমার আইনপুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইতে না হইতে ইংরাজের বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে অনল নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। যে জাতি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় কোটী কোটী মনুষ্যকে দমন করিতে পারে, সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরাজ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রেল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র বিলম্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া দুরূহ। অনেকে পিছাইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তেরো জন পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা পরীক্ষা দিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের পরীক্ষা করিলেন গ্রাপেল। সংস্কতের পরীক্ষা করিলেন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরীক্ষায় দুই জন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন; তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র; দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।

মে মাসের শেষভাগে বি. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকরী তুমি প্রত্যাশা কর?

বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকরী আপনি আমাকে দিন্ না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোনও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোটলাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তিদর্শনে প্রীত হইলেন; বলিলেন, "ভাল, তোমায় আমি কিছুদিনের সময় দিলাম; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।"

চাকরী গ্রহণ করিবার বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে গ্রহণ করিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই তারিখে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারত-মহিলা আষাঢ়।—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের "নৈতিক শিক্ষা ও পরিবার-গঠন" হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধবিশেষের 'সারাংশ'। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তার ফল বাঙ্গালীকে উপহার দিয়া লেখিকা আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দান যাহাতে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হয়, সে পক্ষে তাঁহার দৃষ্টি নাই। ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা সকলে বুঝিতে পারে না। ইংরাজী রচনা-পদ্ধতির ছাঁকা নকল বাঙ্গালা-নবীশদিগের অত্যন্ত উদ্ভট বলিয়া মনে হয়। অক্ষর ও শব্দই ভাষা নহে। সকল ভাষার শব্দ-বিন্যাসবৈচিত্র্য ও বাক্যপ্রয়োগপদ্ধতি এক নহে। এই বৈচিত্র্যেই ভাষার বৈশিষ্ট্য। এক ভাষার বাক্য অন্য ভাষায় অনূদিত, ব্যক্ত, বা অনুকৃত হইতে পারে, কিন্তু মাছিমারা কেরাণীর মত নকল করিলে যে উদ্ভট ও বিকট বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহা ভাষার সঙ্কর। কোনও ভাষায় এরূপ সঙ্কর-রচনা কখনও 'জাতে' উঠিতে পারে নাই। অনেকের বিশ্বাস, এইরূপ রচনায় ভাষা সম্পন্ন ও সহজ হয়!—ভ্রান্তি বোধ করি আর

কখনও এত মোহময়ী হয় নাই!—মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বক্তব্য গুপ্ত রাখিবার জন্য মৌন-ব্রতের ব্যবস্থা আছে। এখন অনেক ইংরাজী-নবীশ যে বাঙ্গালা লেখেন, তাহা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনধিকারী, তাহারা এই শ্রেণীর ইঙ্গ-বাঙ্গালা, সঙ্কর-বাঙ্গালা, ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন না। মাতৃভাষার ধাতু ও প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইংরাজীর অনুবাদ করিলে ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণ সেই পথেরই পথিক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, তারাশঙ্কর, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন,—কিন্তু তবু তাহা বাঙ্গালীর অনধিগম্য নহে। কেন না, তাহার ধাতু ও প্রকৃতি [illegible] আমদানী নহে। আর বিখ্যাত লেখকদিগের মুদ্রাদোষের অনুকরণ নূতন ব্রতীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচলিত রীতির অনুবর্ত্তিনী হইলে, উদ্ভট সঙ্কর ভাষার সান্নিধ্য পরিহার করিলে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের ভাষা উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের "পরশুরামের প্রতি তদীয় পত্নী" নামক কবিতায় বিশেষত্ব নাই। "কাশী-ভ্রমণে" নূতনত্ব নাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নন্দন-বনে" প্রবেশ করিতে ভয় হয়,—ভাষায় এত কাঁটা! রচনা-রীতি অদ্ভুত, জঘন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ যুগে সাহিত্যে স্পর্দ্ধার মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন লেখকদিগের মধ্যে অনেকের মাথা খারাপ হয়—যেন ঝুমোরের ঢাকের মত ঘন্‌ঘন্ করিয়া ঘুরিতেছে। রবীন্দ্রনাথের তপস্যা করিতে করিতে অনেকেরই ধারণা হইয়াছে, তাঁহারাও রবীন্দ্রনাথেরই মত স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী, অতএব সেই প্রতিভায় ওঁ ভাইলিউশন ভগবান তাঁহাদের মস্তিষ্কের কূপোয় ঢালিয়া দিয়াছেন। এই গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধার ক্রীতদাসেরা ভুলিয়া যান যে, ভোষামোদ-প্রতিভার অধিকারী হইলেই সাহিত্য-প্রতিভার প্রসাদ লাভ করা যায় না। এই ভ্রান্তির ফলে আজ কাল 'যত ছিল নাড়াবুনে, সব কীর্ত্তনে' হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অর্ব্বাচীন মনে করিতেছে, ভাষাকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ব্যাকরণকে উড়াইয়া, ছন্দঃশাস্ত্রকে পুড়াইয়া এমন অনন্যসাধারণ অরাজকতার সৃষ্টি করিবে যে, বর্ত্তমানের কোনও চিহ্নই থাকিবে না!—এই সংস্কারে অনেক দুধের ছেলে বহিয়া গেল! দুঃখ হয়

না কি?—এই চারুচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষাকে রসাতলে না দিয়া কোনও মতেই ছাড়িবে না। কে চারুচন্দ্রদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, মোপাঁসার গল্প চুরী যত সহজ, ভাষার রীতি, প্রকৃতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন তত সহজ নহে। তথাকথিত 'প্রতিভা'র যে পরিবারে যথেচ্ছাচারী, হঠকারী সাহিত্যতাঁড়দিগের উদ্ভব হয়, কোনও কালে সে পরিবারের কেহ ভাষা গড়িয়া যাইতে পারে নাই। "বঙ্গবাস" লিখিলে "ভারত-মহিলা" ছাপিতে পারেন, কিন্তু ভাষা তাহা পদদলিত করিবে। "ভণ্ডবালির ঘূর্ণা ভাবের নাচ" সাহিত্য-সভার আনন্দবিধান করিবে, আমরা কিন্তু লেখককে ধলন্দার পথ দেখাইয়া দিব। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর "তুমি" নামক কবিতায় অনেক অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। নূপুর এতকাল রাঙ্গুল চরণে গুঞ্জন করিতেছিল,—চক্রবর্ত্তী কবির কবিতায় "মধুময় সমীরণ 'তুমি'র রাঙ্গুল চরণ ঘেরি করিছে ব্যজন!" তার পর,—"বসন্ত অমিয় মাখা সঙ্গীত-লহরী নূপুরপরশে কত গীত উড়িতেছে!" লহরী! তুমি আর কখনও উড়িয়াছ কি? চক্রবর্ত্তী কালের 'কাব্যি'র উপরও টেক্কা দিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "মডারণ রিভিউ" [illegible] দেবেন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় তাহার অনুবাদ করিতেছেন। সুখপাঠ্য। "সন্দেহে" ছোট গল্প নহে,—উপাখ্যান; বিশেষত্ব নাই। "ধনী ও নির্ধন" কবিতা নহে। কবির মতে, 'দুঃখ মাতা।' পিতাই হউন, আর মাতাই হউন, 'ধনী ও নির্ধনে'র দরজায় তিনি মাথা হাতে বসিয়া আছেন! সাধু সাবধান!

দেবালয়। আষাঢ়।—শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'হিন্দু-ধর্ম্মের লক্ষণ' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। উপাদেয় নিবন্ধ। ভারত-তিলক চিন্তাশীল তিলকের চিন্তামণি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়া দেউস্কর পণ্ডিত আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব্ব রূপসী'র ছন্দের ঝঙ্কার মধুর; কিন্তু ভাবের দৈন্য শোচনীয়। দেবেন্দ্র কবির এই শ্রেণীর কবিতাগুলি একটু 'একঘেয়ে' ও 'পানসে' হইতেছে। কবিবর নূতন তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিন। তাঁহার অমৃত-উৎস শুষ্ক হইবার নহে। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "খলিফা হিজীর ওমর" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "অনুতাপে" 'কী' আছে, সেই

চরণে খোদ অনুতাপ পাঠকের প্রতীক্ষা করিতেছে। সত্য মিথ্যা, অগ্রসর হইয়া দেখুন। "হক্ কেদৎ" "দেবালয়ে"র সমালোচক হইয়াছেন! 'বিতিকিচ্ছি' রূপ না ধরিলে বুঝি স্কন্ধে বিশ্লেষণী শক্তির ভর হয় না!

পতাকা।—জ্যৈষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের অত্যন্ত অভাব। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের "ঋগ্বেদ" বেদ-সিন্ধুর ক্ষুদ্র বিন্দু। আর এই "নিরন্তপাদপে দেশে" "প্রেতের কাণ্ড ও বিচার" নামক এরণ্ডও দ্রুম বটে; কিন্তু অসম্পূর্ণতা তাহাও মুড়াইয়া খাইয়াছে। অতএব আমরা নাচার।

অর্চ্চনা।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় "অর্চ্চনা" কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "অর্চ্চনা" অনেক নূতন মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রাচীন ঋষিপত্তন ও বৌদ্ধধর্ম্ম", শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের কথা", "কলিকাতা প্রতিষ্ঠা", শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর "উন্নতি কি অবনতি?" ও সম্পাদকের 'প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর' যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে।—প্রায় সকল প্রবন্ধই ঐতিহাসিক,—কিন্তু বৈচিত্র্যগুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। 'প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর' সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য "সাহিত্যে" আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা কেশব বাবুকে তাহাও দেখিতে বলি। এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢকা-নিনাদী মাসিকসমূহেও প্রায় দেখিতে পাই না। 'অর্চ্চনা'-মণ্ডলীর সাহিত্য-সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ।—প্রথমেই 'লোক-শিক্ষা'। মামুলী পরামর্শ; নূতন কিছু দেখিলাম না। এক নিশ্বাসে রামায়ণ-গানের মত দুই পৃষ্ঠায় এরূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'সাহিত্যে অপচয়' প্রবন্ধের লেখক আত্মপ্রকাশ করেন নাই। এই প্রবন্ধে তিনি 'সমালোচকে'র যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলির কল্পনায় অনেকখানি সাহিত্য-শক্তির অপচয় হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। এইরূপ দশকর্ম্মান্বিত ও 'বিভূতি'শালী সমালোচকের জন্য লেখক সহায় বিধাতাকে বায়না দিন।—আমরা কেবল ভাবিতেছি, যিনি এত বড় সমালোচকের কল্পনা করিয়াছেন, তিনিস্বয়ং কত বড় সমালোচক!—এই লেখকের মতে 'পাণ্ডিত্য' সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য্য। অবশ্য,

দুনিয়া আরও বহুবার এই তথ্য কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে।—ভাষা-জ্ঞানও যদি পাণ্ডিত্যের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করিব, যাঁহারা সমালোচকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদের পক্ষে 'পাণ্ডিত্য' কি গোমাংস? 'গুণের আবশ্যক' প্রভৃতি প্রয়োগ যে পাণ্ডিত্যের ফল, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয় কি না? 'ময়রারা কি সত্যই সন্দেশ খায় না' মহাশয়? শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'বুদ্ধ-সংবাদ—ব্রাহ্মণ' বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত। "কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা" কুতূহলী পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবে। ঈশানচন্দ্রের স্মরণে বিষাদের সঞ্চার হয়। হায়, আমরা কতটুকু পাইয়াছি, কিন্তু কত হারাইয়াছি। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লাকোঁর ফরাসী হইতে "বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘ বা ভিক্ষু-মণ্ডলী" সঞ্চয় করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক। বিজন তপোবনে মাতৃভাষার কল্যাণকল্পে তিনি ধ্যানমগ্ন। বাঙ্গালা দেশেও এ দৃশ্যকে পবিত্র বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "বিজয়নগর" উপভোগ্য। বরেন্দ্র-ভ্রমণের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের "সমুদ্র" সুখপাঠ্য। ষষ্ঠ স্তবক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের "পুরুষ্বর" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। নবীন আচার্য্যের ভাষার আরোহ ও অবরোহ, গভীর নিনাদ ও কল প্রশংসনীয়। এখনও একটু আতিশয্য, একটু অত্যুক্তি আছে। এইটুকু কালক্রমে তিরোহিত হইলে রাজেন্দ্রলালের ভাষা আরও উৎকর্ষ লাভ করিবে। শ্রীযুত সুরেশ্বর শর্ম্মার "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতার নূতন কথা এই যে,—রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে স্বর্ণবীণা লইয়া 'সুরবৃন্দে নয়নের নীরে ভাসাইতেন'। সুরেশ্বরও বোধ করি এই 'বৃন্দে'র অন্তর্গত ছিলেন, তাই জানিতে পারিয়াছেন! যাক, তার পর রবীন্দ্রনাথ একটু থামিয়া, আবার বীণা ধরিলেন, এবং তাহাতে 'ধরার ক্রন্দনধ্বনি' বাজিয়া উঠিল। কল্পনা কমনীয় বটে, কিন্তু সুরের এই এক ধারা অপগত ও অন্য ধারা উদ্গত হইবার সন—তারিখ বলিয়া দিলে আমরা মিলাইয়া দেখিতাম,—রবীন্দ্রবাবুর ইদানীন্তন যে কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা কাঁদিয়াছি, সেগুলি এই পর্য্যায়ের কি না। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের "বশীকরণ" চলনসই—কিন্তু আশাপ্রদ। শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের "নূতন নীহারিকাবাদ" উল্লেখযোগ্য। "কলিকাতার অভ্যন্তরে" লেখকের নাম নাই, কিন্তু আগুন কি ছাই চাপা থাকে!

বঁধু হে! তোমাকে পাতা-ঢাকা ফুলের মত, ঘোমটা-ঢাকা বধূর মত, বড় মধুর—বড় মিষ্ট মনে হইতেছে। তোমার রচনা-ভঙ্গী যে অনন্যসাধারণ অনুকরণের অতীত। এই উজ্জ্বলে মধুরে, গাম্ভীর্য্যে ও তারল্যে, তথ্যে ও রঙ্গে, তত্ত্বে ও ব্যঙ্গে অপূর্ব্ব সংমিলন,—এই আধ-হরি আধ-হর ভাব,—এই সাহিত্য-বিলাসী ও দার্শনিক সন্ন্যাসীর আকস্মিক ভূমিকা-বিনিময়—এ যে বাঙ্গালায় অতুলনীয়! তুমি কি আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারো? 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' যদি না হইতে, তাহা হইলে ছদ্মবেশের আলখেল্লায় তোমার অপূর্ব্ব শক্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারিতে। কিন্তু তোমার সাহিত্য-শক্তি কি ঢাকিবার?—'কলিকাতার অভ্যন্তরে' এত মধু ছিল, তাহা তোমার আগে কে জানিত? শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' সুলিখিত ও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। বৈশাখী "বঙ্গদর্শনে"র প্রবন্ধ-ভাগ্য প্রশংসনীয়।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। আষাঢ়।—আমরা এই নূতন মাসিকের তিন সংখ্যা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। এত দিন পরে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সমালোচনা না করিয়া আমরা আষাঢ়-সংখ্যার পরিচয় দিব। "সম্মিলন" সুচারুরূপে মুদ্রিত, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক চিত্রে ভূষিত। শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্.এ. ও শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্.এ. এই নূতন মাসিকের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। সাহিত্যের চর্চ্চাই উভয়ের জীবনব্রত। অল্প দিনের মধ্যে নবীন সম্পাদকদ্বয় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয়, ইহাঁদের নেতৃত্বে "সম্মিলন" অচিরে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে। "আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ" সুলিখিত সন্দর্ভ। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "শিল্প" পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এ "শিল্পে" "কুঙ্কুম" ও "চন্দনে"র সৌরভ নাই। "বিশ্লেষণ" ও 'তালিকা' ছন্দে গ্রথিত হইলেও 'কবিতা' হয় না। শ্রীযুত চন্দ্রকিশোর তরফদার "মহাভারতের জ্যোতিষে" পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের "অন্তিম সঙ্গীতে"র সমালোচনা করিব না। শ্রীযুত জলধর সেনের "পাপের ফল" নামক দীর্ঘ গল্পটির আরম্ভ যেমন সুন্দর, উপসংহার সেরূপ নহে। 'All's well, that ends well', 'সব ভালো যার শেষ ভালো'—গল্পের পক্ষেও খাটে। শ্রীযুত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা "আসামের মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব" সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের 'ঋনা' ব্যর্থ রচনা। ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মিহির সম্বন্ধে এ দেশে যে 'গাঁজা-গল্প' প্রচলিত আছে, তাহা সত্য মনে করিবার কারণ নাই। আর সেই অপূর্ব্ব আখ্যানবস্তু রাও-সাহেব-দিগের উপন্যাসেই শোভা পায়; ভদ্র সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরীর 'চমকে জন্তুর দল, জল করে কোলাহল' পড়িয়া আমোদ হয় বটে, কিন্তু ইহা কি কবিতা? শ্রীমতী বিভাবতী সেনের 'শুভ দিবা' ও শ্রীযুত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরীর 'সরস্বতী'ও ঐ পর্য্যায়ের। এগুলি মুদ্রিত হইল কেন, বলিতে পারি না।

প্রবাসী। আষাঢ়।—শ্রীযুত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের "কীচক-গৃহ-গমনে আদিষ্টা সৈরিন্ধ্রী" নামক সুরঞ্জিত চিত্রখানি সুন্দর। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতা-পাঠের ভূমিকা" আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মলোক হইতে "বাঙ্গালা ব্যাকরণের তির্য্যকরূপে" অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধটি অনুশীলন-যোগ্য। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "রবীন্দ্রনাথ" পরমকৌতুকে উপভোগ করিয়াছি। এই রবীন্দ্র-চরিত সম্ভবতঃ inspired লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, কোন্ কাব্য লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কোথায় বাস করিতেন, কি দেখিতেন, এবং কি ভাবিতেন, তাহারও ফর্দ্দ পাইয়াছেন। সুতরাং Authentic। ভক্তির দুধ মারিয়া যে 'খোয়া' বা 'ড্যালা' ক্ষীর হয়, তাহাকে আরও জমাট করিয়া, সেই উপাদানে ভক্ত অজিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা গড়িয়াছেন, এবং তাহার উপর এত ফুল বিল্বপত্র চাপাইয়াছেন যে, নর-জগৎচারী রবীন্দ্রনাথকে আদৌ দেখিবার যো নাই, তবে ধূপের গন্ধে, ঘণ্টার বাদ্যে একটা পূজার আভাস পাওয়া যায়। অতিভক্তি ও অত্যুক্তি বোধ করি শ্যামদেশোদ্ভবা যমজ-ভগ্নীদের মত এক সঙ্গে গ্রথিত। অন্ততঃ 'রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া তাহাই মনে হয়। রবীন্দ্র-ভক্তিতে বর্ত্তমান লেখককে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না;—অতএব তাঁহার 'অ-জিত' অভিধান এত দিনে সার্থক হইল।—এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনা ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে

উঠে ভখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটীতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীব জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান ক'রেছিলাম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলাম—এই আমার মাটীর মাতাকে এই আমার মস্তক শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান ক'রেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হ'ত। * * তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বস্‌লেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহ-জীবনেও এই সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। মধ্যে কোনও বিতর্ককালে তিনি শ্রীযুত গৌরহরি সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আপনাকে 'গাছে'র সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন। "বসুমতী"তে সে চিঠি ছাপা হইয়াছিল। মানুষ আপনাকে কত রকম ভাবিতে পারে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! আমাদের দেশের এক জন—গ্রাম সম্পর্কে খুড়ো—ভাবিতেন, তিনি কুইন ভিক্টোরিয়াকে বাইশ কি তেইশ কোটী টাকা হাণ্ডনোটে ধার দিয়াছেন! কোথায় পড়িয়াছি, মনে নাই, এক জন ভাবিত, তাহার আপাদমস্তক কাচে গড়া! তা আবার 'বেলোয়ারী' নয়, ঠুন্‌কো ফুঁকো কাচ! সে যাহাকে দেখিত, তাহাকেই বলিত, 'তফাৎ! তফাৎ! আমি ভেঙ্গে যাব।' ইহারা কবিতা লিখিত কি না, সন্ধান লইলে হয় না? রবীন্দ্রনাথের 'সংবর্দ্ধনা'র দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই বিবাহ-সভার 'হ্যাণ্ডবিলে'র মত স্তব-রচনার সূচনা হইয়াছে। এক 'প্রবাসী'র অঙ্গেই স্তব-পঞ্চক প্রকটিত দেখিতেছি। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে 'কবি-সম্রাট' উপাধি দিয়াছেন। যদি 'সাহিত্যিক'দিগকে যাচনা দিতে হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! আশা করি, নূতন সম্রাট অওরঙ্গজেবের মত অপর পক্ষের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিবেন না। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির "আসামী ভাষা—নবীন" বিশেষজ্ঞের অধিগম্য। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর "খণ্ডগিরির যৎকিঞ্চিৎ" উপভোগ্য। প্রবাসীর 'চ-বৈ-তু-হি'গুলির আর উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

চিত্রশালা।

প্রসাধন।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন নব্যবঙ্গ-গঠনকর্ত্তৃগণের অন্যতম, স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম প্রতীচ্য খণ্ডে যাত্রা করেন, তখন তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইতালীর রাজধানী রোমও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রোমের তদানীন্তন পোপ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন, এবং রাজোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান-ভূষণে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। প্রিন্সের প্রত্যাবর্ত্তনকালে শিল্পপ্রসূ ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশজাত বিবিধ শিল্প-সম্ভার পোপ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। সেই সকল শিল্পসামগ্রীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিত্রকলা-সম্ভূত কতিপয় প্রসিদ্ধ ও সুন্দর তৈলচিত্রও ছিল। তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ অদ্যাবধি তাহা সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য "প্রসাধন" নামক চিত্রখানি তাহারই অন্যতম। চিত্রখানি যথাসাধ্য অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও, এযাবৎ সংস্কার অভাবে, চিত্রশিল্পবিধান অনুসারে চিত্রের নিম্নে বা পশ্চাতে লিখিত শিল্পীর নাম-পরিচয় বা তাহার চিত্রণকালের উল্লেখ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ চিত্রাংশের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। চিত্রটি দেখিলে এখনও নূতন বলিয়াই মনে হয়। এই ত্রিবর্ণ প্রতিলিপি দেখিয়াও সহজে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে চিত্রশালায় বর্ণিত সমালোচনায় উক্ত হইয়াছে, কোনও চিত্রের পরিচয়-প্রদান তাহার প্রস্তুতকারক শিল্পীর অক্ষমতার নির্দ্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ যে কোনও সুচিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় চিত্রই প্রদান করিয়া থাকে। কবি প্রেমিকার রূপবর্ণনায় যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তোমারই তুলনা প্রাণ! তুমি এ মহীমণ্ডলে!" আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, চিত্রই চিত্রের সম্যক পরিচয়স্থল। সকল উৎকৃষ্ট চিত্রের ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রশংসার বিষয়। আমাদিগের আলোচ্য চিত্রখানির "প্রসাধন" নামটি সম্পাদক মহাশয়ের প্রদত্ত হইলেও, ইহার মূলে একটি সত্য নিহিত আছে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সময় হইতেই তাঁহার পরিবারমধ্যে এতদিন 'চিত্রখানি ভিনিসিয়ন টয়লেট' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। এ নাম উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের বা অন্য কাহারও প্রদত্ত, তাহা

জানিবার উপায় নাই, কিন্তু চিত্রের বিষয়-গত ভাব দেখিয়া তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ভিনিসীয় ললনাগণ চিরদিনই শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রসাধন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পাঠক ও দর্শক এই সুমনোহর চিত্রখানি দর্শন করিয়া স্বয়ং চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে 'ভিনিসিয়ান টয়লেট' নাম শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই চিত্রখানি নয়নগোচর হইলে, তাহার চিত্রকলা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা কোনও প্রাচীন ভিনিসীয় সুশিল্পীর কর-প্রসূত। মূল চিত্রটি ধাতুফলকের উপর ভিনিসীয় প্রথায় অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ নববিধ শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রণালীর (Nine schools of Painting) মধ্যে ভিনিসীয় চিত্রকলা (the school of vinice) তৃতীয় স্থলে অভিষিক্ত। এই পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীস বা রোমীয় চিত্র-প্রণালীর যথাযথ অনুকরণ করে নাই, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই প্রাকৃতিক আদর্শ দেখিয়া তাহার অনুরূপ বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও ছায়ালোকের সভেজ পার্থক্যজনিত সৌন্দর্য্যের সম্যক্ বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'ডোমিনিকো'-শিষ্য 'রোলিনো' এই ভিনিসীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা-মধ্যে প্রতিভাশালী ও প্রতিষ্ঠাবান শিল্পিযুগল জয়রজাইন ও টাজিনো ভেসিলী, যিনি টিসিয়ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, ভিনিসীয় চিত্র-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। মহানুভব টিসিয়ন দৈবশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে বর্ণবিন্যাসের পরীক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা যেরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক আমাদিগের কল্পনাতীত! এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় প্রাকৃতিক বর্ণানুকরণে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন নাই। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ভিনিসীয় প্রথার বর্ণচিত্রণ-প্রণালী এখনও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমাদিগের এইবারের আলোচ্য "প্রসাধন" নামক চিত্রখানি সেই প্রসিদ্ধ ভিনিসীয় প্রথায় চিত্রিত। বর্ণবিন্যাসে ইহা যেমন অসাধারণ, ভাব-সৌন্দর্য্যেও সেইরূপ মনোরম। এ শ্রেণীর চিত্র অধুনা আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিরন্তন কাহিনী।

Three colour blocks by U. Ray & Sons.

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

হিমারণ্য।

স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।

একাদশ অধ্যায়—শেষ।

ভৈরবঘাটী সমুদ্র-সমতল হইতে একাদশ সহস্র ফিট উচ্চ। এখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ভৈরব-দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং একটি বৃহৎ [illegible] শালা ও দোকান আছে। জলও অতি নিকটে; কাঠও যথেষ্ট [illegible] আজকাল ভৈরবঘাটীতে অনেক লোকের বাস। দুই জন কাঠের [illegible] সাহেব এখানে আসিয়া কাঠ কাটাইতেছেন। এখানে চীর-বৃক্ষের [illegible] এই জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ চীর ও দেবদারু বৃক্ষ আছে। চীর বৃক্ষে [illegible] স্লীপার হয়। সাহেবেরা গঙ্গোত্রীর নিম্নে ও ভৈরবঘাটী প্রভৃতি [illegible] উপকূলস্থ স্থানে উপরি-উক্ত বৃক্ষ কাটাইয়া স্লীপার প্রস্তুত করেন, এবং ভাসাইয়া দেন। গঙ্গাস্রোতে স্লীপারকে ভাসাইয়া হরিদ্বারে নিয়া [illegible] এখান হইতে হরিদ্বার ১৩।১৪ দিনের রাস্তা। এই কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে [illegible] জঙ্গলে বারো তেরো হাজার কুলী খাটিতেছে। এখান হইতে গঙ্গো [illegible] মাইল। রাস্তা ভাল। মধ্যে মধ্যে ঝরণা ও বাসোপযুক্ত গুহা [illegible] লোকালয় একেবারেই নাই। রাস্তাটি গঙ্গার উপকূলে উপকূলে [illegible] গিয়াছে। রাস্তা হইতে গঙ্গা এত নিম্নে যে, রাস্তা হইতে গঙ্গা [illegible] না; কেবল গঙ্গা প্রপাতের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করা যায়। গঙ্গার [illegible] দেবদারু ও চীর-বৃক্ষ দ্বারা এমন আবৃত যে, দেখিলে বোধ হয় [illegible] বৃক্ষ-রূপ বসন দ্বারা গঙ্গা-দেবীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আমি প্রত্যূষে ভৈরবঘাটী পরিত্যাগ করিয়া দশটার পূর্ব্বেই গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে যাত্রীদিগের বাসোপযুক্ত চারি [illegible] ধর্ম্মশালা আছে। একখানি দোকান ও একটি সদাব্রত আছে। [illegible] সদাব্রত হইতে ভিক্ষাজীবিমাত্রই তিন দিনের আহার পাইয়া [illegible] এতদ্ভিন্ন গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর মন্দির, রন্ধনশালা ও পাণ্ডাদিগের [illegible] জন্য কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এ হইল, গঙ্গার পূর্ব্ব-তীর।

বৃক্ষ ভাসাইলে, মাকে রাখিতে পারিলে কৈ? তোমার প্রেমাশ্রুতে মায়ের তেজ বাড়িল, অঙ্গ পুষ্ট হইল।

পশ্চিম-তটে আর একখানি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু এবার অতিবৃষ্টিতে গঙ্গার পল ভাঙ্গিয়া মাঠসমেত ঐ ধর্ম্মশালাকে

হিমালয়! তুমি বুক পাতিয়া মায়ের গতিরোধ করিলে, মা বাধা মানিলেন কৈ? তুমি সহস্র-শিখররূপ মস্তক উন্নত করিয়া নিশি-দিন গঙ্গার প্রতি সস্নেহ-ভাবে অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তাহাতেও মায়ের বিক্রম সহিতে পারিলে না, মাকে রাখিতেও পারিলে না! এখন তোমাতে মায়েতে অনন্ত কালের সম্বন্ধ। তুমি মাকে অনন্ত কাল এইরূপ বুকে পিঠে করিয়া পালন কর, মাও এইরূপ অনন্ত কাল মহাপাপীর উদ্ধারের জন্য তোমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সাগর-সঙ্গমে যান; ইহাতে আমার কি? আমি দুই দিনের জীব, দুই দিনের জন্য এই গঙ্গা-হিমালয়-ক্রীড়া দেখিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা শুন পর্ব্বত, তুমি যে পরিমাণে মাটী হইয়াছ, ততটাই মা বুকে করিয়া তোমাকে সমুদ্রে লইয়া গিয়াছেন। তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিতেছেন বটে, কিন্তু যখন সমভূমিতে চলিতেছেন, তখন পৃথিবীকে উর্ব্বরা-শক্তিরূপ স্তন্য দিয়া বাঁচাইতেছেন। পৃথিবী মাটী, তাই মায়ের স্তন্য পাইল। সগর-বংশ কপিল-শাপে ভস্ম হইয়াছিল, সেই ভস্ম যখন কালে মাটী হইল, মা হিমালয় হইতে সমুদ্রতটে যাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। অবশেষে যাহার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেমুদ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই গৃহরূপে পরিণত হইলেন। ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে হইল, আমিও মাটী হইব, মাটী হইলেই গঙ্গা মাকে পাইব।

আমি গঙ্গোত্রীতে তিন দিবস বাস করিয়া মার্কণ্ডেয়তে আসিলাম। মার্কণ্ডেয়তে ছয় সাত ঘর পাণ্ডার বাস ও একটি গঙ্গা-মন্দির আছে। যখন বরফ পড়িয়া গঙ্গোত্রীর গঙ্গামন্দির বন্ধ হইয়া যায়, তখন পাণ্ডারা এইখানে গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করেন। এই মন্দিরে একটি গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গামূর্ত্তি রৌপ্য আবরণে আবৃত। যখন গাটি বন্ধ হয়, তখন পাণ্ডারা মায়ের অলঙ্কার, মায়ের সমস্ত ভাণ্ডার, তৈজসপত্র প্রভৃতি এবং মায়ের রৌপ্য-আবরণ লইয়া এখানে আসেন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসই মার্কণ্ডেয়তে খুব ধূমধামের সহিত গঙ্গা-পূজা হইয়া থাকে। শীতকালে এইখানেও বরফ পড়ে; কিন্তু তিন চারি দিবসের বেশী স্থায়ী হয় না। ঋষিপ্রবর মার্কণ্ডেয়ের তপস্যার স্থানে মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাণ্ডারা ভক্তির সহিত এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। এখানে বিল্বপত্র একেবারেই অপ্রাপ্য। গ্রীষ্ম ঋতুতে বন্যকুল পাওয়া যায়; সর্ব্ব-ঋতুতে এখানে এক প্রকার সুগন্ধি পত্র পাওয়া যায়; এই হিমালয়স্থ দেবদেবী এই পত্রপুষ্পেই সন্তুষ্ট।

মার্কণ্ডেয়তে সাধু অভ্যাগতদিগের বাসের জন্য একটি ধর্ম্মশালা আছে। আমি এখানে আসিয়া এই ধর্ম্মশালাতেই বাস করিলাম। এই স্থানের গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীরেই দুইটি রাস্তা। পশ্চিম তীরের রাস্তাটি গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া মসুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব-তীরের রাস্তাটি গঙ্গোত্রীর মূল রাস্তার দশ মাইল হইতে আরম্ভ করিয়া মার্কণ্ডেয়ী ও মকবা গ্রামদ্বয় ভেদ করিয়া হর্ষিল নামক স্থানে মূল রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। যাত্রীরা মকবা বা মার্কণ্ডেয়ে না আসিয়া মার্কণ্ডেয় ও মকবার পর-পারস্থিত ধরালী গ্রামে বিশ্রাম করিয়া গঙ্গোত্রীতে যান। মক-বাতেও পাণ্ডাদের বাস। মকবা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে, যে, যখন মহর্ষি নারদ-মানস-সরোবর ভ্রমণ করিয়া নিম্ন-প্রদেশে যান, তখন তিনি কোপাণ্ডে লেংটী পরিধান করেন, এবং মকবাতে মুখপ্রক্ষালন করেন। যে প্রস্রবণটিতে ঋষিপ্রবর মুখপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই প্রস্রবণটি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। পাণ্ডারা এই প্রস্রবণেরই জল পান করিয়া থাকেন। মকবা গ্রাম পাহাড়ের উপর স্থাপিত। মকবা হইতে গঙ্গা এত নিম্নে যে, পাণ্ডারা গঙ্গাতীরে থাকিয়াও গঙ্গাজল পান করিতে পারেন না, এবং এই গ্রামের নিকটে গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য কোনও রাস্তাও নাই। মকবার পর-পারেই ধরালী গ্রাম। ধরালী গ্রামও গঙ্গাতীরে স্থাপিত। এই গ্রামে দুইটি অতি পুরাতন শিব-মন্দির আছে। একটি সদাব্রত ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। এখানে গঙ্গার ঘাট বান্ধান আছে, সুতরাং গ্রামবাসীদের গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করিবার কোনও অসুবিধা নাই। ধরালী গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রী এক দিবসের রাস্তা। যাত্রীরা ধরালীতে আসিয়া রাত্রিবাপন করে, ভৈরবঘাটীতে যাইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করে, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গো-ত্রীতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি এখানে কতিপয় দিবস বাস করিয়া মকবার পথে হর্ষিল নামক স্থানে যাই।

গঙ্গোত্রীর মূল রাস্তা হর্ষিল হইয়া গিয়াছে। হর্ষিলে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ বাঙ্গলো আছে। এই বাঙ্গলোটি টিরি রাজ্যের সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব প্রস্তুত করেন। এখন এই বাঙ্গলোটী টিরি-রাজের। আমি মার্কণ্ডেয় পরিত্যাগ করিয়া সেই দিবসই সুখী গ্রামে আসি। এই প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া দেবগৃহ আছে। সেই দেব-গৃহে অভ্যাগতদিগের থাকিবার স্থানও আছে। আমি সুখী গ্রামের দেবালয়ে

রাত্রিযাপন করিলাম। এখন আমার গন্তব্য স্থান—উত্তরকাশী। পরদিন প্রত্যুষে সুখী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ভটোয়ারীতে আসি। ভটোয়ারীর পরই মণিহারীর ধর্ম্মশালা। আমি ভটোয়ারী হইতে যাত্রা করিয়া এক দিবসেই উত্তর-কাশী আসিয়াছিলাম। গঙ্গোত্রী হইতে মকবা চৌদ্দ মাইল, মকবা হইতে সুখী ৬ মাইল, সুখী হইতে ভটোয়ারী ১৬ মাইল। ভটোয়ারী হইতে উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অদ্য হিমালয় প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় উত্তর-কাশীতে আসিলাম। এখানে আসিয়াই প্রথম বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে ধর্ম্মশালায় চলিয়া গেলাম।

উৎসর্গ-পত্র।

১

বিনোদ এক জন সাহিত্যিক। প্রথমে ইতিহাস লিখিত। হঠাৎ মনে করিল, 'উপন্যাস লিখিলে কি হয়?'

উপন্যাস লেখা ঐতিহাসিকের পক্ষে একটু শক্ত। ইতিহাসের শেষ নাই। মধ্যে সমাপ্ত করিয়া দিলে চলে। সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে। ভীষণ যুদ্ধ, দুর্গ অবরোধ, রাজার পলায়ন, রাণীর আত্মহত্যা, প্রজার অবস্থা, এ সব প্রায় জানা থাকে। উপন্যাসের চরিত্র সত্য হইতে খানিক দূরে গিয়া কল্পনা করিতে হয়। কড়ি কোমল ও কখনও কঠিনের মধ্য দিয়া তুলিকা চালাইতে হয়। নানা প্রকারের রঙ্গ মিশাইয়া, আলোকের সহিত ছায়া জড়িত করিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, সুচারুরূপে গল্পটা শেষ না করিলে রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লজ্জা করে।

যাহা হউক, বিনোদের প্রতিজ্ঞা, সে উপন্যাস লিখিবে। রাত্রি দশটা। আকাশ মেঘশূন্য। তারকা-মালা সখের উদ্যানের প্রস্ফুটিত জাতিযুথীর ন্যায় ঊর্দ্ধে জ্বলিতেছে। এমন সময়ে বাদুড়-বাগানের দিকটা নির্জ্জন হইয়া পড়ে।

উপন্যাস-লেখার প্রধান কারণ, বিনোদের স্ত্রী আসিয়াছে। বিনোদের স্ত্রী প্রমীলা সাতিশয় সুন্দরী। সে কথা সকলেই জানিত। বিনোদ জানিত; প্রমীলাও জানিত। বিনোদ সে কথা প্রমীলাকে জানাইতে গিয়া লজ্জা পাইয়াছিল। প্রমীলা বলিয়াছিল, "সত্য কথা জানানোর দরকার কি?"

সেই বাক্য কুঠারাঘাতের মত বিনোদের শুষ্ক ইতিহাস-বৃক্ষের আসল ডালটা নষ্ট করিয়াছিল। ঘর গৃহস্থালী, ছেলেপুলে, নিন্দা-প্রশংসা, এ সব ত ক্ষুদ্র জীবনের প্রাত্যহিক ইতিহাস। তার আবার বিস্তার কেন? যখন ছেলেপুলে হইবে, কান্নাকাটী পড়িবে, ঝগড়াঝাঁটী চলিবে, তখন আপনা আপনিই ইতিহাস জাজ্বল্যমান হইয়া দাঁড়াইবে। [illegible] উদ্দাম যৌবন, মনোহর কল্পনার কানন, ইহার মধ্যে আ[illegible] বিরহের সন্ধ্যা, মিলনের ঊষা, এ সব কৈ? ইহাই ত উপন্যা[illegible] উপন্যাস না লিখিলে মান থাকে কৈ?

বিনোদ ভাবিল, 'তাই ত! প্রণয়ের পালা কথায় অনেকটা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু কাগজে-কলমে ত কখনও লিখি নাই, কেমন দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।' বিনোদ যতই ভাবিতে লাগিল, ততই ইতিহাসের মত ভাব আসিতে লাগিল। '১১৪৪ খৃঃ। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের পর গৌড়ের বিধ্বংসাবস্থা।' (এখানে প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ)। কি সর্ব্বনাশ! ক্রমেই ইতিহাস দাঁড়াইতেছে! 'যাহা হউক, ক্রমে উপন্যাসের দিকে লওয়া যাইতে পারে'—বিনোদ লি[illegible] 'গভীর রাত্রি। কলকল স্বরে অমাবস্যা-নিশীথিনীর প্রগাঢ় তমিস্রার অ[illegible] পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গা আধুনিক রাজমহলের পদপ্রান্ত ধৌত করিয়া বহি[illegible] যাইতেছেন। তটোপরি সুরম্য দ্বিতল গৃহে সুখ-শয্যায় একটি যুবতী শয়ানা। যুবতীর নাম মৃণালিনী।'

অবশ্য, বিনোদের দৃষ্টি নিদ্রাভিভূতা প্রমীলার দিকে। বিনোদ প্রমীলাকে লইয়াই উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনও সরল উপা[illegible] ছিল না; কারণ, সম্মুখেই জীবন্ত আদর্শ। তাহাকে ফেলিয়া, কোনও নূত[illegible] নায়িকার কল্পনা করা কি সহজ কথা? বিশেষতঃ, এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী[illegible] অবতারণা করিলে উপন্যাসটুকু বিয়োগান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা বিনোদের মোটেই ইচ্ছা নহে।

অথচ, অমাবস্যা রাত্রিতে নিদ্রিতা যুবতী স্ত্রীর পার্শ্বে জাগরিত স্বামী, সেই বা কি রকম? বিনোদ বেশ ভাবিয়া দেখিল যে, স্বামীকে আপাততঃ বাদ না দিলে উপন্যাস একেবারে মাটি হইয়া যায়। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নায়িকা। অনূঢ়া হইলেও চলিবে না। অতএব স্বামীকে দূরদেশে পাঠানই সুসঙ্গত। তাই বিনোদ লিখিল।—

'মৃণালিনী শ্রেষ্ঠকন্যা। তিন বৎসর হইল, বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এখন পিত্রালয়ে। স্বামী বলাইচাঁদ শেঠ সাতখানি ডিঙ্গা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া পাঠান-বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দিল্লী যাত্রা করিয়াছে। সে কালে পত্রাদি লিখিবার প্রথা ছিল না; বিশেষতঃ বণিক্‌সমাজে স্ত্রীকে পত্র লেখা মহা লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

'মৃণালিনীর সহিত বলাইচাঁদের মধ্যে একবারমাত্র দেখা হইয়াছিল। তাহার পর আর কোনও কথা হয় নাই, কোন সংবাদ নাই। আজ অমানিশির সময় সুন্দরী ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।

'কি স্বপ্ন? সে কি মিলনের স্বপ্ন?—না। মৃণালিনী কিশোরের স্বপ্ন দেখিতেছিল। বহুদিন পূর্ব্বে মৃণালিনী নদী-তটে কাঁখে ক্ষুদ্র কলসী লইয়া জল আনিতে যাইত। এক দিন শ্রাবণের সন্ধ্যা ঈষন্নমিত সূর্য্যের সিন্দূর-কিরণ মেঘে প্রতিভাত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পশ্চিমে এক খণ্ড মেঘ কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে ঘনীভূত হইল। বেগে ঝড় উঠিল। একখানা নৌকা তীরবেগে নদীতটে আসিয়া লাগিল। মৃণালিনী সভয়ে কলসীতে জল লইয়া তীরের দিকে গেল। কিন্তু যাইতে যাইতে মুষলধারে বৃষ্টি। তেমন বৃষ্টি আর গৌড়ে কখনও হয় নাই।'

'মৃণালিনী তাহার সই মালতীর সহিত নিকটস্থ বটবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া। ক্রমেই ঘন মেঘ, ক্রমেই বজ্র এবং বৃষ্টি। এমন সময় বৃহৎ বংশ ছত্র মাথায় দিয়া এক জন যুবাপুরুষ উপস্থিত।'

২

'যুবকের মস্তকে উষ্ণীষ, গলদেশে সুবর্ণহার, তেজঃপূর্ণ সুন্দর মুখ। হৃষ্টপুষ্ট-বপুষ্মান্। মুখে উদার হাসি। যুবক মৃণালিনীর নিকট আসিয়া খানিকটা গম্ভীর হইল, খানিকটা হাসিল।

'যুবক। আপনাদের যদি ছাতার দরকার থাকে, তবে এটা লইয়া স্বচ্ছন্দে বাটী যাইতে পারেন; পরে পাঠাইয়া দিবেন; আমি নৌকার উপর বসিয়া থাকিব।

'মালতী। আপনার নাম?

'যুবক। 'বিনোদলাল শেঠ। আমার শ্রেষ্ঠিবংশ।'

[টীকা। এখানে বিনোদের ... উপন্যাসে নিজের নাম ও বায়কের

নাম একই করিবার বিশিষ্ট কোনও কারণ ছিল না। তবে পাঠকের জানা উচিত যে, বিনোদ সম্প্রতি আফিং খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে মাত্রা বাড়াইয়া অনেকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। নায়কের নামকরণ পাকা উপন্যাস-লেখক ছাড়া ধাঁ করিয়া অন্য কেহ করিতে পারে না। বেচারা উন্মনা হইয়া নিজের নামটাই লিখিয়া ফেলিয়াছিল—সং।]

তৎকালে সুষুপ্তা প্রমীলাও বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই ব্রীড়াপূর্ণ স্নিগ্ধ-নৈশমলয়-বাতাহত ঈষৎকম্পিত আঁখিপলক বিনোদের মধুর কল্পনায় ক্রীড়া করিতেছিল। সুন্দরী স্বপ্নাবেশে ঈষৎ হাস্যমানা। বিনোদ দেখিয়া মহাখুসী। যেন কল্পনাজগতে বিনোদের উপন্যাসের আদর বাড়িতে লাগিল। উপন্যাস লেখা ক্রমে চলিতে লাগিল।—

'মালতী। এখানে কি উদ্দেশ্যে?

'যুবক। সহধর্ম্মিণীর অন্বেষণে। একটি গৃহস্থঘরের স্ত্রীধর্ম্মপটু বালিকা আমার চাই।

'মালতী। গৌড়দেশে কোনও বালিকা পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণীর ব্যবসায় করে নাই। বোধ হয়, আগ্রায় বিধবা বালিকা চেষ্টা করিলে পাইতেন। এখানে আসা আপনার পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

'যুবক। (সলজ্জভাবে) আপনার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। স্ত্রী হইলে, যে সব কাজ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে শিখা চাই। যেমন—পান সাজা, বিছানা পাড়া, জলখাবার তৈয়ারী, এমন কি, যমুনায় জল আনা—

'লজ্জায় মৃণালিনীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। বালিকা মালতীর পশ্চাতে গিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র ধরিয়া টানিল। "মালতী দিদি, বাড়ী চল না, বৃষ্টি ক্রমেই বাড়্‌ছে।" (সঙ্গে সঙ্গে যুবকের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত।) তখন রাত্রি। মালতী একটু চটিয়া গিয়াছিল। "মহাশয়, আমাদের দেশে সেরূপ ক'নে পাওয়া দুষ্কর। এই গৌড়ে যত মেয়ে আছে, তার মধ্যে আমাদের মৃণালিনী সেরা। সে ও সবই জানে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনি কি মনে করেন যে, বিবাহ হইলে সে পান সাজিবে, বাটনা বাটিবে, আর আপনার আগ্রা দেশের যমুনায় জল আনিতে যাইবে? তার বাপের মত ধনী এ দেশে নাই।"

যুবক অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "মার্জ্জনা করিবেন। আমি এ দেশের রীতি-নীতি জানি না। তবে শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনার সঙ্গিনী অবিবাহিতা। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি,

বিবাহ করিয়া তাঁহাকে যেন যমুনার জল আনিতে না হয়। আপনারা চলিয়া যান। আমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলাম। নৈশবন্ধুকে মনে রাখিবেন।"

'যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বটবৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। মৃণালিনী মালতীর হাত ধরিয়া যুবকপ্রদত্ত ছত্রতলে আশ্রয় লইল। যাইবার সময় ক্ষুদ্র রুলসীটি কাণে লইল। একবার নৈশবন্ধুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিল। একটিবার বোধ হয়, যমুনার জল মনে করিয়া হাসিয়াছিল। কতদিনের কথা!'

'মৃণালিনী আজ সেই স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছিল।'

এইটুকু লিখিয়া বিনোদ ভাবিল, 'এখন নায়কের সহিত নায়িকার বিবাহের কথাটা থাকি'। তবে পাছে ভুলিয়া যায়, তাই পেন্সিলে নোট করিয়া রাখিল—

'এই যুবক বলাইচাঁদের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্রটি মন্দ নয়। কন্যারও কথাই নাই।'

প্রায় দ্বিপ্রহর। বিনোদ নিদ্রাগত। গৃহের দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। শীতল দক্ষিণ-বাতাস ছাতের টবে প্রস্ফুটিত বেলার সুরভি-ভরি লইয়া মধ্যে মধ্যে ঘুমন্ত নব-দম্পতীর নিশ্বাস-বায়ু পরিশুদ্ধ ও উৎফুল্ল করিয়া আবার বহির্বায়ুর সহিত মিশিতেছিল। এমন সময়ে বকুলবৃক্ষস্থিত কোকিল কিংবা পাপিয়ার চূড়ান্ত নৈশগনভেদী ডাকে প্রমীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রমীলা দেখিল, বিনোদ একটা জীর্ণ মাদুরের উপর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। শিয়রে খানকতক লেখা কাগজ ও কালীকলম।

প্রমীলা স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিল। স্বামী কত সাধের! জগতে স্ত্রীর আর কে আছে? রূপগুণ না থাকিলেও তাহারই মধ্যে ইষ্টদেবতা। আমি কিছুই চাহি না, কেবল তোমাকেই চাহি। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তোমাকেই দেবতা করিব।

সাহিত্যিক বিনোদ ঘুমে বিভোর। প্রমীলা অতি সন্নিকটে। বিনোদের সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। বই লিখিয়া জীবনধারণ করে। প্রমীলা সুশিক্ষিতা, সুকবি। ভাবিয়াছিল, কবিতা লিখিয়া ছাপাইবে। গহনা বেচিয়া বিজ্ঞাপন দিবে। লাভ হইলে লুকাইয়া বড় বড় ইতিহাস কিনিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া পড়িবে। স্বামীর প্রতিভা, স্বামীর গৌরবই প্রমীলার জীবনের ব্রত। সে কথা বলিয়া দরকার কি? স্বামীকে উপন্যাস লিখিতে বলিয়া

প্রমীলা প্রতিজ্ঞা করিল যে, প্রথম কবিতা লিখিয়া স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিবে। হঠাৎ একটা উৎসর্গ-পত্র লিখিতে সাধ হইল।

প্রমীলা কালী কলম লইল। কাগজ লইল। দীপশিখা সতেজ করিয়া দিল। শিয়রের কাগজগুলি সবই লেখা। দেখিল, বিনোদ একটি উপন্যাস কাঁদিয়াছে। প্রথমে দেখিল, উপন্যাসটার নাম উৎসর্গপত্র! কি আশ্চর্য্য! কি কল্পনার সংযোগ!

৩

বিনোদের গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িয়া প্রমীলার মনে কি হইল, তাহা বুঝিতে হইলে গোটাকতক পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক।

বিনোদের ভগিনী সরলার শ্বশুরালয় আগ্রায়। সরলার স্বামী নরোত্তম শেঠের বড়বাজারে একটা বিলক্ষণ কারবার ছিল, তাই সে মধ্যে মধ্যে সরলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিত। নরোত্তমের মাতুল রাজমহলের এক জন প্রসিদ্ধ অর্থশালী বণিক। তাঁহার একমাত্র কন্যা মৃণালিনীর অসামান্য রূপগুণ লক্ষ্য করিয়া অনেক ধনী শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহার করপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু আগ্রার বলীহিচাঁদ শেঠের সহিত মৃণালিনীর পিতা খুব ধুমধামের সহিত তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মৃণালিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

সেই বিবাহে বিনোদ নিমন্ত্রিত হইয়া দম্পতীর কথা ভগিনী সরলার নিকট শুনিয়াছিল। বিনোদ নিজে কখনও মৃণালিনীকে দেখে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বপ্রণয়টুকু কল্পনা করিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিনোদের বিবাহ হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিত, যদি আমার জীবনে প্রমীলার সঙ্গে জড়িত একটা উপন্যাসের মত পূর্ব্বকথা থাকিত, তবে কতই সুখের হইত! কিন্তু বিনোদের দাম্পত্য জীবনে উপন্যাসের লেশমাত্র ছিল না। প্রমীলা স্কুলে পড়িত। তাহার সাহিত্যে অসামান্য উৎকর্ষ, কবিতার সুন্দর রচনা, এ সব কথা বিনোদ ভাল জানিত না। বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছিল, প্রমীলা চতুরা। কলিকাতার মেয়েদের উপর বিনোদের অনাস্থা বহুকালের। বিনোদ ভাবিয়াছিল, প্রমীলা 'পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী'র মত একটা কিছু। পিতার অনুরোধেই বিনোদের বিবাহ। বিনোদের বিবাহের দুই মাস পরেই তাহার পিতার কাল হয়।

বিনোদের মাতা বহুদিন পূর্ব্বে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। শূন্য বাটী ভাড়া দিয়া বিনোদ মেসে থাকিত, এবং সেখানেই ইতিহাস লিখিয়া জীবন

কাটাইত। কিন্তু ক্রমে আফিঙ্গের মাত্রার আধিক্য দেখিয়া বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া বাদুড়বাগানের বাটীতে আনিয়াছিল। শ্রীশ বলিল, 'বিনোদ, তুমি মাটী হয়ে যাচ্ছ। এ সময়ে প্রেমচর্চ্চা সবিশেষ আবশ্যক। তুমি যে রত্ন পেয়েছ, তা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

বিনোদ নিতান্ত সাদা মানুষ। বন্ধুর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। শ্রীশের সঙ্গে বিনোদের শ্বশুরের বেশ আলাপ ছিল। সে প্রমীলাকে আনিয়া বিনোদের গৃহে, এবং (বোধ হয় খানিকটা) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দাসদাসী, ব্রাহ্মণ, রন্ধনের তৈজসপত্র, ভাণ্ডার, শয়নাগার, ফুলের টব, একটা ঔষধের বাক্স, শেলাইয়ের কল, দেয়ালের ছবি, সব ঠিক করিয়া গুছাইয়া দিল। কেবল নূতন জীবনের পত্তন করিবার ভার বিনোদের হাতে রহিল।

কিন্তু লজ্জা! লজ্জাই বিনোদের কাল। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, কিন্তু নববিবাহিত যুবকের পক্ষে সঙ্গীন দোষ। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত না হইলে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় না।

স্বামীর হৃদয়ই স্ত্রীর অবগুণ্ঠন। তাহার মধ্যে তাহার জীবন-ভরা হাসি-কান্না, মান ও অভিমান। বিনোদের প্রথম আবাহন প্রমীলার নিকট শুষ্ক, রুক্ষ ও আনন্দহীন বোধ হইল। সেটা বিনোদের যোগ্য হয় নাই। সাহিত্যিকের কি এই ভাব?

কিন্তু এক দিনেই চতুরা প্রমীলা বিনোদকে অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিল। 'আফিঙ্গের নেশা না ছাড়িলে ঠিক্ হবে না।'—ইহাই প্রমীলার সন্ধ্যাকালের সিদ্ধান্ত। তাই প্রমীলা চারিটি অন্ন মুখে দিয়া সকাল সকাল চুপ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াছিল, শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, কৌটা চুরি করিয়া লইব, বেশী আবদার করিলে ঝগড়া করিব। তাহারই স্বপ্ন দেখিয়া হাসিয়াছিল।

সুতরাং নিদ্রাভঙ্গের পর প্রমীলার অর্দ্ধ-ঘুমন্ত ভাব, অভিমানের ও আব-দারের, এবং সিকি আধিপত্যের ভাব, এই ষোল আনা মিশ্র অপূর্ব্ব ভাব হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

বিনোদ-রচিত গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া প্রমীলার হৃদয়াকাশ হইতে সে সব ইন্দ্রধনুর ভাব ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল। আকাশ প্রথমে নির্ম্মল, ক্রমে মধ্যাহ্নের ন্যায় দগ্ধ ও স্থির হইল, ক্রমে একটা ঝড়ের মতন উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের ঘোর কালো মেঘ সব ছাইয়া ফেলিল।

অন্য কেহ হইলে দামিনীর চমক ও অশনিপাতের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু প্রমীলার হৃদয় ভরা ভাদ্র মাসের ন্যায় চিরস্নেহ ও শান্তিতে পূর্ণ।

প্রমীলা ভাবিল, 'এ কোন্ মৃণালিনী? এ কি সরলা দিদির মৃণালিনী? বলা বাহুল্য যে, কয়দিবস পূর্ব্বে সরলা আগ্রা হইতে স্বামীর সহিত বড়বাজারে আসিয়াছে। মৃণালিনীর পিতা একটা বহুমূল্য নেকলেস্ কিনিবার জন্য সরলার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। বলাইচাঁদেরও আগ্রা হইতে কলিকাতায় শীঘ্র আসিবার কথা। সরলা বলিয়া আসিয়াছিল, 'রাজমহল হইতে মিলিকে নিয়ে যাব, যদি বড়বাজারের ঠিকানা মনে না থাকে, বিনোদের বাড়ীতে বাহুড়বাগানে পত্র লিখো, আমি পাব। আর যদি মিলিকে লিখিতে ইচ্ছা হয়, সেই ঠিকানাতেই দিও।'

সরলা আসিয়াই বিনোদের অজ্ঞাতসারে প্রমীলার পিত্রালয় হইতে তাহাকে একদিন বড়বাজারে লইয়া গিয়াছিল। মৃণালিনীর সহিত প্রমীলার ভাব হইয়া গিয়াছে। মৃণালিনী লেখা পড়া জানে না, প্রমীলা তাহাকে শিখাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

প্রমীলা যদি মৃণালিনীর ইতিহাস জানিত, তবে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। প্রমীলা ইতিহাসের পক্ষে নয়। কবি হইলে কল্পনার দৌড়টাই বেশী হয়। সে কল্পনা সমধিক যন্ত্রণাময় হইয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল। স্বামীর উপর অটল ভক্তি ও বিশ্বাস প্রমীলার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহার উপন্যাসখানির উপর ভয়ানক রাগ হইল। "ওঃ! কি বিশ্বাসঘাতক নৈশবন্ধু! তুমি কখনও সেকালের ক্ষুদ্র ছবিটুকু মুছিতে পার নাই? ওহে প্রিয় দুর্ব্বলচিত্ত! ঈশ্বর তোমার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি পরস্ত্রীর সহিত নিজের নাম মিশাইয়া উপন্যাস লিখিতে চাও? ধিক্—। তোমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা উচিত।'

৪

কিন্তু প্রমীলা কাঁদিবার মেয়ে নয়। গলা টিপিবার ইচ্ছা হইলেও সে বুঝিল যে, অবশেষে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে। কিন্তু এক সঙ্গে খুন ও আত্মহত্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব। একে কৃশ দেহ, তাহাতে কল্পনামুখরিত মাথাভরা অতি দীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ। নির্জ্জন গ্রামের ক্ষুব্ধ—পরিত্যক্তা—সরসী-পক্ষের অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রমীলার চক্ষু দুটি ভয়ে ও নিরাশায় ছোট হইয়া গেল। 'পরলোক পর্য্যন্ত যাহার হাত ধরিয়া হাসিমুখে

তুচ্ছ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সে যদি অর্দ্ধপথে মোহজালে পড়িয়া পদস্খলিত হয়, তবে আমার অবলম্বন কোথায় ?'

প্রমীলা একবার ভাবিল, আফিং খাইয়া মরিবে। 'যে আফিং সাধ করিয়া চুরি করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমারই মুখে যাইবে। এ মুখ কালো হইবে। আমি দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইব, তুমি দেখিও। যখন ভুলিবে, তখন আবার কৈশোরের বটবৃক্ষ ও যমুনাজলের মধুময়ী স্মৃতি হৃদয়ে টানিয়া আনিও! পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর! একটু আত্মত্যাগ করিতে পার না? এতটুকু রূপের মোহ, এতটুকু কল্পনার কালিমা, তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া 'উৎসর্গ-পত্র' লিখিতে বসিয়াছিলে? ছি! আমি যাহা উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার কণামাত্র তুমি কখনও ভাবিয়াছ?'

ক্রমে শোকের উচ্ছ্বাসে প্রমীলার হৃদয়-গ্রন্থি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। সে শোক অতিকষ্টে আবার রুদ্ধ করিয়া প্রমীলা স্থির হইল।

খাটের পার্শ্বে বন্ধু-দত্ত নূতন বাক্সের মধ্যে বিনোদের আফিংএর কৌটা থাকে। প্রমীলা ধীরে ধীরে বাক্স খুলিয়া কৌটা বাহির করিল। বাক্সের মধ্যে বড় কিছুই ছিল না। দরিদ্র বিনোদের গোটা দুই টাকা, একখানি ফটো, খানকতক পত্র ও একটি ইতিহাসের তালিকা। ফটোখানি প্রমীলার; তাহার পশ্চাতে বিনোদের হাতের লেখা, 'আমার জীবনের নূতন ইতিহাস'। প্রমীলা সেটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

'বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমার ইতিহাস চাহি না, উপন্যাস খুঁজিতেছি।'

প্রমীলা একে একে পত্রগুলি পড়িতে লাগিল। একখানি পত্র সুগন্ধি-যুক্ত, দেলখোস-সৌরভময়, 'বন্দে মাতরম্' ছাপের উপরে এক বৃন্তে দুইটি ফুল। পত্রের প্রথম লাইনেই 'প্রাণের মৃণালিনী'—

'এই যে নায়ক! নৈশবন্ধু! তোমার উপন্যাসের চূড়ান্ত প্রমাণ এখানে!'

প্রমীলা তখনই আফিং খাইত, কিন্তু একটা বিরাট ঘৃণা তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। সেই ঘৃণা মানব-জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বৈরাগ্য আনিল। তাহার কম্পিত দেহ ও করতল শবের ন্যায় শীতল হইয়া গেল।

প্রমীলা মনে করিয়াছিল, পত্রখানি আর পড়িবে না। কিন্তু তাহার সমস্তটা পড়িবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল। মাথার যন্ত্রণায় প্রমীলা ছাতে গিয়া টবের পার্শ্বে বসিল।

তখন গগনে শুকতারা ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ক্ষীণ আলোক

কলিকাতার পাণ্ডুবর্ণ পূর্ব্ব দিক্ ভেদ করিয়া ক্রমে ছাদের আলিসায় এবং বাতায়ন-পার্শ্বে আশ্রয় লইতেছিল। ট্রামগাড়ীর তারের উপর কোথাও দুই একটি ক্ষুধার্ত্ত পাখী তৃতীয় যামের অবস্থার তদন্ত করিতে গিয়া ধীর ভাবে বসিয়া আছে।

ক্ষীণ আলোক হইলেও চিঠি পড়া যায়।

'প্রাণের মৃণালিনী! কল্য আগ্রা হইতে যাত্রা করিব। এ চিঠি বিনোদ বাবুর ঠিকানায় দিলাম। গত নিশিতে আমি পূর্ব্বকালের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সে রাজমহলের ঘাটের কথা। সেই তোমার কচি হাতে ক্ষুদ্র কলসী, সেই মুষলধারে বৃষ্টি ও বটবৃক্ষতলে আশ্রয়, ও শকুন্তলার ন্যায় সস্নেহ সভয় দৃষ্টি। নৌকা হইতে নামিয়াই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, মন প্রাণ সবই উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তখন ভয়ে বলিতে পারি নাই; তোমার সেই মালতী বড় মুখরা।

'তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে, তোমাকে কখনও ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, কখনও একখানি পত্র লিখিতে পারি নাই। আমাদের বণিক-সমাজ কি অসভ্য! জানিতে পারিলাম, তুমি কলিকাতায় গিয়াছ। তাই লুকাইয়া একখানি পত্র লিখিতেছি। পাছে নরোত্তমের হাতে পড়ে, তাই বিনোদ বাবুর বাটীতে গিয়া সরলা লুকাইয়া আনিবে। তুমি সবটুকু না পড়িতে পার, তাহাকে দিয়া পড়াইয়া লইবে। তোমারই, বলাই।"

'বলাই'! এ ত বিনোদ নয়! প্রমীলা চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিল,—'বলাই'! অতি দুঃখিনী অনাথা যেমন তাহার ভিক্ষালব্ধ কৃত পয়সাটি কুড়াইয়া পাইলে ভাল করিয়া দেখে, সেই রকম করিয়া পত্রখানি প্রমীলা আবার দেখিল। সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আলোকে সত্য ইতিহাসবাণী প্রমীলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। প্রমীলার হৃদয়রণক্ষেত্রে ইতিহাস উপন্যাসকে পরাজিত করিল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল। শুকতারা প্রভাতকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া জীবন মধুময় করিয়া তুলিল।

প্রমীলার খুব একটা কান্না, এবং খুব একটা হাসির ভাব একত্র আসিয়া, উভয় উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 'ভাগ্যিস্, এ কথা কেউ জান্‌তে পারে নাই! কিন্তু বিনোদ উপন্যাসের মধ্যে তার নাম দিল কেন? আর, কি বেহায়া, পরের চিঠি খুলিয়া পড়ে কেন? এটার কিনারা না করিয়া আমি ছাড়িব না।'

সাহিত্যিক বিনোদ তখনও নিদ্রায় অচেতন। যে আবাহন বিনোদ করে নাই, প্রভাত-কিরণে সারানিশি জাগরণের পর, প্রমীলা সেই আবাহন করিতে আসিয়াছে। তাহার হৃদয় হইতে প্রেমের ধারা বহিয়া আঁখি, কপোল, ওষ্ঠাধর ও সমগ্র মুখমণ্ডল সুন্দর রাগে রঞ্জিত করিয়াছে। প্রভাতের গান, প্রভাতের চিত্র, প্রভাতের তরুণ তেজোময় উদ্যমপূর্ণ জীবন, সকলই প্রভাতময়ী প্রমীলার হইয়া তাহার জীবন-প্রভাতের ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিতেছে। সংশয়ের মেঘ গিয়াছে। অমা-নিশায় ভীতিপূর্ণ প্রেতচ্ছায়া দূর হইয়াছে। স্বামীকে মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিয়াছিল, সেই অনুতাপে প্রমীলা স্বীয় কোমল আলুলায়িত কেশ দিয়া নিদ্রিত স্বামীর পদধূলি মুছিয়া দিল।

কিন্তু প্রমীলা স্বামীর ঘুমন্ত মুখ চুম্বন করিল না। কারণ, তখনও কৈফিয়ৎ বাকি ছিল। অবশ্য কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু সেটার জন্য বিনোদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমার এত অপমান!

শিয়রে রক্ষিত উপন্যাস লইয়া প্রমীলা ভাল করিয়া পড়িল। এবং কালী কলম লইয়া মন্তব্য লিখিল। যথা,—

'হে ঐতিহাসিক! তুমি উপন্যাস লিখিবার উপযুক্ত পাত্র নহ। প্রথমতঃ, ১১৪৪ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠি কন্যা সুবর্ণবণিক হইলেও শকুন্তলার মত, কিংবা অন্ততঃ চিত্রাঙ্গদার মত প্রগল্‌ভা ছিল না। মুসলমান-শাসনে তখন কুল-বধূগণ বিলক্ষণ সজাগ থাকিত। দ্বিতল গৃহে, যুবতীগণের মত স্বপ্ন দেখিত না।

দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নটাই বা কেমন? কিশোরের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন লইয়া তোমার এত আনন্দ কেন? যদি উপন্যাসের স্বপ্ন হয়, তাহা হইলেও একটা পরপুরুষের সহিত পূর্ব্বপ্রেমের স্মৃতি-সংযোগে ১১৪৪ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কলুষিত করিয়া তুমি জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছ। যদি ঐতিহাসিক স্বপ্ন হয়, তবে তাহার মধ্যে তোমার নাম কেন? তুমি এতদূর নির্লজ্জ ও রূপতৃষার্ত্ত যে, সমাজে তোমার মুখ দেখানো উচিত নয়।

তৃতীয়তঃ, তাহার আরও একটী কারণ আছে। তুমি একটি ভদ্রলোকের পত্রিকা খুলিয়া পাঠ করিয়াছ। ইহাতে তোমার নামে সে নালিশ করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সে পত্রখানি অবলম্বন করিয়া তুমি উপন্যাস রচনা করিতে বসিয়াছিলে? কি ঘৃণার কথা!

ইহার সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ আজ সন্ধ্যার মধ্যে না দিলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তোমার মুখ দেখিবে না।

মৃণালিনী দাসী
প্রমীলা দাসী।

প্রমীলা উপন্যাসের সহিত মন্তব্যটুকু সকালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বন্ধন শেষ করিয়া, পান সাজিয়া, বড়বাজারে সরলা দিদির বাটীতে নূতন সই মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রির ইতিহাস, গল্পটুকু ও মন্তব্যটুকু দেখাইল। মৃণালিনীর রাঙ্গা টুকটুকে মুখ লাল হইয়া গেল। 'দিদি, উপন্যাস থেকে বিনোদ বাবুর নামটা শীঘ্র কেটে দে।'

সরলা সমস্ত গল্প শুনিয়া হাসিয়া খুন। 'তোরা কচি মেয়ে, পুরুষমানুষের মনের ভাব বুঝিস্‌নে। বিন্নু একে আফিং খায়, আর তাহার উপর উপন্যাসের সাধ। আত্মহারা হইয়া লিখিয়াছিল।'

প্রমীলা। আচ্ছা, আত্মহারার দৌড় ক্রমে বুঝা যাবে।

প্রমীলাও বাটীতে ফিরিয়া গেল না। উপন্যাস ও মন্তব্য পাঠাইয়া দিল। বিনোদ বিকালে উহা পাঠ করিয়া ত্রস্তভাবে শ্রীশচন্দ্রকে ডাকাইল।

শ্রীশ আসিয়া বলিল 'ব্যাপার কি?' বিনোদ সব খুলিয়া বলিল। 'একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। এখন উপায়?'

শ্রীশচন্দ্র অতি দুঃখিতভাবে বলিল, 'ছি, ছি! আমি অনেক দিন থেকে বলে আস্‌ছি—তুমি আফিং ছাড়।'

বিনোদ। আমি কান মলিলাম, আর খাইব না।

শ্রীশ। আমাকে কৌটা দাও।

কৌটা আনিতে গিয়া বিনোদ দেখিল, কৌটা নাই, প্রমীলার ফটোগ্রাফখানি খণ্ড খণ্ড।

বিনোদ। সর্ব্বনাশ! সে কৌটা লইয়া গিয়াছে। ফটোগ্রাফ ছিঁড়িয়াছে। এখন উপায়?

শ্রীশ সমস্ত বুঝিয়া মনে মনে হাসিল। 'পাগল, দেখ্‌ছ না, তোমার জন্য বাড়া ভাত ও ক্ষীর পর্য্যন্ত রাখিয়া গিয়াছে। আফিং খাইয়া যদি সে মরিবে, তবে গৃহস্থালী কেন? নিজে পান সাজিয়াছে, বিছানা পাড়িয়াছে, কেবল যমুনায় জল আনিতে যায় নাই।'

বিনোদ। ঠাট্টা করিও না। আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে।

শ্রীশ। যমুনা থাকিলে আনিত। বিনোদ, আগে বলেছি, তুমি রত্ন পেয়েছ। শীঘ্র গিয়া গলায় করিয়া আন।

বিনোদ বড়বাজারে গিয়া কি করিয়া রত্ন আনিয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তবে সন্ধ্যার পরে তিনটি সুন্দরী বিনোদের শূন্যঘরে আসিয়া জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বিনোদের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, উপন্যাসের চেয়ে সত্য ইতিহাসই ভালো। তাহার উৎসর্গপত্র জীবনের ঈশ্বরের পদপ্রান্তে।

তীর্থ-যাত্রী।

রবির উদয়-রশ্মি জ্বলিতেছে মেঘের-মুকুটে,—
মুদিতার মাধুরীতে শুক্রতারা যায়—অস্ত যায়!
বর্ণে বর্ণে মেঘমালা মদমত্ত-শিখি-কণ্ঠ প্রায়—
মরি, মরি, কি আনন্দে বিশ্বপদ্ম উঠিতেছে ফুটি!
অই শুন, অই শুন—হৃদিহরা কণ্ঠভরা সুর,
প্রাণের-অমৃতরসে সপ্তস্বরে উঠিছে শিহরি।
কাঁপিতেছে এ বিশ্বের সঞ্চারিণী আনন্দবল্লরী,
রূপ-রস-গীত-গন্ধে দশ দিক্ মোদিত—মধুর!
হে অমৃততীর্থযাত্রি, পুণ্যকায়, ত্যাগব্রতধারি,
উঠ উঠ—চল দ্রুত—অতিরুদ্র কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে।
ফুটেছে প্রভাত-প্রভা! নিদ্রা তন্দ্রা তোমারে কি সাজে—
মহামন্ত্র-সাধনায় চিত্ত যার বৈকুণ্ঠ-বিহারী?
হীন যারা থাক পিছে,—তুমি যাও মুক্তিতীর্থ পানে,
থাক্ শ্মশানের শব মৃত্যুমৌন এ মহাশ্মশানে।

শ্রী মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

এবার আমি একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব।—'মিউটিনী'র সময়ের কথা। বঙ্কিম-চন্দ্র তখনও সেই পরীক্ষা দিয়া হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন ঊনবিংশবর্ষমাত্র।

সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। বারাকপুর ও বহরমপুরে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মান্দ্রাজ ও অযোধ্যা ইন্ধনসংগ্রহ করিতেছে; দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে; কাণপুর চাপাটী পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে। বাঙ্গালা আগুন জ্বালাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—দূরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম আকাশের গায় লাল চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। ক্ষীণশক্তি মোগল আশায় উৎফুল্ল—নির্ব্বাপিত-বীর্য্য মহারাষ্ট্র প্রতিহিংসা-লোলুপ—বাঙ্গালী দর্শক।

বাঙ্গালী দর্শক, বাঙ্গালী আবার পথপ্রদর্শক ও বাঙ্গালী আবার সকল বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালীই ইংরাজের প্রথম দেওয়ান, বাঙ্গালীই ইংরাজের ফাঁসি-কাঠে প্রথম ঝুলিয়াছে—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে খৃষ্টান হইয়াছে—বাঙ্গালীই সকলের আগে বিলাত গিয়াছে। বাঙ্গালী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগুন প্রধূমিত করিয়াছে—বাঙ্গালী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়াছে—আবার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'বয়কট'-অনলেও ফুৎকার দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভাল বা মন্দ সকল কার্য্যেই বাঙ্গালী পথ-প্রদর্শক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারি দিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল। চুঁচুড়ায় সে সময় এক দল গোরা সৈন্য থাকিত। এক্ষণে আর সৈন্য থাকে না, কিন্তু যে বৃহৎ অট্টালিকায় সৈনিকগণ বাস করিত, সে অট্টালিকা আজও আছে। এক্ষণে তাহা আদালত ও আপিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গোরানিবাসের নিম্নে গঙ্গা। তথায় একটি ঘাটও আছে; তাহাকে বারাকের ঘাট বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া এই ঘাটে আসিয়া নামিলেন। উদ্দেশ্য,—থিয়েটার-দর্শন। চুঁ এক জন ধনাঢ্য একটি থিয়েটারের দল সংগঠিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রকে এই দলে যোগ দিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত কাঁটালপাড়ার আরও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বা বৃদ্ধ। কিন্তু সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় ছোট ভাইকে লইয়া আসিলেন। বারাকের ঘাট হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী নিকট নহে; ঘণ্টা-বাট হইতে

নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র বারাকের ঘাটে নামিলেন; অপর ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র নৌকায় ঘণ্টা-ঘাটে নামিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য,—একটু ভ্রমণ রাস্তা গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুরম্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাস্তার ধারে —গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং; মাঝে মাঝে থাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ দিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যহারে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী পথের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কুকুরও ছিল। একটা কুকুর পূজনীয় পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগিল। আমরা দেখিতে পাই, সংসারে আমরা যে জিনিসটাকে বা যে মানুষটাকে যত ভয় করি, সে জিনিসটা বা মানুষটা আমাদের তত চাপিয়া ধরে। কুকুরকে দেখিয়া পূর্ণবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাকে ভীত দেখিয়া কুকুর ও ভয় উভয়ই তাঁহাকে আরও চাপিয়া ধরিল।

কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লাফাইয়া একটা থামের উপর উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সাহেবদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গাপানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণবাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোদ্যত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদন-মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "Fine sport indeed! Don't you feel ashamed?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, সাহেবেরা স্তম্ভিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইল।

থিয়েটার ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাঁটালপাড়া হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র ফিরিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সে দলে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইয়াছিল। এই সামরিক বিধান অনুসারে, চুঁচুড়ার সীমার মধ্যে রাত্রি নয়টার পর কেহ পথে বহির্গত হইলে প্রহরী তাহাকে গুলি করিয়া নিহত

করিতে পারিত। ঘণ্টা-ঘাটের উপর দুই জন প্রহরী ছিল। কাঁটালপাড়ার দল ঘণ্টা-ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইলে এক জন গোরা অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া জনৈক অগ্রগামী ভদ্রলোকের বুকের উপর সঙ্গীণ স্থাপন করিল। সেই ভদ্রলোকেরা আনন্দসহকারে থিয়েটারের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সম্মুখে এই বিপদ। বঙ্কিমচন্দ্র একটু পিছাইয়া ছিলেন। সঙ্গীরা থামিল দেখিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, এক জন গোরা বন্দুক-হস্তে পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াইয়াছে—অপর প্রহরী অগ্রগামী ভদ্র ব্যক্তির বুকের উপর সঙ্গীণ স্থাপন করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন সামরিক বিধানের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, এই বিধান অনুসারে প্রহরী তাঁহাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র কম্পিতকলেবর ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া দিয়া নিজে সাহেবের সম্মুখে দাড়াইলেন; এবং সংযত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা গঙ্গার অপর পার হইতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। গোরা বলিল,—"How am I to know that?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "You may ask the District Magistrate. He was present."

গোরা বলিল, "I believe you. Take yourselves off at once."

গোরারা পথ ছাড়িয়া দিল, কম্পান্বিতকলেবর ভদ্রলোকেরা তৎপরে বেগে গঙ্গার দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, মহা বিপদ—সেখানে নৌকা নাই! সাহেবেরা Take yourselves off বলিয়া খালাস; কিন্তু ভদ্রলোকেরা যান কিরূপে? সাঁতার কাটিয়া না গেলে উপায় নাই। ডাঙ্গায় সাহেবের ভয়, জলে কুমীরের ভয়। কেহ কেহ জলটাকে অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কালেজের ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, সম্মুখস্থ চড়ায় দুইখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিতে কাহারও সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকিলেন; তাহারা আসিল, এবং ভীত, কম্পিত ভদ্রলোকদের লইয়া অপর পারে প্রস্থান করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ডেপুটী কালেক্টার; বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি সি. আই. ই।

বাঙ্গলার মাটীর দোষ। তা' হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই দূষিত মাটীতেই শতাব্দীতে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। *

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুৎসা-কুমারী।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

আমার নাম কুৎসা-কুমারী। আমি মা বাপের বড় আদরের মেয়ে। মা বাপ সোহাগ ক'রে আমার এই নরম নরম নামটি রেখেছিলেন।

আমি লোক-জগতের মানস-কুক্ষির সুকুমার কলুষ-কৌতুক-সঞ্জাতা সুকুমারী কন্যা। সেই কুক্ষি-তলে আমি জন্মেছিলুম অনাদি কালে। তা'র পর নিমেষে নিমেষে নূতন জন্ম গ্রহণ করিতেছি। আমি ক্ষণ-জন্মা, যশস্বিনী। আমার জন্মের অন্ত নাই; জীবনের অন্ত নাই।

আমি চির-জীবিনী। আমার মরণ নাই। আমার হ্রাস নাই; বৃদ্ধি আছে। আমি অনবরতই বেড়ে চলেছি। আমি অক্ষুরন্ত উন্নতিশীলা; অক্ষুন্ন-যৌবনা। অবনতি ও অবসাদ আমার একেবারেই নাই।

আমি বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকালের অঙ্কুর থেকে কেন,—আগে হ'তেই আছি। স্বয়ং সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই, তাঁর সৃষ্টিকালে, আমার কমনীয় কবিতা-কলার বিষয়ীভূত হয়েছিলেন। সে কথামৃত আমারই কল্পনা, আমারই রচনা, এবং আমারই রটনা বটে।

শুদ্ধই কি সৃষ্টিকারী? পালনকারী ও প্রলয়-প্রমথনকারীও কি কুৎসা-কুমারীর কম-কণ্ঠ-কূজিত কাব্য-নিধির নায়ক নন! তাহাও কি আর তোমরা জান না।

ব্রহ্মার মত বিষ্ণু ও ব্যোমকেশও আমার রস-নিঃস্যন্দিনী রসনার অতীব রুচিকর পদার্থ। বিশ্বের বীজাঙ্কুরকাল থেকেই ত আমি এই ত্রি-শক্তির স্বভাব চরিত্রের, 'পাবলিক' ও 'প্রাইবেট' 'কেরিয়ারে'র এবং পারিবারিক

---

* স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ। শচীশ বাবুকিয়দংশ "সাহিত্যে" মুদ্রিত করিবার অধিকার দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

আচার ব্যবহারের সবিশেষ গবেষণা ও সমালোচনা ক'রে এসেছি। সেগুলি আমার সর্ব্বাঙ্গ 'এপিক;'—আমার মধুর মানস-সরসী-সঞ্জাত মহাকাব্য-রূপ কনক-কমল-কিশলয়-গুচ্ছ।

স্বর্গবর্গ, মর্ত্ত্যবর্গ,—সর্ব্ব-বর্গেই আমি সমান বিদ্যমান। সুরলোক, নরলোক, জনলোক, তপোলোক কোনও লোকই কুৎসাধিকারের অতীত নয়। আমি শ্রীমতী কুৎসাকুমারী সকল লোকেই আছি। সকল লোকই আমায় লইয়া আছে। আমি স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান সোহাগিনী। আমার মৃদু মধুর নিস্বন শুনিবামাত্র, নর অমর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয় তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় সদা সজাগ করিয়া রাখে।

আমার কোমল কাকলী এমনই শ্রুতি মধুর, সুস্বাদু, আর আরামদায়ক যে, তাহার চিক্কণ চুম্বুকাকর্ষণে চিত্তমাত্রই আকৃষ্ট রয়েছে।

যথা মানব মানবীর, তেমনই দেব দেবীর ও দৈত্য দানবীর কার্য্যকলাপ ও 'ক্যারেক্টার' আমি 'স্ক্রুটিনাইজ' ও ক্রিটিসাইজ' করি; উদ্‌ঘাটন ও আলোচনা করি; চর্ব্বণ ও রোমন্থন করিয়া থাকি। আমার এই [illegible] প্রক্রিয়ার কাব্যময় কথামৃত লোকত্রয়কে—সে কালে, এ কালে,—সজীবতা স্ফূর্ত্তি দিয়া আসিতেছে।

নিরীহে, নীরবে, নির্ম্মলে, নধরে, আর সবুজে, সুন্দরে আমার আদর বেশী। আমি সদাই সেই শাকসবজীগুলির উপর চরিয়া থাকি। তাই ব'লে আমি অত্যুচ্চকে, অতি কঠিনকেও ছাড়ি না। আমি সর্ব্বোচ্চকে সমভূম করি। পাষাণ কেটেও খানখান করে থাকি। আমার কটাক্ষে যক্ষ রক্ষও কক্ষচ্যুত হয়।

আমি স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী, মিষ্টহাসিনী, কুশাঙ্গিনী কামিনী। কেন আমার এই ক্ষুদ্র রসনাখানি সর্ব্ববিধ-শক্তিশালিনী, সর্ব্বপ্রকারের সাংঘাতিক-ঘাতিনী! কেন, তাহা জানি না। পোড়া লোকে কিন্তু তাই বলে তাই!

আমি কুৎসা, কোথাও কখনও যেতে চাই না। তবু দেখ, আমি কোথায় নই, কিসে নই। পোড়া লোকেই ত আমায় নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আকাশে, পাতালে, স্থলে, জলে, বাতাসে, নিঃশ্বাসে, সংসারে, অরণ্যে, নির্জ্জনে, জনস্থানে, 'প্রাইবেটে,' 'পবলিক প্লেসে,' পুস্তকে, আমি কুৎসা-সুন্দরী, সর্ব্বত্র সমান ও সজাগ ভাবে বিরাজ করিতেছি। আমি প্রত্যক্ষে,

পরোক্ষে, অন্তরীক্ষে, 'আড়ি পেতে' আছি। লোকে আমায় আড়ি পাতিয়ে রেখেছে।

তোমার কায়ার ছায়াবৎ আমি অনবরত তোমার অনুসরণ করিতেছি। তোমার অতীতের, বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের কৃত ও অকৃত কার্য্যের, সম্পাদিত ও সংকল্পিত সমস্ত বিষয়ের অণু-পরমাণুটির পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইয়া ও অনুমান করিয়া, আমি তাহার প্রত্যেকটি চিরিয়া চিরিয়া দেখিতেছি,—চিবাইয়া চিবাইয়া চাকিতেছি।

তোমার নিজের ও নিজস্বের প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস, আমি সমাহিতচিত্তে, অতি সতর্কভাবে, অনিমেষনয়নে নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছি;—কুটিল কয়ালের তরাজু-কাটায় সেগুলির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া, বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণে ও দূরবীক্ষণে, সেগুলি পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করিয়া, আমি সুচতুর রাজনীতিকবৎ, রেখায় রেখায়, পরদায় পরদায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, তোমার সুখ-শান্তির, তোমার গৌরব-সম্ভ্রমের, তোমার কীর্ত্তি-সৌরভের, তোমার পারিবারিক চরিত্রের, তোমার সামাজিক সুনামের, আ! তোমার জীবন-ভূমিরের কোন্ কোমল, নির্ম্মল ও নিভৃত অংশে—কোন্ কোন্ মর্ম্মস্থানে আক্রমণ ও মর্ম্মান্তিক দংশন করিব। তাহার কোন্ কোন্ ছিদ্র দিয়া ও কোথায় কোথায় ছিদ্র করিয়া ও সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিব।

তোমার নিদ্রাকালেও আমি তোমায় ছাড়ি না। আমি সারানিশি জাগিয়া, সারানিশি তোমার শিওরে বসিয়া, সাধ্যমত স্বকার্য্য সিদ্ধ করি। আমি তোমার শয়নকক্ষ বেড়িয়া বেড়িয়া, প্রতি প্রহরে খাড়া পাহারা দিই। তোমার প্রত্যেক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন দর্শন করি। আমায় দেখিতে পাও না। আমি বাতাসে মিশিয়া যাই। অদৃশ্য থাকিয়া তোমায় দেখি। বাতাসের ভিতর থাকিয়া তোমার বিশ্লেষণ করি, তোমার বুক চিরি। বাতাসে করিয়া তোমার বুকের রক্ত উড়াইয়া লইয়া যাই।

একা কি তোমার! তোমার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুকের রক্ত। তোমার গোষ্ঠী গোত্রের নাড়ীনক্ষত্র আমার 'নোট-বুকে' নামে নামে 'নোট' ও 'কোট' করা রহিয়াছে।

[illegible] সদাসর্ব্বদা নিরবচ্ছিন্ন 'ডিসেক্ট' করি। তাদের জীবন্ত দেহযষ্টি, [illegible] শবদেহের মত, শিরায় শিরায় ছেদন বিশ্লেষণ

করি। করি আমার এই ধারাল দাঁত আর সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়ে। আমি তাদের রক্ত-কুষ্ঠ মোক্ষণ করি, আমার এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী রসনা দিয়ে। তা'রা যাতনায় ধড়ফড় করে। আমার ভীষণ 'ভিবিসেক্সনে' ম্লান, মলিন, মৃতবৎ হয়। জীবন্মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক বেদনায় পূর্ণ-মৃত্যু কামনা করে। আমি অম্লানমুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমি কাহাকেও পুরাপুরি মারি না। মানুষ মানুষীকে জীবন্মৃত করিয়াই আমি আরাম পাই। তা'তেই আমার মন আহ্লাদে ডগমগ হয়। আমি অধিক চাই না। অল্পেই সন্তুষ্ট।

এ অল্পও বুঝি অমনই হয়! মানুষ মানুষী বুঝি জিহ্বা-হেলনেই জীবন্মৃত হয়! কুলকামিনী বুঝি কথাটি উঠিতে উঠিতেই কলঙ্কিনীর হয়। সাধ্বী বুঝি শব্দমাত্রই অসাধু হয়!

আ! তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? এত অত্যল্প ফলও অমনই ফলে না। তাহা ফলাইতে আমাকে কত কৌশল করিতে হয়, অনেক ফাঁদই পাতিতে হয়।

লোকের গৃহ-ছিদ্র আমি একে একে অনুসন্ধান করি। ছেদন বিশ্লেষণ করিও বিস্তর। নাসা-রন্ধ্রে একটু কোন-কিছুর গন্ধ গেলেই, তখনই আমি রেলগাড়ীর মত ছুটি। কত স্থানে গন্ধ না পেয়েও ধেয়ে যাই। পিছু লেগে থাকি,—যদি গন্ধ পাই। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতীব তীক্ষ্ণ। কুক্কুর অপেক্ষাও কোটী গুণ বেশী।—আমি যে কুৎসা। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘা না দেখেও ঘায়ের গন্ধ পায়। এক রত্তি গন্ধকে আমি গন্ধমাদন করে' তুলি।

তা, সব ফুলে কি গন্ধ থাকে! সকলেরই অঙ্গে কি ক্ষত পাই? শত সন্ধানেও ছিদ্র বাহির হয় না। আমার সমস্ত শ্রম মারা পড়ে। ছেদন বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়। ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমালোচনায় সোয়াস্তি পাই না। তাহাতে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। তৃষ্ণা মিটে না।

আমি—কুৎসা তখন কল্পনা করিতে বসি। কল্পনা-শক্তির প্রভাবে কলঙ্কের সৃষ্টি করি।

কোন্ আদি কবির,—কোন মহাকবির কল্পনা আমার দৌড়দার দ্রুত-বেগ-শালিনী কল্পনার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমার কল্পনা অনবরত আকাশ-ধাবিনী; দ্রুতগামিনী দামিনীরও অগ্রে ও ঊর্দ্ধে দৌড়ায়।

সর্ব্বাদ্যা ও কবি-ঘট স্থিতা কাব্য-শক্তি। আমিই সর্ব্বপ্রথম কবি, এবং সর্ব্বশেষ কবি। আমারই কক্ষ ও বক্ষঃ থেকে পৃথিবীর সমস্ত কবি ও কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে। আমার কল্পনার কণিকামাত্র প্রসাদ লাভ করে' কবির কবিত্ব। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসাদি আমারই কৃপায় অমর;—আমারই কল্পনার ও বর্ণনার অংশবিশেষের অণুমাত্র লাভ করে' পরমাণু-মাত্রের অধিকারী হয়ে, তা'রা অক্ষয় কবি-কীর্ত্তি রেখে গেছে।

আমি বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ করি, কবির কল্পনা করি। তা'র পর করি বর্ণনা। বর্ণনা-করি অত্যুজ্জ্বল বিবিধ বর্ণে, বিশিষ্ট চিত্রকরের অভুল তুলি দিয়ে। প্রথমে ছায়াপাত করি, পরে রেখা-পাত, তা'র পর করি বর্ণ-পাত। যেখানে যে বর্ণটি খাটে, সেখানে সেটি, অতিসন্তর্পণে অঙ্কিত করি। বিশিষ্ট বিবেচনার সহিত, প্রত্যেক রঙ্গের পরে পরে, পার্শ্বে পার্শ্বে, তাহার উপযোগী রঙ্গের 'রিলিফ' দিই। তা'র পর তুলির শেষ সুনিপুণ স্পর্শে চিত্র সমাপ্ত করি; এবং তাহার উপর এক পোঁচ পাকা 'পারমানেণ্ট' বার্ণিশ ব্রশ করে দিই।

তখন 'প্রুফ্' ও 'পারস্পেক্‌টিবে' পূর্ণ পরিণয় হইয়া, আলেখ্য অত্যুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কাব্য-চিত্র সম্পূর্ণ সজীব ও সর্ব্বাঙ্গীন সত্যবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে।

অতঃপর আমি পূর্ণমাত্রায় প্রচার আরম্ভ করি। প্রথম অঙ্কে,—"চুপ, চুপ—চুপ; চু...উ...প্!" তা'র পরে, "ফুস্ ফুস্—ফিস্ ফিস্!" "ছি ছি ছি! কেহ যেন শোনে না!"

আমার লক্ষ কোটীও মুখের সকলেই সর্ব্বত্র সকলকে বলে,—"ছি ছি ছি! চুপ চুপ চুপ! কেহ যেন শোনে না!" আমার সহস্র কোটী চোখের সকলেই চক্ষু টেপে,—"চুপ চুপ চুপ!"

বস! নিশ্চিন্ত।

আমি, আমার কাব্য-কথা ঘর হইতে বাটে যাইয়া যাই। ঘাট হইতে বাটে লইয়া যাই। ক্রমে, গ্রামগ্রামান্তরে, সহরে নগরে, বাজারে বাজারে, রেলওয়ের কক্ষে, ষ্টীমারের বক্ষে, ট্রাম-কারে, আফিস-ঘরে, মঠে মন্দিরে, আলয়ে, থিয়েটারে, উপাসনার আসনে, আদালতের প্রাঙ্গণে—সাধারণ, অসাধারণ নানা প্রকারের সর্ব্ববিধ স্থানে, স্থলে জলে, আকাশে পাতালে, সর্ব্বত্র তাহার প্রচার ও প্রসার করি।

আমার কমনীয় বাক্য চোখে, মুখে, নাকে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রচারিত হয়; সশব্দে ও নিঃশব্দে প্রচারিত হয়;—ইঙ্গিতে, টেপা হাসিতে, চাপা কাশিতে চমৎকার প্রচারিত হয়; পত্রে পুস্তকে, গদ্যে পদ্যে প্রচারিত হয়; বাদ্যে ভাণ্ডে, নাট্যে রঙ্গে, নানা রূপে, নানা দিকে সুপ্রচারিত হয়। আমার কাব্য,—কুৎসা-কুমারীর কবিতা কখনও অপ্রচারিত, অপ্রকাশিত থাকে না।

আমি এক দিকে বিরাট 'অধর'; অপর দিকে বিপুল 'পরমেশ্বর'। আমার 'পপুলারিটী' যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর। শ্রীমতী কুৎসা-কুমারী দ্বারা প্রণীত কাব্যের মত লোক-প্রিয় পদার্থ পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমি প্রথমে ঘটাই। ঘটাইতে ঘটাইতে রটাই। আমি ঘটাই 'অপবাদ'। রটাই কলঙ্ক,—কুৎসা।

আমি অঙ্কিত করি অপবাদের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য, এবং পরিবাদের পরম রমণীয় পট—'পিকচার'—'পোট্রেট'। আমি রচনা করি কলঙ্কের চিত্র বিচিত্র কাব্য। আমার অমোঘ শক্তি, অসীম সাহস। আমি সাংঘাতিক। আমার শত জিহ্বা, সহস্র চক্ষু, কোটী কর্ণ।

ঘটাইতে আমি অঘটন-পটীয়সী। রটাইতে আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পাদরী। আমি অঘটন ঘটাই; অনৃত রটাই। দুধকে জল করি, জীয়ন্ত মানুষে পোকা পড়াই।

আমার অদ্ভুত ইন্দ্রজালে, শুভ্র শ্বেত পদ্ম কদর্য্য কৃষ্ণবর্ণের কণ্টকে পরিণত হয়। আমার সাংঘাতিক সংস্পর্শে সুবর্ণ লৌহ-মূর্ত্তি ধারণ করে। আমার কূট কৌশল-জালে সাবিত্রীর মত সতী লক্ষ্মী লোক-লোচনে, কালামুখী কলঙ্কিনী হয়।

যাহা কখনও ঘটে নাই, আমি তাহা ঘটাই। আর তাহাই সত্যবৎ রটাই। লোকে সম্পূর্ণ সত্য বলে' তাহা বিশ্বাস করে। ধ্রুব সত্য বলে' তাহা গ্রহণ করে।—করি আমার কল্পনা আর বর্ণনার গুণে। কাব্য-জগতে আমার যেমন অতুল উদ্ভাবন, তেমনই অমূল্য সৃষ্টি ও সম্পাদন। আমার 'কন্‌সেপ্‌সন্' এবং 'এক্‌সিক্যুসন' উভয়ই তুল্য উচ্চ অঙ্গের।

কু লোকে আমায় কালামুখী কুৎসা বলে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি কবি,—কাব্য-কল্প-লতিকা নয় কি?

তা, কুৎসা,—নামটি মন্দই বা কিসে? কুরূপা আমি কিসে? কুরূপার

কি এত আদর, এত আকর্ষণ হয়? আমার সুন্দর রুচি মুখখানি দেখিতে, আমার সুধাস্রাবিণী কথার কাকলী শুনিতে,—কে না ছুটে' আসে! আমার 'নিতুই নব' লাবণ্যে কোন্ মূঢ় না মোহিত হয়!

আমার মত সুন্দরী ত্রিসংসারে কে আছে? যদি কেহ থাকে, আর যদি সে রমণীর কখনও সাক্ষাৎ পাই, তবেই না তার রূপখানা কেমন দেখ্‌তে পারি; আর তা'র রসখানি কত, মাপতে পারি। নইলে, আর কি বোল্‌বো! কা'রও রূপ রস দেখ্‌তে এ বয়সে ত আমার বাকি নাই।

কেমন নামটি! বিচক্ষণ বাপ মা বেছে বেছে আমার এ নাম রেখেছিল। কুৎসা! কুৎসা-কুমারী! কুৎসা-সুন্দরী! কুৎসা-কুসুম! আহা! কেমন রুচি রুচি, নরম নরম, মিষ্ট, মোলায়েম, আর মধুময়, কাব্যময় আমার এ নামটি।

ইহার—আমার এই ললিত-কান্ত নামের সবটুকুই কাব্য। আমার সর্ব্বাঙ্গই কবিতা—মাখনে মাখা। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, অনবরতই আমার গা হ'তে গ'লে গ'লে পড়ে। তাদের কতক 'ট্রাজিডী' কতক 'কমিডী'। 'কমিডী' খুব কমই। কেমন নয় কি?

আমার আদি 'এপিক' সকল হইতে, 'ইপকে ইপকে' যুগে যুগে, আমি নানাজাতীয় কাব্যের বিকাশ করিয়া আসিতেছি। বৃহৎ ও বৃহত্তরের ন্যায় আমার ক্ষুদ্র ও খণ্ডকাব্যও কত রকমের, কত রঙ্গ-বিরঙ্গের! সনেট, স্যাটায়ার, ব্যালাড, ব্যালেট, ইডিল, এলিজী, স্কোলিও, ষ্টরনেলো, লিরিক্, রেচপেটো, টপ্পা, তুকো, কনজোন,—ইত্যাদি কত কতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড-খণ্ড-ই না আমার কুৎসা-কাব্য।

কেমন? এখন বুঝেছ ত সব? চিন্‌লেছ ত আমায়?

শৈলাক্ষ।

১

পাটলিপুত্র হইতে রোহিতাশ্বদুর্গ তখন দুই তিন দিনের পথ ছিল। নগর অতিক্রম করিয়াই শোণ নদের পূর্ব্বতীর অবলম্বন করিয়া প্রশস্ত রাজপথ রোহিতগিরির পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাও। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে এই রাজপথ বিংশতি হস্ত প্রসর ও পাষাণাচ্ছাদিত ছিল। অশ্ববাহিত রথে কুমার নরেন্দ্র গুপ্তের

সহিত আমরা কয়েক জন মৃগয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। নদের পূর্ব্বতীর অবলম্বন করিয়া রাজবর্ত্ম রোহিতগিরির অপরপারস্থিত কপিলনগরে আসিয়া শেষ হইয়াছিল।

রোহিতাশ্বদুর্গে যাইতে হইলে কপিলনগরেই শোণ নদ অতিক্রম করিতে হইত। অপর পারে অপ্রসর গোমেধমহিষ-পাদচ্ছন্ন পথে বৃক্ষশূন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইত। সে সময়ে রোহিতগিরি হইতেই বিন্ধ্যাটবী দক্ষিণাপথের উত্তরসীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই নিমিত্তই গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ আটবিক সামন্তগণকে শাসনাধীন রাখিবার জন্য দুর্জ্জেয় রোহিতাশ্বদুর্গের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র রোহিতাশ্ব মগধের দক্ষিণ-সীমান্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

কুমার নরেন্দ্রগুপ্তের পরিচয় বোধ হয়, তুমি অবগত আছ। তখন মহাসেনগুপ্ত নামে-মাত্র সম্রাট। মগধ, গৌড় ও বঙ্গ ব্যতীত বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অপর সমুদয় প্রদেশই বহুকাল পূর্ব্বে সম্রাটগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। বাল্যকালে আমরা শুনিয়াছি যে, উত্তরকুরুবাসী হূণগণ সম্রাট্ কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে পঞ্চনদ অধিকার করে, এবং স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের প্রারম্ভে মগধ, মালব ও আনর্ত্ত ব্যতীত বিশাল সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশই তাহাদের হস্তগত হয়। শেষ অবস্থায় মগধ ব্যতীত আর কোনও প্রদেশেই স্কন্দগুপ্তের অধিকার ছিল না। সেই অবধি সম্রাটগণ সম্রাট্ উপাধি লইয়া মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। নরসিংহগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের সহিত চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের বংশ-লোপ হওয়ায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর হর্ষগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমুদায় কথাই ইতিহাসে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে।

তখন গৌড় ও বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। তন্মধ্যে সান্নিধ্যহেতু গৌড় যথারীতি রাজস্ব প্রেরণ করিত, কিন্তু জলময় বঙ্গ প্রায়ই রাজস্ব-প্রেরণে বিরত থাকিত। বস্তুতঃ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বাধীন নরপতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্ত তখন প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য যুদ্ধযাত্রায় অক্ষম হইয়াছে। নরেন্দ্রগুপ্ত ও মগধগুপ্ত-নামক কুমারদ্বয় তখন শৈশব অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং তাঁহারাও যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শিতা লাভ

করেন নাই। সুতরাং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুমারামাত্য উপাধি সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সাম্রাজ্য ছিল না বটে, কিন্তু রাজবংশেরও সাম্রাজ্যের উপযোগী আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমস্তই তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের জন্য যে রীতি নীতি ও পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র মগধের ভূম্যধিকারী হইয়াও তদ্বংশীয়গণ তাহা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে রাজ্যের প্রাচীন বংশগুলি হইতে কুমারগণের শৈশবের ও যৌবনের সহচর নির্ব্বাচিত হইত, এবং সেই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণের ফলে আমি মহারাজ ভট্টারকপাদীয় নরেন্দ্রগুপ্তের শৈশবের সহচর হইয়াছিলাম। আমার পিতৃপুরুষগণ বহুকাল যাবৎ পাটলিপুত্র নগরের মহাদণ্ডনায়কপদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। শুনিয়াছি, সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠবের সময়ে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকযুদ্ধাবসানে প্রীত হইয়া আমার কোনও এক পূর্ব্বপুরুষকে উক্ত পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি রাজধানীর মহাদণ্ডনায়কপদে আমাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের গৌরব অতীত হইলেও, মগধে, অঙ্গে, গৌড়ে ও বঙ্গে বংশপরম্পরায় রাজপুরুষগণ একই পদ অধিকার করিয়া আসিতেছেন। শত শত বৎসরের মধ্যে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রথগুলি বেগবান অশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যোজনের পর যোজন পথ অতিবাহিত করিতেছিল। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে শুষ্কবক্ষ শোণ নদ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, এবং সময় সময় প্রবল বায়ু আসিয়া নদীবক্ষের বালুকা লইয়া পথ অন্ধকার করিয়া তুলিতেছিল। শীতের যথেষ্ট প্রকোপসত্ত্বেও সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য বোধ হইতেছিল। কারণ, মধ্যাহ্নে শোণের বিশাল বক্ষের বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিপাসায় কাতর হইয়া কুমার সারথিকে রথ রাখিতে আদেশ করিলেন।

আমি ও মুদ্গগিরির দুর্গরক্ষক জয়বর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মা জলের চেষ্টায় শোণের দিকে গমন করিলাম। সঙ্গে এমন কোনও পাত্র ছিল না যে, জল লইয়া আসি। মনে করিয়াছিলাম, জল পাইলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া লইয়া আসিব। শোণ নদের বিশেষ পরিচয় অবগত না থাকিলে, তাহা হইতে জল আনা যে কিরূপ আয়াসসাধ্য, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। শোণ সে স্থানে প্রায় ক্রোশদ্বয় বিস্তৃত। ইহার মধ্য দিয়া পঞ্চহস্তপরিমিত স্রোত প্রবাহিত

হইতেছে। যে স্থানে রথ হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহার অদূরে দিয়া ক্ষীণ স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। পানে জল পাইবার একটি সহজ উপায় অবগত ছিলাম। নদীবক্ষে যে কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বালুকা খনন করিলাম। জল পাইয়া স্ব স্ব পিপাসা নিবারণ করিলাম, এবং শুভ্র উষ্ণীষের কিয়দংশ সিক্ত করিয়া কুমারের জন্য লইয়া চলিলাম। বালুকারাশি তখন এত অধিক উত্তপ্ত হইয়াছে যে, আমাদিগের চর্ম্মপাদুকার পদতলেও অসহ্য উত্তাপ বোধ হইতেছে। জল লইয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া দেখিলাম, রথগুলি কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইয়া একটি প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, দীর্ঘকায় শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত এক ব্যক্তি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এবং রথের উপরে থাকিয়া কুমার তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। আমাদিগের বহুকষ্টলব্ধ জল লইয়া কুমার হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন মাত্র, জানাইলেন যে, পথিক জলদান করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার পিপাসার শান্তি [illegible]

পথিকের সহিত পরিচয় হইল। সে ব্যক্তি গান্ধারনিবাসী; তাহার ফলের ব্যবসায় আছে। প্রতি বৎসর সে তাহার [illegible] শুষ্কফল লইয়া গৌড়ে বিক্রয় করিতে যায় এবং বিনিময়ে গৌড়দেশ হইতে নারিকেল ও কৌষেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনে।

যৌবনের প্রারম্ভে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম। অনাহারে পথিপার্শ্বে তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। তখন সকলে তন্ময় হইয়া পথিকের কাহিনী শ্রবণ করিতেছি। উত্তরাপথে এমন নগর নাই, যাহা সে দেখে নাই। কুমার সাগ্রহে তাহার নিকট হইতে নিজের বংশগৌরব শ্রবণ করিতেছিলেন। জালন্ধরবাসীরা এখনও কুমারগুপ্তের নাম করিয়া বিলাপ করিয়া থাকে শুনিয়া কুমারের আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। শকগণের রাজধানী একমাত্র রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল মথুরা নগরীতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে প্রভাকরবর্দ্ধনের সৈনিকগণ বাস করে শুনিয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত লোচনদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। জাহ্নবী-তীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সমুদ্রগুপ্তের অন্তঃপুর জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে। মহাদয়শ্রী অনেক দিন স্থাণ্বীশ্বরে প্রস্থান করিয়াছেন। পাটলিপুত্রবাসিগণের পক্ষে উহার সংবাদ লওয়াও অসম্ভব। প্রভাতে সূর্য্যকিরণ যখন গঙ্গাবক্ষে [illegible] হইয়া সপ্তর্ষিশ্বেতসৌধশিখর স্পর্শ করে, তখন মনে হয়, হিমালয়ের [illegible]

ছিল। পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যের ঐরূপ আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে। সে শীঘ্রই স্কন্দগুপ্তের দেহাবসানের দিবসে অশ্রুধারাতে সোমনীচুম্বন করিয়াছে; এখন তাহা দুর্ব্বলের হস্তগত। সুতরাং মৎস্যদেশ হইতে খেত মর্ম্মর আনয়ন করিবার উপায় ছিল না। আমার পর মহোদয়ই সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। রাজধানী মথুরা, দশপুর প্রভৃতি নানা স্থান পরিক্রমণ করিয়া সে স্থাণ্বীশ্বরে স্থাপিত হইয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তূপ অযত্নে রাজপথে পতিত রহিয়াছে, এবং তাহাতে শৃগাল ও কুক্কুর ব্যতীত মহোদয়ের অন্য কেহই ঘৃণা করে না। স্পন্দহীন হইয়া কুমার সেই কাহিনী শুনিতেছিলেন। অন্যান্য কারণ ব্যস্ত না হইলে হয় ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুমারদেবই ভাবেই থাকিতেন। কিন্তু কপিলনগর তখনও বহু দূর; সন্ধ্যার পূর্ব্বে নগরে উপস্থিত না হইতে পারিলে মনুষ্য বা পশু কাহারও আহার্য্য মিলিবে না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুমারকে যাত্রা করিতে হইল। রথারোহণ করিবার পূর্ব্বে কুমার পথিককে ফিরিবার পথে পাটলিপুত্রে বা রোহিতাশ্বে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সে ব্যক্তিও গৌড় হইতে প্রত্যাগমনের পথে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, স্থীরও হইল।

পথবাহী উষ্ট্রদ্বয়ের বল্গা ধরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পথিক পৌণ্ড্রাভিমুখে যাত্রা করিল। যতক্ষণ উষ্ট্রগুলি পূর্ব্ব দিকে দেখিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপিলনগরে পঁহুছিলাম। তখন নগরাধ্যক্ষ আমাদিগের বিলম্বে শঙ্কিত হইয়া সম্মুখে সম্রাট্ সদনে বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। অবশিষ্ট পথ নীরবে অতিবাহিত হইল, কুমারকে চিন্তান্বিত ও মৌন দেখিয়া আমরাও যথাসাধ্য নিস্তব্ধ হইয়াছিলাম। বস্ত্রাবাসে কপিলনগরপ্রান্তে রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে হস্তিপৃষ্ঠে গোপার হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

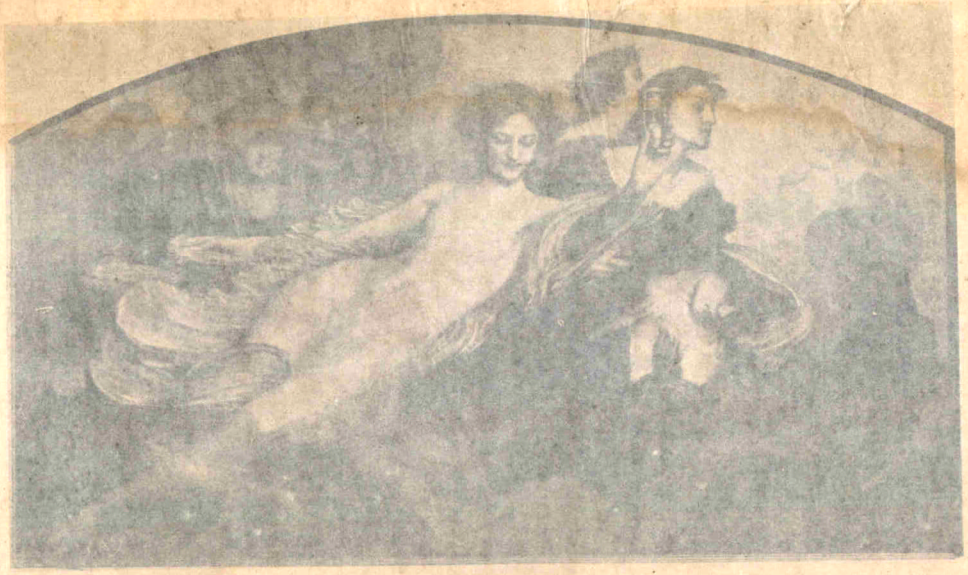

হোরা

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য-চর্চ্চা।

কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পার্সীব্রাউন ও জর্ম্মণ পণ্ডিত ডাক্তার ভয়েল্ক; উভয়েই কলাবিদ্যা ও জাতিবিশেষের সাহিত্যের উন্মেষ-বিষয়ে একই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যখন কোনও জাতির মধ্যে শান্তির শীতল শুভ্রভাব বিরাজ করে, তখন সেই জাতির সাহিত্যের বা কলা-বিদ্যার সম্যক্ উন্মেষ সম্ভবপর হয় না। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে যখন জাতির প্রায় সকলেই জিগীষাপরায়ণ হইয়া নর-শোণিত-স্রোতে ধরাকে অভিষিঞ্চিত করে, তখনই জাতির মধ্যে সুকবি জন্মগ্রহণ করে, দৈবীশক্তি সম্পন্ন চিত্রকরের বা ভাস্করের উদ্ভব হয়। এই নিয়ম পৃথিবীর সকল জাতির সম্বন্ধে সকল কালেই সত্য। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে এই নিয়মের ব্যত্যয় কোনও দেশেই কখনই ঘটে নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, কেন এমন হয়? জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, আমরা তাহারই মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। সেই সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের সমন্বয় ঘটাইবার একটু প্রয়াস পাইব।

সাহিত্যের মূল।

পূর্ব্বে বিদ্বজ্জনসমাজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বিকাশে মুগ্ধ হইয়া, মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় যে ভাষা বা ছন্দ সকলের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যলিপ্সা হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি, কলা-বিদ্যার বিকাশ। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মানুষ যখন সভ্যতার ও ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতির শক্তি ও সে সৌন্দর্য্য-উপভোগের সামর্থ্যের কোনক্রমেই হ্রাস হয় না, বরং উপভোগের হিসাবে উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। পরন্তু জাতির ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটিলে সাহিত্য ম্লান হয়, কলাবিদ্যা হতশ্রী হইয়া যায়। জর্ম্মণীর জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর বন্য জাতি সকল প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও, তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাবটিই মাত্রাধিক্যে বিরাজ করে। এই বিস্ময় হইতে আতঙ্কের ভাব মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে, আর সেই আতঙ্কের জন্যই উপাসনা ও ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিস্ময়টা হয় কেন? শাস্ত্র বলেন,

দ্বৈতানুভূতি হইতেই বিস্ময়ের উদ্রেক। আমি আছি, আর আমা ছাড়া বিশ্ব-বিকাশ আছে। আমি এই বিশ্বের বিকাশ-বিলাস দেখিয়া নিত্য মুগ্ধ হই, ক্ষণে ক্ষণে উহার নবীনতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই। এই নবীনতার অনুভূতি হইতেই বিস্ময় প্রকট হয়। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভীরচাউ (Virchow) বর্ব্বর মনুষ্যে বিস্ময়-উদ্রেকের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্তের সমর্থনই করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ব্বর মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধি নাই, পরম্পরাগত ধারণারাশি নাই, অন্ধ বিশ্বাস নাই। সে যাহা দেখে, তাহা প্রথম দেখে, নূতন দেখে; যাহা দেখে, তাহার একটা চলনসহি ব্যাখ্যা করিয়া মনকে শান্ত করিতে পারে না। তাই নবীনতায় সে মুগ্ধ হয়, সেই মোহ জন্য বিস্ময়, আর বিস্ময় হইতেই ভাবোদ্রেক হয়, এই ভাবই সাহিত্যের মূল, কলাবিদ্যার মূল। এই ভাব দুই আকারে প্রকাশ পায়;—এক, জিগীষার ভাব, প্রাকৃত শক্তি-রাশিকে পরাভূত করিয়া আমি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিব,—এই বিস্ময়ের ব্যাপারকে করামলকবৎ আমি আয়ত্ত রাখিব; দ্বিতীয় তন্ময়ত্বের ভাব; এই রূপসাগরে আমি ভাসিয়া যাই, এই নিত্য নবীনতায় আমি ডুবিয়া যাই; ইহাই হইল উপাসনার ভাব, ধর্ম্মের ও সাধনার মূল—কাব্য অলঙ্কার-সাহিত্যের ও চতুঃষষ্টিকলার বনীয়াদ। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে, প্রতিবেশ-প্রভাব অনুসারে, পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির সঙ্ঘাতে এই উভয়বিধ ভাব নানা আকার ধারণ করে। এই আকার হইতেই জাতির বিশিষ্টতার নির্দ্দেশ ঘটিয়া থাকে।

স্বতঃসিদ্ধি ও পরম্পরা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, যাহা অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই আপ্তবাক্য। এই যে মনুষ্য-দেহে আত্মা আছে, মরণের পর একটা অবস্থা আছে, ভগবান আছেন, পাপপুণ্য আছে—এই সকলের জ্ঞান মনুষ্য-মাত্রেরই আছে। এই জ্ঞান আসিল কোথা হইতে? কোন্ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা মানুষ জানিতে পারিল যে, তাহার দেহের মধ্যে আত্মা আছে, সে আত্মার মরণ নাই? কে মানুষকে বলিয়া দিল যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন আছেন? পাপপুণ্য ভাল মন্দ আছে? যে সকল মানবধর্ম্ম আপ্তবাক্যের (Gospel) উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সকল ধর্ম্ম একই রকমের উত্তর দিয়া থাকে। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, সকলেই বলেন যে, ভগবান

স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া এই সকল তত্ত্ব মানুষকে শিখাইয়াছেন। ইহাই হইল, Revealed Religion বা আপ্তবাক্যের বনীয়াদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সকলের সিদ্ধান্ত। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, উহা পরম্পরাগত, কতকটা স্বতঃসিদ্ধ। চার্লস্ ডারবিন অসংখ্য অসভ্য জাতির ব্যবহারের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরভীতি বা প্রীতিবিবর্জ্জিত, পাপপুণ্য-ফলশঙ্কাহীন কোনও বর্ব্বর জাতিই দেখিতে পান নাই। কাজেই জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সকল ধারণাকে মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধারণা বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। চার্ব্বাক দর্শনে লেখা হইয়াছে যে, অহঙ্কারটা অনুভূতি-জন্য—শীতোষ্ণের অনুভূতি, কোমল কঠিনের অনুভূতি—অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতেই, 'আমি আছি', এই ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমি যখন আছি, তখন আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—ইহাই হইল মানুষের প্রথম অভিলাষ। এই জিজীবিষা হইতে মনুষ্য-হৃদয়ে নানা ভাবের উদ্রেক হয়। বেণ, হক্সলি প্রভৃতি বুধগণ এক সময়ে এই মতের সমর্থন করিতেন। কিন্তু ওয়ালেস্, ক্রুক্স্, লামার্ক, ওলিভর লজ, ভিরচাউ প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণ এই মতের নিরসন করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধির ও ভাবের উন্মেষ অনন্ত, অজ্ঞেয়, পরম্পাগত স্বতঃসিদ্ধির দ্বারা ঘটিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মোট কথা এই, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যতই অনুসন্ধান কর না কেন, একটা অবস্থা ও একটা ভাবে গিয়া এমন ভাবে ঠেকিতে হইবে যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে প্রকৃত্যমনসা সহ।" ফলে একটা স্বতঃসিদ্ধি ধরিয়া লইতেই হইবে। সাহিত্যের ও কলাবিদ্যার পক্ষ হইতে পরম্পরা ও আপ্তবাক্যকে মান্য করিয়া লইলে অনেক বাজে গোল কমিয়া যায়।

প্রতিবেশ-প্রভাব।

প্রতিবেশ প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্ত। ডাক্তার ভয়েঙ্ক বলেন যে, প্রতিবেশ-প্রভাবের দ্বারা ইউরোপের জাতি সকল দুইটি ভাবে সজীব হইয়া উঠে। প্রথম, জিগীষা; দ্বিতীয়, অর্থলিপ্সা। ইউরোপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন প্রকৃতির প্রভাব তিন যুগে বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল। ক্রুসেডের (crusades) সময় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের প্রভাব প্রবল হইয়াছিল। মধ্যযুগে, শিভালরির প্রভাবকালে ক্ষত্র-প্রকৃতির উন্মেষ হইয়াছিল। আর স্পেনের অভ্যুত্থানের সময় হইতে ইংরাজের প্রাধান্য-

কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য বা বণিকের প্রভাব প্রবল হইয়াছে। গোড়ায় ইউরোপ জিগীষাপরায়ণ ছিল, পরে সে জিগীষা অর্থলিপ্সায় পরিণত হয়। স্পেনের দক্ষিণাংশ, ইটালী ও গ্রীস্, ইউরোপের এই কয়টি দেশে প্রকৃতি মানুষের আংশিক সহচরী; অর্থাৎ, এই সকল দেশে মানুষ অনায়াসে দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সামগ্রী সকল প্রকৃতির অঞ্চল হইতে লইতে পারেন। ইংলণ্ডে, জর্ম্মণীতে ও ফ্রান্সে এ বিষয়ে প্রকৃতি ব্যভিচারিণী। মানুষকে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া তবে জীবনযাপনের উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। যে দেশের মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সদাই যুযুৎসু হইয়া থাকিতে হয়, সে দেশে মানুষ একটু সুখের আস্বাদ পাইলেই, বিলাস-প্রিয় ও অর্থ-লিপ্সু হইবেই। তাই ইউরোপে বৈশ্য-প্রকৃতিটাই প্রবল। ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে এই বৈশ্য ভাবটা অতি প্রবল হইয়াছে; তাই এই তিন দেশের সাহিত্যের অধোগতি ঘটিতেছে। পূর্ব্বে যে ভাবকে সাহিত্যের বনীয়াদ বলিয়াছি, বিলাসের ক্লেদ-প্রবাহে সে ভাব ভাসিয়া যায়। কেন যায়, তাহা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর প্রকৃতিগত ভাবের বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে।

জাতি-তত্ত্ব।

"ভারতে শক-শোণিত" লিখিত ও মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইবার পর এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ "পাইওনীয়র" পত্রের বিগত ৫ই জুন (১৯১১ খৃঃ) তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয়-স্তম্ভে The uses of Anthropometry শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রিজলীর মতের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য। এই কারণে সেই প্রবন্ধের সারমর্ম্ম সংকলন করিয়া দিলাম। সুবিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন,—

"অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করা যেরূপ বিপজ্জনক, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা তদপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর। দীর্ঘকাল বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ না করিলে, ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োগে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দানের

কোনও ব্যবস্থাই নাই। ফলে, বিগত ১৯০১ অব্দের আদমসুমারীর বিবরণীর লেখক প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবেই ভারতের জাতি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কতিপয় বিস্ময়কর মতের প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের ও নাসিকার পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া মারাঠাদিগকে শকবংশ-সমুৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, খানদেশ ভেদ করিয়া শকজাতি মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারে, এরূপ কোনও প্রমাণ বিদ্যমান নাই; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরাও তাঁহার সিদ্ধান্তের আনুকূল্য করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটিকে হঠকারিতা-প্রসূত অনুমানের (Rash assumption) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় নাই। শকজাতি স্থূলশীর্ষ ছিল, এবং মহারাষ্ট্রবাসীরাও কিয়ৎপরিমাণে স্থূলশীর্ষ; শুদ্ধ এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শকবংশোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বরং ঐতিহাসিক প্রমাণের যদি কোনও মূল্য থাকে, তবে যে উত্তর-ভারত দীর্ঘকাল শকজাতির লীলাস্থানে পরিণত হইয়াছিল, সেই উত্তর-ভারতের অধিবাসী জাতি-সমূহের মধ্যে (তাহারা দীর্ঘশীর্ষ হইলেও) প্রাচীন শকজাতির বংশধরদিগের অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে।

"নাসিকার উচ্চতা ও খর্ব্বতার পরিমাণ অনুসারে ভারতীয় জাতি-সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবরত্ব, বা আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্ব স্থির করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। এই কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিতে হইলে অসংখ্য জাতির নিবাসস্থান ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির নাসিকার পরিমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা না করিয়া, স্বল্পসংখ্যক পরিজ্ঞাত তথ্যকে স্বীয় অনুমানের অনুকূল করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

"ডাক্তার ওয়াচার (Dr. Watcher) নামক এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত নরদেহ-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নানা পরীক্ষার (experiment) পর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মনুষ্যের মস্তকের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টাই সমীচীন নহে। তাঁহার পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, শৈশবে কোমল উপাধান-ব্যবহার

করিবার সুযোগ পাইলে, দীর্ঘশীর্ষ পিতামাতার সন্তানেরাও ক্রমশঃ স্থূল-শীর্ষ হইয়া উঠে। সেইরূপ কঠিন উপাধান-ব্যবহারের ফলে বালকেরা ক্রমশঃ দীর্ঘশীর্ষ হয়। ডাক্তার ওয়াচার অবশ্য পাঁচ বৎসরের অধিক কাল কোনও শিশুকেই এইরূপ পরীক্ষাধীন রাখিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত নৈসর্গিক বিধানে ঐ সকল শিশুর মস্তক পুনরায় পৈতৃকভাবাপন্ন হইবে কি না, তাহা এখন বলা যায় না। তথাপি যখন কৃত্রিম উপায়ে শৈশবে মস্তকের আকার পরিবর্ত্তিত হয় দেখা যাইতেছে, তখন মস্তকের দৈর্ঘ্য ও স্থূলত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যে কিছুতেই সঙ্গত নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। *

"ইউরোপে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কৃত্রিম উপায়ে নাসিকার আকারের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে। উচ্চবংশসম্ভূত লোকের ন্যায় দেখাইবার জন্য অনেকে সদ্যোজাত শিশুর নাসিকার মধ্যদেশ আকর্ষণপূর্ব্বক উহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষেরও কোনও কোনও প্রদেশে লোকে এই প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াচার কৃত্রিম উপায়ে দুই যমজ ভগিনীর মধ্যে এক জনকে দীর্ঘনাসা ও অপরটিকে স্থূলনাসা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফল কথা, নাসা ও শীর্ষের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া জাতি-তত্ত্বের বিচার সমীচীন নহে।

"এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর কথার আলোচনা না করিয়া থাকা, যায় না। দেশের রাজশক্তি যদি এইরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমানের সমর্থনে

---

* অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ দেশের প্রাচীনারা নবজাত শিশুদিগকে স্নান করাইবার সময় তাহাদিগের মাথা জোরে চাপড়াইয়া গোল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। শিশুর মস্তকে তৈল-মর্দ্দন-কালেও দেখিয়াছি, তাঁহারা বালকের মাথা চাপিয়া গোল করিবার চেষ্টা করেন। কোনও বালক দীর্ঘশীর্ষ হইলে, তাঁহারা বলেন, শৈশবে তাহার মাথার গঠনের প্রতি কেহ যত্ন করে নাই, তাই এইরূপ হইয়াছে। উপাধান-বিন্যাসের দোষে শিশুর মস্তকের গঠনের ব্যতিক্রম হয়, এ কথাও প্রাচীনাদিগের মুখে শুনিয়াছি। সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগের কেহ শিশুর মস্তক যথাসাধ্য গোলাকার, কেহ বা যথাসাধ্য দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, যখন কৃত্রিম উপায়ে মস্তকের গঠনের তারতম্য ঘটে দেখা যাইতেছে, তখন মস্তকের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া জাতিতত্ত্বের ন্যায় জটিল তত্ত্বে মীমাংসা করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আগ্রহপ্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হইতে পারে, তাহাই এ ক্ষেত্রে সবিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অপক্ষপাত বিচারকের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও হজুকপ্রিয় লোকের অভাব নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের দলে পড়িয়া কোনও বিশিষ্ট অনুমান বা 'থিওরী'র সমর্থন করেন, তাহা হইলে নিতান্তই অবিজ্ঞের ন্যায় কাজ করা হয়।—ভারতগবর্ণমেণ্টের ন্যায় রাজশক্তির পক্ষে ইহা নিতান্তই অনুচিত। এ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ের আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।"

যে দেশে লোকের নিকট বর্ণ-সঙ্করত্ব ঘোর অবজ্ঞা-জনক দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সে দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে "পাইওনীয়রের" প্রতিবাদে দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সহানুভূতি থাকা উচিত।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বেসনগরের শিলালিপি।

প্রাচীন শিলালিপি ও পুস্তকাদি হইতে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক যুনানীদিগের (গ্রীক্ মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ মার্শাল সাহেবের যত্নে গত বর্ষে যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে) তক্ষশিলার যুনানী নৃপতি এণ্টিয়ালকিডসের (Antialkidas) দূত হেলিও-ডোরস্ (Helio-dorz) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাগবত-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত গ্রিয়ারসন সাহেব, বৈষ্ণবধর্ম্ম (ভক্তিমার্গ) অতি আধুনিক সময়ে উদ্ভূত ও খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শে গঠিত বলিয়া যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই অতি প্রাচীন লিপির দ্বারা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনিও এক্ষণে হয়ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন।

মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যে ভিল্‌সানগর বৌদ্ধদিগের পবিত্র প্রাচীন স্তূপের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। তথাকার স্তূপের বিষয় জেনারল কানিংহাম সাহেব তাঁহার "ভিল্‌সা টোপস্ (Bhilsa Topes) নামক বহুমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভিল্‌সা হইতে, কিছুদূরে অবস্থিত

প্রাচীন বিদিশা-নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জেনারল কানিংহাম সাহেব ১৮৭৭ সালে বিদিশার স্থান নির্ণয় করিয়া উহার সুবিস্তৃত বিবরণ তাঁহার সম্পাদিত "আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে" প্রকাশ করেন। তথাকার বেতয়া ও বেস নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে এক প্রাচীন বিশাল স্তম্ভও তিনি আবিষ্কার করেন; তাহার চিত্র ও আয়তনের পরিমাণাদি উক্ত রিপোর্টে (প্লেট ২৪, প্রথম চিত্র) সংযুক্ত আছে। ঐ স্তম্ভ তথায় "কেবলা বাবা" নামে প্রসিদ্ধ; সকলে উহাকে অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন যাত্রী তথায় গমন করিলে উহার সম্মুখে পশু-বলিদান ও উহার গাত্রে সিন্দুর লেপন করিয়া থাকে। যে সময়ে, কানিংহাম সাহেব এই স্তম্ভের অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সে সময়ে কালক্রমে প্রচুর পরিমাণে সিন্দুর উহার উপর জমিয়া উঠিয়াছিল এবং জনসাধারণে উহাকে অতি পবিত্র মনে করিয়া নিয়মিত ভাবে অর্চ্চনাদি করিত। এই সকল কারণে, তাঁহার পক্ষে উহার সম্পূর্ণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। উহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহা গুপ্তদিগের সময়ের-স্তম্ভ হইবার সম্ভাবনা এবং সিন্দূরের নিম্নে উহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তার নামও থাকিবার কথা। কিন্তু যখন তথাকার পূজারীগণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, উহার উপর কোন প্রকার লিপি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, তখন তিনি নিরাশ হৃদয়ে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর সিন্দূরের চাপ অধিক হইয়া পড়ায় কয়েক বৎসর হইল, উহা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যাত্রিগণ পুনরায় পূর্ব্ববৎ সিন্দূর লেপন করিতে বিরত হইলেন না। অতঃপর বিগত ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে যখন মিঃ মার্শাল সাহেব 'টুরে'—তথায় উপস্থিত তখন গোয়ালিয়র রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার লেক সাহেব স্তম্ভটির এক অংশে প্রাচীন অক্ষরের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সেই অংশের খানিকটা সিন্দূর উঠাইবা-মাত্র অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে, মিঃ মার্শাল সাহেব পুনরায় স্তম্ভটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। তাহার ফলে দুইটি অতি প্রাচীন শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য তিনি সমগ্র শিক্ষিতসমাজের ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

কানিংহাম যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই লিপিটি গুপ্তদিগের

সময়ের হইবার সম্ভাবনা তাহা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তদিগের বহুপূর্ব্বে—খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে লিপি দুইখানি খোদিত হইয়াছিল। সে সময়কার কেবল অশোক-লিপিই আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আলোচ্য এই দুইখানি লিপির মধ্যে বড়খানি অর্থাৎ সপ্ত-পংক্তি-যুক্ত লিপিখানিই আমাদিগের সবিশেষ আলোচনার বিষয়। মিঃ মার্শাল সাহেব এই লিপিখানির ছাপা প্রস্তুত করিয়া একখানি ডাক্তার ব্লক (Dr. Theo Block) সাহেবের নিকট, আর একখানি উহার ফটোসহ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডাক্তার ফ্লিট্ সাহেবের নিকট বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাঃ ব্লক সাহেব কৃত উক্ত লিপির রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী ভাষান্তর মিঃ মার্শাল সাহেব তাঁহার "Notes on Archæological Exploration in India, (1808-9)" নামক প্রবন্ধে ছাপাইয়াছেন। ডাঃ ফ্লিট্ সাহেবও স্বকৃত রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী অনুবাদ উক্ত সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর উহার একটি রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী ভাষান্তর বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন অক্ষরান্তরের মধ্যে একটিতেও শেষ পংক্তির পাঠ সন্তোষজনক হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ ফটোতে অথবা ছাপে ঐ পংক্তির কতিপয় অক্ষর স্পষ্টরূপে উঠে নাই। বিগত বর্ষে মিঃ লেক সাহেব পুনরায় উক্ত স্তম্ভটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাইয়া উহার একখানি উত্তম ছাপ মদীয় অধ্যাপক বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিৎ ভিনিস্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। অধ্যাপক মহাশয় শেষ পংক্তির স্পষ্টরূপে পাঠোদ্ধার করিয়া সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে উহার প্রধান সংশয় নিরাকৃত হইয়াছে।

উক্ত লিপির বাঙ্গালা অক্ষরান্তর ও ভাষান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অক্ষরান্তর :—

(১) দেব দেবস বা (সু) দেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং
(২) কারিতো ই (অ) হেলিও দোরেণ ভাগ
(৩) বতেন দিঅস পুত্রেণ তখসিলাকেন
(৪) যোনদূতেন আগতেন মহারাজস
(৫) অংতলিকিতস উপংতা সকাসংরও

† রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের—অক্টোবর সংখ্যা (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

(৬) কাসীপুতস [ভা] গুভদ্রস ত্রাতাবস

(৭) বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস

ভাষান্তর ঃ—

"দেবতাদিগের দেবতা বাসুদেবের এই গরুড়ধ্বজ, তক্ষশিলাবাসী দিয়ের (Dion) পুত্র ভাগবত হেলিও দোর (Heliodoros) (নামক) যবন-দূত এই স্থানে নির্ম্মাণ করেন, (যিনি) মহারাজ অংতলিকিতের Antial Kidas) নিকট হইতে ত্রাতার রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট (তাঁহার প্রবর্দ্ধমান রাজ্যের চতুর্দ্দশ বর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।"

টিপ্পনী।

ভাষা।—এ লিপির ভাষা প্রাকৃত; কিন্তু সংস্কৃতের সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের যুনানী (গ্রীক) রাজগণের মুদ্রার উপর খরোষ্ট্রী লিপিতে যে ভাষা উৎকীর্ণ হইত ইহার ভাষাও তাহার অনুরূপ।

গরুড়ধ্বজ।—বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখভাগে কখন কখনও যে স্তম্ভ দেখা যায়; তাহার মস্তকদেশে গরুড়দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকার স্তম্ভকেই সাধারণতঃ গরুড়ধ্বজ বলা হয়। গুপ্ত নৃপতিগণের মুদ্রাদিতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তক্ষশিলা।—পঞ্জাবের এক অতি প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম ট্যাক্সিলা। সেকান্দার বাদশা যখন এই নগরে আগমন করেন, তখন একজন হিন্দু নৃপতি এস্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই নৃপতি হিন্দু-রাজন্যগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বিনাযুদ্ধে সেকান্দারেরর অধীনতা স্বীকার করেন। পরে এই নগর পঞ্জাবের যুনানী নৃপতিগণের রাজধানীরূপে গণ্য হয়। সম্ভবতঃ গ্রীক রাজা এণ্টিয়ালকিডস্ এই খানেই তাহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

দীঅ।—গ্রীক্ ভাষায় ইহাই ডীয়ন (Dion) নামে পরিচিত।—যখন এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় লিখিত হয় তখন উহাতে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। অশোকের লিপিতে এণ্টিয়োকসের স্থানে 'অন্তিয়ক' অন্তিয়োক' অথবা 'অন্তিয়োগ' লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে টলেমি স্থানে 'তুরমায়' 'এণ্টিগানস্' স্থানে 'অন্তিকিনি' বা অণ্ডো ও 'এলেকজাণ্ডারের' স্থানে 'অলিকসন্দর' লিখিত হয়। মুসলমানগণের সময়েও সংস্কৃত লেখকগণ 'আমির'কে 'হামির' রূপে এবং 'সুলতান' কে 'সুরত্রাণ" রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, দেখা যায়।

ভাগবত।—বৈষ্ণবগণের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবত-সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ের অনুযায়িগণ বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে গৌণ ও ভগবদ্ভক্তিকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

অন্তলিকিত।—ইহা গ্রীক ভাষার 'এন্টিয়ালকিডস' নামের প্রাকৃত রূপ। এণ্টিয়াল্‌কিডস্‌ খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন। তক্ষশিলায় সম্ভবতঃ ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁরই প্রেরিত দূত হেলিওডোরস্‌ বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই নৃপতির কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটির উপরে প্রাচীন গ্রীক্‌ লিপি দৃষ্ট হয়। আর একটিতে খরোষ্ট্রী লিপিতে এই প্রকার লিখিত আছে—"মহরজস জয়ধরস অন্তিয়লিকিদস"। বেসনগর লিপির পূর্ব্বেও এরূপ অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, পঞ্জাবে বহু গ্রীক্‌নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ত্রাতার।—(সং 'তাতৃ" হইতে নিষ্পন্ন) ইহার অর্থ রক্ষক। কিন্তু সে অর্থ এ স্থানে প্রযোজ্য নহে। এ শব্দটি একটি উপাধি; গ্রীক্‌ 'সোটর' Soteros শব্দ হইতে প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই উপাধি হইতে অনুমান করা যায় যে, রাজা ভাগভদ্র অতি পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন।

কাশীপুত্র।—রাজা ভাগভদ্রের নামের সহিত তাহার মাতা কাশীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতে কোন কোনও রাজার নামের সহিত তাঁহাদের মাতারও নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে, সে সময়ে রাজাদিগের অনেক রাণী থাকিত, কাজেই কাহার গর্ভে বর্ত্তমান রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করা কঠিন হইবে বলিয়া রাজার সহিত তাঁহার মাতারও নামের উল্লেখ করা হইত। আন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন বংশের রাজা শাতকর্ণীকে গৌতমীপুত্র, পুলুমাইকে বাসিষ্ঠী-পুত্র, শর [illegible]-মঢ়রী-পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ প্রাচীন মুদ্রা ও লিপি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাজন্য বর্গের নাম [illegible] অন্য নামের ও সহিত এরূপ ব্যবহারের অভাব নাই। সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি দাক্ষীপুত্ররূপে কথিত হইয়াছেন। মহাকবি ভবভূতি নিজেকে জাতুকর্ণপুত্র ও মহাকবি শ্রীহর্ষ মামল্লদেবী-পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

ভাগভদ্র।—ইনি কোন্‌ বংশের রাজা সে বিষয়ে কোনও পুস্তকে এ পর্য্যন্ত

কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। মহাকবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নি-মিত্র" নাটক হইতে জানিতে পারা যায় যে, শুঙ্গবংশের সংস্থাপক রাজা পুষ্পমিত্রের সময় তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশা নগরীতে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ভাগভদ্র রাজার সময় পুষ্পমিত্রের সময় হইতে দূরবর্ত্তী নহে। এরূপ হইতে পারে যে, ভাগভদ্র পুষ্পমিত্রের বংশ হইতেই সম্ভূত হইয়া-ছিলেন।

মন্তব্য।

ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯০৭ সালে "Modern Hinduism and its debt to the Nestorians" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খৃষ্টানদিগের যে একটি দল প্রাচীনকালে মান্দ্রাজে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের দ্বারাই হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তিমার্গ সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ডাক্তার মহাশয়ের এই মৌলিক মতের কেহ প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহার প্রতিবাদ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল! বেণ্ণনগর লিপি হইতে প্রমাণ হইয়া গেল যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ভক্তিমার্গের অনুবর্ত্তী ভাগবত-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন গ্রীকগণ পর্য্যন্ত ইহার অনুযায়ী হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিদেশী গল্প।

[১] ঘুরের রাস্তায় রাজার কুকুরটি হারাইয়া গিয়াছিল। কুকুরটির এমন কোনও বিশেষত্ব ছিল না—দেখিতে সাধারণ কুকুরেরই মত। এই জন্য সে বিশেষভাবে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এক জন সরকারী মেথর কুকুরটিকে দেখিতে পাইল। তাহার গলায় গলাবন্ধ ছিল না—এ কুকুর কখনই ভদ্রলোকের নয়! তা' ছাড়া রাজার আদেশ,—কুকুরের গলায় গলাবন্ধ কিংবা অন্য কোনও চিহ্ন না থাকিলে, সরকারী মেথরেরা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া রাজ-সরকারে জমা দিবে। তাহারা রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত।

মাহরাজা পাখী যেমন সুকৌশলে ছোঁ মারিয়া তাহার আহার শিকার করে, তেম্‌নি নিপুণতার সহিত মেথরটি কুকুরটিকে ধরিয়া তাহার গাড়ীতে বন্ধ করিয়া রাখিল। ধরা দিতে কুকুরটি কোনও আপত্তি করিল না।

গাড়ীতে আরও অনেক কুকুর ছিল। এই নবাগত স্বজাতীয়কে একটু স্থান দিতে হইল দেখিয়া, দু' একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এই নূতন বন্ধুটি কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে তাহার সহযাত্রীদের মুখের দিকে চাহিল; তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না—ল্যাজ গুটাইয়া সরিয়া গেল।

মেথর ভাবিল, এ কি ব্যাপার! নূতন কুকুর ধরিয়া গাড়ীতে বন্ধ করিলেই খানিক ক্ষণ চেঁচামেচি হয়। কিন্তু এ কুকুরটির আগমনে সেরূপ হইল না! কারণ কি? আবার ভাবিল, বোধ হয় কোনও গৃহস্থের কুকুর—কোনও রকমে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে! যাহা হউক, সন্ধান আবশ্যক।

চৌরাস্তার মোড়ে এক জন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল। মেথর তাহার নিকটে গিয়া প্রথমে মাথার টুপী খুলিয়া সম্মান দেখাইল। তার পর জড়িতকণ্ঠে আস্তে আস্তে কহিল, "আমি এ—এই একটা কুকুর ধরেছি, তা' সেটা——"

"দেখি!" বলিয়া কনেষ্টবল মেথরের সঙ্গে কুকুরের গাড়ীর নিকটে গেল। কুকুরটি দেখিয়া কনেষ্টবল চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কি, ঐ কুকুরটা! তুই কি পাগল হয়েছিস্? ভদ্রলোকে কি কখনও ও রকম কুকুর পোষে? আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি, এ কুকুর কোনও কালে ভদ্রলোকের নয়! সহরের সব বড়লোকের কুকুরকে আমি চিনি।"

কনেষ্টবলের কথায় মেথরের মনের অনিশ্চিত আশঙ্কা দূর হইয়া গেল—তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

ঠিক সেই সময়ে সেই স্থান দিয়া এক মুটে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতরে নবধৃত কুকুরটিকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি মাথার টুপি খুলিয়া কুকুরটিকে সেলাম করিল।

কনেষ্টবল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও রকম কর্‌লি যে? পাগল না কি তুই!"

মুটে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "পাগল হ'ব কেন! ও কুকুর তো আমাদের মহারাজের।"

কনেষ্টবলের বোধ হইল, যেন পৃথিবী তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতেছে! নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে সে কহিল, "রাজা-ম'শায়ের কুকুর! আর তুই বেটা তাকে ধরে' গাড়ীতে পুরেচিস্! ছেড়ে দে বল্‌ছি এখনই।" বলিয়াই সে মেথরটির মস্তকে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল—মেথর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

মেথর নীরবে এই অপমান সহ্য করিল—কিছু বলিল না। তাহার পর কম্পিত হস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া কুকুরটিকে বাহির করিয়া দিল।

কনেষ্টবল শিস দিয়া কুকুরটিকে আদর করিতে করিতে বলিল, "আমি একে গাড়ী করে' বাড়ী নিয়ে যাব।"

"হাঁ, তা' নিয়ে যাবি বৈ কি! গর্দ্দভ! দেশের নিয়ম কি জানিস্ না?"—কনেষ্টবল চকিতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এক জন পুলিস-সার্জ্জন! ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে উত্তর করিল, "আ—আ—জ্ঞে এ—টা রাজা—"

সার্জ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মূর্খ, রাজার কুকুর কি কখনও এ রকম হয়? তা'র সঙ্গে সঙ্গে চাকর থাকে—তা'র কত যত্ন! আর এ কুকুর—"

সার্জ্জনের কথা শেষ হইতে না হইতে কনেষ্টবল কুকুরটিকে ধরিয়া সবলে পদাঘাত করিল—কুকুর একেবারে গাড়ীর ভিতর ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

সেখানকার এক জন দোকানদার সার্জ্জনকে কহিল, "ম'শায়, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, এটা সাধারণ জাতের কুকুর নয়? এর গা কত পরিষ্কার—সাধারণের কুকুরের কি কখনও এ-রকম থাকে?"

সার্জ্জনের মনে সন্দেহ হইল। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, হাঁ, এটা বোধ হয় রাজারই কুকুর!"

হঠাৎ ক্রোধ-কম্পিতস্বরে সার্জ্জন বলিয়া উঠিল, "কুকুরটাকে এখনই বের করে' দে—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, এটা যে-সে কুকুর নয়।"

"ঠিক কথা! এটা যে-সে কুকুর নয়!" সার্জ্জনের এক বন্ধু মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা! এটা যে-সে কুকুর নয়।"

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল।

বন্ধুকে দেখিয়া সার্জ্জন কহিল, "তা হ'লে তোমার মতে এটা একটা সাধারণ কুকুর!"

বন্ধু কহিল, "সাধারণ কি? বোধ হয় কুকুরটা ক্ষ্যাপা! দেখ্‌চ না—এর চোখ দুটো কেমন ঘোলা-ঘোলা।"

"হাঁ তাই ত বটে!" সার্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "যা বেটা, ভ্রাগ্‌স্কীর গাড়ী চালা—দেখ্‌তে পাচ্চিস না, এটা একটা পাগলা কুকুর!' তার পর একটু থামিয়া কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল, "এই ও বেটাকে দু'দিন কয়েদ করে' রাখিস্—পাগ্‌লা কুকুর গাড়ী থেকে ছেড়ে দেওয়ার মজাটা ওকে দেখিয়ে দেব।"

ক্যাঁচ! ক্যাঁচ! ক্যাঁচ! ধীরে ধীরে কুকুরের গাড়ীখানি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

—আধ ঘণ্টা পরে পাঁচ জন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত! সকলের মুখই বিষণ্ণ, সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট। সার্জ্জন তখনও সেইখানে 'ইতস্ততঃ' করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া এক জন পুলিস-কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "রাজার কুকুরকে দেখেচ?"

সার্জ্জনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—মুহূর্ত্তের জন্য সে নির্ব্বাক্! তাহার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। সে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—কি উত্তর দিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিবার পর সার্জ্জন কোনও কথা না কহিয়া টলিতে টলিতে, যে দিকে গাড়ী গিয়াছে, সেই দিকে ছুটিল। উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরাও তাহার অনুসরণ করিল। * * *

পরদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল,—মেথরের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড, সার্জ্জনের কর্ম্মচ্যুতি ও নগরপালের পাঁচ শত মুদ্রা জরিমানার আদেশ বাহির হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ যে রাজনীতিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এই বিবরণ আদ্যোপান্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার কোনও শাস্তি হয় নাই। *

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

* রুসিয়ার সাময়িক সংবাদপত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক Azoffএর একটি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত।

ক্ষমা।

কুকুরের নাম ম্যানা। তাহার আকৃতি বৃহৎ। সে যে কোন্ জাতীয় কুকুর কেহই তাহা অবগত ছিল না। বেদীয়া দম্পতির বিবাহের সময় হইতেই সে তাহাদের আশ্রয়ে আছে। একে একে বেদীয়াদের চারিটি সন্তানকে সে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়ঃক্রম সাত বৎসর।

ম্যানা সেই পরিবারেরই যেন একজন। তাহাকে কোনও মতেই বাদ দেওয়া চলে না। বেদীয়ারা তাহাকে "আশ্রয়হীন দরিদ্র আত্মীয়ের" ন্যায় দেখিত। সেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যথাসাধ্য তাহাদের মন যোগাইয়া চলিত, কাজে লাগিবার চেষ্টা করিত। মনিব দম্পতি এবং তাহাদের সন্তানেরা ম্যানাকে ভালও বাসিত, আবার উৎপীড়নও করিত। কখনও তাহাকে গালি দিত, কখনও বা তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত।

কোন্ দিকে গমন করিলে তাহাদের সুবিধা হইবে স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, "ম্যানা বলত, লক্ষী, এখন কোন্ পথে যাই?"

ম্যানা তাহার মত প্রকাশ করিত। ডাকিতে ডাকিতে সে হয়ত বেদিয়াদিগের নির্ব্বাচিত পথের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইত। ইহাতে তাঁহারা বুঝিত যে, পথটি ম্যানার মনোনীত হয় নাই। বাতাসের বিচিত্রঘ্রাণে সে বুঝিতে পারিত, কোন্ দিকে গেলে দলের লোকের সুবিধা হইবে।

কুকুরের পরামর্শ মত কাজ করায় বেদিয়াদিগের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। পর্য্যটন-কালে যে নগর গ্রাম ও পল্লীর ভিতর দিয়া তাহারা যাইত, যদি দৈবক্রমে তথায় ঝুড়ি অথবা অরণ্যলতা গুল্ম প্রভৃতির আদৌ আশানুরূপ বিক্রয় না হইত, তাহা হইলে তাহারা বলিত, "নির্ব্বোধ কুকুরটাই যত অনিষ্টের গোড়া। উহার জন্যই এমন হইল।"

পারিবারিক কলহ প্রায় কুকুরের পৃষ্ঠদেশেই পর্য্যবসিত হইত। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয় জীবটি ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন কলহরত ক্রুদ্ধ দম্পতির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তাহার ফলে উভয় পক্ষ হইতেই তাহার পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত-বৃষ্টি হইত। সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির কলহ নিবারিত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইত।

ম্যানা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারিত। ক্লান্তি তাহার ছিল না।

ইহা ছাড়া তাহার মত কঠোর রক্ষক বা অভিভাবকও বিরল ছিল। একাধিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া সে অনায়াসে জয়লাভ করিত। বেদিয়া-দম্পতীর সন্তানদিগের রক্ষাই করাই তাহার প্রধান কার্য্য ছিল। সে যেমন বালকদিগের রক্ষায় যত্নশীল ছিল; তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেও তাহার সেইরূপ উৎসাহ দেখা যাইত। খেয়াল-বশেই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, শিশুরা প্রায়ই পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ম্যানা নীরবে জননীর ন্যায় তাহাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। তাহার আত্মত্যাগ অপূর্ব্ব, সহিষ্ণুতা লোকদুর্লভ।

বৎসরে একবার করিয়া বেদিয়ারা কুকুরের শাবকগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিত। সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা ম্যানা তখন লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিত। তার পর আবার সে নিজের কাজে মন দিত, শিশুদিগের সহিত খেলা করিত, তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিত। কিন্তু তাহার দিকে চাহিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, তাহার নয়নযুগল অবর্ণনীয় দুঃখে ম্রিয়মাণ, তাহার শোক সান্ত্বনারও অতীত।

একদা বসন্তকালে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেদিয়ারা ইহাতে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। পথ চলিতে চলিতে সহসা তাহাদের গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। নিকটে লোকালয় না থাকায় তাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। বেদিয়াপত্নী ঝুড়ি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একটিও বিক্রীত হইল না। বালকেরা ভিক্ষায় বাহির হইল, কিন্তু ভিক্ষা মিলিল না। ক্ষেত্র হইতে অপহরণ করিবারও কিছুই তখন ছিল না। ম্যানার শাবকগুলি অত্যন্ত শিশু, সুতরাং বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অনাহারে কিছুক্ষণ একরূপে চলিতে পারে; কিন্তু গাড়ীর চক্র-নির্ম্মাতাকে ত মূল্য দিতে হইবে?

দৈবানুগ্রহে রাজপথে জনৈক শিকারীর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। লোকটি দীর্ঘাকার, কৃশ। তাহার তাম্রাভ মুখমণ্ডলে ঈষৎ পীতাভ শ্মশ্রু। লোকটির মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মূর্ত্তিমতী।

ম্যানার গলদেশে লৌহশৃঙ্খল। সে তখন একটি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ ছিল। তাহার শাবকগুলি চারি পার্শ্বে খেলা করিতেছিল। আগন্তুক প্রফুল্লচিত্তে শীস্ দিতে দিতে যখন ম্যানার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে কুকুরটি অকস্মাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মানুষের প্রকৃতি পশুরা অতি সহজেই বুঝিতে পারে।

আগন্তুক কুকুরের গর্জনে চমকিত হইয়া অকস্মাৎ সেইখানে দাঁড়াইল। ভয়লেশহীন, বৃহদাকার কুকুর ও তাহার শাবকদিগের প্রতি সে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনোযোগের সহিত তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া পথিক সহসা উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

বেদিয়া পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ছানাগুলির কত দাম লইবে? প্রত্যেকের দাম দশ শিলিং, কেমন? ওহো, বেশ। এখন আমার কথা শুন। সম্প্রতি ক্লেনওয়ে মেলায় আমি একটা মজার খেলা দেখিয়াছিলাম। এখন নিজে আমি সেটা পরীক্ষা করিব। মাতার কাছে ছানাগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহারা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। একটু থাম, আমি যা বলি, শোন। যে যে জিনিস দরকার, তোমাদের কাছে সবই আছে, দেখিতেছি। মুরগীর এই খোপটার মধ্যে ছানাগুলিকে বন্ধ করিলেই চলিবে। তার পর মাতার নিকট হইতে খোপটা কিছু দূরে রাখিতে হইবে। আচ্ছা, দুই পাউণ্ডের স্থলে আমি তিন পাউণ্ড তোমাদের দিব। আমার কাছে আর এক পয়সাও নাই।"

বেদিয়া-দম্পতী ও বালকগণ একবাক্যে এই নিষ্ঠুর, পৈশাচিক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। তাহারা তখন ম্যানার জন্য সত্যই আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছিল। ম্যানা অশান্তভাবে ডাকিতেছিল। প্রভু ও তাহার পত্নীর ভয়াবহ মুখমণ্ডলদর্শনে সে যেন তাহার আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আগন্তুক কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বেদিয়া-দম্পতীর নৈরাশ্য যতই বাড়িতে লাগিল, সে শিকার খেলা করার জন্য ততই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের এখন অর্থের বড়ই প্রয়োজন। অবশেষে আগন্তুকের প্রস্তাবে বেদিয়া পুরুষটি সংকল্প স্থির করিয়া বিকট হাস্য করিল। তার মুদ্রাগুলি পকেটস্থ করিল। বেদিয়ার অর্থযুক্ত অস্বাভাবিক হাস্যে বিদেশীর মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে অতটা লক্ষ্যও করে নাই।

ম্যানার গলদেশস্থিত লৌহশৃঙ্খলের দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইল। শাবক-চতুষ্টয়কে খোপের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুকুরের অনতিদূরে রাখিয়া শিকারী সরিয়া দাঁড়াইল। ম্যানা সন্তানদিগের কাছে আসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। শৃঙ্খলে টান পড়িল। তাহার নাসিকা খোপ স্পর্শ করিল মাত্র।

বেদিয়া রমণী গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় লইল। সেই বীভৎস দৃশ্য দর্শন বা সন্তানবিয়োগকাতরা জননীর আর্ত্ত চীৎকার শ্রবণ করিবার স্পৃহা তাহার বিন্দুমাত্র ছিল না। শিকারী বন্দুকে গুলি ভরিল।

বেদিয়া বলিল, "একটু থাম।"

বালকদিগের কাছে সে দৌড়িয়া গেল। তাহারা কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাত ধরিয়া গাড়ীর কাছে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার হাত পা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। বালকটির হাতে কতিপয় লোষ্ট্র ছিল। পূর্ব্বাহ্নে এ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বিষম অনর্থ ঘটিত। কিরূপ কৌশলে লোষ্ট্রাঘাতে মানুষকে বিকল করিতে হয়, বালক তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল।

পৈশাচিক অভিনয়ে অধিক সময় গেল না। শিকারী দূর হইতে গুলি করিবার বাসনায় কয়েক বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। ছাদাগুলি বন্দুকের শব্দে ভীত ও কাতর হইল। চীৎকার করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণরক্ষার জন্য যেন কাতরভাবে তাহারা জননীকে ডাকিতে লাগিল। গুলি ফুরাইয়া গেলে অন্ততঃ একটি ছানারও প্রাণরক্ষা হইতে পারে, বেদিয়া মনে মনে এইরূপ আশা করিতেছিল; কিন্তু শিকারী শেষ গুলির আঘাতে অবশিষ্ট ছানাটির প্রাণবধ করিল।

যখন এই পৈশাচিক, নিষ্ঠুর—হত্যাভিনয় চলিতেছিল, ম্যানার অবস্থা তখন কি ভীষণ! তাহার রোমরাশি কাঁটার ন্যায় সোজা হইয়া উঠিয়াছিল। মুখ হইতে ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছিল। বন্দুকের শব্দে সে প্রতিবার আক্রোশে, ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। তাহার দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ মানুষের আর্ত্তধ্বনির ন্যায় হৃদয়বিদারক ও শোককরুণ।

উৎপীড়িতা কোনও নারী—কোনও মাতা এমন নৈরাশ্যপূর্ণকণ্ঠে ঘাতকের নিকট সন্তানের জন্য করুণা ভিক্ষা করিতে পারিত না। তার পর উন্মত্তার ন্যায় সে বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কি ভীষণ উদ্যম! কি প্রাণান্তকর চেষ্টা! আপনাকে শত-ছিন্ন করিয়া সে বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

একবার যদি সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে সন্তান-ঘাতীর আর রক্ষা ছিল না। সে তাহাকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিত। কিন্তু ব্যর্থ রোষে, নিষ্ফল আক্রোশে সে শুধু গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বক্ষের রক্ত সে গর্জ্জনে যেন স্তম্ভিত হয়, শুকাইয়া যায়। গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে প্রচণ্ড গর্জ্জন পরিশ্রুত হইল। তাহার দুঃখে, যন্ত্রণায় ও ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বেদিয়া রমণী ও শিশুগণও চীৎকার করিতে লাগিল।

শিকারী পৃষ্ঠদেশে বন্দুক রক্ষা করিয়া বলিল, "কি চমৎকার কুকুর! যেন সিংহী!"

বিকট হাস্যে বেদিয়া বলিল, "বটে?—যা হোক্, এখন ত তোমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার কথামত কাজও আমি করেছি। তুমি বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছ, কেমন?" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "এখন তোমাকে একটা পরামর্শ দি, তুমি পলাও। কুকুরকে এখন আমি ছাড়িয়া দিব। সেটা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?"

শিকারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "কি বলিতেছ? তুমি কি আমায় হত্যা করিতে চাও না কি? রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

সে আশ্রয়-প্রত্যাশায় চারি দিকে চাহিল। কিন্তু চক্রবাল-সীমায় কোনও গৃহ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। শুধু প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। উত্তপ্ত ভূমিতলে পা পড়িলে লোকে যেমন লাফাইয়া উঠে, সে তেমনই ভাবে লাফাইতে লাগিল। উন্মত্তবৎ সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু অর্থ বা গুলি কিছুই তাহাতে আর খুঁজিয়া পাইল না।

"আমি খত লিখিয়া দিতেছি,—পাঁচ পাউণ্ড,—পঞ্চাশ পাউণ্ড—"

অবিচলিতকণ্ঠে বেদিয়া বলিল, "তোমার অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। বৃথা প্রলোভন দেখাইতেছ। তোমার ব্যবহারে বুঝিয়াছি, তোমার প্রতি এতটুকু দয়া দেখানও উচিত নয়।"

যখন তাহারা এইরূপ আলোচনা করিতেছিল, স্যানা তখন অধীরভাবে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। শিকারী উন্মত্তের ন্যায় মাথার কেশ উৎপাটন করিতে লাগিল। সে বেদিয়াকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল। বেদিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গে বলিল, "শোন, তোমাকে আমি এইটুকু অনুগ্রহ করিতে পারি। তুমি রাস্তার ঐ মোড় পর্য্যন্ত না গেলে আমি কুকুরের গলার শিকল খুলিয়া দিব না। প্রায় ৬০০ হাত তুমি অগ্রে রহিলে। তার পর প্রাণপণ বেগে দৌড়াইয়া যদি

জীবন রক্ষা করিতে পার, তাহারই চেষ্টা দেখ। যাও, যাও, পলাও, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিও না। আমি আর কোনও কথা শুনিব না। যাও, আমি আর দেরী করিতে পারিতেছি না।"

ইতস্ততঃ করায় আর লাভ নাই দেখিয়া হতভাগ্য শিকারী একবার পশ্চাতে ফিরিয়া কুকুরের ফেনপ্লাবিত মুখের পানে চাহিল; তার পর উন্মত্তের ন্যায় বেগে দৌড়াইতে লাগিল। সে পথের বাঁকে পঁহুছিবামাত্র ম্যানার শৃঙ্খলও উন্মোচিত হইল। উদ্ভাবেগে ম্যানা সন্তান-ঘাতীর অনুসরণ করিল। তাহার তীব্রগতিবেগে পথের ধূলিজাল ধূম্ররাশির ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল।

বেদিয়া-দম্পতী সন্তানগণ সহ গাড়ীর কাছে দাড়াইয়া দেখিল, পলাতক ও আক্রমণকারীর মধ্যস্থ ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। যতই সে পলায়নমান শত্রুর সন্নিহিত হইতেছিল, ম্যানার লোমাঞ্চকর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ততই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল।

পলাতক দেখিল, ভীমমূর্ত্তি কুকুর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আর তাহার রক্ষার আশা নাই। তখন সেও আত্মস্মরণকারী ম্যানার ন্যায় বিকট-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। তাহার আকৃতি তখন এমনই ভীতিজনক, কণ্ঠস্বর এমনই বিকট ও বীভৎস হইয়া উঠিয়াছিল যে, পথিপার্শ্বস্থ একটি বালক তাহাকে দেখিয়াই পলায়নের উপক্রম করিল। বালকটি পথের ধারে মেষপাল চরাইতেছিল। ভয়ে বালকের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। পথের ধারেই একটি জলাশয় ছিল; বালকের সংজ্ঞাশূন্য দেহ তন্মধ্যে গড়াইয়া পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তেই ম্যানা সেখানে উপস্থিত হইল। শত্রু তখন আর কয়েক হস্ত মাত্র দূরে। ম্যানা বালকের অবস্থা দেখিতে পাইল। তখন তাহার গর্জ্জন যেন ভিন্নরূপ শুনাইল। গুলির দ্বারা বিদ্ধ জন্তুর ন্যায় সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। আবার সে গর্জ্জন সহকারে লাফাইয়া উঠিল। তখন যেন একটা অশরীরী অলংঘনীয় বিরাট ব্যবধান অটল প্রাচীরের ন্যায় তাহার গতিরোধ করিল। সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেই হইবে! সে ত আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! নিরাশ্রয় বিপন্ন বালককে সে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবে! এখন পৃথিবীতে এমন

কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে সেখান হইতে সরাইতে পারে। বোধ হয়, এমন প্রতিবন্ধকও পৃথিবীতে নাই, যাহাতে এখন নিঃসংশয়ে তাহাকে বাধা দিতে পারিত!

নিমেষমধ্যে সে জলে লাফাইয়া পড়িল। বালককে মুখে করিয়া সে তীরে টানিয়া তুলিল। তার পর পরমস্নেহভরে রসনা দ্বারা বালকের আর্দ্র কেশগুচ্ছ, মুখ ও চক্ষুর উপর হইতে সরাইয়া দিল।

চেতনা লাভ করিয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন ম্যানা উদাসভাবে পলাতক যে দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকে একবার চাহিল। তার পর নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া বৃথা এতটা পথ আসিয়াছে বলিয়া যেন অনুতপ্তচিত্তে সে পুনরায় মনিবের কাছে ফিরিয়া গেল। দাসত্বের যন্ত্রণাপূর্ণ বোঝা আবার সে স্কন্ধে তুলিয়া লইল।[১]

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বাণান-সমস্যা।

(ব্যাকরণ-বিভীষিকার পরিশিষ্ট)

২

উচ্চারণদোষে (অনেক স্থলে সহজ উচ্চারণের চেষ্টায়) এক বর্ণ আর এক বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। ভাষাতত্ত্ববিৎ এরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই চারিটা উদাহরণ দিব, নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিব না। এক ব্যঞ্জনের বদলে আর এক ব্যঞ্জন আসিয়া পড়ে, ইহার উদাহরণ নিতান্ত অল্প নহে। দাড়িম (দাড়িম্ব) ডালিম হইয়াছে; প্রাদেশিক উচ্চারণে ডণ্ড, ডাঁড়াও শুনিয়াছি। যিনি যত বড় বিদ্বান্‌ই হউন, কেহ গর্দ্দভ বলেন না, গর্দ্ধব বলেন! কাক্, শাক্, বক্, দিক্ প্রভৃতির কাগ্, শাগ্, বগ্, দিগ্ উচ্চারণ খুব চলিত। দুই একখানি পুস্তকে দিগ্ বাণানও যেন দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে দোষ নাই, কেননা দিশ্ শব্দের প্রথমার একবচনে দিক্ দিগ্ দুইই হয়। উচ্চারণদোষে প্রসাদ-সঙ্গীতে 'স্বখাত সলিলে' 'স্বখাদ সলিলে' মুদ্রিত হইতেছে। ঘনিষ্ঠ লিখিতে 'ঘনিষ্ট' লেখারও কারণ এই উচ্চারণদোষ। প্রাদেশিক উচ্চারণে বর্গের চতুর্থ বর্ণ

---

১ লিয়ো। ফ্রাপির রচিত প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত।

তৃতীয় বর্ণে, দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে, তবর্গের বর্ণ টবর্গের বর্ণে, অকারাদি শব্দ রকারাদি শব্দে, রকারাদি শব্দ অকারাদি শব্দে, নকারাদি শব্দ লকারাদি শব্দে, লকারাদি শব্দ নকারাদি শব্দে, স-কার হকারে, পরিণত হইতে দেখা যায়। বাণানেও ইহার জের আসে বলিয়াই কথাটা তুলিলাম। উই কুই, ওলন রোখা, কড়াই কলাই, প্রভৃতি প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে বাণান করিতে দেখা যায়। নদীয়ার নোক, নাল, নাউ, নেবু, নেপ, নোঁয়া, নুচি, নল্‌তা (পল্‌তা), নক্সী, নলিত, আখাপড়া; বর্দ্ধমানের লৌকো, লদে (নদীয়া), লদী, লতুন, লিতাই, লারাণ, লবীন। ইহার কোন কোনটি কেতাবেও উঠিয়াছে যথা, নতি (পল্‌তা)। পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ্মীন্দর দক্ষিণবঙ্গের সর্ব্বত্র নখিন্দর নামক হিংস্রজীবে পরিণত। লোকসান না নোকসান, লওয়া না নেওয়া (নী ধাতু হইতে) লিখিব?

কখন কখন প্রাদেশিক উচ্চারণে শব্দের ঈষৎ পরিবর্ত্তনও হয়। যথা, কাৎলা কাতল, কলাই কলুই, ইকুন উকুন, তৈল তোল, ত্যাল, বেগুন বাগুন বাইগুন, বায়গোন; পোঁটলা টোপলা, কাবারী ব্যাঁকারী, বাতাসা বাসাতা, বাতাস বাসাত, বাকস ফুল বাসক ফুল, বাক্স বাস্ক, ডেক্স ডেস্ক, টেক্স টেক্স ইত্যাদি। নিজের নিজের অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে বাণান করিলে এখানেও বিভ্রাট। এক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই সকল বর্ণবিপর্য্যয়ের আলোচনা করিব।

(৫) স্বর-বিপর্য্যয়।

(৵০) অ=উ। বামুন

অ=এ। ধেনুক, পায়েস, বয়েস (বেনোয়ারী),

এ=অ। আলপনা (উচ্চারণ আল্‌পনা=আলেপনা)

আ=এ। ছেলি (ছাগল, প্রাচীন কাব্যে)

ঈ=আ। কলা (কদলী)

উ=ই। ইকুন (কলিকাতার উচ্চারণ) উৎকুণ হইতে উকুণ হওয়াই সঙ্গত। বালি (বালু), ইঁদুর (উন্দুর)।

ই=এ। বেহারী (বিহারী)

এ=ই। সংস্কৃত এব বাঙ্গালার ই হইয়াছে যথা তিনিই। এখনি না লিখিয়া এখনই লেখা সঙ্গত।

* ও=উ। কুশী (কোশী)

* উ বা উ=ও। এই জন্যই কি 'চুষ্য' চোষ্য হইয়া পড়ে?

ঋ=ই। ঘি, হিয়া (হৃদয়), অমিয় অমিয়া (অমৃত), তিয়ান, গির (রাঢ়ের গৃহ)।

ঋ=এ। শেয়াল, ঘেন্না, কেপ্পন, পেথক্ (পৃথক্) মেদা, (উচ্চারণ ম্যাদা, মৃদু)।

উচ্চারণদোষে সংস্কৃতভাষার শব্দ পায়স, বয়স্, ধনুঃ, বালু, কোশী, বিহারী

* সংস্কৃতভাষায়ও কতকগুলি বাধা নিয়মে ইহাদিগের স্থান-বিনিময় হয়।

প্রভৃতিরও বাণান বিকৃত হইতেছে, দেখা গেল। অপভ্রংশের বেলায় ওরূপ হইলে দোষ নাই।

(৶০) অকারের 'ও' উচ্চারণ

বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত। যথা, আদ্যবর্ণে, অন্ন কল্য লক্ষ লক্ষ্য শক্তি ভক্তি; মধ্যবর্ণে, নরম গরম শরৎ জগৎ; অন্ত্যবর্ণে, কাল ভাল যত তত কত শত; আদ্য ও অন্ত্য উভয় বর্ণে, মত (ন্যায় অর্থে), সত্য গদ্য পদ্য মদ্য। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে এ উপদ্রবটা কম। অথচ আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে উচ্চারণদোষের জন্য টিটকারী দিই! বলা বাহুল্য, সংস্কৃত শব্দও এই উচ্চারণবিভ্রাট্ হইতে উদ্ধার পায় নাই। যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে সংস্কৃত শব্দের অভাব নাই। একটু চেষ্টা করিলে আরও অনেক উদাহরণ মনে পড়িবে। উচ্চারণের দোষ বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কেন না, কোন কোন স্থলে উচ্চারণানুযায়ী বাণান আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে মতো, কালো, ভালো ইত্যাদি লিখিতেছেন। সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ বিকার ঘটান সুব্যবস্থা নহে। কৃষ্ণবর্ণবাচক 'কাল' শব্দ সংস্কৃত। অতএব কালো লেখা অসঙ্গত। ও (এখনও, যদিও) সংস্কৃত অপির অপভ্রংশ (বাঙ্গালীর মুখে অপি=ওপি); অতএব 'এখনো' না লিখিয়া 'এখনও' লেখা সঙ্গত।

তবে কেহ কেহ বলেন, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রভেদ রাখিবার জন্য, (ambiguity) অর্থগ্রহের খটকা নিবারণের জন্য, এইরূপ বাণানে সুবিধা আছে। সময়বাচক কাল, যমবাচক কাল, কৃষ্ণবর্ণবাচক কাল তিনই সংস্কৃত; ইহা ছাড়া কল্যর অপভ্রংশ কাল আছে।* কিন্তু এই প্রভেদ-জ্ঞানের জন্য বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি? মতো, 'কোনোর বেলায়ও এই যুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখিয়াছি।

(৶০) 'এ' র 'য়্যা' উচ্চারণ।

ইহা লইয়াও বাণানের হাঙ্গামা কম নহে। কি করিলে এই বিকৃত উচ্চারণ বাণানে সূচিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক মৌলিক উদ্ভাবনা হইয়াছে। 'এ্যা' ও 'অ্যা' সব চেয়ে উৎকট! ঐরূপ উচ্চারণ বুঝাইতে য ফলা আকার

* চারিটি অর্থের তিনটিতে ল হসন্ত উচ্চারিত (বাঙ্গালায়)। চতুর্থ স্থলে অন্ত্য অ উচ্চারণের চেষ্টা হইয়াছে, আর অ ও হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দিলে সব লেঠা চোকে না। যখন হ্যারিসন রোড্ লিখিয়া বসি, তখন 'হ্যা'র যে আর একটা উচ্চারণ আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। 'হের,' 'হেন' প্রভৃতি স্থলে যখন আপনা আপনিই ঠিক উচ্চারণ আসে, তখন য ফলা আকার না লাগাইয়া হেরিসন লিখিলে চলে না কি? তবে বিদেশী শব্দ বলিয়া উচ্চারণ বুঝাইবার প্রয়োজন, সে কথাও মানি। এ সমস্যার মীমাংসা কি?

(৬) হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান।

১। উচ্চারণদোষে আমিরা হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান হারাইয়াছি। কেবল ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশুদ্ধি আসিয়া পড়ে। কতকগুলি স্থলে সংস্কৃতভাষায় বিকল্পে হ্রস্বদীর্ঘ হয়, যথা ই ঈ—শ্রেণি বেণি, রাজি,আলি, কটি, কোটি,রাত্রি, রজনি, সূচি, শারি, শকটি, মক্ষি, অবনি, অটবি, ধমনি, আবলি, তরি, ক্রটি, ধরণি, ভঙ্গি,যুবতি প্রভৃতি; অন্তরিক্ষ অন্তরীক্ষ; প্রতিকার প্রতীকার, পরিতাপ, পরীতাপ, পরিহাস পরীহাস; তি (ক্তিন্) প্রত্যয়ান্ত হইলেও পদ্ধতি পদ্ধতী দুই রূপই হয়। উ ঊ। তনু তনূ, চঞ্চু চঞ্চূ, হনু হনূ, অলাবু অলাবূ শম্ভু শম্ভূ, স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ভূ, শম্বুক শম্বূক, জম্বুক জম্বূক, ভল্লুক ভল্লূক, পুরুষ পূরুষ ইত্যাদি। অভিধান লিখিতে বসি নাই, নিঃশেষ করিয়া উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি স্থলে অর্থভেদে (ব্যুৎপত্তিভেদে) হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাণান আছে। যথা, দিন দীন, চির চীর, দ্বিপ দ্বীপ, বলি বলী, আহুত আহূত, কুল কূল, সুত সূত, পুর পূর।

হ্রস্বদীর্ঘরহস্য।

মুখ	কিন্তু	মূক	কলি	কিন্তু	কালী	শম্ভু
আকুল	,,	অকূল	শিক্ষা	,,	দীক্ষা	মুহূর্ত্ত
বিদুষী	,,	বিদূষক	ভিষক্	,,	ভীষণ	(মুহূরে দেখাদেখি
চ্যুত	,,	চূত (আম্র)	ধীর	,,	ধীর	মুহূর্ত্ত ছাপা হয়!)
শুচি	,,	সূচি	নিশিত	,,	নিশীথ	পুরুষ পূরুষ
			উদ্গিরণ	,,	উদ্গীর্ণ	শুশ্রূষা, মুমূর্ষু
রুক্ষ	,,	রূক্ষ	বিকিরণ	,,	বিকীর্ণ	বিভীষিকা, বিভীতকী
ক্ষুদ্র	,,	ক্ষূদ্র	ভিলা	,,	শীল	পিপীলিকা, কনীনিকা
পুণ্য	,,	পূর্ণ	বিহিত	,,	বিহীন	কিরীট, ফণিনী
স্ফুরণ	,,	স্ফূর্ত্তি	ক্রিয়া	,,	ক্রীড়া	বাল্মীকি
নুকুল	,,	চূর্ণুল	অসি	,,	মসী	শারীরিক
পুত্র	,,	পূত	প্রভুত্ব	,,	প্রভূত	ভাগীরথী
সূত	,,	প্রসূতি	তুষ্টি	,,	তূষ্ণীম্ভাব	পৌরাণিকী
শূণ্য	,,	শূন্য	কু-জন	,,	কূজন	

একাধিক ই বা উ-বর্ণ

২। সংস্কৃতশব্দের অপভ্রংশের বেলায় কি করা উচিত? অনেকের দেখি, হ্রস্বর দিকে ঝোঁক; ঘটি কুশি পাখি গিন্নি ইত্যাদিরূপ ছাপা প্রায়ই দেখি। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ধরিয়া হ্রস্বদীর্ঘ স্থির করা সঙ্গত নহে কি? ঘটের স্ত্রীলিঙ্গ ঘটী, এ ত খাঁটি সংস্কৃত। কোশী (সং. হইতে কুশী (বাং)। পক্ষীর অপভ্রংশ পাখী, গৃহিণীর অপভ্রংশ গিন্নী ইত্যাদি। ঘটিকা হইতে ঘড়ি, এখানে হ্রস্ব ঠিক। শ্রেণী শ্রেণি সংস্কৃত দুইই হয়, অতএব সিঁড়ি শিঁড়ী, শারি শারী, দুইই হইতে পারে। নবদ্বীপ=নদীয়া। কিন্তু দীপশলাকা =দীয়াশালাই, এখানে 'দী' কেহ লিখিবে কি? সখীর অপভ্রংশে সঈ (সই নহে) কেহ মানিবে কি? সৈ লিখিয়া কাঁকি দেওয়া চলে (যেমন বধূ= বউ=বৌ)। 'আসীৎ' হইতে আছিল, তাহা হইতে ছিল, ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে ত আছীল ছীল লিখিতে হয়! সূচি=ছুঁচ, সূত্র=সুতা; সূত্রধর= ছুতার! ঘূর্ণধাতু=ঘুরিতেছে।

খাঁটি বাংলায় 'ঈ' যোগে সচরাচর স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা কাকী, খুড়ী, মামী, জ্যেঠী (কলিকাতায় ভিন্ন উচ্চারণ)। দাদার স্ত্রীলিঙ্গে কি উভয় বর্ণেই প্রত্যয় হইয়াছে? তবে কি দীদী লিখিব? সে যে 'গডাটর চণ্ডের' ডীডী অপেক্ষাও উৎকট হইবে, পিসি মাসি। কাকী মামীর দলের নহে (পিতৃষ্বস্থ মাতৃষ্বস্থর অপভ্রংশ); অতএব স্ত্রীপ্রত্যয় 'ঈ'র স্থল নহে। ঋকারের অপভ্রংশে ই হইবে কি ঈ হইবে বলা কঠিন, ই সঙ্গত নহে কি? পিসি মাসির বেলায় আবার উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে; স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে (পিসে মেসো)। তাহাই স্বাভাবিক, কেননা আগে পিসি মাসির সঙ্গে সম্পর্ক, পরে পিসে মেসোর সঙ্গে।

(৭) স্বর ও ব্যঞ্জনে গোলযোগ।

আমরা অ য় এই উভয় বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ করি না, সেই জন্য স্বরের অ, অন্তঃস্থ য় নাম দিয়া প্রভেদ জানাই। (সংস্কৃতে য আছে য় নাই, সংস্কৃত য বাঙ্গালা য় উচ্চারণের কতকটা কাছাকাছি।) ইহার ফলে অনেক স্থলে অ না লিখিয়া য় লিখি, আ না লিখিয়া য়া লিখি। প্রাকৃতে দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দের বা পদের ব্যঞ্জন অপভ্রংশে অ হইয়াছে, যথা সাগর=সাঅর, দ্বার=দুআর, সখা=সঅ, নব=নঅ, খদির=খএর, গুবাক=গুআ, শিখর= শিঅর, রাজ=রাঅ, পাদ=পাঅ, বনচারী=বনআরী, কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলির সায়র (যথা বর্দ্ধমানে কৃষ্ণসায়র, দেওঘরে জলসায়র), দুয়ার,

সন্ধা, নয় (nine) নয়া (new), খয়ের, শুয়া, শিয়র, রায়, পায়া, বেনোয়ারী বাণান হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহা বন্ধ করা অসাধ্য। হিসাব মত ধরিতে গেলে, করিয়া গিয়া যাইয়া (কৃত্বা গত্বা যাত্বা), করিয়াছে গিয়াছে যাইয়াছে (করি+আছে ইত্যাদি), এগুলির করিআ করিআছে ইত্যাদি বাণান হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা লোকে মানিবে কি? কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন 'সাঅর' সন্ধি হইয়া 'সার' হইয়া পড়িবে, করিয়াছে কর্য্যাছে হইয়া পড়িবে, কিন্তু বাঙ্গালায় ওরূপ সন্ধি হয় না। তাহা হইলে যাইব যেব, খাইব খেব, সই সে, রাই রে, হই হে, হইত হেত, হয় নাই কেন? জমীদারী সেরেস্তার ও আদালতের কাগজপত্র এবং প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়ে য়ার স্থলে আ ঠিক আছে।

ঋ ও ৠ-সম্বন্ধেও আমরা উচ্চারণে কোন প্রভেদ করি না। তবে এজন্য বিশেষ কোন বাণানের ভুল লক্ষ্য করি নাই। পৈতৃক পৈত্রিক দুইই হয়, এখানে কোন ভুল নাই। মাত্রিক, ভ্রাত্রিক কাহাকেও লিখিতে দেখি নাই (মাত্রা হইতে অবশ্য মাত্রিক হইতে পারে)। কেহ কেহ ঘৃত ঘ্রত লেখেন!

(৮) ব্যঞ্জনবিপর্য্যয়।

কতকগুলি অক্ষরযুগ্মকে ব্যঞ্জনবিপর্য্যয়সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। যথা ব ব, খ ক্ষ, জ য, র ড়, ণ ন; শ ষ স (এখানে অক্ষরত্রিকে)।

(৯) ব ব।

বর্গ্য ব অন্তঃস্থ ব আমরা উচ্চারণে প্রভেদ করিতে জানি না (সেই জন্যই তাহাদের এইরূপ বিতং দিয়া নাম দিই)। ইহার ফলে, দুই বএ গোল করিয়া, বশম্বদ, স্বয়ম্বরা, সম্বাদ, এবম্বিধ, সম্বর্দ্ধনা, কিম্বা, অপরম্বা, সম্বরণ, বারম্বার, কিম্বদন্তী (বর্ষংবদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে) প্রভৃতি লিখিয়া বসি, এ কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। সম্বল সম্বাধ, সম্বোধন, সম্বন্ধ ঠিক, কেন না এখানে বর্গ্য ব; অবশ্য সংবল, সংবাধ, সংবন্ধ, সংবোধনও বিকল্পে হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হরপ হইলে (যথা পেটকাটা ব বা নাগরী ব এবং সোজা ব) এ বিভ্রাট ঘটিতে পাইত না। আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। জ য, খ ক্ষ, র ড়, ণ ন, শ ষ স, অ য়, আ য়া, ই ঈ, উ ঊ, এ সব স্থলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর থাকাতেও ভুল বাণান আটকায়

নাই। আসল গলদ উচ্চারণে। উচ্চারণ শোধরাইবার যখন উপায় নাই, তখন পদে পদে ব্যুৎপত্তিজ্ঞান না থাকিলেই বিভ্রাট ঘটিবে।

(৵০) জ য।

জ য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত শব্দের য অনেক সময় বাঙ্গালায় অপভ্রংশে জ হইয়াছে। 'কাজ' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূয পূঁজ হইয়াছে, কবিতায় ধৈর্য্য ধৈরজ হইয়াছে। (অন্য হইতে আজ এ নিয়মে হয় নাই, এখানে দ=জ হইয়াছে; ঐরূপ ধ=ঝ হয় যথা মধ্য=মাঝ, সন্ধ্যা=সাঁঝ, বন্ধ্যা=বাঁজা)। অপভ্রংশের বেলায় ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া জ হইবে কি য হইবে স্থির করাই সঙ্গত নহে কি? যেমন যাতৃ=যা, যক্ষ=যঁক, যন্ত্র=যাঁতা, যন্ত্রিকা=যাঁতী, যুগ=যোড়া, যুজ্=যোড়া (ক্রিয়া), শয্যা=শেয, যজ্ঞ=যগ্যি, যজ্ঞেশ্বর=যগ্গু, যশোদা=যশী, যজ্ঞোডুম্বর=যগ্যিডুমুর বা যগ্‌ডুমুর, যোটা কি জৌট ধাতু হইতে? যবানী বা যমানী হইতে যোয়ান নহে কি? যৌবনিক যাবনিক। পক্ষান্তরে, জলৌকা=জোঁক, ভ্রাতৃজায়া=ভাজ, জাত=জাহু (যাদব হইতে নহে), সজ্জা=সাজ, মজ্জা=মাজ, বজ্র=বাজ, জগৎ=জগু।

অনেকে প্রাকৃতের নজীরে 'কাজ' লেখেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, প্রাকৃতে য নাই, অতএব সে নজীর মানিতে হইলে জে, জাহা, জত, জথা, জেথা, জখন, জেমন, লিখিতে হয়, অথচ এ সব গুলির যদ্ শব্দ হইতে উদ্ভব। প্রাচীন পুথিতে 'জাহা' 'জদি' প্রভৃতি বাণানের অভাব নাই। কিন্তু সেই সব বাণানের জন্য কবিগণ স্বয়ং দায়ী, কি লিপিকরেরা অজ্ঞতাবশতঃ উদ্ভট বাণান চালাইয়াছে, ইহার বিচার না করিয়া পুথির বাণান গ্রাহ্য করা যায় না। লিপিকরেরা অনেক সময়ে জমীদারী সেরেস্তার বা আদালতের আমলাদের মত যথেচ্ছ বাণান চালাইয়াছে। সাহিত্যে যে সেই সব বাণান শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রাকৃতের দোহাই দিলে যে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে, ণত্বষত্ববিচারে তাহা দেখাইব।

জ য রহস্য।

জীব	কিন্তু	যব	জমা (ব্রাহ্মিক)	„	যম
জীবন	„	যৌবন	জমা („)	„	যোত্র (যোত্র)
জাতি	„	যূথী	(অজ্ঞান, অজ্ঞান)	জান (জন্ ধাতু)	কিন্তু যান (যা ধাতু)
জাতী (পুষ্প)			জাত (জন্ ধাতু)	কিন্তু	যাত (যা ধাতু)
জ্যোতিঃ	„	যতি	জাহ্নবী	„	যমুনা

জবন যবন, জবনিকা যবনিকা, জামাতা যাম্মাতা, দুই রূপই হয়।

(৶০) র ড়।

সংস্কৃতে যেমন য আছে য় নাই, তেমনি ড আছে ড় নাই। র ড় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত শব্দের র অনেক সময়ে বাঙ্গালায় অপভ্রংশে ড় হইয়াছে। প্রথমতঃ বলিয়া রাখি, সাধারণতঃ ট বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশে ড় হয় যথা, বাটী=বাড়ী, কটাহ=কড়া, কর্পট=কাপড়, ঘোটক=ঘোড়া, ফোটক=ফোড়া ও স্ফোটন=ফোঁড়া, দংষ্ট্রা=দাড়া, পঠন=পড়া, কঠোর=কড়া, শৌণ্ডিক=শুঁড়ি, দণ্ডায়=দাঁড়ান, ওড্র=উড়িষ্যা, ওড্ডী=উড়ীধান, ভাণ্ড=ভাঁড়, খণ্ড=খাঁড়। ত বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশেও কখন ড় হয় যথা, পতন=পড়া, কপর্দ্দক=কড়ি। ঝঞ্ঝা (ঝটিকা নহে)=ঝড়, সংজ্ঞা=সাড়া, এখানে চ বর্গের অপভ্রংশ। ল এর অপভ্রংশেও ড় হয় যথা, কলায়=কড়াই (কলিকাতায়), পল্লী=পাড়া। কিন্তু র কঠোর উচ্চারণে ড় হইয়া পড়ে, তাহাই এখানে আমার বক্তব্য। যথা শ্বশ্রূ=শাশুড়ী (অথবা শ্বশুর শব্দের খাঁটি বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গ), বর (শ্রেষ্ঠ)=বড়, ত্বরা=তাড়াতাড়ি (তাড়নায় দেখাদেখি), ভ্রম্ ধাতু=বেড়ান, দ্রু ধাতু=দৌড়ান, বৃতি=বেড়া, প্রতিবেশী=পড়শী, অন্তরাল=আড়াল, আতুর=আঁতুড়, আম্রাত=আমড়া। কখন কখন অর্থভেদে র ড় হয়। যথা মড়া (=মৃতদেহ), মরা; পার পারাপার, পাড়ী দেওয়া বা জমান (পুকুরের পাড় কি পাহাড় ?)। সুড়ঙ্গ প্রকৃতপক্ষে সুরঙ্গ। কেহ কেহ গরুড় লিখিতে গড়ুর লিখিয়া বসেন! নীর নীড়, ক্রোর ক্রোড়, নারী নাড়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ। পূরণ কিন্তু পীড়ন। হেরম্ব কিন্তু হিড়িম্ব। ইশারা কিন্তু সাড়া।

এ ক্ষেত্রেও ড় ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বিষম প্রভেদ। ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দক্ষিণবঙ্গের লোকে বর, আতুর ঘর, শ্বাশুরী, তারাতারি, ইত্যাদি লিখিতে সম্মত হইবেন কি? সুরঙ্গ সংস্কৃতশব্দ, সে ক্ষেত্রেও শুদ্ধ বাণান চলিবে না কি? ময়মনসিংহের কবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয় তাঁহার 'পেটকাটা ব এর উড়িষ্যাযাত্রা' নামক উপাদেয় কবিতায় (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫) আমাদের উপর খুব এক চোট লইয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে দক্ষিণবঙ্গের উচ্চারণের বিশেষত্বই বোধ হয় বলবৎ থাকিবে, ব্যুৎপত্তির আপত্তি কেহ আমলে আনিবে না।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এর 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(।০) খ ক্ষ।

এইরূপ ক্ষ অপভ্রংশে খ হইয়াছে। যথা ক্ষুদ্র=খুদ খুদে, চক্ষুঃ=চোখ, ইক্ষু=আখ, পক্ষ=পাখা, পক্ষী=পাখী, লক্ষ=লাখ, অক্ষি=আঁখি, কক্ষ=কাঁখ (কুক্ষি=কোঁক, বক্ষঃ=বুক, খ না হইয়া ক হইয়াছে), ভিক্ষা=ভিখ, পরীক্ষা=পরখ, লক্ষীন্দ্র=নখিন্দর, ক্ষুরপ্র=খুরপো, ক্ষেত্র=খেত, ক্ষিপ্ত=খেপা, ক্ষানিক=খানিক, ক্ষুধা=খিদে, ক্ষতি=খেতি, যৎক্ষণ=যখন, তৎক্ষণ=তখন, এতক্ষণ=এখন, কিংক্ষণ=কখন।

অপভ্রংশে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ অবিকল গ্রহণ করিলে ক্ষ অবিকৃত রাখা উচিত। ক্ষীর, ক্ষণ, ক্ষার, ক্ষতি, ক্ষত, ক্ষোভ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতের মতই লেখা উচিত। ক্ষণা খনা হইয়া পড়ে নাই কি? (রায় সাহেব বলেন, ক্ষমা খনা হইয়াছে!) অপভ্রংশে খোদাই চলিবে, কিন্তু ক্ষোদিত না লিখিয়া খোদিত লেখা কি সঙ্গত? ক্ষুর খুর, দুইই সংস্কৃতে আছে। আকাঙ্ক্ষা হাল বাণানে আকাঙ্খা হইতে দেখিয়াছি, পক্ষান্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (এটা কি সংস্কৃত?) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে হইতেছে। ইহাই কি বাহাল থাকিবে? ক্ষিপ্র ও ক্ষরস্রোত যেন ছাপায় দেখিয়াছি, মনে হয়।

খ ক্ষ রহস্য।

খর কিন্তু ক্ষার, ক্ষরণ। খত (ধারনিক), খাত কিন্তু ক্ষত।
খিন্ন কিন্তু ক্ষুণ্ণ। খ্যাতি কিন্তু সাক্ষাৎ।

(।/০) ফলা (সংযুক্ত বর্ণ।)

আমরা য ফলা ব ফলা উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ত ও তএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ক ও কএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ন ও নএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, ম ফলার স্পষ্ট অনুনাসিক উচ্চারণ করি না, ইত্যাদি কারণে অনেক স্থলে ভুল বাণান আসিয়া পড়ে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ হইয়া পড়ে, পক্ক পক্ক হইয়া পড়ে, উচ্ছ্বাস উচ্ছাস হইয়া পড়ে, ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ হইয়া পড়ে। এখানেও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সতর্কতা না থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। উদাহরণ দিতেছি—

বসন	ব্যসন
লক্ষ	লক্ষ্য
মর্ত্ত	মর্ত্ত্য
ব্যঙ্গ	ব্যাঙ্গ্য
বঙ্গ	ব্যঙ্গ
অপত্য	আপত্তি
সত্য	সত্ত্ব
অন্ন	অন্ন
পণ্য	উৎপন্ন
অন্যায়	অব্যয়

সত্ত্ব	স্বত্ব সত্তা
সর্গ	স্বর্গ
দ্বার	দ্বার
দ্বীপ	দ্বীপ
দেশ	দ্বেষ
কজ্জল উজ্জ্বল	দুইটা জ
প্রজ্বলিত	একটা জ
তদীয়	ত্বদীয়
সরস্বতী	স্বর
শান্ত	সান্ত্বনা (সান্তনা নহে)
বংশ	ধ্বংস
জ্বরা	জ্বর
ধ্বনী	ধ্বনি
শত	স্বতঃ
অর্দ্ধ, মূর্দ্ধা	উর্দ্ধ (উর্দ্ধও হয়)
চ্ছল	স্ব
সায়ং	স্বয়ং
শম্ভু	স্বয়ম্ভু

শরণ	স্মরণ
রুক্ষ	স্পৃক্ষ
লক্ষণ	লক্ষ্মণ
লক্ষ	লক্ষ্মী
অশ্ব	অশ্ম
শ্মশ্রু	শ্মশ্রু
বিশ্ব	ভীষ্ম
তুষ্ট	তুষ্ণীম্ভাব

(।৵০) ণ ন।

কতকগুলি শব্দের 'ণ' স্বাভাবিক। যথা, কণ কণা কাণ কোণ গুণ গণ পণ বীণা বেণু বাণ বেণী মণি স্থাণু পুণ্য শোণ শাণ পাণি লবণ গণিকা কল্যাণ ইত্যাদি। অবশিষ্ট সর্ব্বত্রই 'ন' ধরিতে হইবে। তবে ণত্ববিধানের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ফাল্গুন, গগন, ফেন সম্বন্ধে একটু গোল আছে। কোন কোন মতে ফাল্গুণ, ফেণ। অনেকে চিহ্ন বহ্নি লেখেন, তাহা ভুল। অনেকে আবার হু হু এই দুইটার বাণানের কি প্রভেদ, তাহাই জানেন না। দৃশ্যকাব্য বুঝাইতে ভাণ, ভাঁড়ান বুঝাইতে (feigning) ভাম। অনেকে দ্বিতীয় অর্থে ভাণ লেখেন। তাহা কি ঠিক? দ্বিতীয়টি 'ভা' ধাতু হইতে না ভণ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ন স্থলবিশেষে ণ হয়, তদ্বিষয়ে অর্থাৎ ণত্ববিধানের জটিল সূত্র সম্বন্ধে সংস্কৃতব্যাকরণে বরাত চালাইব। কেবল দুই একটি গোলমেলে উদাহরণ দেখাইব। শূর্পণখা, এখানে বিকল্পে ন হয় না। দুর্নাম, হরিনাম, হরেনাম, দুর্নীতি, নির্নিমেষ এগুলি ণত্ববিধানের স্থল নহে, কিন্তু ছাপায় প্রায়ই ণ দেখি। সংজ্ঞা বুঝায় বলিয়া হরিমোহন, রামমোহন ও তত্তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ণত্ব হওয়া উচিত নহে কি? প্রণাশ কিন্তু প্রনষ্ট; হিরণ্ময় কিন্তু মৃন্ময় চিন্ময়।

অনেকে এ দুইটিতে ণত্ব করেন, এবং ঠিক লিখিয়াছেন বলিয়া তর্ক করিতে ছাড়েন না। রুগ্‌ণ লইয়াও ঘোর তর্ক; অনেক ব্যাকরণজ্ঞ বলেন, এখানে ণত্ব হইবে, ছাপাখানার টাইপের দোষে অগ্নির মত বাণান হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ণত্ব হইবে না জোর করিয়া বলেন। মূর্দ্ধন্য শব্দে 'ন' টা দন্ত্য। পাণিনি নিজ নামে দুইএরই মান রাখিয়াছেন।

ণ ন রহস্য।

প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পুরাহ্ণ	কিন্তু	মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক
মণি, মণীন্দ্র	,,	মুনি, মুনীন্দ্র
বন্ধণা	,,	যাতনা
প্রবীণ	,,	নবীন
বীণা	,,	বিনা
পণ্য	,,	উৎপন্ন
অগ্রহায়ণ, শ্রাবণ	,,	আশ্বিন, ফাল্গুন
আপণ (দোকান)	,,	আপন (আত্মন্ হইতে?)
পাণি (হস্ত)	,,	পানি (জল যাবনিক) 'পানীয়'র অপভ্রংশ?
প্রণাম	,,	নমস্কার
পরিণাম	,,	হরিনাম
ক্ষুণ্ণ	,,	খিন্ন
পুণ্য, পুর্ণ	,,	শূন্য
পণ্য	,,	মান্য
করুণ	,,	করুন (বাংলা ক্রিয়াপদ)
পীড়ন	,,	পীড়ন
গণ	,,	ঘন
রণ	,,	বন
শাণ	,,	সন (যাবনিক)

ষণ ও সন বা শন রহস্য

বিষণ্ণ	প্রসন্ন
শোষণ	শাসন
ভূষণ	বসন
ঘর্ষণ	স্পর্শন
দক্ষিণ	ঈশান
পোষণ	পেশন
পরিষেষণ	পরিবেশন

এইটাই নাকি বেশী শুদ্ধ।

এক্ষণে অপভ্রংশের কথা তুলিব। কর্ণ=কাণ, পর্ণ=পাণ, চূর্ণ=চূণ, স্বর্ণ=সোণা, বর্ণন=বাণান, এ সব স্থলে অপভ্রংশেও ণ লেখা ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়। কেহ কেহ তর্ক তুলেন, রেফ যখন অপভ্রংশে নাই, তখন ণ হইবে কেন? কিন্তু এ সব স্থলে ণ যে ণত্ববিধানের নিয়মে হইয়াছে, ইহার কোন

প্রমাণ নাই। মূল শব্দগুলির ণ স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমান করি। এইরূপ কঙ্কণ=কাঁকণ বা কাঁকুণি, বণিক্=বেণে, কাণ=কাণা, দ্বিগুণ=দুণা (পক্ষান্তরে পাদোন=পৌনে)। গ্রহণ=গেরোণ (eclipse), সন্তরণ=সাঁতরাণ, এ সব স্থলেও ণত্ব হওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত স্থলগুলিতে প্রাকৃতের নজীর আনিলে আমার জিত, কেননা প্রাকৃতে ণ র ছড়াছড়ি। বনচারী বেণোয়ারী হয় কেন?

পক্ষান্তরে যখন অনট্, ইনী (ইন্+ঈ) প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পদের স্বাভাবিক ন ণত্ববিধানের সূত্রানুসারে ণ হইয়াছে, তখন অপভ্রংশে ঋ র ষ বর্ণের অভাব ঘটিলে ণত্ব হইবারও অবসর ঘটিবে না। যথা, শ্রবণ=শোনা, প্রেষণ=পাঠান, কার্ষাপণ=কাহন, গৃহিণী=গিন্নী, ব্রাহ্মণী=বাম্নী, বারাণসী হইতে বেনারসী, ঘৃণা=ঘেন্না, কৃপণ=কেপ্পন। "নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।" এ মীমাংসা কি অসঙ্গত? যাঁহারা প্রাকৃতের নজীরে 'জ্ঞ' আমদানী করেন, 'ণ' সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত?

শ ষ স।

ণ ন লইয়া যে হাঙ্গামা, এখানে আবার তাহার উপর এক কাঠী, কেননা এ ক্ষেত্রে দু'টা নহে তিনটা। এখানেও উচ্চারণে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাযেই ব্যুৎপত্তিজ্ঞান ভিন্ন উপায় নাই।

স কোথায় ষ হয়, সে কথার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের (ষত্ববিধানে) বরাত চালাব। কতকগুলি স্থলে দুই রকমই হয়। যথা, শ স, কলশ কলস, কেশর কেসর, বিকাশ বিকাস, কিশলয় কিসলয়, শূর্প সূর্প, শূকর সূকর, বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ, কৌশল্যা কৌসল্যা, শ্রোতঃ স্রোতঃ, শর্ব্বরী সর্ব্বরী, রশনা রসনা। শ ষ; কশা কষা, কোশ কোষ, বেশ বেষ।

পুষ্প একরূপ বাণান হয়, কিন্তু বাষ্প বাষ্প দুইই হয়। ভ্রংশ ঠিক, ভ্রংস ভুল; পক্ষান্তরে ধ্বংস ঠিক, ধ্বংশ ভুল। অনেকে ভ্রংশের দেখাদেখি ধ্বংশ লেখেন দেখি, ধ্বস্ত দেখিয়াও তাঁহাদের চৈতন্য হয় না। সঙ্কট বোধ হয় শকটের দেখাদেখি শঙ্কট হইয়াছে। শীকার যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে 'স্বীকার' করিতে হইবে। শঙ্কর শিব অর্থে, সঙ্কর স্বতন্ত্র বস্তু। বিশ, বিষ, বিস সংস্কৃতে তিনই আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থে। ষত্ববিধানের বিকল্পের স্থান ও নিষেধের স্থানগুলি সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

শ ষ স রহস্য।

শ	ষ
দেশজ	কিন্তু ভেষজ
পেশন	,, পোষণ
দেশ	,, দ্বেষ
শোধ	,, নিষেধ
শিব	,, বিষ্ণু
ঈশান	,, দক্ষিণ
বৈশাখ, শ্রাবণ, অশ্বিন	,, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, পৌষ
স্পর্শ	,, হর্ষ
বিশ্ব	,, ভীষ্ম

শ	স
আভাষ	,, ভাস (অর্থভেদে)
মাষ	,, মাস (,,)
মানুষ	,, মানস, মনসা
শিষ্য	,, শস্য
পুষ্কর	,, ভাস্কর

ষ	স
তৃষা	,, পিপাসা
ঈর্ষ্যা	,, হিংসা

ষ	স
সুষুপ্তি	সুপ্তি
সুষমা	,, সমা

ষ	স
আধিকার, বহিষ্কার, পরিষ্কার	,, পুরস্কার, তিরস্কার, নমস্কার
কল্যাণীয়েষু	,, কল্যাণীয়াসু

শ	স
নিরাশ কিন্তু	নিবাস (নিরসন)
শম	,, সম (অর্থভেদে)
শ্রুত	,, শ্রুত (,,)
অশক্ত	,, অসক্ত (,,) আসক্ত
অংশ	,, অংশ (,,)
সঙ্কর	,, সঙ্কর (,,)
শ্যামা	,, আসা (আগমন)
শারদা (দুর্গা), শারদীয়া	সারদা (বাগ্দেবী)
শূর	,, সুর
শীত	,, সিত
শর	,, সর
শত	,, সতঃ
শরণ	,, সরণ
শ্রুতি	,, স্মৃতি
শ্রী	,, স্ত্রী
শান্ত	,, সান্ত্বনা
শম্ভু	,, স্বয়ম্ভু
শাখা	,, সখা
শ্বেত	,, স্বেদ
শোভা	,, সভা
শ্রেষ্ঠ	,, সৃষ্টি
ভ্রংশ	,, ধ্বংস
শব্দ	,, সঙ্জ্ঞা
বংশ	,, ধ্বংস
শ্বশ্রূ	,, স্বসৃ
প্রশ্ন	,, জিজ্ঞাসা
শীৎকার	,, সৎকার
বিশ্ব	,, দ্রুব
বাঁশী	,, অসি
শিরঃ	,, সার
অভিশাপ	,, অভিসম্পাত
শুচি	,, সূচি
অশ্রু	,, অস্র
অবশ্য	,, রহস্য

শ	ষ	স
বিশ	বিষ	বিস (অর্থভেদে)
বিশদ	বিষাদ	অবসাদ
ঈশ	ঈষৎ	সৎ

একত্র একাধিক।

শশ—শশক, শ্মশ্রু শ্বশ্রূ, শিশু

ষষ—ষষ্ঠ, ষষ্ঠী

সস—স্বস্থ, সংসার

শ্ব—শেষ, বিশেষ, পরিশেষ, শোধ, শীর্ষ, শিষ্য, শিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, শিক্ষা, শুশ্রূষা, শ্লেষ, শ্লেষ্মা

শ্ম—শাসন, শাস্ত্র, শান্তি, শ্বাস, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, বিশ্বাস, শ্লাঘা, প্রশংসা

ষ্ব—সুষ্ঠু, সুষ্টি, সর্ষপ

এবার অপভ্রংশের কথা তুলিব। এখানেও ণ ন র ন্যায় ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বাণান করাই সঙ্গত। যথা, শ্বেত=শাদা, শ্রেণী=শিঁড়ী ও শারী, শুদ্ধ=শুধু,

শৃঙ্গ হইতে শিঙ্গারা শিঙ্গুর, সর্ষপ=সর্ষে, প্রতিবেশী=পড়্শী, লেখা উচিত। উদ্দেশ হইতে যদি হদিশ হইয়া থাকে, তবে শ লিখিতে হইবে। অথবা এটি যাবনিক শব্দ? তিনি সুদ্ধ গেলেন, বা মাল সুদ্ধ গেরেফ্‌তার,—এসব স্থলে সুদ্ধ সার্দ্ধং এর অপভ্রংশ নহে কি? বিস্ফোটক হইতে বিস্‌ফোড়া হইবার কথা, বিষফোড়া নহে, (ইহাতে বিষ আছে কি না, ডাক্তারেরা বলিতে পারেন)।

ণত্ববিধানের বেলায় যেমন বলিয়াছি, ষত্ববিধানের বেলায়ও সেইরূপ বলিব, যখন অপভ্রংশে ষত্ববিধানের সূত্রের প্রয়োগের আর অবসর নাই, তখন 'স' লিখিব। পিসি মাসি, না পিষি মাষি (পিতৃষ্বসৃ মাতৃষ্বসৃ)? অনেকের তৃতীয়ঃ পন্থাঃ পিশি মাশি!

অপভ্রংশ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। শব্দটা অপভ্রংশ হওয়ার পরে তাহার উপর আর নূতন করিয়া ণত্ববিধান ষত্ববিধানের ঢাপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ পিসি মাসির বেলায় অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর স আছে, অতএব ষ হইবে, এই কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লেখকগণকে বিব্রত করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ বাংলা ক্রিয়া করুন, করিবেন, প্রভৃতিভেদেও ণত্ববিধানের ফের আনিলে চলিবে না।

আরবী পারসী শব্দের বেলায় (ফেরাস-জিম্মিশ, সাহেব-খুশী, কর্শী) বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। পরিষদ্ আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। ময়মনসিংহের সাহিত্যসম্মিলনে এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের এতই কঠোর শাসন যে, তাহার এলাকার বাহিরে, দেশজ শব্দ ও ইংরাজী শব্দের বাণানে, লেখকদিগের স্বাধীনতা থাকাই ভাল। অনেককে প্রাণান্ত করিয়া ট্রেণ, মার্কিণ, প্রোণাউন, ডারুইণ, ড্রেণ, ক্রেণ, জার্ম্মাণ, (hurricane) হার্কিণ, কর্পোরেষণ, ষ্টেষণ, লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এ সব স্থলে ণত্বষত্বের জন্য পীড়াপীড়ি করা নিতান্তই জুলুম। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিন্তু বলেন, ভাষায় বাণানের একটা সাধারণ নিয়ম ও সুসঙ্গত শৃঙ্খলা থাকা উচিত। কতকগুলি স্থলে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শব্দ সংস্কৃতভাষার নিয়মে বাণান করিতে হয়, যথা—এজেণ্ট, পেটেণ্ট, প্যাণ্ট, লণ্ঠন, এণ্ড (and), গ্রাণ্ড, ষ্টেশন, ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টকিং; কেননা সংস্কৃতভাষার বিশেষত্ব বশতঃ এ সব স্থলে ষত্ব ণত্ব হয়। ছাপাখানার টাইপও সেইরূপ আছে; ট এর সঙ্গে স, ও ট বা ঠ বা ণ এর সঙ্গে ন্ যুক্ত থাকে না। (উভয়পক্ষেই মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলিয়া সংস্কৃতে ট এর সঙ্গে ষ্, ট বা ঠ বা ড এর সঙ্গে ণ্ যুক্ত হয়।)

উচ্চারণানুযায়ী বাণান। (phonetic spelling)

আজকাল এক সম্প্রদায় লেখক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তার শব্দগুলি যে ভাবে উচ্চারিত হয়, অধিকল সেই মত বাণান গ্রন্থাদিতে চালাইতেছেন। শিশুপাঠ্য রূপকথার বহিতে এরূপ করিলে আপত্তিকর নহে, কেননা সেগুলিতে দিদিমার মুখের কথা ঠিকটি শুনিতেছে, শিশুদিগের মনে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিলে গল্পটা জমে ভাল। কিন্তু গম্ভীর রচনায় পর্য্যন্ত এইরূপ বাণান দেখা যায়। ভগবানের গুণগান করিবার সময়ও কি ভক্তের মুখের ঠিক উচ্চারণটি ফনোগ্রাফের সাহায্যে আদায় করিয়া ছাপার কেতাবে চালাইতে হইবে? গ্যাছে, খাচ্ছে, দেখ্‌ছিলুম, কোর্চ্চো, যাচ্ছি, হয়েছেল, গেলুম, ইত্যাদি ক্রিয়াপদ সদ্‌গ্রন্থে স্থান পাইতেছে। এখনি, কখনো, তাই তো, কোনো, মতো, কালো, প্রভৃতি বাণান করা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইতেছে। মতো কি কলিকাতার উচ্চারণানুগত? আমাদের অঞ্চলে উভয় অকারেরই বিকৃত উচ্চারণ হয়, সেরূপ লিখিতে গেলে 'মোতো' লিখিতে হয়। কিন্তু তাহাতে একটা কদর্য্য শারীরক্রিয়া সাধনের অনুমতি বলিয়া কেহ বুঝিলেই ত চমৎকার! কী, যে কি বস্তু, তাহা সমজদার ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ যুক্তি দেন, বুঝিবার সুবিধার জন্য অর্থভেদে মত (মৎ উচ্চারণ) মতো, কাল (কাল্ উচ্চারণ) কালো, ইত্যাদি বাণান করা সুবিধা। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রভেদজ্ঞানের জন্য বহুশ্রুত পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি?

আসল কথা, ইঁহারা (phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণানের পক্ষপাতী। অবশ্য প্রথম যখন লেখন প্রণালীর সৃষ্টি হয়, তখন এক একটি ধ্বনির দ্যোতক এক একটি অক্ষরের উদ্ভাবন হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাষার পরিণতি (বা অবনতি) ঘটিয়া উচ্চারণে দ্রুততা, জড়ত্ব প্রভৃতি আসিয়া পড়িয়া, সকল স্থলেই উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাসে অল্পবিস্তর প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সেই দোষের সংস্কার সাধন করিয়া আবার নূতন পত্তন করা অসাধ্যসাধন। ইংরাজীতে এই দোষ অত্যন্ত প্রবলরূপে বিদ্যমান। একজন ইংরাজের উচ্চারণ অনুসারে শব্দগুলির বাণান লিখিয়া গেলে কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নমুনা অনেক ইংরাজী হাস্যরসাত্মক পুস্তকে দেওয়া আছে। পাঠকবর্গকে

A Bad Boy's Diary ও A Naughty Girl's Diary পড়িতে অনুরোধ করি। (Phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণানের চেষ্টা বিলাতে একাধিক বার হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে, সুবিধার অছিলায়, এই কদর্য্য বাণান গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। এমন কি, 'একটা নূতন কিছু'র দেশ মার্কিন মুল্লুকেও রাজশক্তির চেষ্টায় পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা চেক ফেরত দিয়াছেন! অথচ ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে যে গলদ আছে তাহার তুলনায় আমাদের ভাষার অক্ষরবিন্যাসপ্রণালী অতি নির্দ্দোষ। (perfect).

(Phonetic spellnig) উচ্চারণানুযায়ী বাণান চালাইতে হইলে কোন্ অঞ্চলের উচ্চারণের আদর্শ ধরিতে হইবে, ইহার মীমাংসা কে করিয়া দিবে? বীরসিংহের ও ময়মনসিংহের উচ্চারণ এক নহে, রঙ্গপুরের (রাজসাহার) ও রামপুরহাটের উচ্চারণ এক নহে, জাহানাবাদের ও মুর্শিদাবাদের উচ্চারণ এক নহে। পাশাপাশি দুইটি জেলার উচ্চারণ এক নহে; জেলার দুই মহকুমার (যথা রাণাঘাট ও মেহেরপুর) উচ্চারণ এক নহে; কলিকাতার ও কলিকাতার আশপাশের উচ্চারণ এক নহে। এমন কি, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কলিকাতার এক পরিবারের উচ্চারণ অন্য পরিবারের উচ্চারণের সঙ্গে অবিকল এক নহে। উচ্চারণবৈষম্য সত্ত্বেও প্রচলিত প্রণালীতে শব্দটি লিখিলে এখন সর্ব্বত্র বুঝিতে পারে; কিন্তু নূতন প্রণালীর বাণান চালাইলে তাহা দুঃসাধ্য হইবে। তাহা ছাড়া, ঠিক কাণে যে ধ্বনিগুলি বাজে তাহা ছাপার অক্ষরে যথাস্বরূপ ব্যক্ত করিতে হইলে (accent) মাত্রা (?) ও কথার টান পর্য্যন্ত বুঝাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। (কলিকাতায় 'বরযাত্র' প্রথম syllable এ accent, আমাদের অঞ্চলে দ্বিতীয় syllable এ); এ সব সূক্ষ্মধ্বনি বুঝাইতে গেলে phonetic spelling এ কুলাইবে না, phonograph এর ব্যবস্থা করিতে হইবে!

কেহ কেহ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন, রাজধানীর উচ্চারণই আদর্শ হওয়া উচিত। এ কথাই না হয় মানিয়া লইলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যেমন রাঢ়ের শব্দ সংগ্রহ করিয়া কোষ ছাপাইতেছেন, সেইরূপ আর কেহ কলিকাতার উচ্চারণের একটা তালিকা করিয়া দিয়া বঙ্গীয় লেখকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন কি?

উচ্চারণানুযায়ী বাণানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি, ইহাতে অনেক স্থলে শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের বিঘ্ন ঘটিবে। একেই ত আমাদের বিকৃত উচ্চারণে

শব্দের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া লওয়া অনেক স্থলে কঠিন, তাহার উপর বাণানে এই রকম বৈরাচার হইলে দুর্গতির একশেষ হইবে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বহুল ব্যবহারে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে, সে গুলির বাণানে পরিবর্ত্তন করিতে [illegible] একটা কেহ মাথা [illegible] দুই একজন মৌলিক লেখক আরম্ভ করিতেছেন। [illegible] বা অনুস্বারানুনাসিকঘটিত ভুলভ্রান্তি [illegible] পড়ে। কিন্তু [illegible] সময়ে। কেহ উচ্চারণ মত [illegible], কেহ প্রাকৃতের [illegible] আরও জটিল করিয়া [illegible] কেহ যা খুসী তাই [illegible] স্থলে শব্দটি কোন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, তাহা লেখক [illegible] বা সে দিকে লেখকের [illegible] অনেক স্থলে তা[illegible] এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

[illegible] বাঁচাইয়া, সকল [illegible] আট ঘাট বাঁধিয়া, [illegible] হইয়া, মত প্রকা[illegible] বাঙ্গালাভাষা [illegible] সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম। [illegible] ও পরামর্শ পাইলে কৃতার্থ হইব। [illegible], সময়ানুসারে [illegible] পারি, সমস্যার [illegible] করিব। এই ক্ষীণ [illegible] কি সিদ্ধান্তেই অরণ্যে রোদন [illegible]

সমাপ্ত

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

[illegible] বাণী মন্দিরের সমর [illegible] সাহিত্যিক সুপরিচিত নলিনীকান্ত [illegible] নলিনীকান্ত জীবনের [illegible] পুত্রশোক [illegible] সহধর্ম্মিণীকে [illegible] স্বজনের [illegible] করিয়া, তাঁহাদিগকে

নলিনীকান্তের

জলসংক্রান্ত ইথাসি [illegible]

[illegible] চলের [illegible] ভাগ [illegible] তাঁহার স্মৃতি [illegible]

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

ইংরেজ কবির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ব্রাউনিং, টেনিসন ও রসেটীর তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস ও সমালোচনা তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। গত কয়েক বৎসর তিনি দর্শন, রাজনীতি-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।—যে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা অপূর্ণ রহিল। সমগ্র জীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফল চিতায় ভস্মসাৎ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন ছোট গল্পের মহাপ্লাবন উপস্থিত। বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বে এমন ছিল না। সেই সময়ে যে দুই এক জন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নলিনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। "সাহিত্যে" তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরাসী গল্পের অনুবাদ "সাহিত্যে"ই প্রথম প্রকাশিত হয়। মনীষী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী—এখন ব্যারিষ্টার—মূল ফরাসী হইতে "ফুলদানী" নামক একটি গল্পের অনুবাদ করেন। উহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। তাহার পর নলিনীই ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বহুদিন সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। যত দূর মনে পড়িতেছে, নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় মোপাঁসার গল্পের অনুবাদ করেন। নলিনী জর্ম্মন কবি হায়েনের বড় ভক্ত ছিলেন। হায়েনের বাঙ্গালা অনুবাদ লইয়াই তিনি প্রথমে "সাহিত্যে"র পাঠকগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

নলিনী "প্রিয়দর্শিকা" নাটিকা ও পীয়ের লোটীর একখানি উপন্যাসের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সাহিত্যে তিনি যে জন্য স্থান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে অল্প। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সাহিত্যের সৌরভ ও গৌরব আছে। হায়! তাঁহার সহিত যে 'সম্ভাবনা' লুপ্ত হইল, তাহা যদি বাস্তবে পরিণত হইত!

সাফল্যের সমাদর 'সম্ভাবনা' ভোগ করিতে পারে না। নলিনীকান্তের সহিত আমাদের যে আশা ভস্মসাৎ হইল, বাহিরে তাহার পরিচয় নাই। তাঁহার নিকট আমরা কতটুকু পাইয়াছি! কিন্তু কত পাইবার আশা করিয়াছিলাম! কল্পনার ঋদ্ধি, ভাষার সমৃদ্ধি, অধ্যয়নের ফল, জীবনের

অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যখন তাঁহাকে মাতৃভাষার সেবার অধিকারী করিয়া তুলিল, ঠিক সেই সময়েই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

নলিনীর জীবনে দেখিয়াছিলাম, 'রসো বৈ সঃ।' সেই রস-স্বরূপের কৃপা ভিন্ন মানুষ কখনও এত সরস হইতে, সরস থাকিতে পারে না। সুখে দুঃখে উদাসীন, সদানন্দ, নলিনীকান্ত বন্ধুমণ্ডলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেন।

সাহিত্যের ভক্ত, সাহিত্যের সাধক, সাহিত্যের উপাসক নলিনী আড়ম্বর-শূন্য, নিরহঙ্কার জীবন যাপন করিয়া, 'দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে' উদ্ভাসিত হইয়া, সগৌরবে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বেও তিনি সজ্ঞানে, প্রশান্তভাবে, সুস্পষ্টস্বরে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বাণী,—"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" বন্ধু! বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইয়া তুমি মাকে ডাকিয়াছিলে। এখানকার মাকে কাঁদাইয়া তুমি সেখানকার মার কাছে চলিয়া গিয়াছ। মা তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

তোমার ও আমার বন্ধু কবি গাহিয়াছিলেন,—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ, কাঁদ,—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

তোমার বিয়োগে এই কবি-বচন আমাদের অন্বর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। হায়!

"দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ"—

ধরার পান্থশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিন্তু যাহারা সেই অতল হৃদয়ের অপার স্নেহের পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এই মর্ম্মান্তিক বিয়োগ-বেদনা কি দুঃসহ! *

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

* বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই শ্রাবণের "বঙ্গমতী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সংগ্রহ।

কাসিমের মুরগী।

ছেলেবেলা থেকেই কাসিমের জানোয়ার ও পাখী পুষিবার খুব সখ্ ছিল। বিধবার একমাত্র পুত্র—কাসিমের আদর যত্নের সীমা ছিল না।

একদিন এক সাঁওতালের নিকট তিনটি ধব্‌ধবে সাদা মুরগী দেখিয়া, কাসিম মুরগী কয়টি কিনিয়া দিবার জন্য তাহার মাকে ধরিল।—মা কিনিয়া দিলেন।

—আবদুল্লা কাসিমের কাকা। স্থানাভাববশতঃ ও বাড়ী অপরিষ্কারের ভয়ে সে কখনও মুরগী পুষিত না। কাসিম সব ঠিকঠাক করিয়া লইল। মুরগী পুষিয়া অবধি কাসিমের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল—মুরগীর দেখা শুনা, খাওয়ান দাওয়ান লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে খেলিয়া আসিয়া কাসিম দেখিল, তাহার একটি মুরগী নাই। বাড়ীর 'আনাচ কানাচ', গাছের ঝোপ ঝাপ, কুয়োর ধার সব খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু মুরগীটি কোথাও পাইল না। অবশেষে বিষণ্ণমনে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কাসিম দেখিল, তাহার কাকা মুরগীটিকে কাটিয়া রাঁধিতেছে। সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল সকাল কাসিমকে শুইতে দেখিয়া তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বল্ বাবা! লক্ষ্মীটি!" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাসিম সব কথা বলিয়া ফেলিল। মা কত বুঝাইলেন, বলিলেন, "আমি ভাল ভাল চারিটা মুরগী কিনিয়া দিব।" কিন্তু কাসিম কহিল, "আমি আর মুরগী পুষিব না।" রাত্রে কিছু না খাইয়া কাসিম শুইয়া রহিল—তাহার ঘুম হইল না।

সকালবেলা ভয়ানক দুর্য্যোগ। কাসিম কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সেই দুর্য্যোগে অবশিষ্ট মুরগী দুইটি লইয়া তাহার এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুকে মুরগী দুইটি দিয়া কাসিম কহিল, "মুরগী দুটি ভাই পুষিস্—যত্ন করিস্ কিন্তু।"

বাড়ী ফিরিয়া সে মাকে সব কথা জানাইয়া কহিল, "মা, কাকা যেন টের না পায়!" কিন্তু আবদুল্লা মুরগী দুটি দেখিতে না পাইয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া কাসিমকে মুরগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাসিম ভয়ে বলিল, "আমি জানি না।"

পরদিন আবদুল্লা রকের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার মেজাজটা বড়ই রুক্ষ ছিল। এমন সময় কাসিমের হিন্দু বন্ধু মুরগী দুইটি লইয়া সেখানে উপস্থিত! আবদুল্লা জিজ্ঞাসা করিল, "কার মুরগী?" বালক কহিল, "কাসিমের।—সে আমার কাছে মুরগী দুটো রেখে এসেছিল—বাবা রাখতে দিলে না।"

আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিলেন। বন্ধুকে ও মুরগী দুইটিকে দেখিয়া কাসিমের প্রাণ উড়িয়া গেল। আবদুল্লা যখন বলিলেন, "এ কি!" তখন কাসিম ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। আবদুল্লা কহিলেন, "আচ্ছা! এখন রেখে দে, আমি দেখ্‌চি!" কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে মুরগী দুইটি লইয়া রাখিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া মুরগী দুইটি আনিতে বলিলেন। কাসিম ভয়ে ভয়ে মুরগী দুইটি আনিয়া কাকার সম্মুখে দাঁড়াইল। আবদুল্লা মুরগী দুইটি লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল, কাসিমও তাহার অনুসরণ করিল।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবদুল্লা একটি মুরগী ছাড়িয়া দিল। মুরগীটি উড়িয়া আসিয়া কাসিমের বুকের উপর পড়িয়া ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিল—কাসিম তাহাকে চাপিয়া ধরিল। "ফের মিথ্যা কথা বল্‌বি, বল!" বলিয়া আবদুল্লা যখন উনানের পাশ হইতে ছুরী তুলিয়া লইল, তখন কাসিম চীৎকার করিতে লাগিল, "মেরো না, কাকা, মেরো না! আমার পোষা মুরগী! তোমার দুটি পায়ে ধরি, মেরো না!" সে চীৎকার আবদুল্লার পাষাণবক্ষ ভেদ করিতে পারিল না—আবদুল্লা মুরগীর গলায় ছুরী বসাইয়া দিল। আবদুল্লা যখন কাসিমের হাত হইতে আর একটি মুরগী লইতে গেল, তখন কাসিম "মা গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

কাসিমের মা তখন কূয়ার ধার হইতে কাপড় কাচিয়া ফিরিতেছিলেন—চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল্লা তাঁহাকে সরাইয়া, কাসিমকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

আবদুল্লা যখন নানা উপায়ে কাসিমের চৈতন্য-উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাসিমের মুরগীটি ঘরের মধ্যে আসিয়া অস্থিরভাবে

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার আর ভয় নাই, সে আবদুল্লার গায়ের উপর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাসিমের হাতে গায়ে পায়ে মাথায় ঠোঁট ঘষিতে লাগিল—তাহার বুকের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান হইলে কাসিম বলিয়া উঠিল, "আমার মুরগী?" মা কহিলেন, "এই যে বাবা এইখানে।" আবদুল্লাও তাড়াতাড়ি মুরগীটিকে কাসিমের হাতের কাছে সরাইয়া দিল। কাসিম মুরগীকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া রহিল।—ভারতী; শ্রাবণ।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। শ্রাবণ।—প্রথমেই স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনা—'গীত-গৌরাঙ্গ'। এবার চতুর্থ স্তবক প্রকাশিত হইয়াছে। তথ্য অল্প, অতিশয়োক্তি অধিক। শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগীর 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী "বিদ্যাপতির লিখনাবলী" নামক সুলিখিত প্রবন্ধে গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী শৈলজা গুপ্তার "বিধবা" নামক কবিতার শেষ স্তবক মন্দ নহে।—

"ধৌত করি বাসনার চিতা আঁখি-জলে,
লভেছ নির্ম্মল শান্তি হৃদয়ের বলে;
আত্মসুখ বলি দিয়া,
ত্যাগী মুক্ত শুদ্ধ হিয়া,
পরের কারণে সদা খুঁজিছ কল্যাণ;
দেবি, তুমি ধরণীতে দেবতার দান।"

শ্রীযুত চারুচন্দ্র চৌধুরী 'শেরপুরের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শেরপুরের নবীন জমীদার তাকিয়া ও তাসের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াছেন, সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী পিতার পুত্রের সাহিত্য-সাধনার সঙ্কল্প দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি—আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবে' কনিষ্ক ও হবিষ্ক প্রভৃতির সর্ব্বজনবিদিত ইতিহাস পড়িলাম। বিক্রমপুরের প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত যে, কনিষ্কের রাজ্য

প্রাচীন পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; আর বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লেখক উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধপ্রভাব বিক্রমপুরে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া, পাল রাজগণের রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত যে উহা বিক্রমপুরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ সকল মূর্ত্তিই তাহার জীবন্ত সাক্ষী।" বলা বাহুল্য, লেখক প্রমাণ-প্রয়োগে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার অবকাশ পান নাই! অথচ ইহাই তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। উদ্ধৃত বাক্য যোগেন্দ্রনাথের রচনা-রীতির 'জীবন্ত' নমুনা,—এ রীতিকে কখনও কি 'নিভন্ত' দেখিব না? "তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকেই অধিকতর প্রবল ছিল" কি বাঙ্গলা? 'ক্ষণিক' যদি আলোকিত হয়, তাহা হইলে ব্যাকরণের ভবিষ্যৎ অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। এক স্থানে লেখক লিখিয়াছেন,—'বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে পারি।' না, আপনি 'প্রমাণ' করিতে পারিবেন না,—হয় 'সপ্রমাণ', নয় 'প্রমাণিত' করুন। কুকুটমিশ্রের মত পল্লবগ্রাহী হইয়া আপাততঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইবার চেষ্টা করিবেন না—কেবল চঞ্চু দ্বারা পরের 'সংগ্রহ' খুঁটিয়া কেহ ভাণ্ডারকর হয় নাই। তাহার পথ স্বতন্ত্র। অগ্রে অনুশীলন, পরে বিতরণ, ইহাই জ্ঞানের আদান-প্রদানের ধারা। সেই সনাতন রীতিকে পল্লবগ্রাহিতা এখনও হত্যা করিতে পারে নাই। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের 'জমীদার' মুদ্রিত না হইলেই আমরা সুখী হইতাম। অন্ততঃ ইহার কিছু কিছু বাদ দিলে শোভন হইত। 'সাময়িক প্রসঙ্গে' শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী 'শিক্ষা-বিস্তারে' শ্রীযুত গোখলের 'শিক্ষা-প্রসার-সম্পর্কীয় আইনে'র আলোচনায় বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।' শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার 'জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে?' প্রবন্ধে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষার জটিলতায় বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে না। কেন না, এই প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থলে 'বাঙ্গলার তেলে ভাজা ইংরিজির ডিশ্।' খাঁটী বাঙ্গালী তাহা হজম করিতে পারিবে না। 'লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা' মন্দ নহে। 'প্রামাণিকের কীর্ত্তি' উল্লেখযোগ্য। 'সম্মিলনে'র মত উৎসাহী স্থানীয় পত্র না থাকিলে, এ সকল কীর্ত্তির কাহিনী এত শীঘ্র শুনিতে পাইতাম না। চিত্রগুলি সুন্দর।

পতাকা। আষাঢ়।—প্রথমে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের 'ঋগ্বেদ'—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্ত মুদ্রিত হইয়াছে। কত দিনে শেষ হইবে, ততদিন 'পতাকা' উড়িবে, পুড়িবে, কি ছিঁড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ নাগের "প্রেতের কাণ্ড ও তাহার বিচার" মন্দ নয়, কিন্তু এক বিন্দু।

প্রজাপতি। শ্রাবণ।—কাগজখানি 'প্রজাপতির পাখ্না',—'ঘট-কচু-ডামণি!' এ যুগে এরূপ পত্রের উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহাতে ঘটকালী-অপেক্ষা সাহিত্যের মাত্রা অধিক। এত অধিক যে, সময়ে সময়ে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার' প্রবন্ধে বিহারী বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তথ্য অপেক্ষা মন্তব্য অধিক। রাও সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'প্রত্যক্ষ অনুভূতি' উল্লেখযোগ্য। সত্যযুগে ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন; কলিযুগে মজিলপুরের রাও সাহেব 'পতিতপাবন'-দ্রষ্টা হইয়া কীর্ত্তনের সুরে গান বাঁধিয়া পতিতপাবনকে thanks দিয়াছেন। হারাণ বাবু গাহিয়াছেন,—

'চুপে চুপে এসে বুকেতে বসে নিলে ভার সমুদায়।'

কিন্তু আমাদের একটু সংশয় হইতেছে,—পতিতপাবন যদি বুকে চাপিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার ভার ত রাও সাহেবকেই বহিতে হয়! হারাণচন্দ্র এই কীর্ত্তনেও তাঁহার আজন্মসিদ্ধ মৌলিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

'চোখে আসে জল, না সেধে পেয়েছি'

একবারে হুবহু সত্য; যাঁহারা সৌভাগ্যসূত্রে কখনও হারাণচন্দ্রের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা সে সুখে বঞ্চিত, তাঁহাদিগকে শুধু লিখিয়া সে 'পান্সে চোখে'র স্বরূপ বুঝাইতে পারিব না।—হারাণ বাবু 'সিংহশিশু হয়ে মিশে' 'মেষপাল' শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন, তাই আক্ষেপ করিয়াছেন। তা দুঃখ করিয়া লাভ কি? 'গতস্য শোচনা নাস্তি!' এবার সিংহ-যূথেই মিশিবেন। রাও সাহেব আবার 'রাজপুত্র আমি' বলিয়া স্পর্দ্ধাও করিয়াছেন! এখন রাজায় ও সিংহে দ্বন্দ্ব না বাধিলেই আমরা বাঁচি। কথায় বলে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'—এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটী হয় নাই। হারাণচন্দ্র স্বাক্ষরের শেষে বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন,—'রাও সাহেব!' জয়, রাও সাহেবের জয়!

সুপ্রভাত। আষাঢ়।—এই সংখ্যার প্রথমে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

ও রাণী মেরীর সুরঞ্জিত চিত্র আছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বৈজ্ঞানিক বিদুষী আচার্য্যা কুরী' প্রবন্ধে তথ্য আছে।—কিন্তু ভাষা কট-মট ও জটিল। নূতন লেখকদিগকে মাতৃভাষার সাধনায় ব্রতী দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু সেই সাধনায় যে প্রয়াস, যে ধৈর্য্য, যে অনুশীলন আবশ্যক, তাহা ত দেখিতে পাই না। দেখাইয়া দিবার লোকও যে অত্যন্ত বিরল। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' সবই শিখিতে হয়, কেবল বাঙ্গালা লেখায় শিক্ষানবীশী অনাবশ্যক। সুরেন্দ্র বাবুর মত লেখকগণ ভাষায় একটু অবহিত হইলে দেশের কত কল্যাণ হয়। শ্রীযুক্ত হীরালাল সেনের 'শান্তি-নিকেতন' আধ্যাত্মিক মোসাহেবী হইতে পারে, কবিতা নহে। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'যাত্রা' রমণীয়।

জাহ্নবী। শ্রাবণ।—ইতিপূর্ব্বে আর একখানি 'জাহ্নবী' ছিল। সম্পাদক 'নাম'টি না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত বিহারীলাল গোস্বামী 'ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে' প্রাকৃত ও সংস্কৃত মিশাইয়া ভাষার 'জগা-খিচুড়ী' প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'গৌড় কাহিনী' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের উৎকর্ষ-সাধন", বোধ হয়, অন্য পত্রে পড়িয়াছি। শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' নামক কবিতাটিও ইতিপূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল। যদি চর্ব্বিত-চর্ব্বণ অর্থাৎ রোমন্থনই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, কাগজখানির নাম 'গাভী' রাখিলেন না কেন?

নব্য-ভারত।—শ্রাবণ। শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেনের 'পশ্চিমের অধিকারবাদ ও পূর্ব্বের ঋণবাদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'আমার চিতায় দিবে মঠ' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। তাঁহার চিতায় মঠ দিব, কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতাগুলিও বাঙ্গালী চিতায় নিক্ষেপ করিবে। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিয়া রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আত্মারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইতেছেন। বঙ্কিমের আত্মা নগেন্দ্র বাবুকে ফনোগ্রাফ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যে ভাষায় নগেন্দ্র-বাবু আত্মা ব্যক্ত করিয়াছেন, সে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের—নহে, ব্রাহ্মসমাজের। বঙ্কিম কি স্বর্গে গিয়া ভাষা ভুলিয়া গেলেন? তাহা ত বিশ্বাস হয় না। সেই হিরণ্ময়ী রাজরাজেশ্বরী ভাষা পারিজাতের দেশে গিয়া ভিখারিণী হইয়াছে, ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে, তাহা

ত কল্পনা করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন বাবুর ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া আবার খোকাকে মত ব্রাহ্ম সমাজের আড়ষ্ট ভাষা মক্স করিতেছেন, ইহা ত আমরা বিশ্বাস দূরে থাকুক,—স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। শ্রীযুত সেবানন্দ রায়ের 'রাজা নবরঙ্গ রায়' সুলিখিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'টাকের জয়' 'অম্ল-মধুর চাট্‌নী, চুট্‌কীর উপর চটক' মন্দ হয় নাই। নেতানরেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কে এক জন প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোপাল ভাঁড়' বলিয়া সুরুচি ও সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন। স্পর্দ্ধা যে এতদূর গগনস্পর্দ্ধিনী হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না! ''নব্য-ভারতে' আমরা এরূপ বেয়াদবী দেখিবার আশা করি নাই।

'নঁ কেবলং যো মহতোপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।'

ভারতী। শ্রাবণ।—'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সারাংশ। গদ্যে রচিত আধ্যাত্মিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এখন অগ্রে ক্রিয়া, তার পর কর্ত্তা নিবিষ্ট করিয়া ভাষার বৈচিত্র সাধন করিতেছেন। কবিবর বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—'আমার সকল কাজেই originality'। ইহাও তাই। শ্রীমতী সরলাবালা মিত্রের 'ইংলণ্ডের ট্রেণিং কলেজ' তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া 'আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগে,—মনবিকার-চর্চ্চার চূড়ান্ত করিয়াছেন। যে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা যুগসন্ধির প্রভাব অতিক্রম করিয়া দুই যুগের বিশ্লেষণ করিতে পারে, আমরা বাধ্য হইয়া সবিনয়ে বলিতেছি,—ঘোষজায়ার সে সংস্থান নাই। স্থানে স্থানে লেখিকার অতিসাহস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নমুনা-স্বরূপ ঘোষজায়ার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।—'আমাদের পিতামহীগণ পতিগৃহের ঘরণী গৃহিণী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইতেন, তাঁহাদের সহিত প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের জীবন মনের (স্বাভাবিক অনুরাগ ও ঘরকন্না ছাড়া) কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হইত না!' বিস্ময়ের চিহ্নটি লেখিকার. আমাদের নহে। এমন আষাঢ়ে, উদ্ভট ও ভুঁইফোঁড় মন্তব্য আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 'স্বাভাবিক' অনুরাগ কি এত তুচ্ছ? 'ঘরকন্না'র সম্বন্ধ কি আপনারা এখন তুলিয়া দিবেন? 'অস্বাভাবিক অনুরাগই যদি এ যুগের Ideal হয়, তাহা হইলে বলিব।,—

'চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহাকে,
ভস্মরাশি করি ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে।'

কিন্তু পাঠক, বসিয়া যান, রকম আছে। শ্রীমতী ঘোষজায়া এই মন্তব্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'নির্ব্বাপিতদীপকক্ষে পত্নী স্বামী-সম্ভাষণে [স্বামিসম্ভাষণে; যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সমাসই করেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত নিয়মগুলি পালন করিবেন না?] গমন করিতেন, এবং দিবাপ্রকাশের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা স্বামীকে চিনিতে পারিতেন না, তখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত যে স্বামীর পরিবর্ত্তে যদি অপর কেহ শয্যাগ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমাদের পরম শুচিশালিনী ['শুচি' বিশেষ্য নহে, বিশেষণ। 'শুচিশালিনী' বিশেষ শুতাব্দীর উদ্ভট ভাষা-বিবর্ত্ত! 'পরমশুচি'তেই কাজ চলিত।] পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা পিতামহীগণ সে প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।' ফুটনোটে ঘোষজায়া জাহির করিয়াছেন,—লেখিকার কোনও পূজনীয়া আত্মীয়া এই 'গূঢ় তত্ত্ব' 'আত্মজীবন হইতেই বলিয়াছিলেন।' সাধু! লেখিকা 'কোনও' পিতামহীর কথা বলিলে আমরা আপত্তি করিতাম না। কিন্তু তাঁহার 'গণে' বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ভদ্র-পরিবার আপত্তি করিবে। 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' অন্য ক্ষেত্রে খাটিতে পারে, সর্ব্বত্র নহে। তাঁহার আত্মীয়া এই বিশাল সমাজ-সিন্ধুর একটি ক্ষুদ্র বিন্দু। বিন্দু দেখিয়া সিন্ধুর স্বরূপ-নির্ণয় কখনও যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। 'পূজনীয়া'র ভাবনাকে বাঙ্গালী দেশের 'পিতামহীগণে' আরোপ করিয়া ঘোষজায়া সমগ্র দেশের মানহানি করিয়াছেন। প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় বটে। আশ্চর্য্য এই যে, 'ভারতী' অনায়াসে এই কুরুচির নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন,—উন্মত্ত-প্রলাপ প্রকাশ করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাসিসের মুরগী' নামক ছোট গল্পটি সুন্দর হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে পীয়ের লোটীর "Death and Pity"র করুণ-রসপূর্ণ রচনাগুলি মনে পড়ে। ইহার আখ্যানবস্তু অবলীলায় গন্তব্য তীর্থে উপনীত হইয়াছে। লেখক তাহাকে ভাষার ঐশ্বর্য্য ও ভাবের আড়ম্বর পাথেয় দিয়া মহাসমারোহে লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ দেন নাই। বিনা আয়াসে করুণরসের স্নিগ্ধধারাটুকু মাতৃস্নেহ-মন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহে মিশিয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পনার চিহ্ন নাই, অস্বাভাবিকতা বা অত্যুক্তির কলঙ্ক নাই। আসারধারা-স্নিগ্ধ

সুধীর কমনীয় সৌন্দর্য্য দিয়া সুধীন্দ্রনাথ মাতা-পুত্রের হৃদয় গড়িয়াছেন কাসিমের কাকা আবদুল্লার কঠোর প্রকৃতির ছায়ায় মাতা-পুত্রের কোমল হৃদয়ের আলো দিব্য ফুটিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে 'সংগ্রহে' গল্পটির সার-সঙ্কলন করিলাম। শ্রীযুত যদুনাথ সরকার 'জাপানের স্নানাগারে' যে বীভৎস ছবি আঁকিয়াছেন, মহিলা-সম্পাদিত মাসিকে তাহার আবির্ভাব দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীযুত অরবিন্দকুমার দত্তের 'বর্ষা-মধ্যাহ্ন' সুখপাঠ্য মিষ্ট কবিতা। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'গুজরাত কৃষক-পল্লিচিত্র' উল্লেখযোগ্য। 'চয়নে'র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি' অনুশীলনযোগ্য। শ্রীযুত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী মোপাঁসার Confession নামক গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটি ইতিপূর্ব্বে একাধিক রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মধুমক্ষিকা ও ফলোৎপত্তি' সুলিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ।

প্রবাসী। শ্রাবণ। 'বলরামের দেহত্যাগ' নামক চিত্রের সাগর, অম্বর ও ভূমি সুন্দর, আর বলরামের মূর্ত্তি-কল্পনায় তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকল্পা-পদ্ধতি'র বিকার নাই। ইহাও আমরা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। মহেশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ' কোন্ গুণে প্রথম স্থান অধিকার করিল, বলিতে পারি না। হিন্দুরা যেমন পত্রারম্ভে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ফাঁদেন, 'প্রবাসী'ও বোধ হয় সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্ম ফাঁদিবার জন্য মহেশ বাবুকে শীর্ষে তুলিয়াছেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা'য় প্রগাঢ় গবেষণার পরিচয় আছে। বাঙ্গালী এই প্রবন্ধ-পাঠে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্তের 'আর্য্য-ভারতের গোগ্রাস ভূমি' সময়োপযোগী সুপ্রবন্ধ। লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—আর্য্যভারতে লোকের মাটীর ক্ষুধা অদ্যকালের মত প্রবল ছিল না। সেকালে লোকেরা গোগ্রাসের ভূমি রক্ষা করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করিতেন না।' এখন আমাদের ক্ষুধা বাড়িয়াছে। আর সেই জঠরানলে আমাদের স্বার্থপরতা ভিন্ন আর সবই ভস্ম হইয়া যাইতেছে। দেশের ভাই এত দুর্দ্দশা। আশা করি, এই প্রবন্ধ-পাঠে দেশবাসীর চক্ষু ফুটিবে। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক বোলপুরের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীযুত আনোয়ার আলীর 'মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী'র সূচনা পড়িয়া আমরা সমাপ্তির জন্য উৎসুক হইয়াছি।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রকাশ্যে 'নিবেদন' করিলেন কেন? ইহাতে ত প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। বাগচী কবির কবিত্ব অদ্ভুত রসের সৌরভে। অত্যুক্তির এমন আতিশয্য ও কবিত্ব-ভানের এমন নির্লজ্জ ন্যাকামী প্রায় দেখা যায় না।—

'সিঁদুরে আম টক্‌টকে লাল,
অস্ত রবির আবির মাখি',
গণ্ডে তোমার লজ্জা পেয়ে
সরম রাখে পাতায় ঢাকি।'

চীনের সিঁদুরের মত টক্‌টকে গণ্ড যেমন—ঠিক সিঁদুরে আম; তার উপর 'টক্‌টকে লাল অস্ত রবির আবির'! একবারে লালে লাল! বোধ হয়, রুজের বদলে মেজেণ্টা লাগিয়া থাকিবে। তাই দেখিয়া সিঁদুরে আম 'পাতায় ঢাকি সরম রাখে।' তা সরম আর রহিল না।—সিঁদুরে আমের উপর বাগচী কবির খোঁচা দেখিয়া 'হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!' মনে পড়িতেছে! হায় কবি! 'তাও ছাপ্‌লালি, কাব্য হলো, নগদ মূল্য'—আর বলিব না। 'প্রবাসীর' অনূদিত ও সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

সৌরভ। শ্রাবণ।—শিশুপাঠ্য সচিত্র মাসিকপত্র। 'জাপানী বালিকাদিগের কথা' মন্দ নহে। 'চন্দ্ররাজ্যের জীব'. উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য' দিবালোকের অযোগ্য। গল্প দুটি শিক্ষাপ্রদ; কিন্তু এ বিষয়ে উন্নতিবিধানের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

শারদ-লক্ষ্মী।

১

হে শারদ-লক্ষ্মী! তুমি পরিপুষ্ট শস্যে ফলে;
সবিতার শুভ দৃষ্টি তোমার নয়নে জ্বলে।
শত স্নেহ-স্বস্তি-ভরা তোমার অনন্ত দান;
সুবর্ণ কদলী-কান্তি, ইক্ষু—রস-পূর্ণ-প্রাণ।
শৈবাল-রঞ্জিত তরু কুটীরের চারি ধারে
পরিণত ফলে নত, শোভিত বলরী-হারে।
দীর্ণ দাড়িম্বের হাসি মদির অরুণ রাগ;—
প্রকাশে করুণা তব কি মমতা, কি সোহাগ!

বাতাবী হয়েছে পুষ্ট ; কাঞ্চন-পুষ্পন-রাশি,
প্রমত্ত মধুপপুঞ্জ ঘেরিয়া গুঞ্জরে আসি'।
ভুলি' তারা মধুচক্রে মধু-সঞ্চয়ের কথা—
বসন্ত যা দিবে ভরি'—আছে চিরন্তন প্রথা।

২

তোমারি ভাণ্ডারে কে না পেয়েছে দর্শন তব ?
মিতাননে কর্ম্মে স্থিত তুমি নিত্য নব নব।
শান্তমনে বসে কভু শস্য-গেহে পূর্ণ করে,
মন্দ মন্দ আন্দোলিত মুক্ত কেশ বায়ুভরে।
কভু অর্দ্ধশায়ী তুমি সীতা-ভূমি-শয্যা 'পরে—
কেতকী-পরাগ-ধূমে তন্দ্রালস-কলেবরে,—
কভু ধীরে ধীরে তুমি আশু-ধান্য-গুচ্ছ-ভার
যতনে বহিয়া শিরে বাহিনী হতেছ পার।
কলস খর্জ্জুর-কাণ্ডে দেছ রজ্জু বদ্ধ করি,
উত্থিত অতল হ'তে ঊর্দ্ধে রস পড়ে ঝরি' !
ঊষালোকে দেবী তুমি ধ্যানমগ্না যোগাসনে ;
শেফালি কুসুমাঞ্জলি ঢালে তব শ্রীচরণে।

৩

আহি এবে বসন্তের চপল ভরম ভাস ;
তোমার হৃদয়ে ভাসে কি এক গভীর গান !
অন্তিম শয়নে রবি, মেঘস্তর ভেদ দেখি ;—
টানে যবে শেষ রশ্মি কেদারে কনক-রেখা,
তখনি করুণ সুর তুলে ঝিল্লী অগণন,
মূর্চ্ছিত মৃণালিনী, মুহ্যমান কানন !
ওঠে পড়ে সে রাগিণী, সমীরে হারায় প্রাণ !
নবনীতনু গাভী হাম্বা-রবে ধাবমান।
ফুল্লকণ্ঠে, ঐক্যতানে বুলবুল মিলে আসি' ;—
দিগন্তে শ্যামার শিস্ ঢালে শ্রান্তি-সুধা-রাশি !
দোহনের মৃদু ধ্বনি কি মধুর—কি কোমল !
তোমার অঞ্চল চুমি' শিহরে ধরণীতল।

৪

এসেছিল সন্ধ্যারাণী, ফিরেছে গোধূলি-বাসে,
সুপ্রসন্ন দশ দিশি, দিগ্বধূর জ্যোৎস্নাহাসে।
ভাসিছে আরতি-ধ্বনি, কি বা শুভ শঙ্খরব!
বঙ্গের শুদ্ধান্তে সতী পূজে পাদপদ্ম তব।
তোমার কিরীট চন্দ্র দীপ্ত নীল নভোভালে;
স্নাত বনরাজি মুগ্ধ আজি তব ইন্দ্রজালে।
শ্যামে নীলে, চক্রবালে এ কি প্রীতি-আলিঙ্গন!
সৌন্দর্য্যে সম্পদে স্বর্গে পরিণত এ ভুবন।
অফুরন্ত সুধাভাণ্ড, উচ্ছলিত—বিগলিত;
বিভোর চকোর—ভক্ত-কবিচিত্ত প্রসাদিত।
প্রাণারাম পৌর্ণমাসী, রাজলক্ষ্মী হৃদাসনে
জেগে থাক্ কোজাগর, চিরানন্দ এ জীবনে।

পিশাচ পুরোহিত। *

সমালোচনা।

আমরা "পিশাচ পুরোহিত" নামক একখানি অদ্ভুত উপন্যাস সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় এক জন "কল্পনাকুশল প্রতিভাবান" ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের আখ্যানবস্তু হইতে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। দীনেন্দ্রবাবু এমন সুকৌশলে "পিশাচ পুরোহিত"কে বাঙ্গলার রূপান্তরিত করিয়াছেন যে তাহাকে নিতান্ত পর মনে হয় না। সচরাচর ইংরেজীর অনুবাদের বিকট 'বোট্‌কা' গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যথিত পীড়িত হয়। ইহাতে তাহার লেশমাত্রনাই। দীনেন্দ্রবাবু অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পুষ্পিত, প্রাঞ্জল, মধুর, সরস রচনা-পদ্ধতি বাঙ্গলা দেশে অনেক লেখকের আদর্শ হইতে পারে। দীনেন্দ্র বাবুর সেই ভাষার ইন্দ্রজালে এই উপন্যাসখানিকে মৌলিক বলিয়া ভ্রম হয়।

---

* পিশাচ পুরোহিত:—শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন করিয়া দীনেন্দ্রকুমারের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদিগের দরবারে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, সকলের প্রিয়। সে ক্ষেত্রে আমি যদি লণ্ঠন ধরিয়া দীনেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে যাই, তাহা হইলে আমিই হাস্যাস্পদ হইব। বলা বাহুল্য, আমার হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা নাই।

"পিশাচ পুরোহিতে"র পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে, আমরা দীনেন্দ্র-বাবুকে সত্যপ্রিয়তার জন্য ধন্যবাদ দিব। এমনই দেশের অবস্থা, এমনই কালের প্রভাব, সাহিত্যে সত্যপ্রিয়তার প্রশংসাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সত্য ও ঋতই যে সাহিত্যের প্রাণ, সেই সাহিত্যেও লেখকগণ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন না! প্রাচীন সাহিত্যে চোর-পঞ্চাশৎ আছে; নব্য সাহিত্যেও 'চোর' কবির আবির্ভাব হইয়াছে। 'কবি'কে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলাম। চোর কবি পরের কবিতা চুরী করিয়া কবিতা লেখেন। চোর গল্পলেখক পরের গল্প চুরী করিয়া গল্প 'রচেন'! চোর ঔপন্যাসিক বড় বড় উপন্যাসের, 'ছায়া নয়, কায়া লইয়া' মৌলিক উপন্যাসের সৃষ্টি করেন! দুই এক জন 'চোরের উপর বাটপাড়ী' করিতেও সঙ্কুচিত হন না! এ অবস্থায় দীনেন্দ্রবাবুকে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের নিকট "পিশাচ পুরোহিতের"র ঋণ স্বীকার করিতে দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি! দীনেন্দ্রবাবু মূল গ্রন্থকারের নাম দিলেন না কেন? নব্য সাহিত্যের ভাবী চোর-পঞ্চাশতে "পিশাচ পুরোহিতে"র নাম থাকিবে না! দুঃখের বিষয় নহে কি?

"পিশাচ পুরোহিত" আমরা একনিশ্বাসে পাঠ করিয়াছি; কয়েক পৃষ্ঠা অগ্রসর হইবার পর বাধ্য হইয়া "পুরোহিতে"র বিস্ময়াবহ জটিল চরিত্রের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়াছি। "পিশাচ পুরোহিত" অদ্ভুত রসে পাঠকের হৃদয় প্লাবিত করে; আর অপ্রত্যাশিত কৌতূহলের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া পাঠকের চিত্তকে বন্দী করিয়া রাখে। শেষ পৃষ্ঠায় উপনীত হইয়া যখন মুক্তিলাভ করা যায়, তখন মনে হয়, পিশাচ পুরোহিত রা অই রেবেকা ও নরেনের চরিত্রে যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমিও বুঝি সেই প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম। আর, রা-তাই নামক সেই মিসরী কুহকীর ইতি-সভ্যতাদীপ্ত, কর্ম্মবিক্ষুব্ধ ইউরোপের দেশে দেশে, খর্জ্জুরতালীবনরাজিত নদরাজ নীলের তীরে তীরে, পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়-কেন্দ্র

অন্ধতমসময় গুপ্ত গর্ভে, প্রাচীন থিব্‌স নগরের রহস্যময় ভগ্নাবশেষে, শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর গভীর দ্বিপ্রহরে চক্রবাল-চুম্বিত-পরিধি বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরে, প্রাচীন মিশরের ভাগ্যবিধাতা আমন দেবের জীর্ণ মন্দিরে, সহস্র সহস্র 'মমী'র নিভৃত চিরবিশ্রামনিকেতনের উগ্রগন্ধ-চর্চ্চিত আগারে বিচরণ করিয়াছি! নীরব নিশীথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরু-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। অর্ণবযানে সমুদ্রতরঙ্গে দুলিয়াছি। ঐন্দ্রজালিক ঔপন্যাসিকের কুহকে প্রাচীন মিশরের রাজা ফারোর রাজসভা দেখিয়াছি। অনিমেষনয়নে অতীত যুগের মিশর রাজধানীর কারু-নৈপুণ্য ও কলা-বৈভব দেখিয়া 'রা' দেবের অনুগৃহীত কুহকী রাজপুরোহিত রা-মিসের নির্ব্বাসনকালে সম্রাট ফারোর রাজধানীর সুপ্রশস্ত সুগঠিত রাজপথে অতীত যুগের বিচিত্র জন-প্রবাহ ও অদ্ভুত যান বহনের বৈচিত্র্য দেখিয়াছি! গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া মনে হইয়াছে, কল্পনার কল্পলোক হইতে কেন এই কঠোর কর্ম্ম-জগতে ফিরিয়া আসিলাম!

স্থানাভাবে আমরা "পিশাচ পুরোহিতে"র আখ্যানবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিলাম না। সমগ্র জগৎ এই বিচিত্র উপন্যাসের কার্য্যক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতীত ও বর্ত্তমানে এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বিস্তৃত। কাশীর 'কৌটার ভিতর কৌটা' কখনও দেখিয়াছেন? এই উপন্যাসেও তেমনই আখ্যানের গর্ভে নূতন আখ্যান! এক বিস্ময়ের কোষে ভাবী শত বিস্ময়ের বীজ! ইহাতে মনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ, বা কোনও নৈতিক, সামাজিক, বা রাজনীতিক সমস্যার বিশ্লেষণ, বা মীমাংসা নাই। ইহা শুধু উপন্যাস। বিচিত্র, অদ্ভুত, রহস্যময় উপন্যাস, সুখপাঠ্য। কৌতূহল ইহার প্রাণ। বিস্ময়ের সৃষ্টি ও আগ্রহের উদ্দীপনাই ইহার একমাত্র অভীষ্ট বলিয়া মনে হয়। অধ্যায়ে অধ্যায়ে নূতন কৌতূহল, নূতন দৃশ্য, নূতন সৃষ্টি। কোরকের মত মুদিত কৌতূহল ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে; ঝরিয়া যায়; কিন্তু যাইবার সময় যে বীজ রাখিয়া যায়, তাহা হইতে আবার নূতন কৌতূহলের উদ্ভব হয়। ইহাই "পিশাচ পুরোহিতে"র বিশেষত্ব! কল্পনার বিচিত্র লীলায় হৃদয় আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হয় বটে, কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও বীভৎস, কুৎসিত আদিরসের ইঙ্গিত নাই। সচরাচর কৌতূহলের উদ্দীপক লঘু সাহিত্যে—ডিটেক্‌টিভের গল্পে যে বীভৎস রসের বন্যা বহে, এ গ্রন্থে সে শ্রেণীর অপচার নাই।

এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর স্তরে স্তরে প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার সহিত আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনা আছে। রা-তাই কুহকী, দূরদর্শী, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি। রা-তাই ভূত ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়। তদুপরি রা তাই কঠোর সমালোচক। সে যখন সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরিকায় নব্য প্রতীচ্য সভ্যতার কমনীয় তনুর ব্যবচ্ছেদ করিতে থাকে, তখন তাহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া থাকা যায় না।

দীনেন্দ্র বাবু ইউরোপের সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে কৌতূহলের কোহিনূর উপহার দিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব না। প্রশংসা করিব না, তাঁহাকে ও বাঙ্গালীর পাঠক-সম্প্রদায়কে অনুযোগ করিব।

দীনেন্দ্রকুমার প্রতিভাশালী। তাঁহার "পল্লীচিত্র" ও "পল্লীবৈচিত্র্য" বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলার পল্লী-শ্রী ও পল্লী-বাসীর প্রকৃতি তিনি যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, এ যুগে আর কেহ তেমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। করুণরসে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর প্রকৃতি লইয়া মৌলিক উপন্যাস লিখিবেন না কেন?

বাঙ্গালীর রুচি যদি বিকৃত না হইত, বাঙ্গালী যদি ঢাকাই মসলিন ছাড়িয়া জমকালো ছিটের আদর না করিত, তাহা হইলে দীনেন্দ্র বাবু মৌলিক রচনায় নিরত থাকিতেন। কিন্তু সাহিত্য শুধু বর্ত্তমানের বস্তু নয়। ভবিষ্যৎ সাগ্রহে দীনেন্দ্র বাবুর পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্যের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দীনেন্দ্র বাবুকে আমরা অনুরোধ করি, এ দেশের মৌলিক পটে তিনি এইরূপ কৌতূহল-চিত্র অঙ্কিত করুন। বিদেশ হইতে রত্নচয়ন নিঃস্ব সাহিত্যের পক্ষে আবশ্যক বটে, কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের প্রতিভা তাহার মূল্য হইতে পারে না।

চিত্র-পরিচয়।

ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর ডব্লিউ গড্‌ওয়ার্ডের "চিরন্তন কাহিনী" নামক চিত্রখানির ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। "চিরন্তন কাহিনী" আপনিই আপনাকে ব্যক্ত করিবে।

শ্রীযুত আর্থার হ্যাকার 'হোরা'র মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছেন। 'হোরা' কালের ক্ষুদ্র সমষ্টি। এক ঘণ্টা পরিমিত কালচক্র 'হোরা' বলে। কবি-চিত্রকর আঁকিয়াছেন,—হোরা মরিতেছে, কালের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, অতীতে মিশিতেছে। আবার বর্ত্তমান আসিতেছে। হোরা যাইতেছে, হোরা আসিতেছে। অনন্ত কালপ্রবাহে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। নিপুণ চিত্রকর পটে কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপাসিকা।

Blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press.*

মুস্কিল-আসান্

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বন্যার প্রকোপে জিলার কতকগুলি গ্রাম ভয়ানক জলপ্লাবিত হইয়াছিল, এবং অনেক জীবজন্তু এবং মনুষ্যবর্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। স্থানটি সরকারী খাসমহল। প্রজাগণের কষ্টে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর, নিধিরাম গুপ্ত কানুনগোই মহাশয়কে অভিসাবধানে তদন্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। নিধিরাম বাবু যদিও স্থলপথে তদন্ত সম্বন্ধে অতিশয় দড়, কিন্তু জলপথকে তিনি বাল্যাবধি ভয় করিতেন। কারণ,—

১। তাঁহার সন্তরণ জানা ছিল না।

২। একবার জলে ডুবিয়া বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

৩। অল্পতেই তাঁহার সর্দ্দি লাগিত। অগ্নিমান্দ্য রোগও বিলক্ষণ ছিল।

পরওয়ানা-হস্তে ত্রস্ত কানুনগোই মহাশয় তৎক্ষণাৎ আমাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমরা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার সহিত গন্তব্য গ্রামে নৌকারোহণে যাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—'আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া থাকিবেন; আমরা লোক জন সাক্ষী-সাবুৎ সকলই সংগ্রহ করিয়া দিব।' ইত্যাকারে, সাহসে ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া আমরা তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া আসিলাম, এবং যথাযোগ্য ভৈষজপত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যুষেই যাত্রা স্থির করিলাম।

প্রাতঃকাল। নিধিরাম বাবু ফ্ল্যানেলের কমফর্টার (গলাবন্ধ), রবারের জুতা প্রভৃতি পরিধানপূর্ব্বক নৌকার মধ্যে উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে দুই এক জন শিক্ষিত বন্ধু পোর্টম্যাণ্টো সমভিব্যাহারে সহর হইতে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহারা আগ্রহসহকারে আমাদিগের সহিত গ্রামপরিদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। যদিও শ্রাবণ মাস, কিন্তু নৌকাখানি খুব বড়, এবং বিপদ্-আপদ-নিবারণার্থ সঙ্গে একখানি ছোট ডিঙ্গা ছিল। চারি জন মাঝি ও দুই জন ভৃত্য। সন্ধান পাইয়া নিধিরাম বাবুর কুকুর 'টেবি' ও বিড়াল 'পুসি' নদীতটে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল!

উদ্রেক-করণার্থ সাবধানে তৈল-মর্দ্দন ও তামাকু-সেবনে রত হইলেন। মাঝিগণ ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে লাগিল। ভৃত্যগণ বাটনা বাটিতেছিল, এবং বিড়াল, কুকুর ও ছাগল সস্নেহদৃষ্টিতে আমার প্রত্যেক কার্য্যের অনুমোদন করিতেছিল।

এইরূপে কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। কারণ, সেখানে জল দুই হাতের অধিক নয়। মাঝিগণ কহিল, আমরা খাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি; আর নৌকা চলিবে না। নলিনী মাষ্টার কহিল, ঠিক খালের মুখে নৌকা রাখ; নচেৎ জল কমিয়া গেলে জীবজন্তু সমেত আমাদিগের নৌকা ন্যূহের (Noah's Ark) বিরাট তরীর ন্যায় আরারাট্-শৃঙ্গে বাধিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে মাষ্টারের সহিত তর্কযুদ্ধে গুরুচরণ ও রাধাচরণ পরাস্ত হইল দেখিয়া আমরা সকলেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। মাঝিগণ নৌকা নঙ্গর করিয়া ডিঙ্গা পশ্চাতে বাঁধিয়া দিল। খালে বিলক্ষণ স্রোত ছিল। গ্রাম অতি সন্নিহিত। কোনও কোনও গৃহ অর্দ্ধমগ্ন; কতগুলি সম্পূর্ণ জলসাৎ; এবং কতিপয় গৃহ তখনও দণ্ডায়মান। একটা প্রকাণ্ড আটচালার মাথা দূরে দৃষ্ট হইতেছিল। তাহা এক জন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার বাটী। নাম নরহরি গোপ। খাস মহলে তাঁহার প্রায় দুই সহস্র বিঘা জমী ছিল, সদাব্রত ছিল, এবং অনেক গোধন ছিল।

কানুনগোই মহাশয়ের সহিত নরহরির বহুকাল আলাপ। নূতন বন্দোবস্তে, জলডুবি ও ভাঙ্গন প্রভৃতির খাজনা-মাফে, সীমানা-বিবাদে, নানাবিধ প্রকারে নিধিরাম বাবু তাহাকে সাহায্য করিতেন, এবং সেও নিধিরাম বাবুকে সাহায্য করিত। নরহরির বাটীতেই তদন্তের কাছারী স্থির হইল। কেবল সেখানে কোনও প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিলে হয়।

কেহ বলিল, 'কলাগাছ বাঁধিয়া ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত।' মোক্তার মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলেন না। মাঝি কহিল, 'অতি কম জল, হাঁটিয়া গেলে অর্দ্ধ ঘণ্টায় আটচালায় পঁহুছান যাইতে পারে।' নরহরি বাবু কহিলেন, 'পা ভিজিয়া সর্দ্দি হইবে।' মাষ্টার বলিল, 'আপনি পোর্টম্যাণ্টোর উপর বসিয়া থাকুন; আমরা ঠেলিয়া লইয়া যাই।' কথাটা সকলেরই মনঃপূত হওয়াতে আমিও পুনর্ব্বার তাহাই প্রস্তাব করিলাম। নিধিরাম বাবু এই রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন;—'কিন্তু প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হানি কি?' আমার রন্ধনাদি শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরীক্ষা করিয়া সকলে খাইতে বসিব, এই স্থির করিয়া, ডিঙ্গীর উপর খিচুড়ী ও ব্যঞ্জনাদি কদলীপত্রে ঢাকিয়া আমি পোর্টম্যাণ্টো মাথায় করিলাম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই আমার সুহৃত্ নৌকা হইতে জলে অবতীর্ণ হইলেন; কেবল কুকুর, বিড়াল ও ছাগল নৌকায় থাকিয়া গেল।

পোর্টম্যাণ্টো জলে ভাসাইয়া তদুপরি কানুনগোই মহাশয়কে আমরা সাবধানে বসাইলাম। নলিনী বাবু বুঝাইয়া দিলেন, যদি ভাসমান পদার্থের আয়তনের সমান জলের ওজন, সেই পদার্থের ওজন ও আরোহীর ওজনের সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, তবে পোর্টম্যাণ্টো নিশ্চয় ভাসিবে। এটা আর্কিমিডিস নামক বিখ্যাত পণ্ডিতের বচন। বচনটি যে সত্য, তাহা চট্ করিয়া সপ্রমাণ হইল, এবং কানুনগোই মহাশয় ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈববিপাক কোনও আইনের অধীন নয়; সেই পুরাতন বচনানুসারে কানুনগোই মহাশয় আবার তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া গেলেন! কারণ, তাঁহার সম্মুখের ভাগ পশ্চাৎ অপেক্ষা ভারি ছিল, এটা প্রথমে হিসাবের মধ্যে পাওয়া হয় নাই। আমরা ব্যস্ততা-সহকারে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সিক্ত, ত্যক্ত ও সন্তপ্ত নিধিরাম বাবুকে জল হইতে উত্তোলন করিতেছি, এমন সময় ঘোর রবে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নরহরি বাবু বলিলেন, শীঘ্র দেখ, কোনও বিপদ নহিলে আমার টেবি কখনও ডাকিত না।

৩

চাহিয়া দেখিলাম, সর্ব্বনাশ! ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানি পরলোকগামী জীবাত্মার ন্যায় খালের খরতর স্রোতে নদীর অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে! আরোহী,—একমাত্র সেই নপুংসক ছাগল! অনুমান করিয়া দেখা গেল যে, আমাদিগের অনুপস্থিতিকালে সে কদলীপত্রে লুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া নৌকা হইতে অবলীলাক্রমে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ডিঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অধুনা সেই কদলীপত্র ও তদাচ্ছাদিত অন্নব্যঞ্জনাদির অধিকারী সেই ছাগল। দুর্গম পথে তাহারা চলিয়া যাইতেছে, কাহার সাধ্য ফিরাইয়া আনে? নৌকা বাহিয়া তাহাদিগকে ধরা অসম্ভব। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহই বিশেষরূপ সন্তরণপটু নহেন। মাঝিগণ অগ্রসর হইতে চাহিল না। 'জল বাড়িতেছে, আমরা না থাকিলে নৌকা ভাসিয়া যাইবে।' ঠিক তাহাই। প্রায় দুই হস্ত জল বাড়িয়াছে, খাল স্ফীতকলেবর; আমাদিগের ওষ্ঠ শুষ্ক, কলেবর ঘর্ম্মাক্ত। পঞ্চদশ

ক্ষুধার্ত্ত পুরুষের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, জলমগ্ন হইবার আতঙ্ক। কানুনগোই মহাশয় সিক্তবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকার উপর বালিসে ঠেশ্ দিয়া নানাবিধ দুর্ভাবনাপূর্ণ কল্পনার সহিত দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। গুরুচরণ সেন অশ্রুপূর্ণনেত্রে বহুদূরে ক্ষুদ্রমক্ষিকার ন্যায় দৃশ্যমান ডিঙ্গাখানির দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 'যাও বৎস! (নপুংসক ছাগলের প্রতি) যে পিতার ক্রোড় হইতে আসিয়াছিলে, সেখানে যাও।'

মোক্তার মহাশয় দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, 'এই প্রকার বহু জীবজন্তু ও মনুষ্যবর্গ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে. কাহারও স্ত্রী, কাহারও শিশুসন্তান। না জানি, কত শোক তাহারা পাইয়াছে। আপনার একটা ছাগল গিয়াছে বই ত নয়। আপনি অধীর হইবেন না'।

যদিও কথাটা সত্য, এবং সান্ত্বনা ও প্রবোধ সময়োপযোগী ও শাস্ত্রসঙ্গত, তথাপি কথাটা ঢাকিয়া নলিনীকান্ত গুহ বলিলেন, 'রাধাচরণ, তোমার বোধ হয় পৃথিবীর গোলত্বের সম্বন্ধে প্রথম প্রমাণটি মনে আছে? ঐ যে ক্ষুদ্র ডিঙ্গা, যত দূরে যাইবে, ততই ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকিবে।'

চাপরাসী প্রাণেশ্বর গোপ বলিল, 'হুজুর! সেটা ঠিক। আর যদি ডিঙ্গা নদীতে না গিয়া বিলের মধ্যে পড়ে, তবে ঘুরিয়া নরহরি গোপের বাড়ীতেই আসিবে। তাহার কারণ, খালের বামভাগে বিল; সেটার জল গভীর স্রোতের দিকে; খালের মুখে জল কম। এমন কি, নদী হইতে জল, বিলে আসিতেছে। গত বৎসর আমাদিগের নৌকা এই খালে ভাসিয়া বিলে পড়িয়াছিল।

আমরা সকলে যোড়হস্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, ডিঙ্গা যেন বিলে আসিয়া, এবং বিল হইতে নরহরি গোপের বাটীতে আসিয়া আমাদিগের সাধু উদ্দেশ্যের পরিপোষণ করিতে থাকে।'

এই সকল বিপাকে বেলা তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মাঝিদিগের জলপান দ্বারা সকলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলাম। রাঁধিবার সময় ছিল না। জল বাড়িয়া বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল। আমরা নির্ব্বিবাদে নৌকা বাহিয়া নরহরির বাটীতে প্রায় সূর্য্যাস্তের সময় পঁহুছিলাম। প্রাণেশ্বর চাপরাসী প্রফুল্লমুখে নরহরি মণ্ডলের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ে একই জাতি। জনরব এই যে, নরহরির কন্যাকে দেখিয়া প্রাণেশ্বরের হৃদয়ে বৈধ ও পবিত্র প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রাণেশ্বরের বয়স বাইশ।

মালতী দশ বৎসরের মেয়ে। মাথায় খোঁপা ও গলায় সুবর্ণজড়িত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটের মালা। কালো বটে, কিন্তু খুব ডাগর চক্ষু, অতিশয় গহন অন্ধকারেও বিড়ালের মত দেখিতে পায়। এ পর্য্যন্ত মালতীর ভয়ে গোপরাজের গৃহে চোর আসিতে পারে নাই। উভয়ের বিবাহ-সম্ভাবনা গ্রামের সকলেরই মনে জাগরূক হইয়াছিল; কারণ, প্রাণেশ্বর নরহরির বাটীতে জামাতার ন্যায় সমাদৃত হইত।

নিধিরামবাবুর জন্য খট্টাঙ্গ প্রভৃতির যোগাড় হইল। আমরা সতরঞ্চি ও গালিচা পাতিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গেলাম। সুচারুরূপে আলাপন, কই মৎস্যের ঝোল, ক্ষীর ও ছানার যোগাড় হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে অবসন্ন শরীর প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

আমরা সমস্ত দিনের ক্ষুধাকে সংহার করিয়া, তৎপর দিনের ভবিষ্যতের যোগাড়ও কিঞ্চিৎ করিয়া রাখিলাম।

আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে তামাকু সেবন করিতেছি। অধ্যাপক নলিনীবাবু বাঁশের হিসাব করিতেছেন, রাধাচরণ তাহার মানসিক গণিতের সাহায্যে কসিয়া ফেলিতেছে। কানুনগোই মহাশয়ের নাসিকা ধ্বনি—

"অতিশয় বিজন এ ঠাঁই'

ভেদ করিয়া অধ্যাপক হেলম্‌হোলথ্‌জের শব্দ-তরঙ্গের আইনানুসারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত, এবং ক্রমশঃ ব্যাপ্ত। কুকুর খট্টাঙ্গের নিম্নে সুপ্ত হইয়া প্রভুর নাস-মন্ত্রে তাহার নাসিকার ক্ষুদ্র সুর মিলাইতেছিল। বিড়াল গলবিদ্ধ কই মৎস্যের একটা ক্ষুদ্র কণ্টকের সহিত রণে পরাজিত হইয়া বাঁশের ঝোপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার রব করিতেছিল। মোক্তার মহাশয় নূতন ফৌজদারী মোকদ্দমার সম্ভাবনা সম্বন্ধে গ্রামের জনকয়েক জেরা করিতেছিলেন। আমি শুনিতেছিলাম। রাত্রি তখন আটটা।

এত বড় বন্যা হইয়া গেল, কাহারও জিনিসপত্র চুরি কাহারও সহিত কাহারও দাঙ্গা হয় নাই? কাহারও স্ত্রীলোক পুরুষ অপহরণ করে নাই? কোনও ক্ষেত্রের সীমা লইয়া বিবাদ কি বিড়ম্বনা! কি অধর্ম্ম!

এমন সময় এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলমান প্রদীপহস্তে, ছোট কাঠের বাক্স লইয়া উপস্থিত। সে 'দোয়া' দিতে লাগিল ইনি 'মুশ্‌কিল আসান্'।

নদীতীর।

Indian Art School, Calcutta.

আবোচরণ। লোকটা দর্শন শাস্ত্রজ্ঞানে।

নলিনী বলিল, 'আচ্ছা, "কলেন থিরিটায়তে"—আপনি ইহাদিগকে নরক দেখুন।'

আমরা সকলেই চারিটি করিয়া পয়সা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম। তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। নলিনী-মুষ্টার বলিল, 'তেল্‌কি আমরা অনেক দেখিয়াছি।' কিন্তু বৃদ্ধ পুনরায় ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বলিল, তেলকি চিজ নাই; আপনাদিগের মুশকিল্ একই উপায়ে আসান্ হইয়া যাইবে। যাঁহারা আজ মুন্সিফে পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রাতঃকালেই ইহার ফল দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা যশ, মান ও ধনের প্রার্থী, তাঁহারাও দেশে ফিরিয়া গিয়া সেই ফল-দ্বারাই বাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে চাপরাসী প্রাঙ্গণের গোপ আসিয়া ছুটিয়াছিল। তাহার ওষ্ঠ, চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মুশ্‌কিল্ আসানে প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। ক্রমে বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূরে চলিয়া গেল। বোধ হয়, সেও মুশ্‌কিলে পড়িয়াছিল; নচেৎ এতদূরভাবে আনাগোনার চেষ্টা করিবার কোন বিশেষ কারণ ছিল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। একে পল্লীগ্রাম, তাহার উপর জলাকীর্ণ, প্রজাগণ সুখদুঃখের কথা কহিয়া চলিয়া গিয়াছে। নরহরি মণ্ডল গ্রামের মহাজন, প্রজাগণের সঞ্চিত ধন কিংবা ধার কর্জ্জের ব্যাপার সকলই তাঁহার হাতে। ইচ্ছা করিলে তিনি বন্যাপ্রপীড়িত প্রায় এক গণ্ড প্রজার দুঃখমোচন নিমেষের মধ্যেই করিতে পারেন। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা গত বৎসর কেবল সুদেই তাঁহার লাভ হইয়াছিল, এবং অভ্যেতি ঐ প্রজাগণের নিকট তাঁহার পাওনা। প্রথমটা দান করিতে বিভীষণটা ছাড়িয়া দিলে কি প্রজার আর কোন কষ্ট থাকে? যাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা বাস্তবিক কেহ মরে নাই। পুনরায় গোরু ও শীর্ণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া অদ্য গ্রামে আসিয়াছে। ঘর বাড়া ত কেবল চাউল ও টাকার দরকার। কল্য প্রত্যুষে আসিয়া দরবার করিবে নরহরি গোপের নিকট কান্নাকাটী করিবে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই চাপ দিলেই প্রজাগণ বাঁচে। কেবল কানুনগোই মহাশয় ও প্রাণেশ্বর চাপরাসীর উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। চাপরাসী অনেক টাকা চাহে।

দুঃখী প্রজাগণ কোথায় পাইবে? কানুনগোই মহাশয় নরহরির বাধ্য; তিনি কি প্রজাগণের দিকে করুণ-নয়নে চাহিবেন? ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া তিনিই টাকা লন, জরিমানা করেন, সরকারী কর্ম্মচারিগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত চাঁদা আদায় করেন। সেই জন্য বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রায় আদালতে যায় না। রতিকান্ত মোক্তার বলেন, 'কি ভয়ানক! ব্যাটা আমাদের অন্ন মারিতেছে।'

নরহরির অভাব কিসে? কেবল একমাত্র কন্যা মালতী। বিবাহ দিলেই চুকিয়া গেল। তাঁহার ধন রক্ষা করিবে কে? গ্রামের সন্নিকটেই দুর্দ্দান্ত দস্যু কালী মাঝি বাস করে।

প্রজাগণের এইরূপ জল্পনা সকল স্মরণ করিতে করিতে আমার নয়নে নিদ্রা আসিতেছিল।

৫

তখন 'চোর!' 'ডাকাত!' 'সর্ব্বনাশ!' তোমরা সকলে এস!' এইরূপ শব্দ সকল খিড়কীর দিক্ হইতে উত্থিত হইল। ঘন অন্ধকার। চতুর্দ্দিকে জল, কেবল ভেকগণের নিনাদ। তন্মধ্যে একবার কুকুর ও একটা বিড়ালের ধ্বনিও শুনিলাম। ডাকিতেছিল, টেবি ও পুসি। একটা ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমি একখানা লাঠী লইয়া সর্দ্দারদিগকে লইয়া ঘাটের দিকে চলিলাম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ৬, ৭, ৮ ও ৯নং সকলেই আমার পশ্চাতে। কেবল কানুনগোই মহাশয় ডাকাতীর রব শুনিয়া একটা কদম্ববৃক্ষ বাহিয়া চালে উঠিয়াছিলেন।

প্রাণেশ্বর গোপের তখনও দেখা নাই। নরহরি গোপ ও তাহার দুই জন ভৃত্য আমাদিগের সহিত যোগদান করিল।

যদিও সূচীভেদ্য অন্ধকার, তথাপি বোধ হইল, কিনারায় বসিয়া চারি জন দস্যু ক্রমাগত দাঁড় টানিতেছে। মালতী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, 'সর্ব্বনাশ! আমার যত গহনা ও আমাদের সিন্দুকের টাকা সব গিয়াছে।'

তখন প্রাণেশ্বর গোপ দৌড়িয়া আসিল। তাহার নিশ্বাসরুদ্ধ-প্রায় ও দেহ ভয়ানক ঘর্ম্মাক্ত। সে বলিল, 'আমারও সব গিয়াছে। আমি গোয়াল-ঘরের কাছে যে ৫০০৲ টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম,—সব লইয়া গিয়াছে।'

নরহরি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল, 'এখন জলের মধ্যে উহাদিগকে ধরে কে? দেখিতে দেখিতে উহারা বিল পার হইয়া যাইবে।'

মালতী বাধা দিয়া কহিল, 'না বাবা, ডিঙ্গা এক যায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে।' আমরা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম, সেটা ঠিক; চারি জনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও ডিঙ্গা নিশ্চল! কি আশ্চর্য্য! বোধ হয়, কোনও জলমগ্ন গাছ পালায় বাধিয়া গিয়াছে।

নরহরি। মালতী, ভাল করিয়া দেখ্ ত,—কয় জন লোক?'

মালতীর দৃষ্টি অন্ধকারে অসাধারণ। সে বলিল, 'পাঁচ জন লোক ও' একটা ছাগল। চারি জন দাঁড়ে ও এক জন হালে। দাঁড়ে যে বসিয়া, সে কালী মাঝির মত।'

আমি বলিলাম, 'সেটাও ঠিক। এটা আমাদিগেরই ডিঙ্গা; ছাগলটি গুরুচরণের। কি ভয়ানক! আমরা ডাকাত্ মাঝির হাতে পড়িয়াছিলাম! প্রাণেশ্বর। 'ওরা কালী মাঝির দলের লোক, পূর্ব্বে জানিতাম না। উহাদিগের নৌকায় আসাই অন্যায় হইয়াছে।'

এখন উপায়? সকলেরই বুদ্ধি বিপদে পড়িয়া প্রখর হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু মালতীর বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কাজে লাগিল, তার পর নলিনী মাষ্টারের।—মালতী বলিল, 'তীর ধনুক আনিয়া উহাদিগের দিকে ছোড়।' মাষ্টার বলিলেন, 'যদি জলে পড়িয়া সাঁতার দেয়, তবে ঘূর্ণী জাল ফেল্। প্রথমে তীর ধনুক দিয়া নৌকা হইতে তাড়াইয়া দাও, তার পর আমরা গিয়া ডিঙ্গা অধিকার করিব।'

বাটীতে অনেক তীর ধনুক ছিল। বন্দুকের পাশ না থাকাতে গোপবংশ ত্রেতাযুগের ন্যায় শরাসনের—আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিত। চারিটা ঘূর্ণী জাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোটাকতক সাঁওতালী তীর ছুঁড়িতেই দস্যুগণ জলে লাফাইয়া পড়িল। গুরুচরণ ও রাধাচরণ তাহাদিকে ক্রমাগত শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া নৌকা হইতে বিশ হস্ত দূরে তাড়াইয়া দিল। ক্রমে ভৃত্যগণ জালহস্তে ডিঙ্গার দিকে গেল, এবং ডিঙ্গায় চড়িয়া দেখিল, খাজনার বাক্স বর্ত্তমান, এবং নপুংসক ছাগল তাহার উপর বসিয়া আমাদিগের বীরত্বের অনুমোদন করিতেছে। সে গুরুচরণকে দেখিয়া স্নেহভরে ডাকিয়া উঠিল,—'ব্যা! ব্যা!'

নলিনী মাষ্টার গুরুচরণ ও রাধাচরণের সহিত অতিকষ্টে সাঁতার দিয়া

করিতে লাগিল। স্বয়ং কানুনগো মহাশয় পীরকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দস্যুগণকে থানায় রওনা করিয়া আমরা প্রজাগণকে আহ্বান করিলাম। নিমেষের মধ্যে তাহাদিগের সাহায্যার্থ পাঁচ হাজার টাকার তোড়া গোপরাজ গণিয়া দিলেন, এবং প্রাণেশ্বরের সহিত মালতীর বিবাহ হইলে সুদ ছাড়িয়া দিবেন, তাহাও অঙ্গীকার করিলেন।

মুশ্‌কিল এই প্রকারেই যে আসান হইল, তাহা নহে। পুলিস-তদন্তে ঘটনাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গেল, এবং সেখান হইতে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরিত হইল। তৎপরে ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা এই,—

১। কানুনগোই নিধিরাম—সব্‌ডিপুটী হইলেন।

২। আমি—বিধুভূষণ—দারোগার পদ প্রাপ্ত হইলাম।

৩। প্রাণেশ্বর ও মালতীর—বিবাহ হইয়া গেল। প্রাণেশ্বর নায়েব নাজীরের পদ পাইল।

৪। নলিনীবাবু—হেডমাষ্টার হইলেন।

৫। মোক্তার মহাশয় খাসমহলের প্রজাগণের মামলা মোকদ্দমা পাইলেন।

৬। গুরুচরণ ও রাধাচরণ—উভয়ে ধনুর্ব্বাণ ও জালের সাহায্যে বীরোচিত ব্যবহার, ও 'ফুটবল ম্যাচে'র অসাধারণ ক্ষমতা-প্রদর্শনের নিমিত্ত সুবর্ণপদক উপহার প্রাপ্ত হইলেন।

৭। টেবি কুকুর ও পুসি বিড়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেমপাত্র হইল।

৮। কেবল নপুংসক ছাগ গুরুচরণেরই রহিয়া গেল। কিন্তু পরে সে তাহাকে মুশ্‌কিল-আসানের দরগায় ন্যস্ত করিয়াছিল! 'ইহাতে তাহার সদ্গতি হইবে।'

চন্দ্রালোকে।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

মারিয়াঁ।—একজন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দীর্ঘকায়, কৃশ, ধর্ম্মোন্মত্ত, সর্ব্বদাই পারমার্থিক ভাবে ভোর ও ঋজুস্বভাব। তাঁহার সমস্ত মত বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ, তাহার একটু নড় চড় হইবার যো নাই। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস,—তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়—সমস্তই তিনি অবগত হইয়াছেন।

যখন তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মঠ-গির্জ্জার শুঁড়ি-পথে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পায়চারি করিতেন, তখন কখন কখন তাঁহার মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইত:—"ঈশ্বর উহাকে কেন এমন করিয়া সৃষ্টি করিলেন?" তিনি মনে মনে আপনাকে ঈশ্বরের স্থানে স্থাপন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, প্রায়ই উত্তর পাইতেন। বিনম্রচিত্তে তিনি কখনই এ কথা বলিতেন না:—"প্রভু, তোমার অভিপ্রায় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।" তিনি বলিতেন:—"যে হেতু আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই বুঝিতে পারিব; বুঝিতে যদিও না পারি, অন্ততঃ অনুমান করিতে পারিব।"

তাঁহার মনে হইত, জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটা অকাট্য যুক্তি আছে। তাঁহার বিশ্বাস, সমস্ত "কেন" ও সমস্ত "যেহেতু"র ওজন তৌলদণ্ডে সব সময়েই সমান থাকে। জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্যই উষার সৃষ্টি; শস্যকে পাকাইবার জন্যই দিনের সৃষ্টি; শস্যে জলসেক করিবার জন্যই বৃষ্টির সৃষ্টি; নিদ্রার পূর্ব্বায়োজনের জন্যই সন্ধ্যার সৃষ্টি; নিদ্রা যাইবার জন্যই রজনীর সৃষ্টি, এবং কৃষিকার্য্যের জন্যই চারি ঋতুর সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর মনে এরূপ সংশয় কখনই আসিত না যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নাই; অথবা পদার্থমাত্রই, কেবল কাল বিশেষের প্রয়োজনে, জলবায়ুর প্রয়োজনে, প্রকৃতির দারুণ প্রয়োজনে স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীর আর একটি বিশেষত্ব, তিনি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিতেন, অজ্ঞাতসারে ঘৃণা করিতেন। স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

তিনি যিশুখৃষ্টের এই বাক্যটি সর্ব্বদাই আবৃত্তি করিতেন:—"রমণি,

এমন কি জিনিস আছে, যাহা তোমার আমার মধ্যে সমান?" অধিকন্তু তিনি বলিতেন,—"মনে হয়, ঈশ্বর তাঁহার এই রচনাটির সম্বন্ধে নিজেই অসন্তুষ্ট।" তাঁহার মতে, কবিরা যে কন্দর্প শিক্তটির বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা রমণী শতগুণে অপবিত্র। পূর্ব্বে রমণীই ত আদি-মানবকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল; এখনও রমণী ঐ সকল পাপ কার্য্যে নিরতা। রমণী দুর্ব্বলচিত্ত, রমণী সকল বিপদের মূল, রমণী গূঢ়ভাবে মানুষের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। রমণীর পাপদেহ অপেক্ষা রমণীর প্রেম-প্রবণ আত্মাকে তিনি আরও অধিক ঘৃণা করিতেন।

অনেক সময় তিনি রমণীর ভালবাসা পাইয়াছেন, ভালবাসা অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জানিতেন, তিনি নিজে দুর্দ্ধর্ষ। কেবল রমণীর হৃদয়ের এই প্রেম-প্রবণতাই তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত।

তাঁহার মতে, মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ও পরীক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। রমণীর নিকট যাইতে হইলে আটঘাট বাঁধিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, না জানি কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে!

কেবল মঠের সন্ন্যাসিনীদিগের উপর তাঁহার একটু অনুকূল দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদিগকে তিনি নিরীহ মনে করিতেন, কেন না তাঁহারা ব্রতধারিণী। তথাপি তাঁহাদের প্রতিও কখন কখন কঠোর ব্যবহার করিতে বিরত হইতেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন, তপশ্চর্য্যার দ্বারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইলেও, তাহাদের অন্তরে প্রেম-প্রবণতা চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তিনি যে এক জন সন্ন্যাসিমাত্র, তবু তিনিও কখন কখন উহাদের এই প্রেম-প্রবণতার পরিচয় পাইতেন। সন্ন্যাসি-জনের দৃষ্টি অপেক্ষা যাহা একটু বেশী মাত্রায় করুণার্দ্র, সেই করুণার্দ্র দৃষ্টিতে, খৃষ্টের প্রতি তাহাদের যে প্রেম সেই প্রেমের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে, তিনি তাহাদের এই প্রেমপ্রবণতার পরিচয় পাইতেন। তিনি মনে করিতেন, খৃষ্টের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও ইহা রমণীর প্রেম, পার্থিব প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি উহাদের বশ্যতার মধ্যে, উহাদের মধুর কণ্ঠস্বরে, উহাদের অবনত দৃষ্টিতে, উহাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে যখন উহারা শুধু নীরবে অশ্রুপাত করিত, সেই অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি উহাদের এই প্রেম-প্রবণতা উপলব্ধি করিতেন।

মঠ-দ্বার হইতে বাহির হইয়াই তিনি তাঁহার পরিধেয় আলখাল্লাটি

তন্ময়।

Kuntaline Press, Calcutta.

[illegible] এবং সে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] সেও, এই ভাবে [illegible] [illegible] দেখিয়া দ্রুতবেগে চলিতেন।

তাহার একটি ভাগিনেয়ী ছিল। কোন এক নিকটবর্ত্তী স্কুলে সে তাহার মাতার সহিত একত্র বাস করিত। তাহাকে তাঁহার মঠের [illegible] [illegible] শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য সন্ন্যাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, একটু 'পাগলাটে' ধরণের ও পরিহাসপ্রিয়। সন্ন্যাসী যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সে তখন হাসিত; এবং যখন তাঁহার উপর ঝাঁপিয়া উঠিতেন, সে দুই বাহুতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া তাঁহাকে আবেগভরে চুম্বন করিত। তখন যদিও তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে দেবত্ব জাগিয়া উঠিত, এবং তিনি একপ্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তিনি অনিচ্ছাক্রমে তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

সন্ন্যাসী তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন মাঠ-ময়দানের পথ দিয়া চলিতেন, তখন প্রায়ই তাহাকে ঈশ্বরের কথা বলিতেন। সে তাঁহার কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিত না। সে তাহার তরুণ জীবনের স্বাভাবিক আনন্দে [illegible] শের দিকে, তৃণের দিকে, ফুলের দিকে চাহিয়া থাকিত। সে আনন্দ ভরে [illegible] ফুটিয়া উঠিত। কখন কখন একটা উড়ন্ত পতঙ্গ ধরিবার জন্য, একটা ফুটন্ত ফুল তুলিবার জন্য সে ছুটিয়া যাইত, এবং তাহা ধরিয়া বা তুলিয়া আনিয়া সে বলিয়া উঠিত :—"মামা, মামা, দেখ-এটি কেমন সুন্দর, আমার একে চুমো খেতে ইচ্ছা কর্‌চে।" এই যে চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা—ইহা সন্ন্যাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, উত্তেজিত করিয়া তুলিত, কুপিত করিয়া তুলিত। সন্ন্যাসী এই চুম্বনের মধ্যে তাহার সেই প্রেমস্পৃহা দেখিতে পাইতেন, যাহা রমণীর হৃদয়ে নিয়ত অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, এবং যাহার মূল একেবারে উৎপাটিত করা অসম্ভব।

মঠের রত্নভাণ্ডার-রক্ষকের পত্নী সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা দেখিত। সে একদিন সন্ন্যাসীকে গোপনে সংবাদ দিল যে, তাহার ভাগিনেয়ীর এক জন [illegible] আছে।

এই কথা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। সেই সময়ে তাঁহার [illegible] চলিতেছিল, তাঁহার শান্ত মুখ সাবানের ফেনে আচ্ছন্ন ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাঁহার

ধারে খুলিয়া রহিয়াছে; ক্ষীণ লঘু ও স্বচ্ছ গদির ন্যায় নদীটির আঁকা-বাঁকা সমস্ত গতি-পথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী আবার থামিলেন। কি এক অপূর্ব্ব অনিবার্য্য ভাব-রস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

একটা সন্দেহে, একটা অনির্দ্দেশ্য উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত আক্রান্ত হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তরে যেরূপ প্রশ্নের উদয় হইত, সেইরূপ প্রশ্ন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। "ঈশ্বর কেন উহাকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?"

যে হেতু, রাত্রি নিদ্রার জন্য;—অচৈতন্যের জন্য, বিশ্রামের জন্য, বিস্মৃতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ঈশ্বর কেন রাত্রিকে দিনের অপেক্ষা বেশী রমণীয় করিয়া, ঊষা-অপেক্ষা, সন্ধ্যা-অপেক্ষা বেশী মধুর করিয়া সৃষ্টি করিলেন? কেন এই সৌম্য শান্ত চিত্তহারী উপগ্রহটি সূর্য্য অপেক্ষা বেশী কবিত্বময় হইল? যে সকল সুকুমার রহস্যময় ব্যাপার প্রকাশ করিতে সূর্য্যের সঙ্কোচ হয়, অন্ধকার অপসারিত করিয়া সেই সকল ব্যাপার প্রকাশ করিবার জন্যই কি চন্দ্রের সৃষ্টি?

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিহঙ্গ-গায়কেরা অন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিশ্রাম না করিয়া এইরূপ রাত্রে কেন স্বরলহরীতে আকাশ ছাইয়া দেয়?

জগতের উপর কেন এই অর্দ্ধাবগুণ্ঠন নিক্ষিপ্ত হইল? কেন এই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, এই অন্তঃকরণের আবেগ, এই দেহের অবসাদ?

কি জন্য এই সব চিত্তহরণের আয়োজন? মানুষ যখন শয্যাশায়ী থাকে, তখন ত রজনীর এই মাধুরী-লীলা দেখিতে পায় না। কাহার জন্য তবে এই চিত্তহারী দৃশ্য? কাহার জন্য এই কবিত্বরস স্বর্গ হইতে ধরাতলে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে?

সন্ন্যাসী ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু ঐ দেখ, অদূরে, তৃণাচ্ছন্ন মাঠের ধারে, ভাস্বর-বাষ্প-পরিষিক্ত তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া দুইটি ছায়ামূর্ত্তি পাশাপাশি চলিয়াছে।

যুবক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়—স্বকীয় বাহুবীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ললাট চুম্বন করিতেছে। তাহাদের চারি দিকে যে নিশ্চল ভূখণ্ডটি প্রসারিত, তাহা উহাদের অধিষ্ঠানে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উহারা দুইটি প্রাণী, কিন্তু একটি আত্মা; মনে হয় যেন

উহাদেরই জন্য এই নিস্তব্ধ প্রশান্ত রজনী সৃষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের জীবন্ত উত্তর দিবার জন্যই যেন, উহারা সন্ন্যাসীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, আন্দোলিত হইতে লাগিল; মনে হইল যেন, বাইবেল-বর্ণিত রুথ ও বোয়সের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—হয় ত ঈশ্বর মানবের প্রেম-লীলা মায়াবগুণ্ঠনে আবৃত করিবার জন্যই এইরূপ রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই প্রেমিকযুগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। পরক্ষণেই চিনিতে পারিলেন; বালিকাটি তাঁহার ভাগিনেয়ী। এখন তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন! যে প্রেমকে ঈশ্বর এইরূপ সৌম্য সুন্দর মহিমাচ্ছটায় আবৃত করিয়াছেন, সেই প্রেম কি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত?

সন্ন্যাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যে দেবমন্দিরে হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে প্রবেশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাখ্যান।

নটবর দত্তের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে শৈশবে নষ্ট হইবার পর, এটি মেয়ে হইল দেখিয়া, মা বাপ তার নাম রাখিয়াছিল, হারাণী।

নটবর জাতিতে গন্ধবণিক, সে অশিক্ষিত মূর্খ লোক, কিন্তু ধর্ম্মভীরু। পদ্মার তীরবর্ত্তী বাউসমারী-নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার বাড়ী। পদ্মা পূর্ব্বে বাউসমারী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে ছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসরের 'ভাঙ্গনে' পদ্মা বাউসমারী গ্রামের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বাহুবিস্তার করিয়াছে। বাউসমারীর থানাটি 'যায় যায়' হইয়াছে, এখন গ্রামের বাজারে দাঁড়াইয়া বর্ষার তরঙ্গভঙ্গময়ী পদ্মার অশ্রান্ত কল-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়, মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্র লীলা তাহার আবর্ত্তপূর্ণ বিস্তার

বক্ষে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। বাউসমারীর বাজারের পার্শ্বে সাহা বাবুদের সুবৃহৎ আমবাগানের পরেই পদ্মার 'পাউড়ি।'

বাউসমারীর বাজারে নটবরের একখানি ক্ষুদ্র মশলার দোকান ছিল; দোকানখানি ক্ষুদ্র হইলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চারিচালা খড়ো দোকান, দোকানের তিন দিকে ঝাঁপের বেড়া, সম্মুখে তিনখানি ঝাঁপের দুয়ার। বাঁশের মাচার উপর ছোট ছোট ডালায় নানাপ্রকার বেণে মশলা স্তূপাকারে সজ্জিত। দোকান-ঘরের এক পাশে বাঁশের আড়ায় কতকগুলি চটের ঝোলা, প্রত্যেক ঝোলার ভিতর এক এক রকম গাছ গাছড়া, ফল মূল কন্দ;—কোনটিতে ক্ষেতপাপড়ি, কোনটিতে 'কষ্টিকেয়ারী', কোনটীতে অনন্তমূল, বৃহতী, সোনামুখী, রক্তচন্দন, পিপুল প্রভৃতি বনৌষধি। গ্রাম্য কবিরাজ মহাশয়গণের যে সকল বকালের নিত্য প্রয়োজন, তাহা নটবরের দোকান ভিন্ন বাউসমারীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশখানি গ্রামের মধ্যে আর কোথাও পাইবার উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন চাউল, ডাল, তৈল, গুড়, লবণ, মরিচ, প্রভৃতি হইতে হাওয়ার্ডের কুইনাইন, এডোয়ার্ডের টনিক, কে. সি. বোসের সিংহ-মার্কা বিসকুট, সোডা, নীলবড়ি, কাপড়-কাচা সাবান—সকল সামগ্রীই নটবরের দোকানে পাওয়া যাইত; সে যেন একটি ক্ষুদ্র 'মিউজিয়ম'; নটবর যে সামগ্রী নাই বলিত, তাহা সোনার টাকা দিয়াও সে অঞ্চলে কেহ মিলাইতে পারিত না।

সুতরাং বলা বাহুল্য, গ্রামে নটবরের কারবার বেশ ভালই চলিতেছিল। সংসারে পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পাতালী, কন্যা হারাণী, ও গোয়াল-কাড়ুনী ক্যালানী নাম্নী বিধবা গোপকন্যা; এতদ্ভিন্ন নটবরের দূরসম্পর্কীয় শ্যালক জটাধারী তাহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া কখনও দোকানে বসিয়া 'বেচা কেনা' করিত, কখনও গোরুর বিচালি কাটিত, কখনও নিত্যানন্দ পোদ্দারের দোকানে ইয়ারগণের সঙ্গে তাস খেলিত; এবং যেদিন হাতে কোনও কাজ না থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরের বাঁশের মাচায় ছারপোকা-পূর্ণ ছেঁড়া 'ক্যাচকেচে'র পাটীখানি বিছাইয়া একটি তৈলপক্ক বিবর্ণ ছোট বালিস মাথায় দিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত; আর তাহার অদূরে একটা দড়ির মোড়ায় বসিয়া দশমবর্ষীয়া হারাণী বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগখানি খুলিয়া 'বড়গাছ' 'ছোটপাতা' 'লালফুল' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পাঠ মুখস্থ করিত; কোনটা বুঝিতে না পারিলে জটাধারীকে ডাকিত. "ও মামা!

ঘুমুবে? এটা কি—বলে দাও না!" জটাধারী বিরক্ত হইয়া বলিত, 'যাও না, আর 'লেখা পড়া' শিখতে হবে না! পড়বি কোন্ দোকানদারের ঘরে, তোর 'ছোট পাতা' 'লালফুলে'র দরকার কি?—হারাণী নোলক নাড়িয়া গর্ব্বভরে বলিত, "যাও মামা, তুমি বড় দুষ্টু, বাবাকে বলে দিয়ে তোমাকে মজা দেখাবো!"—কোনও কোনও দিন কেবল মৌখিক ভয়-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া সে জটাধারীর পিঠে চিমটি কাটিত, না হয় খোঁপা হইতে লোহার কাঁটা খুলিয়া লইয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিত। আবার কখনও জটাধারী সুখ-সুপ্তির ব্যাঘাতে জীর্ণ বালিসের উপর হইতে সবেগে মাথা তুলিয়া 'দাড়া তো লক্ষীছাড়া মেয়ে!' বলিয়া বীরদর্প প্রকাশ করিবামাত্র হারাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দোকান হইতে পলায়ন করিত। হারাণীর দশম বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল।

২

হারাণীর সমবয়স্ক সহচরীগণের প্রায় সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্রলোকের কন্যা এক জনও ছিল না; কেহ গোপকন্যা; কেহ মুদীর মেয়ে, কেহ বা স্বর্ণকার-দুহিতা। তাহাদের কাহারও সাত, কাহারও আট, কাহারও বা নয় বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল। বাউসমারী চাষী-প্রধান গ্রাম, শিক্ষিত লোক সেখানে নাই। হারাণীর বয়স দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত বড় 'গেছো মেয়ে'র এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া হারাণীর মা পাতালীর প্রতিবেশিনীগণ বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুশ্চিন্তায় তাহাদের মুখে অন্ন রুচিত না, এবং এত বড় 'বেড়ে' মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিয়া পাতালী ও তাহার স্বামী নটবর কোন আক্কেলে নিদ্রা যায়, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তায় তাহারা দিন দিন কাহিল হইতে লাগিল। কিন্তু সে জন্য নটবরের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত না; তবে প্রতিবেশীদের টিট্‌কারীতে বিব্রত হইয়া পাতালী এক এক দিন কড়া কথা শুনাইয়া দিত। নটবর বলিত, "আহা, তুমি যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে করে' আমাকে বাড়ী-ছাড়া কর্‌বার যোগাড় করে তুল্লে!—আমার পাঁচ নয় সাত নয়, ঐ একটি মেয়ে; ওকে আমি চোখের আড়াল কর্‌তে পারিনে, বিয়ে দিলেই ত ওকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, ওকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো?—আরও এক আধ বছর যাক্ না, এত তাড়াতাড়ি কি?" পাতালী তাহার স্বামীকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করিত। শেষে একদিন বলিল, "হাঁগা, তুমি

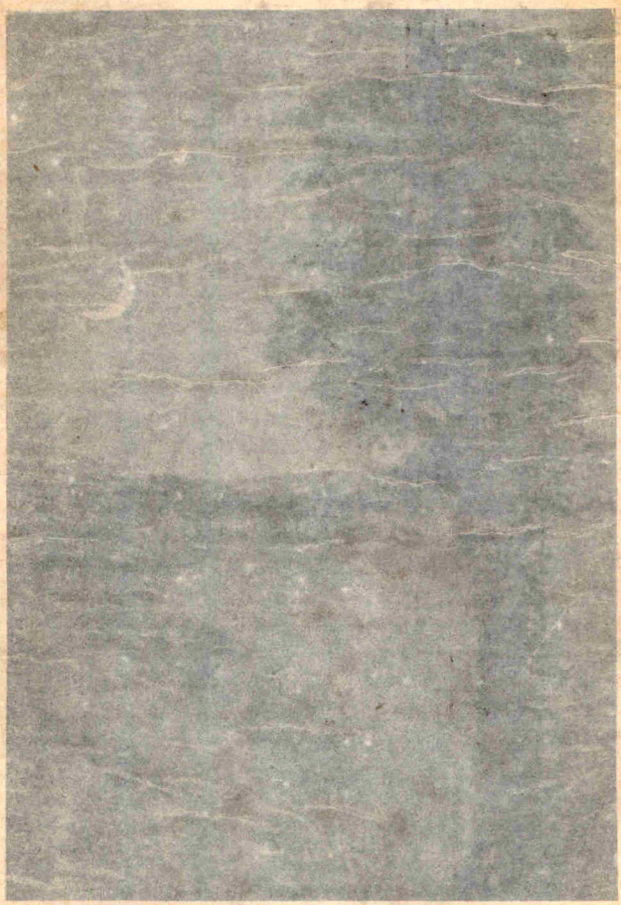

নিশীথ চিত্র।

Indian Art School, Calcutta

[illegible] বিবাহ বড় গুরুতর সমস্যা! নিজের আর্থিক সচ্ছলতা বা [illegible] তাহা নির্ণয় করে না; দুই বৎসর পরে যাহা হয় করা যাইবে [illegible] নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। শুভ অগ্রহায়ণে হারাণীর বিবাহ [illegible]

নটবরের পিতৃবন্ধু কাপড়-বিক্রেতা দে মহাশয় পরামর্শ দিলেন,—"[illegible] পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া কোনও দোকানদারের ছেলের সঙ্গে হারাণী [illegible] দাও, ভাত কাপড়ের কষ্ট না হ'লেই হইল। 'চাকুরে' ভুটুদের কাজ [illegible] নাই! তাহাদের হাঁক বড় বেশী, সামলাইতে পারিবে না। আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থের মত পাশকরা ছেলে নীলাম করিতেছে।"

নটবর বলিল, "মশায় যা বল্‌তেছেন, সে অতি [illegible] কথাই [illegible] কিন্তু আমার হারাণী পরীর মত সুন্দরী, সে যে শ্বশুরবাড়ী [illegible] বাসন মাজ্‌বে, নদী থেকে কলসী কলসী জল আন্‌বে, [illegible] হবে না, তা আমার যদি দশ টাকা খরচ হয়, তাতেও রাজী।"

[illegible] মহাশয় বলিলেন, "বাপু হে, বুঝে সুঝে করো, শেষটা পস্তি [illegible] দুই না যায়—! দোকানদার মানুষের অত উঁচু নজর [illegible]

নটবর গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। পাতালী [illegible] বুড়োর কথা শুনো না; আমার হারাণী কি দোকানদারের 'যুগ্যি'! [illegible] সে যে কত চাকুরে ভাকে সেধে নিয়ে যাবে। তুমি রামপুরো [illegible] দেখিয়া সম্বন্ধ কর না।"

রামসুন্দর অর্থাৎ [illegible] জেলার সদরে গোবিন্দচন্দ্র পালের [illegible] স্বরূপনগরের—জমীদারের কারকুণের কাজ করিতেন। [illegible] পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি জমীদার-সরকারে চাকরী করিতে [illegible] অশিক্ষিত স্বজাতীয় দোকানদারগণ তাঁহার বড় খাতির [illegible] গোবিন্দচন্দ্রের মনেও এজন্য কিঞ্চিৎ অহঙ্কার ছিল। তিনি [illegible] বলিতেন, "আমি নাড়ি-ধরা বেনে নই।"—গোবিন্দচন্দ্র ভুটিয়া [illegible] করিতে [illegible] স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহে যে গৌরব,—[illegible]

গোবিন্দচন্দ্র পালের একটি পুত্র নিতাইচন্দ্র পাল [illegible] করিয়া [illegible] পাশ করিয়াছে। সে এখানে সরকারী করিত। নিতাইচন্দ্রের [illegible]

হইয়াছিল,—কালো মেয়ে সে বিবাহ করিবে না। নিতাইচরণের পিসী একবার কুটুম্বিতা উপলক্ষে বাউসমারী আসিয়া হারাণীকে দেখিয়াছিলেন।

নটবর তাহার মামাতো ভাই দুর্গতি দত্তকে দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল।

৪

গোবিন্দ কয়েক দিনের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুর্গতি দত্ত একদিন প্রভাতে একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ছেঁড়া চটী জোড়াটা পায়ে দিয়া, এবং ময়লা চাদরখানি গলায় জড়াইয়া গোবিন্দ পালের গৃহে যাত্রা করিল। গোবিন্দ তখন খোলা পায়ে জলচৌকীর উপর বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন; পদ্মাবক্ষঃ প্রবাহিত মৃদু সমীরণ-প্রবাহ, তাঁহার কদলী-বাগানস্থিত কদলী পত্রে লাগিয়া সর সর শব্দ করিতেছিল, এবং একটা শঙ্খচীল পথিপ্রান্তস্থ উচ্চ তাল গাছের মাথায় বসিয়া প্রথম হেমন্তের প্রভাতে নবীন সূর্য্যের কিরণধারায় শিশিরশীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছিল। শঙ্খচীলটা "চ-ই-ই" শব্দে ডাকিতেছিল।

দুর্গতি দত্ত মাথা তুলিয়াই শঙ্খচীলটাকে দেখিতে পাইল; সে বড় খুসী হইল, বুঝিল, যখন শঙ্খ চিল দর্শন হইল—তখন নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া শঙ্খ চিলকে নমস্কার করিল।

দুর্গতি দত্তকে গোবিন্দ পাল চিনিতেন, হাজার হউক স্বজাতি ত; তবে তিনি জানিতেন, হাতী ও ব্যাঙে যত তফাৎ—তাঁহাতে ও দুর্গতি দত্তের মত দোক্কাবদারে সেই পরিমাণ তফাৎ! তিনি হইলেন, মহামহিমান্বিত জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত ভড় রায় বাহাদুরের সদরের কারকুণ, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, এবং উপরি-প্রাপ্তি সালিয়ানা বারো সিকা তিন শত টাকা! মমলা-বিক্রেতা ক্ষুদ্র দুর্গতি দত্ত তাঁহার নিকট 'কলিকা' পাইবার যোগ্য নহে। তথাপি হাতী যে ভাবে মশাকে নিরীক্ষণ করে, বিশাল-বপু গোবিন্দ পাল সেই ভাবে দুর্গতি দত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এত সকালে কি মনে করে'? আমার কাছে কোনও দরকার আছে নাকি? ঐ যে, মোড়াটার উপর বো'স।"

অদূরে একটি ছিন্ন মোড়া পড়িয়াছিল; মোড়াটি পূর্ব্বে দড়ি দিয়া বোনা ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষের ভারবহনে জীর্ণ হইয়া দড়ির ছাউনি অনেক দিন পূর্ব্বেই 'পেস্তান' লইয়াছিল, মধুর অভাবে গুড়ের ন্যায় একখানি ছি

শতরঞ্চির কিয়দংশ তাহার একটিনি করিতেছিল। দুর্গতি দত্ত সেই মোড়ার উপর বসিয়া দুই একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমার দাদা বাউসমারীর নটবর দত্তকে বোধ হয় মশায় জানেন। সে অঞ্চলে এত বড় মশলার দোকান আর কারও নাই।"

পালজী দাঁতনটিকে স্বকার্য্যসাধনে বিরত করিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন, "তা, হবে; নটবর দত্ত কি আমাদের জমীদারীর প্রজা? তার কোনও দরকার আছে নাকি?"

দুর্গতি দত্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, "এক রকম দরকার বৈ কি কর্ত্তা, আপনি হচ্ছেন আমাদের সমাজের মধ্যে এক জন 'প্রেধান বেক্তি'—নটবর দাসের একটি মেয়ে আছে 'পরমা সুন্দরী'; শুনেছি, নিতাই বাবুর জন্য একটি ভাল পাত্রী খোঁজ কর্‌চেন, তাই সেই কথা জান্‌তে এসেছি।"

গোবিন্দ পাল মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ওঃ—ঘটকালি কর্‌তে এসেছ!—তা এ বেশ কথা। মেয়ে পছন্দ হ'লে আমি বিয়ে দিতে পারি,—কিন্তু আজ কাল ভদ্রসমাজে দেনা পাওনার যে রকম রীতি পদ্ধতি হয়েছে, তা জান ত?—নটবর কি ততটা পারবে?"

দুর্গতি বলিল, "সে কথা আমি দাদাকে লিখি।"

পাল বলিলেন, "তা লেখ, কিন্তু এ দু পাঁচশোর কর্ম্ম নয়, আর নিতাই যদি মেয়ে 'পছন্দ' করে, তবেই এ কাজ হতে পারে। এ কালের লেখাপড়া-জানা ছেলে, তার উপর চাকরী বাকরী কর্‌ছে। তারা স্বাধীন; পছন্দ অপছন্দের উপর আমার কথা চল্‌বে না।"

৫

নিতাই মুন্সেফী আদালতে, কি ফৌজদারী আদালতে নকলনবিশী করিত, কিন্তু চশমা না হইলে সে দেখিতে পাইত না, সম্মুখে বড় ও মাথার দিকে ছোট করিয়া চুল ছাঁটিত, গোরা মিস্ত্রীর জুতা ভিন্ন দেশী জুতা তাহার পায়ে উঠিত না, এবং এসেন্স ভিন্ন তাহার একদিন চলিত না। নিতাই নকলনবিশীতে কোনও মাসে ১৮৸৵০, কোনও মাসে ২১৷৵০, কোনও মাসে পূরা ২২৲ টাকা উপার্জ্জন করিত। বাড়ীতে এক পয়সা দিতে হইত না, কাজেই বিলাসিতার জন্য তাহার অর্থাভাব ঘটিত না।

নিতাই বারমাসী পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া

বলিতে ছাড়িতেন না। তিনি বলিলেন, "তারা যেমন মানুষ, তেমনি দিয়াছে; মন্দই বা কি দিয়াছে? সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়নি বলে' বৌকে হতশ্রদ্ধা করবি? তুইও মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস। কি ন'শো পঞ্চাশ দিয়েছিলি? আজই যেন তোরা নেকা পড়া শিকে' চাকুরে হয়েছিস, এক পুরুষ আগে কি তোরাও দাঁড়ি ধরিস্‌নি? আমার কাছে উচিত কথা।"

নিতাইয়ের মা রাগিয়া বলিল, "বৌর মা কি তোমাকে উকীল দিয়াছে নাকি? তোমরা বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করচো, তাতে কথা নাই; যত দোষ আমাদের বেলা!"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তবে আর কি? বৌর সঙ্গে যে মেয়েটা এসেছে, ওর গলায় ছুরী দে! বেয়ান পাগীর ত আর দেখা পাবিনে, ছেলের বিয়েতে বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করে' বলে তোদের চোখ টাটাচ্ছে। হা ভগবান, এ হতভাগা দেশে মেয়ের মা ক'রে আমাদের সৃষ্টি কর্‌লে কেন?'

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন। নিতাইয়ের মা তিন মাস তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই।

৭

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হারাণী দেখিল, সে বড় কঠিন ঠাঁই! শাশুড়ী কথায় কথায় 'দোকানদারের বেটী,' বলিয়া কটূক্তি করেন। পান সাজিতে, বিছানা পাড়িতে একটু ত্রুটী হইলেই বিধবা ননদ মুখ ঝাপটা দিয়া বলে, "ধন্যি মেয়ে! মা বাপ তোমাকে এত বড় 'গেছো' করে রেখেছিল, কেবল কি বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছে? কোনও কাজ কর্ম্ম শেখায়নি?" যে সকল প্রতিবেশিনী পল্লীবাসিনী সময়ে অসময়ে গোবিন্দ পালের স্ত্রীর নিকট বিনা সুদে টাকাটা সিকাটা কর্জ্জ লইবার আশায় আত্মীয়তা করিতে আসিত, তাহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিত, "তা হোক, সুন্দর রূপ ত ধুয়ে খাবার জিনিস নয়! এত বড় মেয়ে স'য়ে বসে না; দিন রাত্রি কেবল কান্না!" গোবিন্দ-বনিতা ঝঙ্কার দিয়া বলিত, "তোমরাই পাঁচ-জনে দেখ দেখি। বৌর কত গুণ! মুড়ি মুড়কী খেলে পেট ব্যথা করে, রুই মাছের মুড়ো ছাড়া অন্য মাছ মুখে রোচে না। চক্ষু দুটি যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ, ঝরচেই ঝরচেই! এমন কর্ম্মভোগেও পড়েছি বাপু! আমার যেমন কাজ ছিল না, তাই আজ পাঁড়াগেঁয়ের পরে ছেলের বিয়ে

দিতে গিয়েছিলাম,—জানিয়ে যাবলে!" হারাণী দূরে বসিয়া সব শুনিত, আর অঞ্চলে চক্ষু মুছিত। তাহার সর্ব্বদা মনে হইত, এই কায়া-পিঞ্জর ভেদ করিয়া কতদিনে সে বাহির হইবে! কিন্তু সে আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল; প্রতিবাসিনী প্রৌঢ়া কর্ম্মকার-কন্যা গদার মা কিঞ্চিৎ নিরোপার লোভে হারাণীর 'বডিগার্ড' হইয়া রামপুরে গিয়াছিল। কর্ম্মদোষে খোঁটা' খাইয়া দুই চারি দিনেই সে বেচারার এমনই মন্দাগ্নি হইল যে, একদিন মধ্যাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অনাহারেই একখানি 'গহনার নৌকা'য় উঠিয়া সে বাড়ী পলাইল! হারাণীর শাশুড়ী পূর্ব্বেই রায় প্রকাশ করিয়াছিল, বৌমার এখন বাপের বাড়ী যাওয়া হইবে না। বৌমা একটুও গহনা শেখে নাই। কাজ কর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহাকে যানিকে না রাখিলে তাহার 'চাষাড়ে' ভাব দূর হইবে না।

শীতকালে দরিদ্রের ছেঁড়া কাঁথার মত, বর্ষার দিনে তাল পাতার ছাতি, এই কয় দিন শ্বশুরবাড়ীতে তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে চলিয়া গেল। হারাণী যে মনের বেদনা প্রকাশ করিবে, এমন লোক আর শ্বশুরবাড়ীতে একটিও দেখিতে পাইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সে আর কাঁদিত না। এক এক সময় মা বাপের উপর তাহার বড় রাগ হইত, তাঁহারা কেন তাহাকে এমন করিয়া 'বনবাস' দিলেন?—সে কি তাঁহাদের এতই ভার হইয়াছিল?

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শাশুড়ী যখন ঘরের মেজেতে কাঁচা বিছাইয়া ঘুমাইত, এবং বিধবা ননদ পল্লী-যুবতীদের লইয়া তাস খেলিতে বসিত, তখন হারাণী লুকাইয়া ছাদের উপর উঠিত, এবং নির্নিমেষনেত্রে গ্রামান্ত-পরিপার্শ্ববর্ত্তী অস্ফুট বন-রেখার দিকে চাহিয়া থাকিত; সে জানিত সেই দিকে তাহার বাপের বাড়ী।

গোবিন্দ পালের বাড়ী পদ্মার ধারেই অবস্থিত। নদীমধ্যে প্রথমে বালুকাপূর্ণ চর, তাহার পর 'বহতা' নদী। শত শত নৌকা সাদা পাল উড়াইয়া নানা পণ্যদ্রব্য লইয়া দিগ্দেশে ছুটিয়া চলিত, চরের বালি মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করিত, বহুদূরে সরদহের কুঠীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাউগাছ-গুলির মাথা আকাশের কোলে ধূসর ছায়ার মত দেখাইত, নদীর পরপারে চড়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত কৃষকপল্লীর পর্ণকুটীরগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হারাণীর মনে হইত, ঐরূপ একখানি কুটীরে তাহার শ্বশুরবাড়ী

জননী ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া তাহার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন! বাপের কাছে বসিয়া না খাইলে তাহার পেট ভরিত না, বাবা এখন কাহাকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিবেন! হারাণী চক্ষুর জলে চারি দিকে ঝাপ্‌সা দেখিত।

একদিন সে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ ননদের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার ননদ মানদা ভ্রূকুটীকুটিলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁলা বৌ, তোর আক্কেল কি?—দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস্! আর কি কেউ শ্বশুরঘর করে না? না, তুই-একাই শ্বশুর-বাড়ী এসেছিস্? সকল মেয়েই ত বাপের আদরের, কিন্তু তোর মত বাড়াবাড়ি কেউ করে না।"

হারাণী চোখের জল মুছিয়া নামিয়া আসিল।

কয়েক দিন পরে হারাণী তাহার পিতাকে গোপনে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিল, "বাবা, আমার এখানে মন টিক্‌চে না, আমাকে নিয়ে যাও।"

নটবর তাহাকে বৈশাখ মাসে লইয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিল।

পত্রখানি যথাকালে শাশুড়ীর হাতে পড়িল। পালগৃহিণী সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি বৌ মানুষ, তোমার হাত চেয়ে আম মোটা! তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের নিন্দা করে' বাপ্‌কে পত্র লেখ? কের যদি ও রকম নষ্টামী কর ত তোমার 'অদেষ্টে' বিস্তর 'দুঃখু' আছে।"

কন্যার পত্র না পাইয়া নটবর পুনঃপুনঃ তাহাকে কয়েকখানি পত্র লিখিল; কিন্তু কোনও পত্রই হারাণীর হস্তগত হইল না। বাপের বাড়ীর কোনও সংবাদ না পাইয়া মনের কষ্টে হারাণী দিন-দিন শুকাইতে লাগিল।

৮

বৈশাখ মাস আসিল।

নটবর কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিককে পত্র লিখিল; একখানি, দুইখানি, ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিবার পর জবাব পাইল, "বৌমাকে বাপের বাড়ীতে রাখিবার জন্য পুত্রের বিবাহ দিই নাই; সেই অসভ্য চাষা পাড়াগাঁয়ে তাহার এখন যাওয়া হইবে না; ইচ্ছা হয়, এখানে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইতে পার।"

পত্র পড়িয়া নটবর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,

এমন দয়া-মায়া-হীন রাক্ষসের ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম!" হারাণীর মা রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, "যেমন করে' পারি, পূজার সময় মেয়ে নিয়ে আস্‌বো। বিয়ের কনে তত দিনেও কি পাঠাবে না?"

ক্রমে আশ্বিন মাস আসিল। প্রতিবেশিনী হারুর পিসী রামপুরে হারুর কাছে যাইতেছিল, পাতালী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, "হারাণীকে বলো, আমি পূজার সময় তাকে নিয়ে আসবো, সে যেন কাঁদাকাটী না করে।"

হারুর পিসীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া হারাণী দিন গণিতে লাগিল।

বোধন বসিল। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী গেল, হারাণীকে কেহ লইতে আসিল না। গোবিন্দের বাড়ীর অদূরে ষ্টীমার-ঘাট। দামুকদিয়ার ষ্টীমার প্রত্যহ রামপুরে আসে। পূজার সময় মালের বাহুল্যে ষ্টীমার আসিবার নিয়ম নাই; কখনও প্রভাতে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমার আসে। ষ্টীমারের বাঁশী শুনিলেই হারাণী ছাদে গিয়া দাঁড়ায়; দেখে, ষ্টীমার-ঘাটে লোকারণ্য! কত দেশ বিদেশের যাত্রী মুটের মাথায় মোট দিয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া যাইতেছে; বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই উৎসাহ! মনের আনন্দ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই আরোহিগণের মধ্যে হারাণী একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পায় না! সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল-ছল নেত্রে ছাদ হইতে নামিয়া আসে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিছানায় উঠিয়া বসে, মনে করে, "বাবা এই ষ্টীমারে আসিতেছেন।"—বসিয়া বসিয়া কাহারও কোনও সাড়া না পাইয়া আবার সে শুইয়া পড়ে, চক্ষুর জলে বালিস ভিজিয়া যায়; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুম আসিলে সে স্বপ্নে শুনিতে পায়, বাবা যেন মাথার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "হারাণী, মা, আমি এসেছি, আর কাঁদিস্ নে!" হারাণী চক্ষু খুলিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার, বাড়ী নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। হারাণী মনে করে এ স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিল!—হারাণীর কণ্ঠের হাড় বাহির হইল, সোনার অঙ্গে কালী পড়িল। হারাণী ভাবিতে লাগিল, "বাবা কি আমাকে ভুলিয়া গেলেন? মারও কি আমাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না?"

৬

কথা এই যে, নটবর জ্বরে পড়িয়াছিল। চতুর্থীর দিন অন্ন পথ্য করিয়া পঞ্চমীর দিন বেলা দশটার সময় বাউসগাড়ীর দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী মহিষকুণ্ডী ষ্টেশনে সে ষ্টীমারে উঠিল। এই দেড় ক্রোশও তাহাকে গরুর গাড়ীতে আসিতে হইয়াছিল। দেহে বল নাই, দুই পা চলিতেই মাথা ঘুরিয়া উঠে; লাঠী ধরিয়া সে অতিকষ্টে 'লার্ক'-ষ্টীমারে উঠিয়া চাদরখানি পাতিয়া ডেকের এক পাশে বসিয়া পড়িল। যাত্রী নামাইয়া ও নূতন যাত্রী তুলিয়া লইয়া, 'লার্ক' হুস্ হুস্ শব্দে কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া ও পদ্মার তরঙ্গ-রাশি ভেদ করিয়া রামপুরের অভিমুখে উজানে চলিল।

ষ্টীমারের উপর যাত্রীর হট্টগোল। নানা স্থানে এক একটা দল; কোথাও গান হইতেছে, কোথাও গল্প চলিতেছে, হাসির 'গর্‌রা' উঠিতেছে; কোথাও চারি জন যাত্রী সতরঞ্চি পাতিয়া তাস খেলিতে বসিয়াছে, দর্শকবৃন্দ চারি দিকে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে।—নটবর তাঁহাদের মধ্যে নিতান্ত একাকী; সে ষ্টীমারের এক পাশে বসিয়া সুদূর-প্রসারিত জলরাশির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছে,—'কখন ষ্টীমার রামপুরে পৌঁছিবে, কখন হারাণীকে দেখিতে পাইব? আহা, আজ যে দশ মাস তাহাকে দেখি নাই। বাছা আমার কেমন আছে?"—এতদিন পরেও কি বেয়ান তাকে সঙ্গে পাঠাবে না?"

বেলা তিনটার সময় রামপুরের নীচে আসিয়া ষ্টীমারের বাঁশী বাজিল। "বাবা কি আজও আস্‌বেন না?" বলিয়া, হারাণী তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিল। কতক্ষণ পরে ষ্টীমার জেটীতে ভিড়িল। যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করিয়া নামিতে লাগিল। হারাণী দেখিল, সকল যাত্রী নামিলে নটবর একটি কাপড়ের 'পুঁটুলি' হাতে লইয়া লাঠীতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। পিতার রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ ও মলিন মুখ দেখিয়া হারাণী ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া শাশুড়ীকে বলিল, "বাবা আস্‌চেন!"—তেমন উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সে বাড়ীতে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই।

পূজার ছুটীতে দুই দিন পূর্ব্বে গোবিন্দ বাড়ী আসিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি তক্তপোষে দেহ প্রসারিত করিয়া 'হুঁকায়' তামাক টানিতে-

ছিলেন; এমন সময় নটবর কাপড়ের 'পুঁটুলি'টা দরজার বাহিরে রাখিয়া, কম্পিতপদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈবাহিককে নমস্কার করিল।

গোবিন্দলাল শট্‌কার নল সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "আরে নিতাইয়ের শ্বশুর যে! এসো এসো, তবে কি মনে করে?"

শুদ্ধ দোকানদারকে 'বেহাই' বলিয়া স্বীকার করিতে কারকুণ গোবিন্দ পালের সঙ্কোচ বোধ হইল; কিন্তু পুত্রের শ্বশুর, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

নটবর 'তক্তপোশে'র এক পাশে আড়ষ্টভাবে বসিয়া বলিল, "হারাণী আজ দশ মাস এসেছে, তাকে নিতে এসেছি।"

গোবিন্দ বলিল, "নিতে এসেছ? বৌমা পথে বসে আছে আর কি? আমার মত জানবার পর এলে ভাল হ'তো না? আর আজ পঞ্চমী, আজ নিতে এসেছ? এতদিন ঘুমিয়েছিলে! ঠাট্টা নাকি?"

নটবর বলিল, "মশায় মহৎ 'ব্যোক্তি,' আমি 'ক্ষুদ্দুর' লোক, মশায়ের সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করবার 'যোগ্যি'? তবে আমার মেয়ে, তার 'গব্বধারিণী' আজ দশ মাস তাকে দেখেনি, মেয়ের জন্যে 'দিবে রাত্তির' কাঁদচে। আমি জ্বর হয়ে পড়েছিলাম, 'পত্তি' করেই উঠে আসচি। আর দুঃখ দেবেন না—পাল মহাশয়, একবার দু'দিনের জন্যে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেন, আমি আবার নিজে মাথায় করে রেখে যাব।"

কারকুণ বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এখন ত মেয়ের উপর খুব দরদ! বিয়ের সময় ত মেয়েকে ফাঁকি দিতে ছাড়নি! তা, এসেছ, হাত পা ধোও। ওরে শঙ্করা, হুঁকোটা ফিরিয়ে এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা। আর বাড়ীর ভিতর খবর দে, বৌমার বাপ এসেছে।" পালজী পুনর্ব্বার শট্‌কায় মনোনিবেশ করিলেন।

নটবর বাড়ীর ভিতর গিয়া দাঁড়াইবামাত্র হারাণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া—"বাবা!" বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নটবর কষ্টে অশ্রুদমন করিয়া বলিল, "কেঁদোনা মা, তুমি রাজরাণী হও; আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না।"

বেয়ান দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কন্যাকে বলিল, "ওলো মানি, দোকানদার 'মিন্‌সে' যেমন, মেয়েটাও তেমনি; অত বড় 'ধাড়ী' মেয়ে,

বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লজ্জা হচ্ছে না? আমরাও এককালে মা বাপের মেয়ে ছিলাম, এমন কল্পা করতে জানতাম না।"

১০

আজ ষষ্ঠী। বাউসমারী গ্রামের সাহা বাবুদের বাড়ী মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হয়। ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্নে দশ বারোটা পাখাওয়ালা ঢাক মহাশব্দে গ্রাম আলোড়িত করিতে লাগিল; সানাই করুণ রাগিণীতে আগমনীর কোমল গাথা গায়িতে লাগিল। মা আজ বেদীতে উঠিবেন। গ্রামের একপাল উলঙ্গ ছেলে সাহা বাবুদের প্রকাণ্ড দেউড়ীতে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া বাজনা শুনিতেছিল; পাড়ার মেয়েরা পূজা-বাড়ীর দিকে ঝুঁকিল।

পাতালী বলিল, "আমার মা আজ আস্‌চে, এতক্ষণ ষ্টীমার কত দূর এলো!"

পাতালী মেয়ের জন্য ভাত রাঁধিয়া পাথরের 'খোরা'য় ঢালিয়া রাখিল, দুধটুকু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিল। জটাধারীকে দিয়া বাজার হইতে এক পোয়া সন্দেশ আনাইয়া রাখিল;—মনে মনে বলিল, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার মাকে আমার কোলে এনে দাও; আহা, কতদিন তাকে দেখিনি!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ষষ্ঠীর বাঁকা চাঁদ নির্ম্মল আকাশে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন; ধূপ ধুনার গন্ধে গ্রামখানি যেন উৎসবপূর্ণ। শরতের শুভ্র চন্দ্রালোকে, শীতল নৈশ সমীরণে, বর্ষা-সলিলপুষ্ট রজনীগন্ধার সুকোমল সৌরভে জননী শারদলক্ষ্মীর উদ্বোধনের আভাস অনুভূত হইতে লাগিল।

বাউসমারীর ষ্টীমার-ঘাটে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি হইল। নটবর ষ্টীমার-ঘাটে গাড়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; কখন গাড়ীর চক্রশব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া পাতালী একবার পথে যায়, একবার বাড়ীতে আসে; গাছের পাতাটি নড়িলে মনে করে—ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে!

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; পদদ্বয় যেন দেহভার-বহনে অসমর্থ!

পাতালী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জ্যোৎস্নালোকে স্বামীকে চিনিতে পারিল,

ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুলস্বরে নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এলে, কৈ, আমার হারাণী কৈ ?"

নটবর সেই স্থানে বসিয়া পড়িল,—হতাশভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তাকে পাঠালে না,—মাকে আনতে পারলাম না!"

পাতালী ধীরে ধীরে স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; ব্যথিতহৃদয়ে কাতর স্বরে বলিল, "মা গো, তুই আসুচিস্ ভেবে তোর জন্যে ভাত রেঁধে তোর আশা-পথ চেয়ে বসে আছি!"

পূজার বাড়ীর ঢাকের শব্দে ক্ষুদ্র গ্রামখানিত প্রতিধ্বনি করিয়া তুলিল; কিন্তু ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে নিপতিত ব্যথিত দম্পতীর কর্ণে বিজয়ার শোক-গাথা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাজা।

"মিসেস্ ম্যান্‌সন্?"

"কি লোটী?"

"আজ রাত্রে বাবা রাজা সাজবেন্, কেমন, না?"

"হ্যাঁ লোটী।"

শ্রীমতী ম্যান্‌সন্ অপরিসর গৃহের অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নের সন্নিধানে বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া তিনি প্রশ্নকারিণীর দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বালিকা কক্ষপ্রান্তবর্ত্তী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

তিনি বালিকাকে তিরস্কার করিতে গেলেন; কিন্তু তাহার দীপ্ত, বিশ্রান্ত নয়নের আনন্দদীপ্তি, কচি কিশলয়ের মত কোমল ওষ্ঠে তৃপ্তির মধুর হাস্য দেখিয়া শ্রীমতী ম্যানসনের মুখ হইতে শাসন-বাণী আর নির্গত হইল না। বালিকা ইতিমধ্যে অন্ততঃ দশবার সেই একই প্রশ্ন করিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। গাঢ় নিদ্রা তাহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে সে কোনরূপে উত্তেজিত না হয়, ডাক্তার সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

বালিকা যেন তখন স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। প্রাচীর গৃহদ্বার ভেদ করিয়া তাহার সঞ্চারিণী দৃষ্টি যেন কোনও সুদূর কল্পনার রাজ্যে বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতেছিল। বালিকা যখন এমনই স্বপ্নালস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, শ্রীমতী ম্যান্‌সন্ তখন তাহার সুখের ধ্যান ভাঙ্গিতে চাহিতেন না।

শ্রীমতী পুনরায় সেলাইয়ের কাজে মনঃসংযোগ করিলেন।

লোটী উপাধানে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। নিমীলিতনয়নে সে ললাটচুম্বিত চূর্ণালক লইয়া খেলা করিতে লাগিল। অঙ্গুলিপ্রান্তে কেশাগ্রভাগ জড়াইয়া নয়নের উপর দিয়া টানিয়া আনিল অর্দ্ধবিকশিত অধরে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"বাবা এখন কোথায়?"

মুখ না তুলিয়াই শ্রীমতী বলিলেন, "অভিনয়ের পূর্ব্বে রোজ যেমন পার্কে বেড়াইতে যান, আজও বোধ হয় সেইরূপ গিয়াছেন।"

লোটী নয়ন উন্মীলিত করিল; ক্ষুদ্র পাণ্ডুর মুখখানি বাতায়নের দিকে ফিরাইল। কাচের ফুলদানীতে একটি প্রস্ফুটিত রক্তপুষ্প দেখিয়া বালিকার নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে শয্যার উপর বসিয়া ক্ষুদ্র বাহুলতা বাড়াইয়া দিল।

"মিসেস্ ম্যান্‌সন্! ফুলের গন্ধ আমি বড় ভালবাসি। দূর থেকে একবার গন্ধ লইব, দিন না একবার!"

"তোমার বাবা তোমায় বড় বেশী আদর দেন। রোজ একটা ফুল আনা চাই-ই! কিন্তু কাজটা অন্যায় হইতেছে, তাহা তিনি ভাবেন না। ফুল আমি তোমাকে দিতে পারিব না বাছা; আমি এখনই লইয়া যাইতেছি!"

"তা নিয়ে যান; কিন্তু দয়া করে একবার আমার কাছে বসুন। তার পর আমি চুপ করিয়া ঘুমাইব।"

শ্রীমতী ফুলদানীটা অগত্যা শয্যার কাছে লইয়া গেলেন। বালিকা উহা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, কিন্তু চমকিতভাবে সে সহসা হাত গুটাইয়া লইল। সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, গভীর আগ্রহে প্রাণ-ভরিয়া সে নিশ্বাস টানিয়া লইল। যেন একই নিশ্বাসে সে নূতন জীবন লাভ করিল।

তার পর উপাধানে মাথা রাখিয়া বালিকা নয়ন নিমীলিত করিল। প্রীতি, তৃপ্তি ও পরম শান্তিতে তাহার মুখমণ্ডল যেন হাসিতেছিল।

সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, গন্ধরা লোহিত প্রসূনটি সম্মুখে তাহার

নৌরভ সুরাগভ সঙ্গীতের ন্যায় মৃদু, মধুর ও উন্মাদনাপূর্ণ। কত সুদূর অপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র দৃশ্য তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হইল। ইহলোকের পর পারে যেন দেশ নিশ্চয়ই আছে। সেই দেশের রাজা যেন তাহার পিতা। তাঁহার দেহে রক্তবর্ণ রাজবেশ, শিরে হিরণ্ময় মুকুট। আর সে-যেন সেই দেশের রাজকন্যা।

শ্রীমতী গ্যাইসন্ মুগ্ধ হইলেন, বালিকা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, তখন তিনি বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সীবন-যন্ত্রাদি তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিলেন।

ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া তিনিও নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, বৃদ্ধ ক্রোল রাত্রির অভিনয়ে যাইবার পূর্ব্বে এখনই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবেন।

বৃদ্ধ ক্রোল—অক্টিভিয় অনুপাতে তিনি সত্যই তেমন বুড়া নন—জনৈক অভিনেতা। প্রায় তিন বৎসর হইল, তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক রজনীর অভিনয়লব্ধ সমস্ত অর্থ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সহযোগী বন্ধুগণের প্রীত্যর্থ ভোজের অনুষ্ঠানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন।

সে দিনের, সেই স্মরণীয় রজনীর অন্য কোনও স্মৃতি এখন নাই, শুধু একগাছি শুষ্ক জীর্ণ মাল্য গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত।

ম্যাথিয়া ক্রোল-দেহে ও মনে অভিনেতা। তাঁহার যে জীবনীশক্তি আছে, অভিনয়কালেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে কোনও ভূমিকার অভিনয় তিনি স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতভাবে করিতেন। তাঁহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইত না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। রাজা সাজিবারই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল, তাহাতেই তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। অভিনয়কালে যখন তিনি রাজবেশে রাজসিংহাসনে বসিতেন, সমাগত পার্শ্বচারী, সর্দ্দার, সভাসদ ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা চার দিক্ হইতে তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করিতেন, তখন প্রকৃতই তিনি উৎফুল্ল হইতেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কোনও দরিদ্রা সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। হিতকামী বন্ধুবর্গের উপদেশানুসারেই তিনি বিবাহ করেন। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন বলিয়া বন্ধুবর্গ ভাবিয়াছিলেন, তিনি বড় একরু

নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণায় তিনি বড়ই মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন, সুতরাং বিবাহ করিলে নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন। ক্রোশ সর্ব্বদাই নির্জ্জনতা খুঁজিয়া বেড়াইতেন। অলীক রাজশ্রীর কল্পনা মায়া-মরীচিকার ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহার চিত্ত আক্ষুন্ন করিয়া রাখিত। সে স্বপ্ন হইতে তিনি জাগিতে চাহিতেন না।

অভিনেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপভরে তাঁহাকে "তালি দেওয়া ছেঁড়া রাজা" বলিয়া ডাকিত। যেদিন প্রথম তাঁহার কর্ণে এই বিদ্রূপ-বাণী প্রবেশ করিল, সেদিন অন্তরে তিনি নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রজনীতে সর্ব্বপ্রথম তিনি নৃপতির ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই রাত্রেই তিনি এই কথা শ্রবণ করেন। সোনার মুকুট মাথায় দিয়া রাজবেশে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে সেনাপতি, সর্দ্দার, বীরবৃন্দ ও মহিলামণ্ডলী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। যবনিকা পড়িয়া গেল। রঙ্গালয় প্রশংসা-নিনাদ ও করতালিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল স্বপ্নাবিষ্ট রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া গর্ব্বিতচরণক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি তখন ভ্রমেও একবার মনে করেন নাই যে, তাঁহার মাথার মুকুট কাগজ-নির্ম্মিত, অলঙ্কারনিচয়ে দস্তা ছাড়া স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের কণামাত্র নাই!

তখন দলের মধ্য হইতে জনৈক অভিনেতা বিদ্রূপহাস্যে বলিল, "সবাই সরে দাঁড়াও, আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার রাজা মহাশয় আস্‌ছেন!" কথাটা শাণিত ছুরিকার ন্যায় তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিল। রাজশ্রীর স্বপ্নজাল টুটিয়া গেল। যে মোহ-মদিরা-পানে মুগ্ধ হইয়া তিনি জীবনকে মধুময় ও ধন্য মনে করিতেছিলেন, সে সুখের ইন্দ্রজাল সহসা যেন ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, সত্যই তিনি ভিক্ষুকমাত্র, জীবনের রঙ্গালয়ে দীন দরিদ্র পরকৃপাপ্রার্থী ভিখারী ব্যতীত আর কিছুই নন।

অপরিসর অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় পথে চলিতে চলিতে বাল্যকালে গীত একটি সঙ্গীতের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেই গান শুনিয়া অনেকেই বন্ধুভাবে হাসিয়াছিল, তাঁহাকে দুই চারি পয়সা ভিক্ষাও দিয়াছিল। কিন্তু সেই বন্ধুবৎ ব্যবহার, অথবা ভিক্ষালব্ধ অর্থের কথা আজ তাঁহার মনে হইতেছিল না। শুধু গানের শেষ কলি—"দরিদ্র নৃপতি আমি, হের ছিন্নবেশ"—তাহার অর্থ তিনি পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, আজ যেন

তাহা অর্থযুক্ত হইয়া পূর্ণপ্রভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া দারিদ্র্যের মলিন শীর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অপরিসর অন্ধকারময় গৃহ, মলিন শয্যা, তদুপরি পীড়িতা শিশুকন্যা মাণ্ডিডা। তখন তিনি বুঝিলেন, সত্যই তিনি দীন হীন। এইমাত্র তিনি যে মহিমান্বিত রাজার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রহসনমাত্র। তিনি ভিক্ষুকাধম। যে রাজ্যে এতক্ষণ তিনি রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপপূর্ণ, মায়া-মরীচিকা।

জীবনে তাঁহার একটিমাত্র আনন্দের আধার ছিল, সেটি তাঁহার শিশুকন্যা লোটী। প্রাণ ভরিয়া তিনি কন্যাকে ভালবাসিতেন, হৃদয়ের আবেগ দিয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কন্যাটি মাতার ন্যায় কোমলহৃদয়া ও দুর্ব্বল বলিয়া তিনি তাহাকে দশ বৎসর বয়সেও বিদ্যালয়ে পাঠান নাই।

মাতা যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পরীরাজ্যের বিচিত্র কাহিনী শুনিত। রঙ্গমঞ্চে পিতা সোনার মুকুট মাথায় দিয়া রাজা সাজিতেন, সকলে কেমন তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিত, সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বালিকার নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সে বলিত, "আমি রাজকন্যা।" মাতা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বালিকার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতেন না। গল্প শুনিতে শুনিতে শিশু রাজকন্যা নিদ্রায় কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। নিদ্রাঘোরে সে কত রাজ-ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া সুখে হাসিত।

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীমতী অ্যানসন্ তাহাকে পালন করেন। বালিকা ভাবিয়াছিল, জননীর ন্যায় তিনিও তাহাকে পরীরাজ্যের কথা, বলিবেন, পিতার অভিনয়কাহিনীর গল্প করিবেন। কিন্তু শ্রীমতী অলীক বিষয়ের গল্প করিয়া বালিকার চিত্তরঞ্জন করিতেন না। পিতাও তাহাকে অলীক কাহিনীর মোহে মুগ্ধ হইবার অবকাশ দিতেন না। তিনি জানিতেন, এ ঘর-খানে তিনি চিরজীবন কি দুঃখই পাইতেছেন, কি বিরাট অশান্তির বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছেন।

বালিকা অন্য উপায় না দেখিয়া স্বয়ং মনোনত গল্প রচনা করিয়া লইত। তাহার হৃদয়ে একটা মহা অতৃপ্তি ছিল। সে একবারমাত্র পিতাকে

রাজবেশে দেখিতে চাহে। মাতা যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন সে প্রায়ই বলিত, "মা, আমায় থিয়েটারে নিয়ে চল।"

তিনি বলিতেন, "আগে বড় হও মা, তখন নিয়ে যাব।"

এখনও ত সে বড় হয় নাই। পিতাও তাহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে চাহেন না। অবশ্য সে জন্য বৃদ্ধের হৃদয় ব্যথিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাই বলিয়া অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়া তিনি প্রিয়তমা কন্যার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন না।

আজ রজনীতে তিনি রাজার ভূমিকা অভিনয় করিবেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয়ের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। হৃদয়-চাঞ্চল্যের প্রাবল্যে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন।

কন্যাকে না বলিয়াই তিনি প্রভাতে বাহির হইয়াছিলেন। আহারের যে প্রয়োজন আছে, তাহাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লোটী তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিস্ময়ের কিছুই দেখে নাই। সে বুঝিয়াছিল, আজ পিতা রাজার ভূমিকার অভিনয় করিবেন।

অপরাহ্ণে রাজা ম্যাথিয়া দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার ন্যায় গম্ভীরচরণক্ষেপে তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে তাঁহার গায়ের দীর্ঘ কোট উড়িতেছিল, মাঝে মাঝে তিনি কোটের বোতাম আঁটিয়া দিতেছিলেন।

ম্যাথিয়া ক্রোলকে পার্কের সকলেই চিনিত। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখে আসিয়া নতশিরে টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। যেন প্রকৃতই কোনও মুকুটধারী রাজা চলিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু ম্যাথিয়া ইহাতে বিদ্রূপের কিছুই দেখিলেন না। তিনি স্মিতহাস্যে প্রত্যভিবাদন করিয়া কোটের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

জীর্ণ সোপান বাহিয়া ক্রোল নিজ কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অতি লঘুগতিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ফুলের গন্ধে ঘরটি ভরিয়া উঠিয়াছিল। জানালা খুলিয়া দিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সহসা সন্নিহিত কেদারায় তাঁহার পা লাগিল, একটা শব্দ হইল। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, পাছে শব্দ শুনিয়া বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

কিন্তু বালিকার নয়ন ইতিমধ্যেই উন্মীলিত হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জাগিয়া আছি বাবা, ঘুমাই নাই।"

তখন তিনি কন্যার কাছে গেলেন। তাহার অযত্নবিক্ষিপ্ত কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে তিনি সস্নেহে বালিকার জ্বরতপ্ত ললাট চুম্বন করিলেন।

"মা, আমার, এখনও ঘুমাও নাই? এতক্ষণ ঘুমানো উচিত ছিল।"

"বাবা, আমি এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি!"

দূরাগত স্বপ্নের সুখস্মৃতিতে তাহার নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, "বাবা, কাল আবার আমায় ফুল আনিয়া দিবে?"

বালিকা পিতার বিষণ্ণ নয়নে দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

"না রাজকুমারী, তাহা হইলে তুমি মোটেই ঘুমাইবে না।"

পিতা অভিনয়োপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালিকা উপাধানে মাথা রাখিয়া তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

"বাবা!"

"কি মা?"

"তুমি কি এখনই যাবে?"

"হাঁ বাছা; তুমি ত জান, আমাকে এখনই যেতে হবে"

বালিকা চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ বাবা, আমি কত বড় হ'য়েছি!"

বৃদ্ধ চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, বালিকা দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিরস্কার করিবেন বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কন্যার কাছে গেলেন। কিন্তু বালিকা প্রাচীরে পিঠ রাখিয়া আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দেখ দেখ, আমি এখন কত বড় হয়েছি।"

তার পর বাহুবন্ধনে পিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সে তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা, আজ আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

পিতার বোধ হইল, কেহ যেন শীতল তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল। উত্তেজিত বালিকাকে তিনি নানারূপে শান্ত করিলেন।

বহুক্ষণ পরে যখন বুঝিলেন, সে শান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন

দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া অপরাধীর ন্যায় সন্তর্পণে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কক্ষত্যাগ করিলেন! পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতে আর সাহসে কুলাইল না। নতমস্তকে কুণ্ঠিতভাবে তিনি বাহিরে আসিলেন।

* * * * *

আজ ম্যাথিয়া ক্রোল শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিবেন। অদ্য রজনীতে চির-ঈপ্সিত রাজার ভূমিকা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আজ পৃথিবীর অন্ধকার তাঁহার চক্ষে পড়িতেছিল না, তুচ্ছ ধরণীর ঊর্দ্ধদেশে, মেঘলোকে আজ তিনি যেন বিচরণ করিতেছিলেন। নিজের রাজ্যে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত! এখন তিনি রাজা। হিরণ্ময় মুকুট মাথায় পরিয়া, মহার্হ বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, সামন্তবর্গ ও বিচিত্রবেশধারিণী মহিলাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার বোধ হইল, অবনতশীর্ষ সভাসদগণ ও মহিলাবর্গের পশ্চাতে শিশু রাজকন্যারা নতমস্তকে তাঁহাকে—অভিবাদন করিতেছে! কিন্তু তাঁহার পরিধানে ছিন্ন জীর্ণ মলিন বসন কেন?

যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা তখনও সিংহাসনে উপবিষ্ট; পলকহীন-নেত্রে তিনি রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যাভিমুখে, যেখানে বালিকা নতজানু হইয়া অভিবাদন করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিমেষমধ্যে তিনি বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে তখনও নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। বালিকার নয়নে আনন্দ ও তৃপ্তির বিমল, উজ্জ্বল দীপ্তি। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বালিকা পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বহুদূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় অস্ফুটস্বরে মধুর কলধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "আমার রাজা, আমার বাবা!"

সেই আনন্দপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার জ্যোতির্ম্ময় হর্ষবিস্ফারিত নেত্রযুগল ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ-প্রস্রবণ সহস্র ধারায় যেন উৎসারিত হইয়া উঠিল। একটা গভীর বেদনাও যুগপৎ যেন হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বালিকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া রাজবসনে তিনি তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

* *

সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিল, তিনি দেখিলেন, বালিকা একখানি জীর্ণ

কৌচে শায়িত। তিনি তাহার সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাড়াইয়া। বালিকার কপোলদেশ আরক্ত, তাহার নয়নযুগল নিমীলিত। প্রাচীরবিলম্বিত আলোকাধার হইতে মৃদু দীপালোকশিখা তাহার মুখের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

দরজা মুক্ত হইল; পরক্ষণেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ম্যাথিয়া কন্যার পার্শ্বে একাকী দাঁড়াইয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। নয়নের পলক ফেলিতেও বুঝি তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল। চারি দিকে কি বিরাট নীরবতা! এমন ভীষণ নির্জ্জনতা তিনি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মস্তকস্থিত পিত্তলের মুকুটে আলোকরেখা পড়িয়া এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। স্কন্ধদেশবিলম্বিত কুঞ্চিত রাজবেশ ভূমি চুম্বন করিতেছিল।

মুকুটধারী রাজা অচঞ্চলভাবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি কন্যার পানে চাহিলেন; চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালিকার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, নাসিকা বিস্ফারিত করিল। সে নয়ন নিমীলিত করিল।

বালিকার স্বপ্নালস নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। সে যেন তখন কোনও অপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র মধুর দৃশ্য দেখিতেছিল। তৃপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল যেন হাসিতে লাগিল। পিতার রাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "রাজকুমারী, আমার রাজকুমারী!"—ইহাতেই তাহার তৃপ্তি, আর অধিক সে চাহে না। তার পর সে চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিল।

বৃদ্ধ সমস্তই দেখিলেন, বুঝিলেন, সব শেষ। মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া তিনি কন্যার মাথায় পরাইয়া দিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে এ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল বলিয়াই কি এই অশ্রুপাত? না, তাহা নয়। বালিকার তৃপ্তি ও সুখ কল্পনা করিয়াই আজ তিনি কাঁদিতেছিলেন। অতঃপর অনন্তকাল সে রাজকন্যার ন্যায় কাটাইবে।

আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বালিকার মৃতদেহের অনুকর্ত্তী হইলেন। রাজবেশ ভূমিতে লুটাইতেছিল। অভিনেতৃগণ সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, এখন তাহারাও মাথার টুপী খুলিয়া অবনত-মস্তকে তাঁহার উভয় পার্শ্বে দাড়াইল। শোক কি আজ তাঁহার শিরে রাজমুকুট পরাইয়া দেয় নাই?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

* রিচার্ড কিসার রচিত কোনও প্রসিদ্ধ জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

কুকুরের মূল্য।

তখন বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সন্ লইয়া রেঙ্গুনে আসিয়া বাস করিতেছি। ছেলে ঐখানেই কাজ করে, ছেলের কাছে ছেলের মত হইয়া থাকি,—খাইদাই ঘুমোই, ফরমায়েস মত সব জিনিসপত্র পাই, নাতিপুতি লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাই।

আমাদের বাড়ী ঠিক রাস্তার ধারেই ছিল, সাম্‌নে ফুল-বাগান।

সেদিন অপরাহ্নে সাম্‌নের বাগানে বসিয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলাম; বুড়ো কুকুর জিমি কিছুদূরে ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, চাঁপাফুলের গন্ধে তখন বুড়াবয়সেও মনটা কেমন্ কেমন্ করিয়া উঠিতেছিল।

গল্প করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ বর্ম্মাবাসী পথে চলিতে চলিতে আমাদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুকুরের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, "জেয়া" "জেয়া" বলিয়া ডাক দিল,—কুকুরটা নেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া আনন্দে লোকটির চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল।

আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

লোকটি তখন আমাদের কাছে আসিয়া কহিল, "ক্ষমা করিবেন, যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

আমি কহিলাম, "স্বচ্ছন্দে।"

লোকটি কহিল, "এ কুকুরটি আপনারা কোথায় পাইলেন?"

আমি কহিলাম, "অনেকদিন পূর্ব্বে এক সাহেবের নিকট হইতে কিনিয়াছিলাম।"

লোকটি কহিল, "ইহার নাম কি?"

আমি কহিলাম, "সাহেব ইহাকে জিমি বলিয়া ডাকিত—আমরাও সেই নামে ডাকি।"

লোকটি কহিল, "ইহার এক চক্ষু কি পূর্ব্বেই এইরূপ নষ্ট ছিল?"

আমি কহিলাম "হাঁ।"

লোকটি তখন সন্দেহমুক্ত হইয়া যেন আরও অস্থির হইয়া পড়িল; জিমির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর উঠিয়া বসিতে লাগিল, "বাবুজি, পুরাতন বন্ধুকে আবার অনেকদিনের পর আজ দেখিতে পাইলাম। এ কুকুরটি আমারই ছিল, ইহার একচক্ষু আমিই নষ্ট করিয়াছি। বাবুজি, আমি এ কুকুরটিকে ঠিক ছেলের মত দেখিতাম, আমার একমাত্র কন্যা নিলুয়াও ইহাকে খুব ভালবাসিত। ইহাকে হারাইয়া নিলুয়া দুইদিন জলস্পর্শও করে নাই। তাহার পর আবার যখন ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে কাহিনী—বাবুজি, আপনারা বিরক্ত হইতেছেন—"

আমি কহিলাম, "না, কিছুমাত্র না, আপনি বলিয়া যান।"

আমি লোকটিকে বসাইয়া চা ও চুরুট দিলাম। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল; —"সে অনেকদিনের কথা। তখন কোম্পানির সহিত আমাদের লড়াই বাধিয়াছে। ইরাবতীর বিস্তৃত তটভূমি অধিকার করিয়া ইংরাজসেনা শিবির স্থাপন করিয়াছে; সারিসারি, ছোট ছোট অসংখ্য তাম্বু পড়িয়াছে, সন্নিকটে একটি প্রাচীন বুদ্ধিমঠের মধ্যে সেনাপতি রহিয়াছেন; চারিদিকে চাঁপা, নাগেশ্বর, নারিকেলের বড় বড় গাছ, তাহাদের গা দিয়া একটি উচ্চ প্রাচীর মঠটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

"তখন আমার বয়স পঞ্চাশ হইবে, দেহে অসুরের মত বল, একলাই দশবিশজনকে অনায়াসে সাবাড় করিতে পারিতাম।"

আমি কহিলাম, "চেহারা দেখিয়াই তাহা অনুমান করা যায়।"

লোকটি বলিতে লাগিল, "আমাদের এক ডাকাতের দল ছিল, আমি তাহার সর্দার ছিলাম। আমরা মনে মনে জানিতাম, লড়াই করিয়া ইংরাজের সহিত কোনমতে পারিয়া উঠিব না—পদস্থ সৈনিকপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করিবার ভার আমার উপর পড়িল।

"তখন বর্ষাকাল, প্রতিরাত্রেই অল্পবিস্তর ঝড় বৃষ্টি হইতেছে।

"অন্ধকার রাত্রে গোপনে একদিন আমি সেনাধ্যক্ষের আবাসস্থানটি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গেটের কাছে যত কড়াকড় পাহারা, অন্যস্থানে ততটা নাই।

"ইহার পর একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া প্রাচীরের চারিপাশ

ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একস্থানে ভিতর হইতে একটি লতাবৃক্ষ উঠিয়া প্রাচীরের বাহিরদিকেরও অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া একটা ঝোপের মত করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন স্থানটি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এবার যেদিন গেলাম, আমার সঙ্গে সিঁদ কাটি ও অন্যান্য যন্ত্র ছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রাচীরের গায়ে—আমার তখনকার বিপুল বপু যাহাতে সহজে প্রবেশলাভ করিতে পারে, এমন একটি গর্ত্ত করিলাম। গর্ত্তের উভয়মুখ লতাবৃক্ষের ঘনপল্লবে অদৃশ্য রহিল।

"অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক্ নিস্তব্ধ। আমি আস্তে আস্তে গর্ত্ত দিয়া শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিলাম;—দেখিলাম, দূরে মঠগৃহের একটি কক্ষ হইতে আলো আসিয়া বারাণ্ডার এককোণে পড়িয়াছে, সেখানে বাঘের মত এক প্রকাণ্ড কুকুর থাবা পাতিয়া পড়িয়া আছে;—তাহার চোখ দু'টা আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, যেন সাক্ষাৎ যমদূত। আমার অগ্রসর হইবার আর সাহস হইল না। ফিরিয়া আসিলাম।

"অন্য একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সেদিন কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াছি, পরক্ষণেই দেখি, দুইজন অশ্বারোহী গেটের কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইল, দুইজনে চুপিচুপি কি কথা কহিতে লাগিল। আমার মনে হইল, একজন আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইল। আমি আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। অশ্বারোহীদ্বয়ও সেইস্থানে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়া দুইটিকে বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করিলাম।

"এবার আমি মরিয়া হইলাম। জীবনমরণকে তুচ্ছ করিয়া একদিন গভীর রাত্রে আমি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে বারাণ্ডার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে সেই কুকুরটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমার কাছাকাছি আসিয়াছে, আমি সজোরে তাহার মুখে ছোরা বসাইয়া দিলাম; সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে এক সৈনিকপুরুষ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Block by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

হইয়া আসিল,—তাহার এক হাতে আলো, অন্য হাতে পিস্তল। আমি বুঝিলাম, ইনিই সেনাপতি। কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই চারিদিক্ হইতে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

"আমি কুকুরকে চিনিতে পারিলাম; কুকুরটিও আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল, আমার বুকের উপর বারবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার গা চাটিতে লাগিল। সেনাপতি "জিমি" "জিমি" বলিয়া কুকুরকে ডাকিতে লাগিল—সে তাহাতে কাণ না দিয়া নেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার চারিপাশে কেবল ঘুরিতে লাগিল।

"সেনাপতি আমাকে প্রাণে মারিল না—আমি বন্দী হইয়া গৃহরুদ্ধ হইলাম। কুকুরটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল,—ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহির হইতে সে দরজা আঁচড়াইতে লাগিল। সমস্ত রাত আমি তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম।

"প্রাতে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যখন দ্বার মুক্ত হয় দেখিলাম, বহির্দ্দেশের দ্বারপ্রান্ত রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। কুকুরটি সেখানে দাড়াইয়া আছে।

আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল; কুকুরটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল, লাফাইয়া লাফাইয়া আমার চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল, সম্মুখে আসিয়া করুণ-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কত কি জানাইল। তাহার পটি-বাঁধা চোখ দিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে।

"আমি যতক্ষণ না গেট পার হইলাম, কুকুরটি আমার সঙ্গ ছাড়িল না; আমার সহিত বাহির হইয়া আসিতেছিল, একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি বন্দী হইয়া রহিলাম। যুদ্ধশেষে আমি মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু কুকুরটিকে আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। আমার তাহারই কথা মনে হইত।"—

"বাবুজি, ইহাদের প্রাণ আছে, মানুষের মত ইহারা অনেক কাজ করে"—বলিয়া লোকটি বারবার কুকুরের [illegible]

ব্রহ্মদেশবাসীর এই কাহিনী শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। আমি কহিলাম, "এ কুকুরটি আপনাকে আনন্দের সহিত দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।"

লোকটি তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠিয়া আসিয়া, আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাবুজি, আমি কি বলিয়া আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব, আপনার এ দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।"—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল আমার হাতে ঝরিয়া পড়িল।—লোকটি পুনরায় কহিল, "আমার নাম উথা-ওয়ে, আমি কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই—আপনাকে আমার ঠিকানা দিতে পারিলাম না, কিন্তু যখনই সুবিধা পাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

লোকটি আমাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল—"জেয়া" বলিয়া ডাকিতে কুকুরটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দান করিয়া আমি জীবনে কখনও এত সুখ পাই নাই।

একমাস পরে আমার নামে এক পার্শেল আসিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ উজ্জ্বল চুণী রহিয়াছে; এক টুক্‌রা কাগজে লেখা—উথা-ওয়ের কৃতজ্ঞতার উপহার।

অনেক যায়গায় চুণীটি যাচাই করিলাম—সকলেই বলিল, ইহার মূল্য দশহাজার টাকার কম নহে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃপূজা।

শ্যামার কৃপাণসম দীপ্ত দীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা,
দুলিয়া উঠিল দূরে—মৌন শান্ত দিক্‌প্রান্তভাগে;
থামিছে ঝিল্লীর গান—স্তব্ধ নীড়ে পাখী জাগে-জাগে,
ছিন্ন হ'ল আঁধারের ছায়াময়ী মায়া-যবনিকা।
চিরপ্রেমস্মৃতিমুগ্ধা সুধাধরা স্বপ্নকন্যাগণ
দূর ছায়াপথ হ'তে,—লীলায়িত অস্ত নীলাঞ্চলে,—
মুকুতা ছড়ায়ে গেছে পুষ্পে পর্ণে শ্যামদূর্ব্বাদলে;
স্থলপদ্ম হাসে ঘুমে,—মর্ম্মরিয়া উঠে বেণুবন।
শিহরিছে চরাচর ধরণীর সুরভি নিশ্বাসে,—
মরি—মরি! সারানিশি সুপ্তিহারা শেফালি'-বীথিকা,

[illegible]
[illegible]

মা-অঙ্গণের দিব্য নব রক্ত মদিরা-প্রবাহে
ভেসে এল স্বর্ণগন্ধ-স্বপ্নমাখা তরুণ তপন!
উঠিছে দীপ্তির জল—ভেসে গেল পদ্মের স্বপন,
ফুটিছ কমলা লাজে নীল জলে লুকাইতে চাহে!

শুন শুন কলরোল!—শুভশঙ্খ উঠিয়াছে বাজি,
ভেসে আসে ধূপগন্ধ প্রভাতের মন্থর সমীরে,—
নবীনের মহামন্ত্রে সাধকের মন্দিরে মন্দিরে
খুলিয়াছে রুদ্ধ দ্বার; কি আনন্দ,—মার পূজা আজি!

পদ্মবনে দেখি মা গো, দুটি রাঙা চরণ তোমার,
চরণে কিশোর ভানু রক্তলিপ্ত কনক-মুকুটে,
কনকময় গিরিবনে ঝলমলিত চেলাঞ্চল লুটে'
গোমুখী-নির্ঝরে সদা ভরিছ রুদ্রকণ্ঠহারে!

আয় মা, চিন্ময়ী চণ্ডী, তেজোবৃত্তা, সর্বার্থসাধিকে,
স্নেহহাস্যমাখা মুখে এস দেবী, এস বিশ্বরূপে;
তুচ্ছ বিদ্রূপের দীপ্তি বিভাসিত প্রতি রোমকূপে,
ভ্রূকুটি-বিকুঞ্চিত চক্ষু ক্ষমাভরা চাহে চক্ষু নিকে!

শান্ত আজি হোক বৃত্ত, মত্ত যারা, উঠুক হাসিয়া,
ছুটাও মা, রুদ্রশক্তি কামনার ক্লান্তির মাঝে,
ত্যাগে দুখে তপস্যায় পুণ্যপূত ভক্তিধীর সাজে
লইব মা! বাজে যেন মহামুক্তি শঙ্খটি বাজিয়া!

যৌবনে বলির রক্তে অভিষেক করি মা তোমার,
চেয়ে আছে ভক্তসখা শিবময়ী তোমা ত্রিনয়নে,
মৃত্যু মা চরণস্পর্শে ধন্য হবে এ দগ্ধ ধরণী,
মর্মান্তিক সত্যরূপে সাধকেরে যে মা, জাগিবারে!

[illegible]

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতি-গ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টি রকমের আছে, এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃ-ভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনও বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনও বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই; চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূল রূপে সাধকের হৃদয়মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃণ্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাঙ্গালার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী-পাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপতপে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে মন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এ দেশে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধ-তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য পরি-লক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমান

ধর্ম্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্ত্তিপূজাকে "বোধ্‌পরস্ত্" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া, অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালা দেশেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এমন সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্ত্তিপূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা এ দেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্ত্তি ভাবময়ী মূর্ত্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে, ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণে কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খৃষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজিশিক্ষিত আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজিনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবারাধনার ইহা মূলতত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বস্থে ও সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য, নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে

সদা প্রণত। এই অহং-মমেতি-ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্রভাব জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতি-জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্ত্তনা;—জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে; প্রথম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে—নিম্নাধিকারীর পক্ষে, প্রবৃত্তি-মূলা-সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আবার সন্ন্যাস-সংযম, সর্ব্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্ব্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তি-মার্গে ভোগ নাই; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে; কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জ্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থালী, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য,—আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের মূলে এই সর্ব্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রসময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাবসাগরের বুদ্‌বুদমাত্র। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব;
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দু'টোর একটা করে যাব!"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তি-সূত্রকার বলিয়াছেন,—'ঈশ্বরস্যেষ্টৌ একোঽপি বলী।"—ঈশ্বর-তুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোপপত্তির উদ্দেশ্যেই সাধনা। সংসারমাত্রই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা

করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি-জন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্রপ্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এ সকল সম্বন্ধই ত আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই ত তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্ত্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি বর্ণ-ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংযুক্ত হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন, আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহ-পূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া, বাঙ্গালায় দেবতার পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মাই সর্ব্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর, গৃহস্থলী। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ী আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ দুঃখ আছে, অভাব অভিযোগ আছে, জ্বালাযন্ত্রণা আছে; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ী আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুন্‌ব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

যদি এসেন মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কর্ণা কয়,
তবে ম্যায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মান্‌বো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙ্গালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা;—যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার ভুলী, পুটী, বুড়ী যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, পার্ব্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। সকল ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি; তখন ঠিক ভাবের মত রূপই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময় রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে ভাবের যে বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে সকলই মানস, প্রাকৃত নহে। ইংরেজিতে তাহাকে halucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সামলাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয়। অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ঘন দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার প্রভাব, কাম ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এ সকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্য্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কেমন শক্তির প্রভাবে ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু সেখানে দেখিতে পাই, হোতিপেতি যন্ত্রমন্ত্রধারিণী, সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্ব্বরূপে হৃদয়-আকাশে স্থিরদামিনীর ন্যায় কোটী সূর্য্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্য্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্ত্তির পূজা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের

শ্রীমৎ সদানন্দ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাঙ্গালায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মহাসমীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়া আগমবাগীশই এই দশভুজার পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। কার্পাসচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্য্যন্ত দশভুজা মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে ভাবের দ্যোতনা আছে। সে ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে যে মা শ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষাতৃষ্ণা, নিদ্রা-মায়ারূপে বিরাজমান, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের আনন্দের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া তুমি ত ভাবের ভাবুক হইলে, তবে ত ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন —এ মা কিসের? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহা ত ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রে খোসখেয়ালের কথা নাই। কর্ম্ম আছে, ফলশ্রুতি আছে। কর্ম্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম্ম করি, সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে শাস্ত্র মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম্ম—কর্ম্মীর ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝান যায় না, তাহা কার্য্যে করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালায় কর্ম্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্ম্মও লোপ পাইতেছে। কর্ম্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাঙ্গালার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল; অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আধিয়া চুবিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসার-দাবদাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। এক দিকে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসীপুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্য দিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুররসের

অপূর্ব্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস উপহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন,—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃণ্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর এক জন ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"জান রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রের—উপনিষদ্ শাস্ত্রের—উপনিষদ্‌রাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী ভাবময়ী, এ কথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানিতেন, তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্ম-ময়—ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাঙ্গালা মর্ত্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময়-স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কথাটা ভুল কথা বলিয়া রাখিলাম; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে সে-কথা কহিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব মেঘদূত।

[মহাকবি-কালিদাস বিরচিত মেঘদূতের যক্ষ যেমন মেঘকে দূত করিয়া অলকাপুরীতে পাঠাইয়াছিল, এই কাব্যের নায়িকা রাধিকা দেবীও তেমনই মেঘকে দূত করিয়া দ্বারকাপুরীতে দ্বারকানাথের সমীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার আদ্যোপান্ত সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হইয়াছে।]

১

রৌদ্রে ক্লান্তা বিকল কুমুদী কম্পিত দেহপার্শ্বে,
বাপে বিদ্ধা বিভ্রান্ত হরিণী আকুলা ম্লাননেত্রা,
নৃত্যোন্মত্তা-মুখর যমুনা-শিঞ্জিতা ভূমিকুঞ্জে,
ক্ষোভে যাপে দিবস-রজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা।

২

শূন্যজ্ঞানা কদম কভু বা ধারিছে কর্ণকর্ণে,
আস্যে হাস্য, হরির বরণে সাজিছে পীতিপুচ্ছে,
গুচ্ছে গুচ্ছে কুসুম কভু বা আনিয়া চন্দ্রহাসা
ফুল্লাহারে মধুরমধুরা রাজিছে গাঁথি' কাঞ্চী।

৩

ভারে ভারে রতন মুকুতা ধারিছে স্বর্ণবর্ণা,
উচ্চশ্বাসে কখন ভয়মে সাজিছে যোগি-পত্নী,
সে ঝঙ্কারে কভু সু-উরসে রাখিয়া মিষ্ট বীণা,
সে ফুৎকারে কভু সু-অধরে চুমিয়া ইষ্ট বংশী।

৪

কুঞ্জে কুঞ্জে চপলচরণা হেরিয়া কৃষ্ণচূড়া
"চূড়াচোরা!" ধমকি' বলিয়া তাড়িছে সে ধরারে,
চিত্তোদ্‌ভ্রান্তা দখিন চরণে বাঁধিয়া কণ্ঠমালা,
মোহে মুগ্ধা কনক-রশনা চাপিছে-চারুকণ্ঠে।

৫

প্রেমোন্মত্তা বিপিন-হরিণে ধারিয়া যুগ্ম হস্তে
আশাপূর্ণা মধুর বিনয়ে ভেজিছে কৃষ্ণ-পার্শ্বে;

নেত্রে লজ্জা হরিণ নিরখে কৌতুকে মোহমৌনী
মর্ম্মস্পর্শী শ্রবণপরশী রাধিকা-নেত্র-তারা।

৬

স্পর্শে হর্ষে কখন মলয়ে সাদরে মানি' দৌত্যে
সে দূতাঙ্গে অগুরু রুচিরে লেপিছে হাসি উচ্চে ;
পত্রে পত্রে পবন স্বনিছে, বঞ্চিতা সেই শব্দে
ভ্রান্তা ভাবে পবন চলিছে দ্বারিকা—কৃষ্ণধামে।

৭

লীলালোলা বিজন বিপিনে আটকে সে ময়ূরে,
হর্ষে আসে মধুর বচনে ভাষি' "যা রে শিখণ্ডী !
তালে তালে বিরচি' বরহে মোহিনী নৃত্যলীলা,
দাও কৃষ্ণে জয় জয় শবদে কণ্ঠলগ্না এ পত্রী।"

৮

পুষ্পে পুষ্পে মধুপনিকরে প্রেক্ষিয়া সে বরাঙ্গী,
সে সম্ভাষে ললিত বচনে ভ্রামরে দূত মানি,
ঝাঁকে ঝাঁকে সুমুখ কমলে ঝাঁপিছে ভৃঙ্গমালা,
ত্রস্তা রাধা উছল-বসনে বারবারে নিবারে।

৯

সিন্দূরাভা খ-মণি ঝলকে ভাতিয়া ভাল-অভ্রে,
কণ্ঠে কর্ণে পদভুজবদনে বাঁধিয়া পুষ্পবর্ণে,
মুগ্ধা রাধা কুসুম-মুকুটে সাজিয়া কৃষ্ণরাণী,
ধ্যানে মগ্না চমকি' নিরখে দ্বারিকা চিত্তচোরা।

১০

লালে পীতে সবুজ কুসুমে ভূষিয়া অঙ্গবল্লী,
ক্ষিপ্তা রাধা কখন মুচকী গর্জ্জিছে ইন্দ্রচাপে ;
হাস্যধ্বানে বিকচ দশনে সাজি' কালী করালী ;
লোলা জিহ্বা ঝলকি' কভু বা নাচিছে মুক্তকেশী।

১১

পূর্ব্বে দ্রষ্টা নয়ন-কুমুদে মোদিয়া শুভ্র সৌখ্যে
নিত্যানন্দে পুলকে ধরণী ঢালিয়া জ্যোতি-বন্যা,

নিন্দি' স্বর্গে অতুল ছিল যে রাধিকা-বক্ত্র-চন্দ্র,
রাহুগ্রাসে মলিন অধুনা, রোদিছে সে সুধাংশু।

১২

নীপে নীপে বিজুলি চমকে ধাঁধিয়া কেশ মেঘে,
নিম্নে দোলে সু-গল-রুচিরে যূথিমালা-বলাকা;
বৃন্দারণ্যে উরিল বরষা ভাবি' নাচে কলাপী;
আহা! রাধা সজল নয়নে আজি বর্ষা শরীরী।

১৩

হর্ষোৎফুল্লা হসিতবদনা গৌরবে শুভ্র গৌরী,
সদ্যঃ-স্নাতা তরল কনকে শারদী রাত্রি-তুল্যা,
রম্যা রাধা দিবস দিবসে শোকখিন্না হতাশা,
শীতক্লিষ্টা শতদলনিভা ত্যাগিলা পূর্ব্বশোভা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বাড়ী-বিক্রয়।

দরজার মাথায় বড় বড় অক্ষরে একটুক্‌রা কাগজে লেখা,—"বাড়ী-বিক্রয়।" অনেকদিন ধরিয়া সেটি সেখানে ঝুলিয়াছে, গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে পুড়িয়াছে, শরতের স্নিগ্ধ সমীরণে মৃদু মৃদু দুলিয়াছে।

বাড়ীটি জীর্ণ। মেটে রাস্তার ধূলাকাদা বাগানের লাল রঙ্গের সুরকী-গুঁড়ার সঙ্গে একত্র মিশিয়া যাইত। সেই নির্জ্জন স্থানে বাড়ীটিকে দেখিলে পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইত। প্রাচীরের পার্শ্বের ছোট চিমনী হইতে নীল রঙ্গের ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া কেবল জানাইয়া দিত, সেই বাড়ীতে ধোঁয়ার মতই আনন্দহীন এক জন বাস করে—আনন্দময়ী প্রকৃতির মাঝখানে থাকিয়াও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই।

পথে চলিতে চলিতে পথিকেরা ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইত, উদ্যানমধ্যস্থিত ছোট পুষ্করিণীর পাড়ে গাছে জল দিবার টব্, মাটী কোপাইবার কোদাল, শাবল প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। লাল সুরকী-ঢাকা সরু সরু পথগুলি পরিচ্ছন্ন। কুটীরটি রাস্তার ধারেই—একটু নীচু ভাঙ্গা জায়গার উপর অবস্থিত। খোঁটা পুতিয়া রাস্তার সমান উঁচু করিয়া,

একটি মাচার উপর কুটীরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দূর হইতে ইহাকে তৃণাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্-গৃহ বলিয়া ভ্রম হইত। গাছ পুঁতিবার শূন্য টব্‌গুলি উল্টান রহিয়াছে, 'জেরেনিয়ম্', 'ভার্‌বিনা' স্তরে স্তরে সাঁদা বালুকার উপর সজ্জিত। উদ্যান-মধ্যে দু' একটি শাখাবহুল 'প্লাটান' গাছ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে নানারকম ফলের গাছ,—ষ্ট্রবেরী, মটর ইত্যাদি।

প্রকৃতির এই সুষমা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ খড়ের টুপী মাথায় দিয়া বাগানের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত, সকাল-সন্ধ্যায় ফলগাছগুলির গোড়ায় জলসেচন করিত, গাছের শাখা ছাঁটিয়া দিয়া তাহাদের বাহার শতগুণ বাড়াইয়া দিত।

বৃদ্ধের সহিত কোনও প্রতিবেশীর আলাপ ছিল না—রুটীওয়ালা ভিন্ন আর কেহই বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত না। ফলভারাবনত তরুরাজি ও ভূমির উর্ব্বরতা দেখিয়া কখনও কখনও দু' এক জন পথিক রাস্তায় থমকিয়া দাঁড়াইত, এবং দরজার মাথায় দোমড়ান কাগজে "বাড়ী-বিক্রয়" লেখা দেখিয়া, কুটীরের সেই ভাঙ্গা দরজার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিত। প্রথমে কোনও উত্তর পাওয়া যাইত না। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়িলে বাগানের ভিতর মস্ মস্ শব্দ শোনা যাইত, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃদ্ধ খিল্ খুলিয়া দরজাটি একটু বাঁক করিয়া বিরক্তি-সহকারে বলিয়া উঠিত,—"তুমি কি চাও?"

"এ বাড়ীটা কি বিক্রয় করিবেন?"

অতিকষ্টে বৃদ্ধ উত্তর করিত, "হাঁ, কিন্তু এ বাড়ীর দাম খুব বেশী।" বলিতে বৃদ্ধের চোখ জলে ভরিয়া আসিত, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি কম্পিতহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার পর সে বাগানে অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে থাকিত, এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় মাঝে মাঝে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিত। পথিকেরা বৃদ্ধের এইরূপ ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া যাইত; পথে তাহারা বলাবলি করিত, "আচ্ছা, লোকটা পাগল নাকি! বাড়ী বিক্রয় করিবে লিখিয়া দিয়াছে, অথচ এরূপ করে কেন?"

কিন্তু এই গূঢ় রহস্যের অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। একদিন বৃদ্ধের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম, বাড়ীর ভিতর গোলমাল হইতেছে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

[illegible] এ বাড়ী তোমাকে নিশ্চয় কিনিতে হইবে—তুমি আমাদের [illegible] করিয়াছ।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিতেছে, "কিন্তু দেখ, আমি ত তোমাদের অন্য কিছুই করি নাই। বাড়ী কিনা করা সেটাই ত আমি [illegible]....." বাকী কথা গলা ধরিয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

ক্রমে জানিলাম বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূগণ প্যারি নগরের [illegible] —অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তাহারাই এই বাড়ীটি বিক্রয় করাইবার [illegible] আছেন বলিয়াছে। কেন, তাহা জানি না। বাড়ীটি বিক্রয় করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূগণ প্রত্যেক রবিবারে আসিয়া বৃদ্ধকে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিত—রবিবারের ছুটির অপরাহ্ণ পর্য্যন্তও তাহাকে উপভোগ করিতে দিত না।

আমি যখনই রবিবারে ঐ পথ দিয়া যাইতাম, তখনই শুনিতে পাইতাম বৃদ্ধের পুত্রগণ 'টনো' খেলিতে খেলিতে বাড়ী-বিক্রয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে, এক-একটা কথার প্রসঙ্গ উঠিলেই বিকট চীৎকারে সেই উদ্যানটি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

সন্ধ্যা হইলে সকলে বৃদ্ধের নিকট হইতে চলিয়া যাইত। বৃদ্ধ আলো জ্বালিয়া আগাইয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চশমা মুছিয়া দিত। বৃদ্ধের মুখে তখন একটু হাসি দেখা দিত। আবার আসিবে রবিবার! সে এখনও সাত দিনের কথা! এ কয় দিন ত সে নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবে।

রবিবার ছাড়া অন্যদিন কুটীরে কোনও গোলমাল শোনা যাইত না। কেবল বৃদ্ধের পায়ের জুতার শব্দ মাঝে মাঝে বাহির হইতে শোনা যাইত।

বাড়ী বিক্রয় করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বৃদ্ধের পুত্রগণ তাগিদ করিতে আরম্ভ করিল; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিয়া বৃদ্ধকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত।—বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নাতি নাতিনীরা আব্দার করিয়া বলিত, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে চল। তুমি আমাদের নিয়ে খেলা করবে,—আমাদের খুব আদর করবে, চল না দাদা, আমাদের সঙ্গে!" বৃদ্ধের পুত্রেরাও তাহাতে যোগ দিত, বলিত পুত্রবধূগণ, বাড়ীটি কত টাকায় বিক্রয় হইবে, তাহার হিসাব করিত।

পরিত। বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়া নাতি নাতিনীদের কোলে টানিয়া লইত।

একদিন শুনিলাম, গ্রামের এক পুত্রবধূ বলিতেছে, "বুড়ীর দাঁত এক গাছও হইবে না,—এটাকে ভেঙে ফেলাই উচিত।" আর এক জন এমন ভাবে কথাগুলি কহিল, [illegible] সেপ্টেম্বরই পরিয়া গিয়াছে, এবং তাহার কুঁজীরটিও যেন ভাঙ্গিয়া [illegible] গিয়াছে। এক সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তাহার চোখে জল [illegible]; সে তাড়াতাড়ি [illegible] অগ্রভাগ দিয়া গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে লাগিল।

এই দুইটি মনস্তত্ত্বের আর বিশেষ [illegible] সেই বৃদ্ধ [illegible] অপরিচিত [illegible]—কেহ তাহাকে নড়াইতে পারিত না। [illegible] ছেলেদের মোজাকে [illegible] কথা ভুলাইবার চেষ্টা করিত। [illegible] শীতকালে রাত্রে [illegible] এলুতি [illegible] সময় হইত, তখন এই পুত্রগণকে [illegible] পাঁচ [illegible] হইলে আমি নিশ্চয়ই বাড়ী বিক্রয় করিয়া ফেলিব।"

চেয়ার, পাঁঠা, আমুর, সমস্তই একে একে [illegible] যাইত; 'মেডুয়ার' [illegible] উঠিত; কিন্তু বৃদ্ধের বাড়ী বিক্রয় আর হইত না।

তাহার পর শীতকাল। শীতকালে সে পথে কেহ বড় একটা যাতায়াত করিত না, কোনও ক্রেতাও জুটিত না। এমন কি, শীতকালে তাহার পুত্রগণও আসা বন্ধ করিত। বৃদ্ধ এই তিন মাস বেশ নিশ্চিন্তমনে সময় কাটাইত, [illegible] উদ্বেগ থাকিত না। এই সময় সে উদ্যানে পুনর্ব্বার নূতন গাছ রোপণ করিত, যেসব গাছের ডাল ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিত। তখন শীর্ণ কলেবরে "বাড়ী-বিক্রয়" মোটটি দুয়ারে ঝুলিত হইয়া শীতের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া খেলা করিত।

বৃদ্ধের মতলব বুঝিতে পারিয়া পুত্রেরা আর কি [illegible] করিতে [illegible] ছাড়িল। গ্রামের এক পুত্রবধূ সেই কুটীরে [illegible] করিতে আসিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুখোমুখি [illegible] বসিয়া থাকিত, এবং মুখখানা ঝুলিয়া পড়িলেই [illegible] করিতে করিতে বলিত, "এ বাড়ীটা একবার বেচুন না—এটা বিক্রয়।"

পুত্রবধূ আসিয়া অবধি বৃদ্ধের [illegible] তিনি [illegible] অভ্যস্ত ব্যক্তি যেমন মনের ভয় দূর করিবার [illegible] [illegible] করিতে আলবাল. [illegible] সেই পুত্রবধূর আসিবার [illegible] [illegible] বৃদ্ধের স্ত্রী যখন

করিত। পুত্রবধূ শ্বশুরকে বলিত, "বাঃ! আর বীজ বুনিয়া কাজ নাই। দু' দিন পরেই ত বাড়ী বিক্রী হইয়া যাইবে, তবে মিছিমিছি এত কষ্ট করিবার কি দরকার!" বৃদ্ধ কথার উত্তর না দিয়া একমনে কাজ করিয়া যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বাড়ীখানিকে অপরিচ্ছন্ন রাখিবে না, ইহাই তাহার ইচ্ছা। বাগানটি সর্ব্বদাই ঝকঝকে তকতকে থাকিত—কোনখানে আগাছা পর্য্যন্ত ছিল না।

তখন ঘুঘুর সময়। পুত্রবধূর সাজসজ্জা ও সুমিষ্ট হাসি সত্ত্বেও বাড়ী কিনিবার খরিদ্দার জুটিল না। পুত্রবধূও ক্রমে এই একঘেয়ে ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই পল্লীগ্রামে বসিয়া থাকিলেও ত চলিবে না,—তাহার দোকানের ক্ষতি হয়। সে বৃদ্ধকে বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। অযথা তিরস্কার করিতেও ত্রুটী করিল না। বৃদ্ধ নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল। সে তাহার নবরোপিত বীজগুলি ক্রমে অঙ্কুরিত হইতেছে, ভাঙ্গা দরজার গায়ে "বাড়ী বিক্রয়" লেখাটি এখনও যথাস্থানে থাকিয়া বাতাসে দুলিতেছে দেখিয়া, মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিত।

এবার এই পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়া কুটীরটি আবার দেখিলাম বটে, কিন্তু সেই "বাড়ী বিক্রয়" লেখাটি আর দেখিতে পাইলাম না। এতদিনে তাহারা বাড়ীটি বিক্রয় করিয়াছে। সেই জীর্ণ পুরাতন দরজা আর নাই—একটি নূতন সুচিত্রিত দরজা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। উদ্যানমধ্যে সে সব সুন্দর সুন্দর ফলের গাছ নাই;—ফোয়ারা, বেঞ্চি, চেয়ার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাগানে আমি দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম—একটি পুরুষ ও অপরটি রমণী। তাহারা পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিল। পুরুষটি বেজায় মোটা, তাহার সঙ্গিনীও তদ্রূপ। শুনিলাম, স্ত্রীলোকটি বিকট হাস্য করিয়া বলিতেছে, "আমি পনেরো ফ্রাঙ্ক খরচ করে' ঐ চেয়ারখানি কিনেছি।"

কুটীরের আর সে সরল সহজ, সৌন্দর্য্য নাই। একটি নূতন গৃহ ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে,—সেই ঘরের মধ্য হইতে এক যুবতী পিয়ানোর সুর দিয়া গান ধরিয়াছে। আমার মনে তখন বৃদ্ধের কথাই তোলপাড় করিতেছিল। এই কুটীরে সে-ও একদিন বাস করিয়াছে, কিন্তু সেই একদিন, আর এই এক দিন!

তখন সেই প্যারি নগরের দোকানের ছবি আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম, যেন দোকানের এক কোণে একখানা চেয়ারে

অশ্রুভারাক্রান্ত বৃদ্ধ হতাশমনে বসিয়া আছে—তাহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই; আর তাহার পুত্রবধূরা বড় এক খরিদ্দারকে ঠকাইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া মুদ্রাগুলি বাজাইয়া বাক্সে তুলিতেছে।*

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সে।

১

জীবনে চাহি না কিছু আর,
সুধু—তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখ-খানি!
জ্বলুক যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
সুখী হব, 'সুখে আছে' জানি'।

২

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল।
সরল-অন্তরে হাসিমুখে
সকলি সহিয়াছিল বুকে;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।

৩

বলেছি অনেক রূঢ় কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সে পেয়েছে ভালবাসি'।
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু ফুটে নাই কভু মুখ;
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

৪

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু—ছিল কি সুন্দর!
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পায় পাতিয়া হৃদয়।

---

* সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক Alphonse Daudet-এর একটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

৫

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
জগত-জুড়ান জ্যোৎস্না-রাতি !—
জীবনের জীবন্ত স্বপন !
আপনারে হারায়ে হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন।

৬

পড়ে আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন ;
দেহে দেহ, নাহিক লালসা ;
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা।

৭

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা !
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতিদিবসের কাজ,
চলা বলা চাহনি ভঙ্গিমা !

৮

আহারে বসিলে বসি' কাছে,—
"খাও, নাও, কেন পড়ে আছে ?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা !
নিশায় চরণ-সেবা করি'
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি' ;
প্রভাতে চরণে অধমতা।

৯

যখন যা করেছি মনন,
আগেভাগে করি' আয়োজন
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিশ্বসিয়া।

১০

রোগে জাগি' দ্বিপ্রহর রাতে,—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি!"
দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।

১১

ঘর দ্বার জগত সংসার—
সকলি—সকলি ছিল তার!
আমি নিত্য অতিথি নূতন—
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই;
গৃহ-পানে কভু চেয়ে রই,
অনায়াস দিবস কেমন!

১২

দিত মনে কি ধীর উল্লাস!
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস!
দুখে শোকে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা!
কত শক্তি আপদে বিপদে!
কত শোভা গৌরবে সম্পদে!
ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জ্জনা।

১৩

আজ বুঝি,—আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
বহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,
করেছিনু প্রেম সংযমন;
খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

১৪

বলিনি,—বলিতে ছিল কত।
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত
লয়ে অভিমান রাশি রাশি।
মন খুলে—প্রাণ খুলে তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
"ভালবাসি, বড় ভালবাসি!"

১৫

শূন্য গৃহে বসে আজ ভাবি,—
করেছি প্রেমের সুদৃঢ় দাবী ;
সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসি-মুখে !
শূন্য-প্রাণে চেয়েছে কাতরে,—
প্রেম-বিন্দু দেই নি অধরে,
ম্লান মুখ চাপি নাই বুকে।

১৬

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ বিসংবাদ,
ফুরাইল জীবনের সাধ,
অপ্রকাশ রহিল সকলি !
জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্ল্লভ আজ তাহা !
কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি'।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চুটকী।

(পূজার উপহার)

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পাল।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইন্দ্রচন্দ্র-পাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবীণ ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়েরই অন্তর্ধান হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই জন দিক্‌পাল চলিয়া গেলেন। বাকী রহিলেন কি বায়ু ও বরুণ ? বায়ু ও বরুণ শূন্যগর্ভ (wind-bag) সাহিত্যিক, এবং বরুণ, অর্থাৎ যাঁহার রচনায় নীর নাই, নীর আছে। 'বুঝ লোক, যে জানো সন্ধান'

(২) পলাশী-চূতবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।

'পলাশীর আম্রবনে' দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে, এবং দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমৈশব ইংরাজী পড়িয়া, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই আমি' অবলম্বন করিয়াও বাঙ্গালী ইংরাজী লিখিতে গেলে তাহা 'বাবু ইংলিশ' হইয়া পড়ে। আবার যদি বেচারা 'রাজার নন্দিনী প্যারী'র পায়ে তেল দেওয়া ছাড়িয়া 'দীন দুঃখিনী মা'য়ের ঘরে ফিরিয়া আসে, 'জননী বঙ্গ-ভাষা'র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভাষায় আবার ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ পাওয়া যায়। ছদ্মবেশী যেমন 'পুরুষ কি নারী' চেনা যায় না, ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীর রচনাও সেইরূপ ইংরাজী কি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। কালো লোক কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, জল মাখিলে কালী মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী ইংরাজী লিখিলে বাঙ্গালা-বাঙ্গালা ঠেকে, বাঙ্গালা লিখিলে ইংরাজী ইংরাজী ঠেকে।

(৩) ইংরাজী শিক্ষা।

রূপকথায় একরকম কাজলের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহা চোখে দিলে, যে সব জিনিস শুধু চোখে দেখা যায় না, সে সব দেখিতে পাওয়া যায়, একটা সুন্দর জগৎ চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়ায়। ইংরাজী শিক্ষা ঠিক সেই কাজল। এই কাজল চোখে পরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের প্রাচীন কাব্য নাটক, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ, এমন কি, আমাদের মেয়েলি ছড়া ও ছেলে-ভুলান গল্পের ভিতর যে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন (ও আমাদিগকে দিয়াছেন), তাহা কি ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছিলাম? অথচ অনেকে ইংরাজী শিক্ষাটা দেশ হইতে উঠাইতে চাহেন। তাঁহারা গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার রাধিকার মত নাকীসুরে তান ধরিয়াছেন—

'মুছাইয়ে দে গো আমার নয়নের অঞ্জন'।

(৪) সৌরজগতে কত চাঁদ?

যেমন জ্যোতিষ্কের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ, জহুরীর মধ্যে এক-চাঁদ মোতিচাঁদ, জুয়াচোরের মধ্যে উমিচাঁদ, দেশদ্রোহীর মধ্যে জয়চাঁদ, মাতালের মধ্যে নিমচাঁদ, বাচালের মধ্যে নদেরচাঁদ, সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে লালচাঁদ, জুতানির্ম্মাতার মধ্যে লাকচাঁদ, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারীদিগের মধ্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। (সম্প্রতি নাকি এই বৃত্তি ব্যক্তবৃত্তি হইয়াছে।)

(৫) হিন্দু-বিবাহ।

হিন্দুবিবাহ শ্রাদ্ধাদি দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। ইহাতে প্রেমের সম্পর্ক নাই, হোমের সম্পর্ক। শাস্ত্রে লিখিয়াছে (অনুষ্টুপ্ হইলেই [illegible] —'ঘৌরঙ্গং দুন্দুলাদপি' (এখানে সমাহারদ্বন্দ্ব ইতি উল্লুকটুকুর [illegible] ও কাঞ্চন—এক পর্য্যায়ভুক্ত, রায়সাহেবের পুস্তক দেখুন; অন্যত্র সমাহারদ্বন্দ্ব বাঁধে না।) 'হুতো বক্ত অদক্ষিণঃ' এইরূপ হতগজগোছের কি একটা শ্লোক আছে। অতএব বিবাহে পণগ্রহণ সিদ্ধ! বাস্তবিক, অর্থলাভের ঐ পন্থা—patrimony ও matrimony! ইহারই একশেষদ্বন্দ্ব inoney?

(৬) সীতা ও বঙ্গনারী।

স্ত্রী শুধু স্বামীর একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, সমস্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে, এইরূপ একটা কথা ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি হিন্দুভাবের লেখকগণ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, দীনেশ বাবু তাঁহার 'রামায়ণ ও সমাজ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, রামের নির্ব্বাসনকালে সীতাদেবী পরিবারস্থ সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার সঙ্গে বনে গেলেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করিলেন না। দীনেশ বাবু বলেন, ইহাই প্রকৃত হিন্দু-নারীর আদর্শ। আমাদের সমাজের নারীগণ এই আদর্শভ্রষ্ট হইতেছেন,

করে এই আদর্শ আবার ফিরিয়া আসিবে, ইত্যাদি বলিয়া দীনেশ বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু আক্ষেপ করেন কেন? হালের মেয়েরা ত বুড় শ্বশুর-শাশুড়ীকে পায়ে ঠেলিয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার ভোয়াক্কা না রাখিয়া, স্বামীর সঙ্গে তাঁহার চাকরীস্থানে দূরদেশে যান। প্রবাস আর বনবাস ত একই। তবে আজকাল লক্ষ্মণ দেবর সঙ্গে যান না; স্বামীর ভাই অপেক্ষা পত্নীর ভাই-ই বেশী আদরের। তাই অনেক সময়ে শালাবাবুই এই প্রবাস-যাত্রার দ্বিতীয় সঙ্গী হয়েন। তার পর—সুবর্ণমৃগের সন্ধানে স্বামীকে পাঠান, ত গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম। অতএব তাঁহারা সীতার চেয়ে কম কিসে?

(৭) পারিবারিক জীবন ও ঐকতান-বাদন।

সঙ্গত বাঁধিবার সময় যাহাই হউক, একবার জমিয়া গেলে ঐকতান-[illegible] প্রত্যেক যন্ত্রের স্বতন্ত্র সুর শুনা যায় না, সবগুলি মিলিয়া একটি মধুর ঐক্য-ঝঙ্কার শুনা যায়। প্রকৃত পারিবারিক জীবনেও এই মধুর ঐকতান বিরাজ করে। গীতবাদ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কর্ণজ্বালা উৎ[illegible] পারিবারিক জীবনেও ঐক্যের অভাব হইলে দেখিতে শুনিতে [illegible] হয়। কোনও পরিবারে কর্ত্তার জয়ঢাকের ড্যাড্যাং ডাড্যাং ত[illegible] ত্যক্ত, কোথাও বা গিন্নীর কাঁসীর ট্যাং ট্যাং শব্দে [illegible] কোথাও বা বিধবা মুখরা ভগিনীর বেসুরা বেহালা পিড়ি[illegible] রসভঙ্গ করিতেছে, কোথাও বা ধনীর কন্যা বৌমা তাঁহার [illegible] হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া সমস্ত ঘরটা যুড়িয়া বসিয়াছেন, অন্য [illegible] দিগকে মানে মানে আপন পথ দেখিতে হইতেছে; বৌমা এত [illegible] বাসেন না, একাকিনী তাঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া পাড়া মাৎ করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

(৮) ভাষা ও সভ্যতা।

লোকের ভাষা হইতে সভ্যতা ও আচারবিচারের বেশ [illegible] করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

পাড়াগাঁয়ের লোকে বলে খিদে লাগা, তেতো লাগা; কলিকাতার লোকে বলে, খিদে পাওয়া, তেষ্টা পাওয়া। এই প্রভেদের কারণ কি? পাড়াগাঁয়ে খোলা হাওয়ায় পরিপাকশক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি খুব সতেজ। কাজেই শারীরিক অভাবগুলি তাহাদিগকে তীব্র বেদনা দেয়, [illegible] প্রতিকারে তাহাদিগের রীতিমত পীড়াবোধ হয়। পক্ষান্তরে, সহরে [illegible] করিয়া হজমশক্তি প্রভৃতি (Sluggish) মন্দা [illegible] নিয়ম-রক্ষার জন্য খায়, ঘুমায়; তীব্র আকাঙ্ক্ষা [illegible] একটা কথা, সহরে জীবনসংগ্রাম (Struggle

for existence) বড় কষ্টের, কাযেই আহার নিদ্রা প্রভৃতি সহরের লোকের নিকট এক ঝঞ্ঝাট উপসর্গ। যেমন ভূতে পায়, পেঁচোয় পায়, তেমনই তাহাদেরও ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, ঘুম পায়। এই প্রাকৃতিক অভাবগুলা না থাকিলেই যেন তাহাদের ভাল হইত।

আবার দেখুন, পাড়াগাঁয়ে কোনও প্রতিবেশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে অমুক ব্যক্তি বাড়ী আছেন? কলিকাতায় জিজ্ঞাসা করে, অমুক ব্যক্তি ঘরে আছেন?' পাড়াগাঁয়ে ভেদবুদ্ধি নাই, সমস্ত বাড়ীটাতে পরিবারস্থ সকলের সমান অধিকার। গৃহের এক এক কক্ষে এক এক পাস্ ধামরা রিজার্ভ করা, সেখানে বাহিরি অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ। পায়রার খোপের ন্যায় এক এক খোপে যেড়ে যেড়ে থাকেন। সেখানেই বামুন ঠাকুর ভাতের থালা আনিয়া দেয়, পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা নাই। আহারবিহার সব সেই ঘরে।

আর দেখুন, পাড়াগাঁয়ে বলে, 'সাকো', সহরে বলে 'সাগ্‌গি'। পাড়াগাঁয়ের লোক সাধারণতঃ গরীব, তাহাদের স্বেচ্ছাচারের আদর্শ নীচু, চক্ষু ফিরাইলে তাহারা দেখে ছোট জাত্রা (ছক্কেম,) কিনিবারি মত নহে। সস্তা হইলে খাইব। সহরের লোকে বলে, মাগ্‌গি (মহার্ঘ), দাম বেশী, কিন্তু কেনে। দেড় টাকা সের পটোল, যাট আনা সের ঝিঙ্গের সুতন কিনু, ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে বলে কাপড় কাচা; কলিকাতায় বলে ধোবাণ। সহরে লোক সৌখীন, কাপড় একটু অপরিষ্কার (ময়লা) হইলেই ধোপাবাড়ী দেয়, পাড়াগেঁয়ে লোক যতক্ষণ কাপড় 'কালো' (নীল) না হয়, ততক্ষণ ছাড়ে না।

পাড়াগাঁয়ে বলে, 'সুন্দর', কলিকাতায় বলে, 'ফরসা'। সহরের সৌখীন লোকের রংটা আগে চাই, মানুষের গুণে লোক কেন না তাহারা গৃহের গেম দেখে, পাড়াগাঁয়ের লোক অত কথা বুঝে না, তাহারা 'সুন্দর' চাহে।

(৮) পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন চাউল স্বাস্থ্যের অনুকূল। পুরাতন চাল-চলন বাহ্যিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। ধাত্রে বলে,—

যেনাস্য পিতরো যেন যাতাঃ যেন যাতি।
তেন যায়াৎ সতাং বর্ত্ম ইতি।

তবে তাই বলিয়া [illegible] সেখা নহে। আমাদের [illegible] রোড়শী-বিবাহ যা গো[illegible] ন পুরাতন চাল বিবাহ সেখা নহে। এ সব স্থলে [illegible]

একটু বয়স্ হইলে [illegible] একটু বয়স হইলে [illegible]

চাল-চলনও বরদাস্ত হয় না। যাহাদের অগ্নি প্রবল, অর্থাৎ যুবক-যুবতীদিগের নূতন চাউল বেশ হজম হয়। নূতন চাল চলন, ধরণ ধারণ, কায়দা-কানুনও তাঁহাদের বেশ খাটে সয়। নূতন চাউল খাইতে মিষ্ট, কিন্তু হজম করা কঠিন। নূতন চালচলনও মিষ্ট লাগে, কিন্তু হজম করা কঠিন।

(১০) স্বর ও ব্যঞ্জন।

বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জন দেখিতে পাই। স্বরবর্ণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। মানুষের মধ্যেও ঠিক এই প্রভেদ নাই কি? এক শ্রেণীর লোক [illegible] সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, কখনও [illegible] (Self-m[illegible] [illegible]। [illegible] শ্রেণীর লোক পরের কপালে ফরিয়া খান; কেহ বাপের, কেহ শ্বশুরের, কেহ ভা[illegible] পিতৃনামা চ মধ্যমঃ' প্রভৃতি। কেহ কেহ বা বাহিরের যুদ্ধবন্দী পাকড়াইয়া মানুষ হন। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার ইঁহাদের সাধ্য নাই। এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ। বর্ণমালায় স্বর অপেক্ষা ব্যঞ্জনের সংখ্যা অনেক বেশী; সমাজেও স্বয়ংসিদ্ধ অপেক্ষা পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা অনেক বেশী।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যো[illegible]

ক্ষুদ্র লা-দে-ফ্রুর গ্রামীণ ধর্মমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের অপেক্ষাও দোদুল্যমান ঘণ্টাটি প্রাচীন। উহার স্থানে স্থানে ফাটিয়াও গিয়াছিল। ঘণ্টাধ্বনি বৃদ্ধা নারীর ঘর্ঘর ও কর্কশ কণ্ঠস্বরের ন্যায় শুনাইত। ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলে [illegible] সঞ্চালন করিত, যেন তাহাদের প্রাণে সে শব্দ যন্ত্রণা দিত।

পুরোহিত করেন্‌টিনের বয়ঃক্রম পঁচাত্তর [illegible] তাঁহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল; [illegible] না। বয়োধর্ম্মবশতঃ মুখ ও ললাট রেখাঙ্কিত হইলেও, শিশুর মুখের মত উহা চিরনবীনভাবপূর্ণ ও [illegible] কেশরাজি ভুষারশুভ্র। পুরোহিত মহোদয়ের সদা

করুণা ও বাৎসল্য নিবন্ধন পল্লীর সকলেই তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

পৌরোহিত্যের পঞ্চাশৎবার্ষিক আসন্ন উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন দিবার সংকল্প করিল। মন্দিরের তিন জন রক্ষক গোপনে গৃহে গৃহে ফিরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগৃহীত হইলে তাহারা বৃদ্ধ পুরোহিতকে নিবেদন করিল যে, উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি যেন নগর হইতে একটি নূতন ঘণ্টা ক্রয় করিয়া আনেন।

অ্যাবে করেন্‌টিন্ বলিলেন, "বৎসগণ, দরাম্রয় ভুগবান্ স্বয়ং, অর্থাৎ তিনি কোনও উপায়ে—" আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কথা আর শেষ হইল না।

পরদিবস পুরোহিত মহাশয় মুষ্টা-ক্রয়ের অভিপ্রায়ে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন ক্রোশ পদব্রজে গিয়া রোব্‌নি-লে-রোজ গ্রামে তাঁহাকে গাড়ীতে চড়িতে হইবে। তথা হইতে নগর পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ।

আকাশ নির্ম্মল, মেঘলেশশূন্য। সমস্ত প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল। বৃক্ষের মর্ম্মর, পক্ষিকূজন ও ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত রাগিণী চারি দিক এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। নবাগন্তুক ঘণ্টার ভাবী মধুর আনন্দধ্বনি পুরোহিতের মস্তিষ্কে যেন বাজিয়া উঠিতেছিল। অনন্তসুন্দরের বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব মহিমা উপভোগ করিতে করিতে বৃদ্ধ প্রসন্নমনে উৎফুল্লহৃদয়ে পথ চলিতেছিলেন। রোব্‌নি-লে-রোজ গ্রামে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, গ্রামের প্রান্তভাগে রাজপথের এক পার্শ্বে বেদিয়াদিগের জীর্ণ বস্ত্রাবাস। তাহার অনতিদূরে রাজপথের পার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রান্তদেশে একটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ অশ্বের মৃতদেহ।

মলিন ছিন্নবেশ দুইটি বৃদ্ধ নরনারী মৃত অশ্বের পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছিল। অকস্মাৎ একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের মধ্য হইতে উঠিয়া তাঁহার অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে বলিল—"কিছু ভিক্ষা দিন।"

বালিকার কণ্ঠস্বরে শালীনতার অভাব নাই। তাহার বর্ণ ঈষৎ ম্লান, পরিধানে পীতাভ বসন এবং [illegible] জ্যাকেট। বালিকার নয়নযুগল বিশাল ও কোমল, ওষ্ঠাধর আরক্ত। তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত বাহু নীলপুষ্প-চিত্রিত।

পুরোহিত পাঁতি সংযত করিলেন। মুদ্রাধার হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিলেন। কিন্তু ভিখারিণীর দিকে চাহিবামাত্র তিনি কি ভাবিয়া তাহার অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

বালিকা বলিল, "আমার ভাই জেলে। সে নাকি মুরগী চুরী করিয়াছিল। টাকা রোজগার করিয়া সেই আমাদের সংসার চালাইত। আজ দু' দিন আমরা উপবাসী।"

পুরোহিত পয়সা কয়টি পকেটে রাখিয়া মুদ্রাধার হইতে একটি টাকা বাহির করিলেন।

বালিকা বলিয়া চলিল, "আমি নানা রকম ভোজবাজী দেখাই। আমার মা [illegible] গণনা করেন। [illegible] বেশ দেখিয়া নগর ও গ্রামের অধিবাসীরা আমাদিগকে [illegible] না। [illegible] হইয়া গেল। আমাদের এখন কি হইবে তা জানে?"

পুরোহিত বলিলেন, "গ্রামে কাহারও বাড়ীতে কোনও রকম কাজকর্ম যোগাড় করিয়া লইতে পার না?"

"গ্রামের লোকেরা আমাদের ভয় করে। নিকটে গেলে ঢিল ছুড়িয়া মারে। আর গৃহস্থ-বাড়ীর কাজকর্ম্মও আমরা মোটেই জানি না। ভোজবাজী ও নানারকম হাতের [illegible] আমরা শিখিয়াছি। যদি [illegible] কাপড় চোপড় কিনিবার মত কিছু [illegible] খোরাক [illegible] রকমে চালাইয়া লইতাম। কিন্তু এখন মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর কোনও [illegible]

বৃদ্ধ টাকাটি ব্যাগের [illegible] লইলেন।

"বাছা, ভগবানকে কি তুমি ভালবাস?"

বালিকা বলিল, "যদি তিনি আমাদের [illegible] তাঁহাকে ভাল [illegible]

পুরোহিত [illegible] বিশাল নয়নযুগল তাঁহার [illegible]

"তুমি [illegible]?"

বালি [illegible] তাঁহার কথা [illegible] বুঝিতে পা [illegible]

"বল, "দয়াময় ভগবান, আমি তোমায় ভালবাসি।"

বালিকা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার বিশাল নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া অঙ্গাবরণের বোতাম খুলিয়া মুদ্রাধার টানিয়া বাহির করিলেন। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তিনি উহা বালিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। বালিকা ক্ষিপ্রহস্তে মুদ্রাধারটি লইয়া বলিল, "ধন্যবাদ মসিয়ে আবে, আমি আপনাকেই ভালবাসি।"

বালিকা দ্রুতবেগে পিতামাতার কাছে ছুটিয়া গেল। তাহারা মৃত অশ্বের পার্শ্বে বসিয়া তখনও কাঁদিতেছিল।

ভগবানের রাজ্যে অভাবপীড়িত, নিরন্ন দরিদ্রের দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুরোহিত গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। একান্তমনে তিনি ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছিলেন, এই অজ্ঞানকৃত বালিকার হৃদয়স্থ অন্ধকাররাশি তাঁহার পূত সমুজ্জ্বল আলোকস্পর্শে যেন অপসৃত হয়। অনন্ত-সুন্দর দয়াময়ের পবিত্র প্রেম যেন বালিকার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করে। হয় ত অভাগিনী এ যাবৎ ধর্ম্মের কোনও শিক্ষাই পায় নাই! সে যেন এখন হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখে।

সহসা তাঁহার মনে হইল, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আর কোনও লাভ নাই ত! সঙ্গে আর অর্থ নাই, সুতরাং মন্দিরের ঘণ্টা এ যাত্রা বাঁধা রাখা হইবে কিরূপে? যে পথে তিনি আসিয়াছিলেন, সেই পথেই আবার ফিরিয়া চলিলেন।

পুরোহিত ভাবিতেছিলেন একটা অপরিচিতা, অজ্ঞাতকুলশীলা ভিখারিণীকে তিনি কি করিয়া অপরের গচ্ছিত এতগুলি টাকা দান করিলেন? বাস্তবিক, এ কথাটা এতক্ষণ তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। যদি বালিকাকে ধরিতে পারেন, এই আশায় তিনি দ্রুতবেগে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া তিনি মৃত অশ্ব ও শিবিরের ভগ্নাবশেষ বাতীত সেখানে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেখানে জনপ্রাণীও নাই!

স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিলেন, কার্য্যটি শুধু গুরুতর অন্যায় নয়, মহাপাপই হইয়াছে। তিনি বিধস্ত পল্লীবাসীদিগের নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছেন; তাহাদের তহবিল তছরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেও একপ্রকার চুরী। এই অপকর্ম্মবশতঃ কি

বিষময় ফল ফলিতে পারে, বৃদ্ধ সে বিষয়েও চিন্তা করিলেন। ঘটনাটা কিরূপে গোপন করা যায়? কেহ কেহ বা ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে! কোথায় গেলে পুনরায় পাঁচ শত টাকা সংগৃহীত হইবে? ভক্তকাল লোকের কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎই বা দিবেন? নিজের বা হাতের সন্তোষজনক উত্তর কি তিনি দিতে পারিবেন?

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণমেঘের গাঢ় ছায়া বিশ্বপটে আরও ঘোরাল লেখাইতেছিল। বৃষ্টি নামিয়া আসিল, বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। আবেগ-চঞ্চল বৃদ্ধ জড় পুতুলের মত বিষাদবিমূঢ় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। তিনি আকাশের ও নিজের অন্তরের অবস্থা লক্ষ্য করিতে করিতে নিজের আবাসে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধা পরিচারক—মন্দিরের সেবিকা তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন যে? আপনি কি নগরে যান নাই?"

জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিলেন, "আমি রোজালিন-রোডে পাল্কী ধরিতে পারি নাই। আর এক দিন যাইব। কিন্তু কাহাকে এ কথা বলিও না, আমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি।"

পরদিবস প্রভাতে নিয়মানুযায়ী তিনি মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিলেন না। সমস্ত দিবস নিজের শয়নকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্যানের মধ্যেও বেড়াইতে সাহস হইল না। তৎপরদিবস প্রাতে কোনও মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে অন্তিম উপাসনা করিবার জন্য পুরোহিত মহাশয় আহূত হইলেন।

মন্দিরের পরিচারিকা বলিল "প্রভু এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

পুরোহিত বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "দাসীর ভুল হইয়াছে, আমি আসিয়াছি।"

উপাসনা সারিয়া গৃহে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে জনৈক ভক্ত পল্লীবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

"সুপ্রভাত! নগর হইতে আসিবার সময় পথে আপনার বোধ হয় কোনও কষ্ট হয় নাই? পর্য্যটন আনন্দপ্রদ হইয়াছিল ত?"

পুরোহিত দ্বিতীয়বার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

"চমৎকার, বন্ধু, অতি চমৎকার!"

"ঘটনাটি কেমন?"

তিনি আবার মিথ্যা কথা বলিলেন। হায়! ইহার পর মিথ্যা কথার হিসাব রাখাই যে ভার হইয়া উঠিবে!

"অতি সুন্দর! দেখিলেই মনে হইবে, যেন খাঁটী রূপার তৈয়ারী। আর আওয়াজ কি মিষ্ট! একবার অঙ্গুলির আঘাতস্পর্শে এমন বাজিতে থাকিবে যে, সহজে থামিবে না!"

"আমরা কবে দেখিতে পাইব, প্রভু?"

"শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, বৎস। কিন্তু আগে দান খোলাই করিতে হইবে। আর ধর্ম্মগ্রন্থের কতিপয় শ্লোকও মুদ্রিত করা আবশ্যক। সুতরাং কিছু বিলম্ব হইতে পারে।"

গৃহে ফিরিয়া তিনি মন্দিরের সেবায়েতকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসে, মোটা কাপাসন, চাল ও আলমারী বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা পাওয়া যাইবে কি?"

"না প্রভু, আমার বোধ হয় সবের টাকাও হইবে না। আপনার কাপড়-চোপড়-মূল্য অতি সামান্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ, আজ হইতে আমি আর মাংস খাইব না। উহাতে আমার কোনও উপকারই হয় না।"

পরিচারিকা গম্ভীরভাবে বলিল, "মনিব আবার, আপনারি ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে। কল্য শুইতে যাইবার পর হইতেই আপনার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কি হইয়াছে, আমাকে বলুন।"

সে যে ভাবে প্রশ্ন করিল, তাহাতে আর গোপন করা চলে না। পুরোহিত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

"বুঝিয়াছি। আমি ইহাতে এক বিন্দুও বিস্মিত হই নাই। আপনার হৃদয়ের এই উদারতা ও দয়ার জন্য আপনার সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু অত ভাবিবেন না। পাঁচ শত টাকা যতদিন না সংগ্রহ করিতে পারেন, আমি [illegible] বুঝাইয়া রাখিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

[illegible] একটি নানারূপ গল্প রচনা করিয়া [illegible] শুনাইত।

[illegible] মন্দিরের সম্মুখে একটি [illegible] আছে। সুতরাং [illegible] হইবে।

[illegible] আর চলিল না। তখন পরিচারিকা জানাইল,